অবভাস ও তত্ত্ববস্তুবিচার

ফ্রেন্সিস হার্বার্ট ব্রেডলি

অবভাস ও তত্ত্ববস্তু বিচার

অবভাস ও তত্ত্ববস্তু বিচার
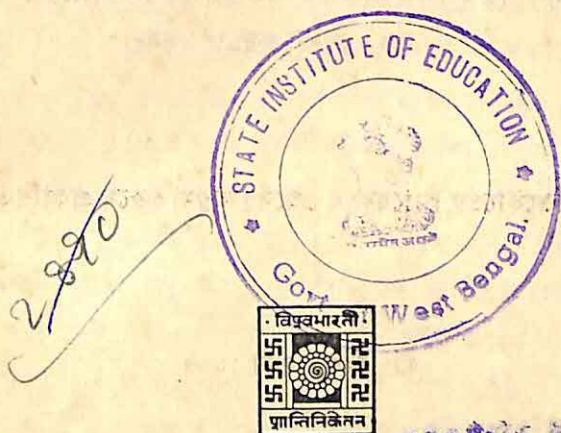
ফ্রেন্সিস হার্বার্ট ব্রেডলি

বি শ্ব ভা র তী

কলিকাতা

পূর্বাভাষ

'একশত বৎসরের ব্রিটিশ দর্শন'এর প্রণেতা জার্মেন পণ্ডিত রুডলফ মেটসের মতে ফ্রেন্সিস হার্বার্ট ব্রেডলি সর্বযুগের ব্রিটিশ দার্শনিকদের অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রধান গ্রন্থ, 'এপিয়ারেন্স এণ্ড রিয়েলিটি' বর্তমান যুগের ব্রিটিশ দর্শনের জগতে সবচেয়ে বেশি আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এই মতের সমর্থন পূর্বে ও পরে অনেকেই করেছেন। ব্রেডলির উক্ত গ্রন্থটি ডক্টর কেয়ার্ডের মতে কাণ্টের পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ বস্তু, 'দি গ্রেটেস্ট থিং সিন্স কাণ্ট'।

এরূপ গ্রন্থের অনুবাদ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ দর্শন-সাহিত্যের পুষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই গ্রন্থটির যথাযথ অনুবাদ অতীব দুষ্কর। গ্রন্থটি এক দিকে কতকটা আমাদের বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের 'মাধ্যমিককারিকা'র মত অথবা শ্রীহর্ষের 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যে'র মত, সকল প্রচলিত সিদ্ধান্ত ও ধারণার সূক্ষ্মবিশ্লেষণ এবং নির্মম খণ্ডন। অন্য দিকে এটি অনেকটা আমাদের অদ্বৈত দর্শনের মত, শুদ্ধ অপরোক্ষ অনুভূতির ভিত্তিতে এক অখণ্ড পরা চিৎসত্তার স্থাপনের অভিনব প্রয়াস। এরূপ জটিল গ্রন্থের ভারতীয় ভাষায় সম্যক অনুবাদের জন্য পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনের তত্ত্ব ও ভাষায় বিশেষ অধিকার থাকা আবশ্যক। ব্রেডলির দর্শনের এই মর্মানুবাদের প্রণেতা শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বহুলাংশে এইসব গুণের অধিকারী।

শ্রীমজুমদার আমাদের মতো 'দর্শন'জীবী অধ্যাপক নন। তিনি শাসন-বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ কাজে জীবনের অধিকাংশ কাল কাটিয়েছেন। কিন্তু আমরা বিহারে তাঁর ছাত্রজীবন থেকে এপর্যন্ত প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর লক্ষ্য করেছি, অন্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও দর্শনের অনুশীলন অব্যাহত ভাবে চলেছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে সকল কলা বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে ক্রমশ দর্শনে এম.এ. পরীক্ষায় তাঁর কৃতিত্ব আরো বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। অবিভক্ত বাংলার শাসন-বিভাগের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ঐ ক্ষেত্রে জীবিকা অবলম্বনের পরেও ক্রমাগত ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের অনুশীলন, ইংরেজিতে ও বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনা, বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের

কার্যে ও পত্রিকার পরিচালনায় সহায়তা ইত্যাদি সর্বদাই তিনি করে এসেছেন। কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের উদ্যোগে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস'এর বঙ্গানুবাদের কাজেও তিনি সাহায্য করেছেন। এই পুস্তকের হুয়াইট হেড সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ তাঁর। আমরা সর্বদাই লক্ষ্য করেছি দর্শনের মধ্যে যা দুরূহ ও দুর্বোধ (যথা অরবিন্দ ব্রেডলি বা হুয়াইট হেডের দর্শন) তার প্রতিই তাঁর আগ্রহ বেশি।

বর্তমান কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি দীর্ঘকাল পরিশ্রম করেছেন; কলকাতায়, শান্তিনিকেতন ও অন্যত্র দর্শনাভিজ্ঞ সুধীজনের ও বঙ্গভাষাবিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করেছেন, এবং ভাষা যথা-সম্ভব অনুবাদগন্ধবর্জিত ও সাবলীল করার জন্য পাণ্ডুলিপির পুনঃ পুনঃ সংশোধন করেছেন। তাঁর দীর্ঘ সাধনা ও যত্নে প্রস্তুত এই গ্রন্থটি আধুনিক ভারতের দর্শন-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করবে এবং বঙ্গীয় দর্শন-সাহিত্যেরও গৌরব বর্ধন করবে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ব্রেডলির এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের অনুবাদের পক্ষেও এটি সহায়ক হবে আশা করি।

এই পুস্তক-প্রকাশনের সহায়তা করে বাংলা সরকার ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

১ অগস্ট ১৯৬৫ — ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত

পূর্বপল্লী। শান্তিনিকেতন — ভূতপূর্ব অধ্যাপক। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচী

কতরকম তো করা হয়। তবুও সব হয় না। কখনো একটা. কখনো আর-একটা কারণের জন্য স্থায়ী ও চরমলাভ অসম্ভব হয়। প্রশ্ন ওঠে, তা হলে কি বিশ্বের অন্তস্থলে কোথায়ও একটা অশান্তির বিষ আছে। একটা ক্ষত বা ছিদ্র আছে? এবং তত্ত্ববিদ্যা জন্মলাভ করে। আপনি দর্শনকে অবহেলা করতে পারেন এবং অস্বীকার করতেও পারেন। কিন্তু খাদ্য পরিপাক করবার জন্য যেমন পিত্তরসের প্রয়োজন তেমনি জীবন পরিচালনা করবার জন্য দর্শনেরও প্রয়োজন। স্বীকার করুন চাই না করুন সেটা আছে। সেটা থাকে এইজন্য যে বুদ্ধির চেয়ে বিশ্বাসের স্থান আমাদের জীবনে অনেক বেশি; বিশ্বাসই বুদ্ধিকে দেখতে শেখায়। এবং কোন্ বিশ্বাসকে আমরা বুদ্ধিসম্মত বলে অবলম্বন করব সেই জিজ্ঞাসাই হচ্ছে মূলত ও মুখ্যত দর্শন।

ব্রেডলির দর্শন আমাদের টানে। যে-বিশ্বাসকে ব্রেডলির বিচার ও বুদ্ধি সমর্থন করে সে-বিশ্বাস ভারতীয়দের বহুযুগের বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "আমি নিত্য লীলা দুইই লই। তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই আবার জীব জগৎ হয়েছেন। জড় আবার কি? সবই চৈতন্য। তিনিই সব হয়েছেন। কোনোখানে বেশি প্রকাশ কোনোখানে কম প্রকাশ।" বুদ্ধির দীপ্তি, কারুকার্য, সূক্ষ্ম ও স্বাধীন চিন্তা ও মানুষের বড়ো বড়ো পুরুষার্থের প্রতি পূর্ণ সমর্থন সব-কিছু মিলিয়ে ব্রেডলির দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও স্বাদই আলাদা। সেইজন্য তাঁর মূল চিন্তাগুলোর একটা বাংলা নিষ্কর্ষ দেবার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা।

বলাই বাহুল্য যে যতখানি ব্রেডলিকে বুঝেছি ততখানিই তাঁকে অনুবাদ করতে পারব। সব অনুবাদই মর্ম-অনুবাদ নাও হতে পারে। তবে আমার এই গ্রন্থকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে না এবং মৌলিক রচনাও বলা যায় না। মূল গ্রন্থের ভাষা ও অর্থের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে লেখা সুকঠিন; সেটা একরকম অসম্ভব ব্যাপার বললেই চলে। অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছি এবং অর্থ যে-ভাষা দাবি করেছে সেই-ভাষা ব্যবহার করেছি। অর্থবতী ভাষার চেয়ে ভাষা-সর্বস্ব অর্থ উচ্চতর কখনো নয়। এবং কখনো কখনো অর্থবতী ভাষার দ্যুতি থাকাও সম্ভবপর।

ব্রেডলির *Appearance and Reality* (অবভাস ও তত্ত্ববস্তু বিচার) নামক বিখ্যাত গ্রন্থের দুই ভাগ। এক ভাগে অবভাসতত্ত্বের আলোচনা আছে এবং

অন্য ভাগে তত্ত্ববস্তুর আলোচনা আছে। প্রতীয়মান ও আপাতসত্য তথ্যাদি-সম্পর্কিত অধ্যায়গুলোর সংক্ষিপ্ত সারাংশ যতদূর সম্ভবপর, ব্রেডলির ভাষায় দিতে চেষ্টা করেছি। তার পর কয়েকটা অধ্যায়ের যেমন চতুর্দশ অধ্যায় থেকে একবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর চেয়ে বিস্তৃততররূপে সারাংশ দিতে চেষ্টা করেছি। দ্বাবিংশ অধ্যায় থেকে ব্রেডলির প্রতি পঙক্তির ভাব ও অর্থ রক্ষা করে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছি। সুতরাং কিছুটা স্বেচ্ছা-চারিতা করেছি। আরো এক ব্যাপারে স্বৈরাচারিতা করেছি। ব্রেডলির গ্রন্থে নানা বিদেশী উপমা ও দৃষ্টান্ত আছে। দশের বোঝবার সুবিধার জন্য এইসব উপমা ও দৃষ্টান্তের পরিবের্ত তজ্জাতীয় দেশের উদাহরণ বা উপমা সন্নিবেশিত করেছি। এই দুটো স্বকৃত অপরাধের জন্য গুণী সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রধানত নিজ মনের কলুষ ও মল পরিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে এই কাজে হাত দিয়েছিলাম। পরমশ্রদ্ধাভাজন দার্শনিক ধীরেন্দ্রমোহনের অমিত উৎসাহ, অনলস উপদেশ ও অকুণ্ঠ সাহচর্য না পেলে কাজ শেষ হত না এবং প্রকাশনায় সম্মত হতাম কি না সন্দেহ। বরেণ্য দার্শনিক ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য ও ডক্টর গোপীনাথ ভট্টাচার্যের কাছেও অনেক সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণ স্বীকার করছি।

আমার দেশের লোকে ব্রেডলির লেখা পড়ে যদি মনে বল, উৎসাহ ও অভয় পায়, তা হলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব। আমার এই কাজের ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও বিচ্যুতির সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত সচেতন; সেইজন্য কোনো প্রকার মাদক মোহ আমার নেই। অমিতধী ব্রেডলি শুধু দার্শনিক নন। প্লেটো, শঙ্কর ও বর্তমান যুগের হোয়াইট হেডের মতো ব্রেডলির রচনা হল বিশ্বের এক অমর ও বিস্ময়কর সাহিত্য। বাংলাদেশের রসস্রষ্টাদের কাছে হয়তো ব্রেডলির চিন্তাগুলোর একটা তাৎপর্য আছে।

১ জানুয়ারি ১৯৬৪ — জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার

অবভাস ও তত্ত্ববস্তু বিচার

প্রথম অধ্যায়

দর্শনের সার্থকতা

বর্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম, মহামতি ব্রেডলি দর্শনের সার্থকতা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সকলের প্রণিধানযোগ্য। যতদূর সম্ভবপর তাঁর ভাষায় তাঁর কথা বলতে চেষ্টা করেছি।

তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা করতে অনেক বাধা। দর্শন নিয়ে থাকা একরকম বাতুলতা। দর্শন ও দার্শনিকতা আর যাই কিছু হোক না কেন দাসত্ব নয়, চিরাচরিতকে মেনে নেওয়া নয়, মুগ্ধমনের শুদ্ধ প্রলাপ নয়। দার্শনিকদের দেখতে যতই শান্ত ও সমাহিত মনে হোক না কেন, তাদের অন্তরে আছে উষ্ণ বিদ্রোহ ও বিপুল দুরন্তপনা। তাদের বৃত্তি হল অসহযোগীর বৃত্তি; আপাত-দৃষ্টিতে তাদের প্রশ্নপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গী একটা অমার্জনীয় অপরাধ। বহুযুগের সুংস্কার, প্রাত্যহিক ও ব্যবহারিক জীবনের বহুজন-স্বীকৃত সত্য ও মিথ্যা, অস্থি-মাংসের ও রক্তের মধ্যে বাসা-বাঁধা নানাবিধ ধারণা, এগুলোর সব কিছুকে উপেক্ষা করে দার্শনিককে তার আলোচনা আরম্ভ করতে হয়। প্রথম থেকেই সে হচ্ছে সংগ্রামী। দর্শনের সম্ভাবনা নিয়েই অনেক সন্দেহ। এর মূল্য নিয়েও বহু সংশয়। বিশ্বকে সমগ্রভাবে জানবার প্রয়াসকে যদি দর্শন বলা যায়, তা হলে অনেকেই প্রথমে এই উক্তি করবেন যে, প্রথমত, এই প্রকার জ্ঞান অসম্ভব ও দ্বিতীয়ত, এই প্রকার জ্ঞান অসম্ভব না হলেও এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা বিশ্ব সম্বন্ধে যা জানতে পারি তা অকিঞ্চিৎকর ও মূল্যহীন।

উত্তরে বলা যায় যে যারা বিশ্বের বা পরমার্থের জ্ঞান অসম্ভব বলেন, তাঁরা না ভেবেচিন্তেই তাঁদের বিশৃঙ্খল স্বভাব অনুযায়ী এই কথা বলেন। কারণ, বিশ্বের বা পরমতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণা না থাকলে 'তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব' এ কথা বলাও অসম্ভব। অন্তত তাঁদের কাছে তত্ত্ব-জ্ঞান অসম্ভব, এই জ্ঞানটা সম্ভবপর হয়েছে। দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে দার্শনিক বিচারের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা স্বীকার করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, যাঁরা দর্শনের জ্ঞানকে সম্ভব বলে স্বীকার করেও তার মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে দার্শনিক এই কথাই বলবে যে, পরমার্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞান আংশিক ও অসম্পূর্ণ হলেও মূল্যহীন নয়; কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মানুষের

মনের একটা নিগূঢ় ও অপরিত্যাজ্য প্রবৃত্তির তৃপ্তি হয়; অপূর্ণ বলেই যে অকিঞ্চিৎকর হতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

এই দৃশ্যমান জগৎ মানুষকে নিয়ত বিস্ময়ে অভিভূত করে রাখে, তার বর্ণ, রূপ, রস ও সৌন্দর্যে। মানুষ বিশ্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন না করে পারে না। যতদিন মানুষ বিশ্বের মর্তাকাশব্যাপী রহস্যে রোমাঞ্চিত হবে, ধর্ম কাব্য ও কলার প্রদোষলোকে বিচরণ করে আনন্দ পাবে ততদিন দর্শনচিন্তারও তাৎপর্য ও মূল্য স্বীকৃত হবে। সাধারণ মানুষের মনও বিশ্বের স্বরূপকে জানতে চায়, তার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ জানতে চায়, জীবনের মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, ভালো ও মন্দের বিচার করে। এই-সব চিন্তা সাধারণ মানুষে করে মনের আরো অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে মিশিয়ে ও এলোমেলো ও ঘোলাটে ভাবে। দর্শন সাধারণের এই জানবার স্পৃহাকেই শোধন করে, সমর্থন করে। তার কথা হচ্ছে, জানতে যদি হয়ই, তবে একান্তভাবে, যথার্থভাবে বিচার করে জিজ্ঞাসার তৃপ্তি আনতে হবে; বেয়াড়া ভাবে নয়, খাপছাড়া ভাবে নয় ও খামখেয়ালী ভাবে নয়। নিষ্ঠা, নিপুণতা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে বিচারের মূল সূত্র অনুযায়ী অন্যান্য মানসিক বৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র জ্ঞানের পথ অনুসরণ করে এই জানবার আগ্রহকে পরিচালিত করবার সংকল্প ও সাধনা হচ্ছে দার্শনিকের। কেউ যদি অপরিচ্ছন্ন বিচারে তৃপ্ত থাকতে পারে, সে থাকুক। তেমনি কেউ যদি সম্যক বিচার না করে, সম্পূর্ণ পর্য্যালোচনা না করে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর না হতে চায় তাকেও নিন্দা করবার কোনো সংগত হেতু নেই। দর্শন আলোচনায় যদি আপাতদৃষ্টিতে কোনো লাভ নাও হয়, তবুও এই আলোচনা বৃথা এরকম ভাববার কোনো কারণ নেই। একমাত্র দর্শনই মানুষকে সাম্প্রতিকের পেষণ, কুসংস্কারের পীড়ন, বিষয়ের আধিপত্য ও সমস্ত রকম মোহ থেকে মুক্ত রাখতে পারে। একমাত্র বিচার-প্রিয় দর্শনই মানুষকে চিরমুক্ত সজীব ও সংস্কারহীন দৃষ্টি দিতে পারে। দিনের আলোতে শর্বরীর ভূত যেমন ছুটে পালায়, দর্শনের সংশয়-কুটিল ও শানিত বিদ্যুৎ-দৃষ্টির সম্মুখে তেমনি কুসংস্কার ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার দাঁড়াতে পারে না।

যে মানুষ অপরের দাসত্ব না করে, বিচারের পথে সত্যকে জানতে চায়, দর্শন তার পক্ষে উৎকৃষ্ট আশ্রয়। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে।

আমরা সকলেই কখনো না কখনো প্রাত্যহিক ঘটনার বাইরের এক বৃহত্তর জগতের আহ্বান শুনতে পাই। দৃশ্যমান জগতের বহির্ভূত এই বৃহত্তর জগতের ডাক আমাদের অনেককেই সময় সময় বিচলিত করে তোলে। নানা জনে নানা ভাবে নানা পথে তাদের জীবনে এমন সত্যের সামনে উপনীত হয় যার উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃই তারা স্বীকার করে নেয়, এই সত্য তাদের জীবনে স্বর্গের সংবাদ বহন করে আনে ও মহত্তর রসের আস্বাদন দেয়। মনুষ্যচরিত্রের এই আধ্যাত্মিক অংশের তৃপ্তি অনেকের কাছে আসে জ্ঞানের মার্গে। তারাই দার্শনিক। বৃহত্তর লোকের খবর একমাত্র জ্ঞানের ও বিচারের পথে যারা পায়, দর্শন তাদের রক্তের দোলায়। তাদের পক্ষে দর্শন জলবায়ুর মতো, খাদ্য-পানীয়ের মতো অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়। তাদের কাছে দর্শনের সার্থকতা তার নিজস্ব গতির মধ্যে। যার মনে জ্ঞানের চাঞ্চল্য এসেছে তার পক্ষে দর্শনের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্যপথ নেই এবং এই আত্মসমর্পণেই তার জীবনের সম্যক সার্থকতা। সাধারণত আত্মত্যাগের নামে আমরা যা করি তা তো শুধু অকিঞ্চিৎকরের দান বা ত্যাগ। কঠিনতর ব্রত ও কঠিনতর ত্যাগ ও আত্মসমর্পণ হচ্ছে জীবনের নির্দিষ্ট পথে নিজেকে পরিচালিত করার জন্য অন্য সবকিছু ত্যাগ। প্রথমে আমাকে জানতে হবে, নির্ধারণ করতে হবে, আমি কি চাই এবং আমি যা চাই তা পাওয়ার জন্য অন্য সবরকম বঞ্চনা ও ত্যাগ স্মিতমুখে আমাকে স্বীকার করতে হবে। এতেই জীবনের চরম সার্থকতা। এই আমৃত্যু দুঃখের তপস্যার জন্যও অনেকের পক্ষে দর্শনের আজীবন চর্চা নিতান্ত প্রয়োজন। যে মানুষ দর্শনের আদেশ পেয়েও তার সেবা করতে কুণ্ঠিত হয়, সুখ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভনে পথভ্রষ্ট হয়, সে হেয়, সে ঘৃণ্য।

দর্শনে প্রকৃত কোনো উন্নতি সম্ভবপর না হলেও প্রতি যুগের চিন্তা-ধারণার উপযোগী নূতনত্ব এতে দরকার ; নূতন ভাষা ও নূতন ভঙ্গীর দরকার। যেমন যুগে যুগে নূতন কাব্যের দরকার, তেমনি নূতন দর্শনের দরকার। নূতনের মূল্য এইখানে যে, যা নূতন ও নিকট তা মানুষের মনকে আকর্ষণ করে বেশি। প্রত্যেক যুগের মানুষের মনের প্রকৃষ্ট বৃত্তিগুলোর চালনা করবার জন্য দরকার নূতন নূতন দর্শন ; নূতন দর্শন পুরাতনের চেয়ে ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তাতে আসে যায় না। যা সনাতন তাকেও

নূতন নূতন ফুলে ফলে ও পল্লবে যুগে যুগে আমাদের কাছে আসতে হবে। যেহেতু মানুষ বদলায়, সেইজন্য দর্শনেরও পরিবর্তন দরকার।]

শেষ কথা এই যে, আমরা যেন মনে না করি যে, একমাত্র জ্ঞান-পথেই পরমার্থস্পৃহা তৃপ্ত হয়। পরমার্থে পৌঁছবার আরো অনেক পথ আছে। কোনো একটা বিশেষ বৃত্তি বা সাধনা ঈশ্বরে পৌঁছবার একমাত্র পথ নয়। এবং বিচারের পথ বা দর্শনের পথ যে অন্যান্য পথের চেয়ে উচ্চতর এমন কথাও বলা চলে না। দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গর্বই হচ্ছে দার্শনিকের নিকৃষ্ট অপরাধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রধান ও অপ্রধান গুণ

স্বগত ও আগন্তুক গুণ

সাধারণত বিশ্বকে আমরা যে ভাবে বিচার করি তাতে অনেক ত্রুটি আছে। সুতরাং আমাদের সাধারণভাবে-বোঝা যে বিশ্ব তা বস্তু নয়, সেটা আপাতস্বীকৃত বিষয় মাত্র। পারমার্থিক বিচারে যা টেঁকে, যাকে সত্য বলে স্বীকার করলে কোনো অসংগতিদোষ হয় না, শুধু তাকেই বস্তু বলে গ্রহণ করা চলে। এবং যা শুধু অনুভবের মধ্যে ধৃত বা যার সত্তা অন্যপ্রকার কোনো সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে আপাতস্বীকৃত, তার নাম অবভাস বা ভান।

অনেকদিন থেকে পাশ্চাত্যে এই মতবাদ প্রচলিত আছে যে আমরা জগতে যা-কিছু অনুভব করি বা প্রত্যক্ষ করি তার দুটো দিক আছে। এক দিক প্রধান-গুণ-বিশিষ্ট ও আর-এক দিক অপ্রধান-গুণবিশিষ্ট। দৃশ্য-জগতের বস্তুনিচয়ের আছে : ১. বিস্তার বা ব্যাপ্তি ও গতি এবং : ২. বর্ণ, গন্ধ, রস, ভার ইত্যাদি অন্যান্য গুণ। প্রথমোক্ত গুণনিচয়কে প্রধান গুণ ও দ্বিতীয়শ্রেণীর গুণাবলীকে অপ্রধান গুণ বলে সাধারণত অভিহিত করা হয়। প্রধান গুণই হল সত্য এবং অপ্রধান গুণ হল অবভাস বা ভান মাত্র, এই হচ্ছে এই মতাবলম্বীদের বক্তব্য। তাদের যুক্তি হচ্ছে মূলত একটা : যা সত্য তা পরিবর্তনশীল নয়। যে গুণ এক অবস্থায় আছে এবং অন্য অবস্থায় নেই তাকে

বিশ্বের সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। সেই পদার্থই সত্য, যা স্বয়ং-নির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অসংগতিদোষমুক্ত। আমরা বহির্জগতে যা কিছু অনুভব করি তার বিস্তার ও গতি, তার দেশ-জনিত গুণ কখনো নষ্ট হয় না কিন্তু তার বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি অন্যান্য গুণের নিত্য পরিবর্তন হয়। তা ছাড়া, অপ্রধান গুণকে বাস্তবিক বলে স্বীকার করা যায় না; কারণ, তার উৎপত্তি ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শের ওপর নির্ভরশীল। একই বস্তু দুজনের চক্ষুতে দুপ্রকার বর্ণের অনুভব আনে; আবার চক্ষুর অভাবে বর্ণেরও অভাব অনুভূত হয়; তার ওপর যে চক্ষুর সংযোগে বর্ণজ্ঞান জন্মে তার মধ্যেও অপর চক্ষুর সংযোগ ব্যতিরেকে কোনো বর্ণ পাওয়া যায় না; সুতরাং বর্ণ না বস্তুতে, না দ্রষ্টা চক্ষুতে আছে। অদৃষ্ট বর্ণ, অনাঘ্রাত গন্ধ, অশ্রুত শব্দ বলে কিছু নেই। শৈত্য, উত্তাপ, শব্দ, ঘ্রাণ, রস প্রভৃতি অন্যান্য গুণের জ্ঞান সম্বন্ধেও এই একই যুক্তি প্রযোজ্য। যদি ঘ্রাণগ্রহণের জন্য কারো নাসিকা না থাকে তা হলে কি আর পুষ্পের সুগন্ধ থাকে? যদি শব্দ গ্রহণের জন্য কারো কর্ণ না থাকে তা হলে কি আর পক্ষীর কলতান থাকে? এ ছাড়া সুখকর ও অসুখকর অনুভবের কথা ধরা যাক। ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ব্যতীত কি আর বস্তুতে সুখকর ও অসুখকর অনুভব বর্তমান থাকে? অপ্রধান গুণনিচয় বিস্তারশীল ও গতিসম্পন্ন বস্তুর বিশেষণ মাত্র; আকস্মিক আবির্ভাবরূপে তারা আসে। সুতরাং দেশ-জনিত গুণের জ্ঞান সত্য। অন্যান্য গুণ অসত্য প্রপঞ্চমাত্র।

এই যুক্তির দুটো দিক আছে। প্রথমত বলা হয়েছে যে, অপ্রধান গুণাবলী বস্তুত নেই; দ্বিতীয়ত, প্রধান গুণাবলী বস্তুত সত্য। অপ্রধান গুণের সত্যতার সমর্থনে এ কথা কি বলা চলে না যে এই গুণগুলো সব সময়ই বস্তুতে নিহিত থাকে, কিন্তু কখনো এরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় এবং কখনো হয় না, এবং কখনো যে হয় না তার কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় ও সহকারী অবস্থার মধ্যে দোষ থাকে? না, এরকম বলা চলে না। কারণ, যে গুণ ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-জাত সেই গুণ ইন্দ্রিয়সংযোগহীন অবস্থাতেও একই রকমই থাকে, এ কথা অর্থশূন্য। প্রিয়া আমার সব সময়েই মনোরমা এ বিশ্বাস তবুও হয়তো রাখা চলে; কিন্তু বস্তুর মধ্যে বা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অননুভূত অবস্থাতেও সুখ ও অসুখ, ঘ্রাণ ও রস পূর্ববৎ রক্ষিত থাকে এই বিশ্বাস রাখা অসম্ভব। চক্ষু-সংযোগ-রহিত লোহিত যদি থাকে, চক্ষু-সংযোগ-জনিত লোহিতের সঙ্গে তা যে সমান-ধর্মা, এর

প্রমাণ কি করে সম্ভব? এবং তা যদি অসম্ভব, তবে দ্বিতীয় প্রকারের লোহিত যে ইন্দ্রিয়-সংসর্গহীন অবস্থাতেও বাস্তবিকই থাকে, তা বলবার পক্ষে যুক্তি কই? এ ছাড়া লোহিতের বস্তুত্ব স্বীকার করলে তার সঙ্গে সুখকর লোহিত, অসুখকর লোহিতেরও বাস্তবিকতা ইন্দ্রিয়ানুভবহীন অবস্থায় স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এরকম স্বীকার করা শুধু আজগুবি ও উদ্ভট কল্পনার সাহায্যেই সম্ভব। অতএব অপ্রধান গুণকে অবভাস বা ভান-পর্যায়ভুক্ত করতে আমরা বাধ্য।

কিন্তু অপ্রধান গুণগুলো কি প্রধান গুণের রূপান্তর বা অবভাস? প্রধান গুণগুলোই কি বস্তুর প্রকৃত রূপ? বিস্তার ও গতিই হচ্ছে বস্তুত্ব, এই মতবাদের অন্য নাম জড়বাদ। কিন্তু এই মতবাদ কি সত্য? বর্ণ, রস, গন্ধ আদি অপ্রধান গুণাবলীর সঙ্গে বিস্তার ও গতির সম্বন্ধ একেবারেই দুর্বোধ্য। কারণ অপ্রধান গুণগুলোর সত্তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং দ্রব্যের বা বস্তুর মধ্যে এদের একটা স্থান নিশ্চয়ই আছে মানতে হয়। কিন্তু বস্তুর মধ্যে স্থান থাকলে অপ্রধান গুণকে মিথ্যা বলা চলে না। তা হলে স্বীকার করতে হয়, জড় পদার্থ প্রধান ও অপ্রধান দুই শ্রেণীর গুণেরই অধিকারী; অথচ এ হতে পারে না। তা ছাড়া যে যুক্তির বলে অপ্রধান গুণকে অবস্তু বলা হচ্ছে সেই যুক্তি বিস্তার ও গতির বেলাতেও প্রযোজ্য। বিস্তার ও গতির জ্ঞানও ইন্দ্রিয়-সংসর্গ ব্যতীত সম্ভব নয়। এবং যে বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিস্তার ও গতির অনুভব হয় তার বিস্তার ও গতি অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয়। সুতরাং বিস্তার ও গতির সংশয়হীন সত্যতা রক্ষা করতে হলে জড়বাদীকে মানতে হবে যে ইন্দ্রিয়ের সংসর্গ বিনা অন্য কোনো রহস্যজনক ভাবে বিস্তার ও গতিকে জানা যায়। যে-দোষে অপ্রধান গুণ দুষ্ট, সেই-দোষেই প্রধান গুণও দুষ্ট। আরো কথা আছে। অপ্রধান গুণ ব্যতীত প্রধান গুণের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। বিস্তার ও গতি শুদ্ধ বিস্তার ও গতি হতে পারে না। কিসের বিস্তার ও কিসের গতি? বর্ণ, গন্ধ, তাপ, শব্দ, কঠিনতা বা কোমলতা প্রভৃতি অন্যান্য তথাকথিত অপ্রধান গুণের সঙ্গে বিস্তার ও গতির জ্ঞান ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। নিছক গতি ও নিছক বিস্তার একটা কল্পনা মাত্র; একটা বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অনুভবের একাংশ থেকে অন্যাংশ বিচ্ছিন্ন করে তবে শুদ্ধ গতি ও শুদ্ধ বিস্তারকে পাওয়া যায়।

যিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অপ্রধান গুণকে প্রধানের ক্রিয়ারূপে দেখতে চান, সেজন্য তিনি এক বিশেষ ভাবে অগ্রসর হন; ও বিস্তার ও গতিকে বর্ণহীন, গন্ধহীন, শব্দহীন ও রসহীন রূপে কল্পনা করেন। এমন বৈজ্ঞানিক কি জন্মাতে পারেন না যিনি বর্ণকে বা গন্ধকে বা তাপকে প্রধান গুণ ও অন্য গুণাবলীকে অপ্রধান স্বীকার করে বিশ্বের বিবর্তন বোঝাবার চেষ্টা করবেন? কিন্তু এই-সব প্রচেষ্টা দ্বারা কখনো প্রমাণিত হয় না যে, শুধু এক শ্রেণীর গুণই সত্য ও অন্য শ্রেণীর গুণ মিথ্যা। কিংবা এও প্রমাণিত হয় না যে, যে-গুণগুলোকে প্রধান বলে কল্পনা করা হচ্ছে সেগুলো প্রকৃতপক্ষে অপ্রধান গুণগুলো থেকে বিশ্লিষ্টভাবে থাকতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্রব্য ও গুণ

বিশেষ্য ও বিশেষণ

বিশ্বের যাবতীয় তথ্যকে বিশেষ্য বা দ্রব্য ও বিশেষণ বা গুণ, এই দুইভাগে বিশ্লেষণ করবার রীতি বহুদিন থেকে চলে আসছে। যেমন ধরা যাক, এক টুকরো মিছরি। মিছরি একটা দ্রব্য বা বস্তু (এখানে ব্রেডলি চিনির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন)। এর কতগুলো গুণ বা বিশেষণ আছে। যেমন, মিছরি মিষ্টি, শক্ত ও সাদা। মিছরি যদি শুধুমাত্র মিষ্টি হত তা হলে এর পক্ষে মিষ্টি হওয়া অসম্ভব হত। কোনো জিনিস শুধু মিষ্টি, আর কিছু নয়, এরকম হতে পারে না। আবার মিছরির মিষ্টত্ব অন্যান্য গুণের থেকে পৃথক। সুতরাং মিষ্টত্ব অন্যান্য গুণের থেকে পৃথক এবং অপৃথক, দুইই। কিন্তু এ গুণগুলোর পৃথক পৃথক অস্তিত্বের যোগফল মিছরিখণ্ড নয়, এ গুণগুলোর একটা ঐকাত্ম্য থাকা দরকার; অথচ মিছরির মধ্যে গুণের সমাবেশ ব্যতীত অন্য কোনো ঐক্য বা ঐকাত্ম্য আমরা খুঁজে পাই না।

এরকম হয়তো বলতে ইচ্ছা করবে যে, গুণগুলোর সহাবস্থান অর্থাৎ এদের পরস্পরসম্বন্ধ -রূপই হল মিছরি। বিভিন্ন গুণগুলো আছে এবং তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধের বন্ধন আছে; তার মানে, প্রত্যেকটা গুণের সঙ্গে অন্য গুণের

একটা সম্বন্ধ আছে কল্পনা করতে হয়। কিন্তু 'সম্বন্ধ থাকার' পরিষ্কার অর্থ আমাদের জানা নেই। মিষ্টত্বের সঙ্গে শ্বেতত্বের সম্বন্ধ তখনই সম্ভব যখন দুয়ের মধ্যে কোনো মিল বা ঐক্য আছে। এই ঐক্য কি? মিষ্টত্ব, শ্বেতত্ব ইত্যাদির বাইরে কোনো দ্রব্য নেই। যাকে দ্রব্য বলা হচ্ছে, তা যদি পর্দার অন্তরালে অবস্থিত অবভাসবহির্ভূত অন্য কোনো সত্য পদার্থ হয়, তার সঙ্গে গুণগুলোর সংযোগ কি করে সম্ভব? এই ভাবে গুণ চায় দ্রব্যকে এবং দ্রব্য চায় গুণকে। এবং এই পরস্পর চাওয়া-চাওয়ি দ্বারা সত্যবস্তু সন্ধানের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়।

অনুভবে যে অখণ্ডতা বা একতা লক্ষিত হয়, বিচারের সময় সে একতার বিনাশ সাধিত হয়। একক অনুভব থেকে দ্রব্য ও তার গুণাবলীর ভাব উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিশ্লেষণের ফলে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে, এক গুণ ও অন্য গুণের মধ্যে যে ব্যবধান উপস্থিত হয় তা কিছুতেই চিন্তাদ্বারা দূর করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। দ্রব্যের অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত হয় মিথ্যায়, না হয় এক উদ্ভট কল্পনায় পরিণত হয়। এমন হয়তো কেউ বলতে পারেন যে, এই ব্যর্থতা আমাদের চিন্তাশক্তির ব্যর্থতা প্রমাণ করে, অন্য কিছু নয়। কিন্তু এভাবে এই বিষয়ের মীমাংসা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের বিচার্য হচ্ছে বিশ্বের স্বরূপকে কিভাবে চিন্তা করলে নির্ভুল হবে। চিন্তার ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য খাড়া করে সব কিছু আরো ঘোলাটে করা কোনো কাজের কথা নয়। বস্তু কি? এই প্রশ্নের অর্থই হচ্ছে বস্তুকে কি ভাবে চিন্তা বা বিচার করলে সেই বিচার সত্য হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

গুণ ও সম্বন্ধ

ব্যবহারিক জগতে, কাজের জন্য, আমরা যা কিছু অনুভব করি তাকে গুণ ও সম্বন্ধ, এই দুই ভাগে ভাগ করি। কিন্তু এই ভাবে আমরা যা পাই তা পারমার্থিক বস্তু নয়। সম্বন্ধ ব্যতিরেকে গুণ কিছুই নয়। এবং গুণ ব্যতিরেকে সম্বন্ধও কিছু নয়।

মনস্তত্ত্ব আমাদের শিখিয়েছে কেমন করে বিভিন্ন গুণের উৎপত্তি সম্বন্ধের ওপর নির্ভর করে ; আরো শিখিয়েছে যে, ছুটো গুণের পার্থক্য ছাড়া গুণের অনুভব সম্ভব নয়। এ পথে না গিয়েও বোঝা যায় যে, সম্বন্ধহীন অবস্থায় গুণকে কখনো আমরা দেখতে পাই না। আমাদের চেতনায় দেখতে পাই সব সময় একটা গুণ অন্য এক বা ততোধিক গুণের সঙ্গে একত্র সম্বদ্ধ। কিন্তু কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, দুই বা ততোধিক গুণ কখনো অসম্বদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না, এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তাদের পৃথক অস্তিত্ব নেই। পৃথক পৃথক অস্তিত্বশীল গুণকে জানতে হলে সম্বদ্ধ অবস্থায় দেখতে হয়, এটা শুধু আমাদের মনের বৈশিষ্ট্য। এই যুক্তি অসার। কারণ, যে মানসিক ক্রিয়ার বলে গুণগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে জানা যায় সেই মানসিক ক্রিয়াকে আকস্মিক ও বাহ্য বলে বিবেচনা করা সম্পূর্ণ অসংগত। অখণ্ড অনুভবকে মানসিক নির্বাচন ক্রিয়ার সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণরূপে জানতে পারা যায় এবং এই নির্বাচন একপ্রকার সম্বন্ধ-স্থাপন ব্যতীত আর কিছুই নয়। মোট কথা, পৃথক পৃথক ভাবে গুণগুলোকে জানতে হলে তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ সংস্থাপন করা অনিবার্য। এর মানে গুণগুলোকে বস্তুত পৃথক বিচার করা অসম্ভব। অন্য দিক থেকে গুণগুলোর মধ্যে স্বভাব-সিদ্ধ পার্থক্য না মানলে তাদের মানসিক পৃথক্‌করণ বা নির্বাচন কি করে সম্ভব তাও বোঝা যায় না, সুতরাং সম্বন্ধ থেকে গুণের উৎপত্তি এ কথাও বলা চলে না।

সার কথা, গুণ ও সম্বন্ধের স্বরূপ আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। গুণের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার না করে সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব। আবার সম্বন্ধের ক্রিয়া স্বীকার না করে গুণের পার্থক্য-স্বীকার অসম্ভব। পর্যালোচনা করলে এই পরস্পর-বিরোধী রূপ আমাদের কাছে একান্ত স্পষ্ট।

দেশ ও কাল

দেশকে আমরা পাই ব্যাপ্তি বা বিস্তারের রূপে। দেশকে দুইভাবে দেখা যায়, অনুভাবে ও বিভুভাবে। যে ভাবেই দেশকে দেখা যাক না কেন দেশের কোনো সীমা নেই। এক টুকরো বিস্তারকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিস্তারে ভাগ করা যায় এবং এই বিভাজনের কোনো সীমা নেই। যত অণুপরিমাণ বিস্তারই হোক না কেন তারও অংশ কল্পনা করা যায়। সেই-রকম বিস্তারকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর রূপে কল্পনা করা যায়। যত বড়োই বিস্তার হোক না কেন তার চেয়েও বড়ো বিস্তারের কল্পনা সম্ভব।

দেশ একটা বস্তু অথবা একটা গুণ ; কিন্তু দেশকে বস্তু অথবা গুণ চিন্তা করতে অনেক বাধা। দেশ একটা সম্বন্ধ, আবার শুধু সম্বন্ধ হওয়াও দেশের পক্ষে অসম্ভব। দেশ শুদ্ধ সম্বন্ধ নয়। বিস্তারের অংশ বিস্তারই হতে পারে, বিস্তারাংশ শুধু বিস্তারের একাংশ ও অন্য-অংশের মধ্যে সম্বন্ধ হতে পারে না। সেইরকম সমগ্র দেশও একটা বস্তু। তা না হলে অংশের কথা বলা যায় কি করে ? অন্য দিক থেকে দেশ বস্তু নয়। একটুকরো দেশের বা স্থলের কল্পনা করুন। ঐ দেশ এক বিস্তৃত পদার্থ যা ক্ষুদ্রতর কয়েক টুকরো বিস্তৃত পদার্থের সংযোগ, আবার ঐ সব ক্ষুদ্রতর বিস্তৃতি আরো ক্ষুদ্র বিস্তৃতির সমূহ। এই ভাবে অণু থেকে অণুতর অংশের সংযোগ বা সম্বন্ধই দেশ। এ ছাড়া আর-একটা সমস্যা দেশ সম্বন্ধে আছে। আমরা যখনই কোনো দেশ বা স্থলকে অনুভব করি, এই অনুভবে অন্য প্রকার গুণের অনুভবও সংযুক্ত থাকে, যেমন বর্ণ, গন্ধ, ভার ইত্যাদির অনুভূতি। বিস্তারের সঙ্গে এই বর্ণাদি গুণের কি সম্বন্ধ আমরা সম্যক ধারণা করতে পারি না। আমরা বলে থাকি বর্ণাদি গুণ বিস্তারের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। কিন্তু 'অন্তর্নিহিত' বলতে আমরা কি বুঝি সম্যক্ প্রকাশ করা যায় না।

এবার কাল সম্বন্ধে বিচার করা যাক। সাধারণত কালকে আমরা দেশের ছবিতে বুঝতে চেষ্টা করি। আমরা কল্পনা করি, কাল যেন একটা স্রোতস্বিনী। অতীত ও ভবিষ্যৎ এই স্রোতস্বিনীর ধারার অংশবিশেষ। দেশের সম্বন্ধে যে-সব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, দেশ-রূপীয় কালের

বেলাতেও সেই-সব যুক্তি প্রযোজ্য। কাল একটা সম্বন্ধ ; আবার শুদ্ধ সম্বন্ধ নয়। কাল একটা বস্তু ; কিন্তু কালের শুধু বস্তু হওয়া অসম্ভব। কাল শুধু সম্বন্ধ নয় ; কারণ, কাল অর্থাৎ স্থিতি বা বর্তনার অংশ স্থিতি বা বর্তনাই হতে পারে। সেইরকম সমগ্র কালও একটা স্থিতি। তা না হলে, তার অংশ স্থিতিহীন শূন্যমাত্রে পরিণত হয়। অন্য দিক থেকে, সমগ্র কাল অসংখ্য ক্ষণের মধ্যে পূর্ব-পশ্চাৎ-সম্বন্ধ-যুক্ত একটা ধারা। ক্ষণগুলোর মধ্যে কতগুলো অগ্রে ও কতগুলো পশ্চাতে, এইটাই কালের স্বরূপ। সুতরাং কাল এই অগ্র ও পশ্চাৎ সম্বন্ধ। এ ছাড়া দেশের বেলাতে যেমন প্রশ্ন ওঠে কালের বেলাতেও তেমন ওঠে যে, অন্যান্য গুণগুলো কালের মধ্যে কি ভাবে থাকে ? কাল ও অন্যান্য গুণের সম্বন্ধের স্বরূপ ধারণা করা অসম্ভব।

আপনি হয়তো বলবেন যে, কালের দেশরূপীয় চিত্র মিথ্যা হতে বাধ্য ; কারণ ; কাল ও দেশ স্বরূপত পৃথক, কিন্তু প্রকৃত কালে কোনো অসংগতি নেই। দেখা যাক, এই মত কত দূর সত্য।

অনুভূত কাল হচ্ছে বর্তমানের অনুভূতি, 'এখন'-এর অনুভূতি। এই 'এখন'-এর অনুভূতি কি অবিভাজ্য ? তা কখনোই হতে পারে না। কারণ কাল অর্থে পূর্ব ও পশ্চাৎ-এর ধারা বুঝতে হবে। সুতরাং আমরা 'এখন' বলে যা অনুভব করি তার মধ্যেও নানা দিক আছে। কারো কারো মতে এই 'এখন'-এর মধ্যে আমরা অতীত ও ভবিষ্যৎকে অনুভব করতে পারি। অন্য আর-এক মতে 'এখন'-এর অনুভবের মধ্যে ভবিষ্যৎ অনুভূত হয় না। 'এখন'-এর মধ্যে একটা অস্থিরতা আছে, যার জন্য 'এখন'-এর অনুভবের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বর্তমান অতীতে পরিণত হচ্ছে। যে মুহূর্তে 'এখন'-এর মধ্যে এক অবস্থা (পূর্ব) থেকে অন্য অবস্থায় (পশ্চাৎ) গমন এসে পড়ে, সেই মুহূর্তে নানারকম অসুবিধা উপস্থিত হয়। পূর্বাংশ পশ্চাদংশের মধ্যে অন্য 'এখন'-এর কল্পনা করতে বাধ্য হতে হয় এবং এই 'এখন'-এর কোনো সীমা থাকে না। 'এখন' যদি একটা নিটোল ক্ষণ না হয়, যার কিছুটা স্থিতি আছে, তা হলে পূর্ব ও পশ্চাতের ধারা বোঝা যায় না এবং 'এখন' যদি একটুকরো স্থিতি হয়, এই স্থিতির কোনো আরম্ভ বা শেষ সম্ভব নয়। এর ফলে এই স্থিতির টুকরোগুলো কালাতীত হয়ে পড়ে। অথচ ছোটো ছোটো স্থিতির টুকরোগুলোর সংযোগে সমগ্র কাল তৈরি, এ ধারণা পরিত্যাগ করা

যায় না। কালাতীত স্থিতির টুকরোর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাকে কাল বলে কল্পনা করতে হয়। এই কল্পনা অসম্ভবের কল্পনা। এ ছাড়া কালের অবধি নেই। কালের স্বরূপ হচ্ছে নিজেকে অতিক্রম করে চলা। কিন্তু সতত-অতিক্রমশীল কালের কোনো অন্তিম বিন্দু খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং কালের ধারণাও অসংগতিপূর্ণ এবং অসত্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গতি, পরিবর্তন ও তার অনুভব

গতির অর্থ এই যে, যা গমনশীল তা অভিন্ন সময়ে দুই ভিন্ন স্থানে আছে। এবং কি করে এ ব্যাপার সম্ভবপর হয় বোঝা যায় না। গতির জন্য দরকার গতিশীল পদার্থের একত্ব এবং গমনক্রিয়ার অবিচ্ছিন্ন ঐক্য। পূর্বাপর দুই স্থানে একই পদার্থের গমনের জন্য কালের বিচ্ছেদহীন ও ভেদহীন ঐক্য প্রয়োজন। কাল যদি সম্বন্ধহীন ক্ষণের সমষ্টি হয় তা হলে গতি অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু কাল যদি বিচ্ছেদহীন ও অংশহীন সমগ্র সত্তা হয়, তা হলে তার বিভাজন অসম্ভব ; সুতরাং সেটাও সত্য নয়।

এই বিষয়ে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এই : কাল ও দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক অংশ-বিশেষে বিভক্ত এবং প্রত্যেক কালের অংশ (ক্ষণ) প্রত্যেক দেশের অংশের (বিন্দু) সঙ্গে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত এবং সময় বা সময়ের গতি হচ্ছে এই কালহীন অংশবিশেষগুলোর মাঝখানকার ব্যবধান। কিন্তু কালকে এই-ভাবে কল্পনা করাতেও সমস্যা থেকেই যায়। কালহীন পদার্থগুলোর (ক্ষণ-গুলোর) মধ্যস্থলে যে ব্যবধান তাদের সমন্বয়ে সমগ্র স্থিতিকাল কি ভাবে তৈরি হতে পারে তা আমাদের ধারণার অতীত। এ ছাড়া যে পদার্থটি গমনশীল তার অভিন্নত্ব এই প্রকার অসংগতিপূর্ণ কালের মধ্যে কি ভাবে রক্ষিত হয় তাও অবোধ্য।

পরিবর্তনের সমস্যা গতির সমস্যার চাইতে আরো গোড়াকার সমস্যা পরিবর্তন যদি অসমর্থনীয়, তা হলে গতিও অসমর্থনীয়। পরিবর্তনের অর্থই হচ্ছে কোনো পদার্থের পরিবর্তন। সুতরাং পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক আছে,

একের দিক ও অনেকের দিক। মনে করুন, একটা পদার্থ 'ক' পরিবর্তিত হচ্ছে। যেহেতু 'ক' পরিবর্তনশীল, 'ক' স্থায়ী হতে পারে না। অথচ 'ক' যদি স্থায়ী না হয়, তবে কার পরিবর্তন হচ্ছে? যদি কালের মধ্যে 'ক'-এর কোনো পরিবর্তন না হয়, তা হলে 'ক' অপরিবর্তনশীল হয়ে ওঠে। আবার যেই 'ক'-এর পরিবর্তন হচ্ছে, অমনি 'ক' ক-১, ক-২ -এ পরিণত হচ্ছে, তা হলে পরিবর্তনের পর 'ক' থাকছে কোথায়? এই সমস্যাটি অন্য ভাবে দেখলে এইরকম মনে হয়। 'ক'-এর বিভিন্ন অবস্থাকে একই কালের পরিধির মধ্যে থাকতে হয়, অথচ কাল ধারাবাহিক। অর্থাৎ 'ক'-এর বিভিন্ন অবস্থাকে একই সঙ্গে ক্রমিক ও যুগপৎ হতে হয়। এই ব্যাপার সম্পূর্ণ অসম্ভব ও আজগবী। সুতরাং পরিবর্তন অযৌক্তিক ও পারমার্থিক বিচারে অসত্য।

ক্রমিক কালের জন্য একত্ব ও নানাত্ব দুয়েরই প্রয়োজন অথচ এই দুই দিকের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বা সংগতি সম্ভব নয়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমরা কখনো একত্বের দিকে, কখনো নানাত্বের দিকে, কখনো ধারা বা গতির দিকে, কখনো বর্তমানতা বা উপস্থিতির দিকে, কখনো সমগ্রের দিকে, কখনো বিভিন্ন অংশের মধ্যস্থিত ব্যবধানের দিকে মনঃসংযোগ করি। কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা এই বিভিন্ন দিকের মধ্যে কোনো সংগতি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বৃথা। এই ব্যর্থতা প্রমাণ করে কাল পারমার্থিক পদার্থ নয়।

STATE INSTITUTE OF EDUCATION Govt. of West Bengal

সপ্তম অধ্যায়

কার্য-কারণ সম্বন্ধ

পরিবর্তনের অস্তিত্ব স্বীকার করলে পরিবর্তন বোঝবার জন্য কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। 'ক' 'খ'-এ পরিণত হল। 'ক', 'ক'ই থাকবে; 'ক' যখন 'খ'-এ পরিণত হয়েছে, তখন অন্য কিছুর জন্য এরকম সম্ভবপর হয়েছে। এই অন্য কিছুকে দিয়েই পরিবর্তনকে বুঝতে হবে। এই অন্য কিছুই তা হলে 'ক'-এর পরিবর্তনের কারণ। সোজা ভাষায়, 'ক'-এর যদি 'খ'-এ পরিণত হওয়া অসম্ভব, তা হলে 'ক+গ' বোধ হয় 'খ'-এ পরিণত

হয়েছে। দেখা যাক এইভাবে কোনো সংগতিপূর্ণ উত্তর পাওয়া সম্ভবপর কি না। 'ক+গ' হয় ১. 'ক'-এর সমান, ২, না হয় 'ক'-এর অসমান। সমান যদি হয় তা হলে পরিবর্তন কেন হচ্ছে বোঝা যায় না, এবং যদি অসমান হয় তা হলে প্রশ্ন হবে 'গ'-এর বর্তমানে 'ক'-এর পরিবর্তন কি করে সম্ভবপর। তা হলে 'ক+গ+ঘ'-এর অবতারণা করতে হয়। এই ভাবে সীমাহীন আবর্তে জড়িত হয়ে পড়তে হয় ও পরিবর্তন বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

আপনি বলবেন বস্তুত কোনো কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নেই, এটা হল আমাদের মনের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি যখন আমরা বস্তুর বেলায় প্রয়োগ করি, এটাকে সমর্থন করবার যুক্তি চাই। যুক্তি বা বিচারে যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি অসমর্থনীয়, তা হলে এই কথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হল যে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ আপেক্ষিক ও আপাতসত্য।

প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা যে শুধু অতীতে প্রবেশ করি তা নয়, আমরা একে একে অন্যান্য সত্তাগুলোকেও কারণের মধ্যে গ্রহণ করতে বাধ্য হই। যেমন 'ক' – 'খ' = 'ক' + 'গ' – 'খ' = 'ক' + 'গ' + 'ঘ' – 'খ' = 'ক+গ+ঘ+ঙ' – 'খ' ইত্যাদি। ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বই কারণ-পর্যায়ে এসে পড়ে। সত্য কারণকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব বলে বিচার করতে আমরা বাধ্য হই। মোট কথায়, প্রত্যেক কারণের মধ্যে এই বিশ্বের পটভূমি বর্তমান। ব্যবহারিক জগতে এই বিশ্বভূমিকা অবান্তর; যেহেতু এই বিশ্বভূমিকার জন্য কোনো বিশেষ পার্থক্য হয় না এবং এই পটভূমিকা কার্যতঃ সর্বক্ষেত্রেই এক। অনেকে বলেন, সত্যবিচারে বর্তমান মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বের সমগ্র অবস্থা হচ্ছে প্রকৃত কারণ ও পরবর্তী মুহূর্তের সমগ্র বিশ্বের সমগ্র অবস্থা হচ্ছে কার্য। এই যুক্তির মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু এই মতবাদও অগ্রাহ্য। সমগ্র বিশ্বের পূর্বাবস্থা সমগ্র বিশ্বের পরবর্তী অবস্থায় কি ভাবে পরিণত হবে আমরা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারি না। প্রথমত, কোনো স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সমগ্র ও পূর্ববর্তী অবস্থা কল্পনা করা অসম্ভব; কারণ এই সমগ্রের মধ্যে গুণ ও সম্বন্ধের অসংগতি এসে পড়ে; দ্বিতীয়ত, সমগ্র বিশ্বের এক অবস্থা অন্য অবস্থায় পরিণত কেন হচ্ছে তাও বোঝা যায় না; ক্ষুদ্র 'ক'-এর বেলায় যে অসংগতি আমরা পেয়েছি, সমগ্র বিশ্বের বেলাতেও সেই অসংগতির সম্মুখীন হতে হয়। পরবর্তী সামগ্রিক অবস্থা পূর্ববর্তী

সামগ্রিক অবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত, এই কল্পনার আশ্রয় শেষ পর্যন্ত নিতে হয় পূর্বোক্ত অসুবিধার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য। বলতে হয় কার্য ও কারণ এক এবং বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্তা অপরিবর্তনীয় ও এক এবং মুহুর্মুহুঃ যে পরিবর্তন দৃষ্ট হচ্ছে তার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এই মত, আর যাই কিছু করুক না কেন কার্য-কারণবাদকে সমর্থন করে না। কার্য ও কারণ অসত্য বলে প্রমাণিত হয়।

সংক্ষেপে, কারণ-বাদের অসংগতি এই ভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ ১. একটা স্থিতিশীল ঘটনাই কারণ হতে পারে। যেমন জ্যামিতিক বিন্দু রেখা বা তলের দ্বারা কোনো ঘন পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে না, তেমনি কালের বিন্দু বা একটা শুদ্ধ ক্ষণ কখনো কারণ হতে পারে না। কিন্তু কারণ যদি এক মুহূর্তের জন্যও স্থিতিশীল হয়, তা হলে তা চিরস্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়, কারণের কার্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। ২. একটা গতিশীল নিত্য-পরিবর্তনশীল ঘটনাই কারণ হতে পারে। কিন্তু সততচলমান ঘটনার কোনো স্থিতি নেই। জ্যামিতির বিন্দুর মতো কালের গতিশীল ক্ষণ একটা কাল্পনিক পদার্থ; এটা নিছক শূন্য পদার্থ, এর কোনো সৃষ্টি-ক্ষমতা নেই। কোটি কোটি ক্ষণের সমষ্টিতেও একটা ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্র ঘটনা তৈরি করা যায় না।

অষ্টম অধ্যায়

কর্ম বা সক্রিয়তা

শক্তি, ক্রিয়া, বল, কর্ম এই-সব শব্দ প্রায়ই পরিষ্কার না বুঝেই আমরা ব্যবহার করি। এই শব্দগুলোর অর্থ যদি বুদ্ধির দ্বারা স্পষ্ট না হয়, আমরা এই বিচার করতে বাধ্য হব, এদের দিয়ে সত্য বর্ণনা করা যায় না। শক্তি, বল প্রভৃতি এক দিক থেকে বিচার করলে কর্ম ও ক্রিয়া থেকে পৃথক। প্রথমোক্ত পদার্থগুলো অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মাঝখানকার কোনো এক লোকে অবস্থিত। কর্ম হচ্ছে ক্রিয়াশীল শক্তি। শক্তি যখন কাজ করতে থাকে তখন ক্রিয়ার উদ্ভব হয়।

ক্রিয়ার দুটো দিক আছেঃ ১. সংঘটন বা পরিবর্তনের দিক এবং

২. কালের আনুপূর্বিকতার দিক। যখন কোনো জিনিসের পরিবর্তন ভেতর থেকে আসে, যখন পরিবর্তনের কারণ জিনিসটার আত্মার বা স্বভাবের মধ্যে নিহিত থাকে, তখন তাকে ক্রিয়াশীল বলা হয়। একমাত্র স্বকৃত পরিবর্তনকে সক্রিয়তা বা কর্ম অভিহিত করা চলে। সক্রিয়তার বেলায় কার্যটি ক্রিয়াশীল বস্তুর প্রকৃতি থেকে সঞ্জাত এইরকম কল্পনা করতে হয়। অর্থাৎ যেটা কার্য বলে পরে উপস্থিত হয় সেটা বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে আগে থেকেই নিহিত আছে; একটা কার্যরূপী ঘটনা ঘটবার আগে যেন কোনো ভাবে বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান আছে; তবে বস্তুর মধ্যে ভাবরূপে কার্যের থাকার মানে এ নয় যে ভাবটা কারো মনের মধ্যে আছে। কারণ, বস্তুর মন নাও থাকতে পারে; সেইজন্য তার ইচ্ছাশক্তি নাও থাকতে পারে। অথচ বস্তুর মধ্যস্থিত এই 'ভাব' শুদ্ধ আমাদের মনের ভাব, যা আমরা বস্তুর মধ্যে আরোপ করি এ কথাও একেবারে নির্বিঘ্নে বলা চলে না।

নিষ্ক্রিয়তা হচ্ছে সক্রিয়তার বিপরীত। কোনো জিনিস যদি পরিবর্তিত হয় বাহ্য প্রভাবের দ্বারা তা হলে তাকে নিষ্ক্রিয়তার উদাহরণ ধরা হয়। নিষ্ক্রিয়তার ফলে বস্তু যে নূতন বিশেষণের অধিকারী হয়, তা অন্য একটা সক্রিয় বস্তুর প্রভাবেই সম্ভব। সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা সেইজন্য পরস্পরসম্বদ্ধ। সক্রিয়তা ব্যতীত নিষ্ক্রিয়তা অসম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, নিষ্ক্রিয় ব্যাপার ব্যতীত সক্রিয় ব্যাপার সম্ভব কি? পূর্বে যা বলা হয়েছে তার থেকে এই মনে হতে পারে যেন সক্রিয় ব্যাপারের কোনো হেতু নেই। কিন্তু এই সংসারে বিনা কারণে কিছু ঘটতে পারে না। সুতরাং কারণ না থাকলেও অন্তত সক্রিয় ব্যাপারের একটা উপযোগী অবস্থা বা উপলক্ষ দরকার। এই উপযোগী অবস্থা বা উপলক্ষ সক্রিয় বস্তুর বাইরে অবস্থিত; এবং উপলক্ষ বা নিমিত্তদ্বারা প্রভাবিত না হলে সক্রিয় বস্তুর পরিস্পন্দ আরম্ভ হয় না। এর মানে তা হলে এই দাঁড়ায় যাকে আমরা সক্রিয় বস্তু বলি তা একাধারে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। যতক্ষণ ক্রিয়াটাকে বস্তুর স্বভাব থেকে উদ্ভূত বা সঞ্জাত এই ভাবে দেখা হয় ততক্ষণ একে সক্রিয় বলা যায়, যেই এটা বাহ্য কোনো উপলক্ষ বা নিমিত্ত দ্বারা প্রভাবিত কল্পনা করি, এটাই নিষ্ক্রিয় পদার্থের উদাহরণ হয়ে ওঠে। একই জিনিস তা হলে দুই-ই হতে পারে, সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়। এই দ্ব্যর্থক অবস্থা বুদ্ধির সমর্থনযোগ্য নয়। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় আছে কি?

সাধারণত কারণ ও অন্যান্য পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে একটা পার্থক্য করা হয়। যে ঘটনাকে কার্য বলে নির্দিষ্ট করি, ঠিক তার পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ বলা হয় ও অন্যান্য সংযুক্ত পূর্ববর্তী ঘটনাগুলোকে উপলক্ষ বা উপাধি বলে ধারণা করা হয়। তবে আমরা যখন যেমন খুশি কোনো একটা পূর্ববর্তী বিশেষ ঘটনাকে কারণ ও অন্য কোনো ঘটনাকে উপলক্ষ বা উপাধি পর্যায়ে ফেলে থাকি। এবং এই দুটো শব্দের ব্যবহার নির্বিচারে করে থাকি। অনেক সময় কারণকে 'সমস্ত উপলক্ষের বা উপাধির সমষ্টি' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু 'সমস্ত উপলক্ষের বা উপাধির সমষ্টি' কোনো বিশেষ স্থিতিকালের মধ্যে অবস্থিত হতে পারে না এবং তার ফলে এগুলোর নাস্তিত্ব দোষ জন্মে। অন্য দিকে এই সামগ্রী বা সমষ্টির পরিবর্তন সাধনের জন্য নূতন উপলক্ষ বা উপাধির প্রয়োজন অনুভূত হয়; অথচ সমষ্টির মধ্যেই সমস্ত নিমিত্তকে কল্পনা করাতে নূতন কোনো নিমিত্তের কল্পনা অসম্ভব। এই ভাবে পরিবর্তন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই অসম্ভব অবস্থার উদ্ভব এইজন্য হতে বাধ্য যে সমস্ত উপলক্ষের বা উপাধির সমষ্টি বলতে আমরা শেষ পর্যন্ত বিশ্বের পূর্ববর্তী সামগ্রিক অবস্থার পটভূমিকাটাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হই। ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে বিশ্বের এই ভূমিকাটাকে উপেক্ষা করা যায়; যেহেতু বিচার্য ঘটনার উৎপাদনে তার বিশেষ কোনো দান নেই; তবু সত্য নির্ণয়ে একে অস্বীকার করা চলে না। বিশ্বের ভূমিকা অনস্বীকারে সমস্ত ঘটনাই অনস্বীকৃত হয়, কিছুই ঘটতে পারে না। বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থাকে কারণ বলে গ্রহণ করলে পরবর্তী সামগ্রিক অবস্থা তার কার্য হয়ে দাঁড়ায়। কোনো বিশেষ ঘটনার বিশেষ কারণ পাওয়া যায় না। অতএব কারণ ও অন্যান্য উপলক্ষ, উপাধি বা উপকরণের মধ্যে তত্ত্বগত কোনো পার্থক্য নেই। থাকলেও তা বোধগম্য নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে পার্থক্য বোধগম্য নয় বলেই নেই। কোনো বিশেষ কার্যসিদ্ধির জন্য আমরা কখনো একটা ঘটনাকে কারণ-স্থানীয় ও অন্য ঘটনাকে উপলক্ষ বা উপাধি বা নিমিত্ত-স্থানীয় বলে থাকি।

এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হয়েছি যে কোনো পদার্থ শুদ্ধসক্রিয় হতে পারে না। তবে পদার্থ বলতে আমরা আদ্যন্তবান পদার্থের কথা চিন্তা করছি, যে পদার্থের মধ্যে একের অধিক অংশ আছে। অর্থাৎ সসীম

পদার্থের পক্ষেই সক্রিয় হওয়া সম্ভব। সসীম পদার্থের যে অংশ, নিমিত্ত বা উপলক্ষ দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত সে অংশ নিষ্ক্রিয় এবং যে অংশ স্বতঃই আর একটা পদার্থের পরিবর্তন বা পরিণাম সাধন করে, সেই অংশ সক্রিয়, এই আমাদের মোটামুটি ব্যবহারিক ধারণা। কিন্তু তত্ত্ববিচারে 'এক বস্তুর' অর্থ বোঝা যায় না, 'অংশ'-এর অর্থ বোঝা যায় না, 'বস্তুর স্বভাব' কি তাও বোঝা যায় না, বা 'ক্রিয়া'র অর্থও বোঝা যায় না। আমাদের এই ব্যবহারিক ধারণাগুলো অসংগতি-দুষ্ট ও অস্পষ্ট। সুতরাং সেগুলো তত্ত্বত অগ্রাহ্য।

নবম অধ্যায়

দ্রব্য বা জিনিস

আমরা কত জিনিসকেই তো 'জিনিস' বলি। কিন্তু জিনিস কি? যার অস্তিত্বের অধিকার আছে, যা কিছু ডেকে বলে 'অয়ং অহং ভো' তাই জিনিস। জলপ্রপাতকে জিনিস বলা হয়তো যেতে পারে, কিন্তু রামধনুকে অনেকে জিনিস বলতে চাইবেন না এবং এক ঝলক বিদ্যুৎ জিনিস কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ অনেক। সুতরাং জিনিস কি?

বস্তু ও গুণের স্বরূপ, গুণ ও সম্বন্ধের স্বরূপ, দেশ ও কালের স্বরূপ, কার্য ও কারণের স্বরূপ ও ব্যাপার ও পরিণামের স্বরূপ কোনোটাই যখন সংগতিপূর্ণ ভাবে বোঝা যায় না তখন জিনিস বলতে আর থাকে কি? জিনিস কোথায় ও কি ভাবে অবস্থান করে? চেষ্টা করে দেখা যাক, জিনিসকে রক্ষা করা যায় কি না।

কোনো জিনিসকে টিকতে হলে খানিকটা কাল পর্যন্ত তাকে স্থায়ী হতে হবে। পারম্পরিক-ক্ষণপ্রবাহের মধ্যে, পরিবর্তনের ধারার মধ্যে একে এক থাকতে হবে। এই একত্ব যদি শুধু ভাবগত হয়, জিনিসের বস্তুসত্তা তাতে রক্ষিত হয় না। কিন্তু একত্বটা ভাবগত ব্যাপার ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কোনো জিনিসের একত্ব বা ঐকাত্ম্য তার প্রকৃতির সমত্ব রক্ষার উপর নির্ভর করে অর্থাৎ কোনো একটা জিনিস এখন জিনিস, যেহেতু পূর্ববর্তী মুহূর্তে এ যা

ছিল এখনো তাই, যে মুহূর্তে অতীত হয়ে গেছে, সেই মুহূর্ত এই জিনিসের যা প্রকৃতি ছিল এখনো তাই আছে। সুতরাং সমত্ব কোনো বর্তমান অনুভূতির বিষয় নয়, এটা যেন একটা কালাতীত ভাব। কতখানি পরিবর্তনের পর একটা জিনিস তবুও তাই থাকে এটা অনেক সময়েই বলা অসম্ভব। যেমন, একটা হুঁকোর খোল বদলালে সেই হুঁকো তাই থাকল। কিন্তু খোল, নলচে, কলকে সবই যদি একে একে বদলানো হয় তা হলেও কি সেই একই হুঁকো থাকবে? (এখানে ব্রেডলি সার জন কাটলারের রেশমী মোজার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।) এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না এইজন্য যে, কোন্ প্রকৃতির সমত্বের ওপর জিনিসের আস্তিক্যের সমত্ব নির্ভর করে তা আমরা সব সময় জানি না। কোনো জিনিসের একত্ব বা ঐকাত্ম্য নির্ভর করে আমরা তার প্রকৃতির সমত্ব সম্বন্ধে কি ধারণা বা ভাব পোষণ করি এর ওপর। সুতরাং ঐ জিনিসের জিনিসত্ব এমন একটা ভাব যা ইন্দ্রিয়জ অনুভবের বাইরে স্থিত। সুতরাং জিনিসের বস্তুগত সমতা বলতে যা আমরা বিশ্বাস করি তা ব্যবহারিক জগতের সত্য, অবভাস বা ভান মাত্র। তার শুধু আপাত-সত্যতা আছে।

দশম অধ্যায়

অহং বা আত্মার অর্থ

বিচারের আগুনে একে একে সব কিছুই পুড়ে যাচ্ছে। বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না তা হলে সত্য কি? শেষ পর্যন্ত সব কিছুই কি অসত্য ও অগ্রাহ্য? এখনো আশার বিষয় একটা আছে। হয়তো আত্মার মধ্যে সত্যকে পাওয়া যেতে পারে। আর যাই অবিশ্বাস করা যাক, অন্তত আত্মাকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। দেখা যাক আত্মা-সম্বন্ধীয় আমাদের ধারণা কতদূর সুসমঞ্জস ও সংগতিপূর্ণ।

কথাটা ঠিক যে আমার আত্মার অস্তিত্ব কোনো এক অর্থে সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত। কিন্তু কি অর্থে আত্মার আস্তিক্য সুনিশ্চিত সেই বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। বাইরের জিনিসের চেয়ে আত্মা সম্বন্ধে আমাদের

ধারণা যে স্পষ্টতর এমন বিশ্বাস করবার কোনো হেতু নেই। গোড়াতেই বলে রাখা ভালো আত্মা সম্বন্ধে আমাদের যে-সব ধারণা আছে সেগুলো সমান দুর্বোধ্য ও অসংগতিপূর্ণ; সুতরাং আমরা অহংকেও অবভাস বলে গ্রহণ করতে বাধ্য।

আত্মা সম্বন্ধে যে-সব বিভিন্ন ধারণা আছে সে-সবের একটা হচ্ছে আত্মা ও দেহ অভিন্ন। এই ধারণা একেবারেই ভুল। কারণ দেহকে আত্মার প্রকাশ ভাবে জানতে হলে কোনো একপ্রকার অলৌকিক অনুভবের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়; কারণ লৌকিক অনুভবে এ কথা ধরা পড়ে না যে আত্মা দেহরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু এইরকম অলৌকিক অনুভব স্বীকার করাতে অনেক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। এবং বাধা উপেক্ষা করে এই অলৌকিক অনুভব স্বীকার করলেও দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ নির্ণয় একেবারেই সহজ হয় না।

সুতরাং দেহকে বাদ দিয়ে আত্মাকে বা অহংকে অন্বেষণ করতে যত্নবান হওয়া যাক। অনেক সময় অহং বা আত্মা অর্থে বর্তমান মুহূর্তে কোনো ব্যক্তির চৈতন্যস্থিত যাবতীয় ঘটনাবলীকে আমরা উল্লেখ করে থাকি। ব্যক্তি-বিশেষের চেতনার কোনো একটা অংশ কেটে নিলে দেখা যাবে তার মধ্যে আছে নানাপ্রকার ভাবনা, সুখদুঃখের বোধ, চিন্তা প্রভৃতির এক মিশ্র পিণ্ড যেটা তার কাছে বহির্জগৎ, অন্যান্য ব্যক্তি ও আত্মারূপে প্রতিভাত হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বের যাবতীয় জিনিস অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মা এবং যা আত্মাও নয় বা অনাত্মাও নয়, এক কথায় যা কিছু বর্তমান মুহূর্তে ঐ ব্যক্তির চেতনা দখল করে আছে তাকে ঐ ব্যক্তির স্বরূপ বলে গ্রহণ করে নেওয়া যায় কি? যায় না। কারণ ১. আত্মা সত্য পদার্থ হলে এর অস্তিত্ব শুদ্ধ এক মুহূর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না; ও ২. এর মধ্যে বিপরীতধর্মী গুণের সন্নিবেশ অসম্ভব। সুতরাং এই মত পরিবর্তন করে আমরা বলতে বাধ্য হব, কোনো ব্যক্তির বিভিন্ন ক্ষণের চেতনাস্থিত ঘটনাবলীর মধ্যে অনুভব, ভাব-ভাবনা প্রভৃতির গড় ও সাধারণ অংশকে আত্মা বলা উচিত। কোনো মুহূর্তের যা অসাধারণ অভিজ্ঞতা তাকে বাদ দিয়ে সব মুহূর্তের মধ্যে যা সাধারণ অভিজ্ঞতা তাকে আত্মা বা অহং নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এক কথায়, কোনো ব্যক্তি সাধারণত যে ভাবে আচরণ করে এবং যে বিষয়-বস্তুর সম্পর্কে আচরণ করে, তাই সেই ব্যক্তির আত্মার পরিচয়। অনাত্মার যে অংশ

STATE INSTITUTE OF EDUCATION West Bengal
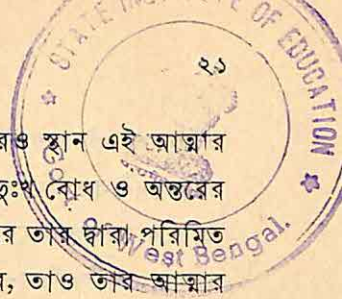
সাধারণত ব্যক্তিটির চৈতন্য অধিকার করে থাকে তারও স্থান এই আত্মার মধ্যে থাকবে। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব শুধু তার সুখদুঃখ বোধ ও অন্তরের অনুভবের মধ্যে, বা সে নিজেকে 'কি' বলে বিবেচনা করে তার দ্বারা পরিমিত নয় ; তার বাহ্য পরিবেশ যে পরিমাণে তাকে গঠন করে, তাও তার আত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে অনাত্মা দ্বারা মানুষ দুইভাবে গঠিত হয় : ১. বিশেষ ভাবে ২. সাধারণ ভাবে। কখনো কখনো অনাত্মার কোনো বিশেষ অংশ, যেমন ধরুন ভার্যা বা পুত্র অথবা বাহ্য পরিবেশের কোনো বিশেষ অংশ, যেমন ধরুন অভ্যস্ত বাসগৃহ, ব্যক্তির আমিত্বকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করে। সেইজন্য এগুলোর নাশের পর বা অভাবে এমন অন্য কিছুই এদের স্থানে-পাওয়া যায় না, যা তার স্বাভাবিক আমিত্ববোধ বা আত্মাকে সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এ ছাড়া বাহ্য পরিবেশ প্রত্যেককেই সাধারণভাবেও প্রভাবিত করে। এই সাধারণ প্রভাবের ফলে প্রত্যেকের মোটামুটি আচরণ, অভ্যাস ও গড় বা স্থূল আত্মা প্রায়শই এরকম থেকে যায়।

যদি ঘটনাবলীর পরিবর্তনে মানুষের আত্মাও পরিবর্তিত হয় তা হলে তাকে প্রকৃত আত্মা বিচার করা যায় কি করে ? অন্য ভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে এই বলে যে, ক্ষয়ক্ষতি প্রেম বা মরণের প্রভাবে যদি কোনো ব্যক্তির জীবনের স্রোতের মোড় ফিরে যায় তা হলেও কি সেই ব্যক্তি অভিন্নই থাকে না ? অথচ মানুষের এক বয়সের গড় বা স্থূল আত্মা অন্য বয়সের গড় বা স্থূল আত্মার থেকে পৃথক। এমনও হতে পারে, বিভিন্ন বয়সের গড় আমিত্বের মধ্যে কোনো মিল নেই। তা হলে কি আত্মা এক নয় ? কিংবা প্রকৃত আত্মার স্বরূপ অন্য কিছু ?

আর-একবার তা হলে মনের ঘরদুয়ার খুঁজে দেখতে হয়, সেখানে এমন কিছু আছে কি না যা আত্মার সারাংশ। কি সে পদার্থ যা দিয়ে আত্মার একত্ব ও অনন্যত্ব গঠিত ? একটা অনুভবপিণ্ডের ওপর আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অনুভবপিণ্ডের কোন্ অংশ সার-স্থানীয় ও কোন্ অংশ অসার-স্থানীয় তা নির্ধারণ করা অসম্ভব। বাহ্য ঘটনাবলী এই অনুভবরাশিকে এমন প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে কঠিন পীড়া এমন-কি মৃত্যুও ঘটতে পারে। এই অনুভবরাশির চতুর্দিকে তাকে রক্ষা করে এমন কোনো প্রাচীর নেই। যখন-তখন বাহ্য ঘটনার

S.C.E.R.T., W.B. LIBRARY 14.6.05 2878

আক্রমণে এই অনুভবস্রোত পর্যুদস্ত হতে পারে। তবে বিভিন্ন মানুষের পরিবর্তনশীলতা বিভিন্ন প্রকারের। কেউ সহজে পরিবর্তিত হয়, কারো প্রতিরোধক্ষমতা অনেক বেশি। তা হলেই প্রশ্ন ওঠে যে স্মৃতিহীন, রুগ্নমনা, স্বপ্নমগ্ন, পরিবর্তিত-রুচি মানুষটি কি পূর্বেকার সুস্থ মানুষই রয়ে গেছে? অনেকসময় বলা হয় যে, এমন একটা অংশ মানুষের মধ্যে আছে যার পরিবর্তন নেই। কি সেই অংশ, আমরা জানি না; এবং আত্মাকে যদি এক অপরিবর্তনশীল বিন্দুতে পরিণত করা হয়, তা হলে তাকে আর আত্মা বলা চলে না।

কোনো পদার্থের সমত্ব অন্বেষণ করবার আগে ঐ পদার্থের কোন্ দিকের সমত্ব আমরা খুঁজছি এই ধারণা স্পষ্ট না থাকলে আমরা আমাদের অন্বেষণে ব্যর্থ হতে বাধ্য। পুরুষ বা আত্মা বলতে আমরা কি বুঝি এ বিষয়ে আমাদের ধারণা গোলমেলে। সেইজন্য আমাদের পুরুষের ঐকাত্ম্য-সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা নিষ্ফল হতে বাধ্য।

এইবার আমরা এতাবৎ যা আলোচনা করেছি তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে দেখি। সাধারণত আমরা মানুষের দেহের সত্তাকেই আত্মার সত্তা বলে দেখি। দেহাত্মাই আত্মা এই ভেবে থাকি কিন্তু এই দেখাতে গলদ অনেক। দেহের সমত্বই সন্দেহাতীত নয়। তা ছাড়া দেহের ঐকাত্ম্য ও আত্মার ঐকাত্ম্য একার্থবোধক এই বাক্য বা বচন খুব কম লোকেই বিশ্বাস করবে। দেহ ছাড়া একটা চেতনাগত স্থায়িত্বও আত্মার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অথচ কোনো প্রমাণ নেই যে, স্বপ্নহীন নিদ্রা, স্বপ্ন ও অন্য মনোবিকারের অবস্থায় এই চৈত্তিক অবিচ্ছিন্নতা অব্যাহত থাকে। সুতরাং চেতনার অবিচ্ছিন্নতার উপর আত্মার অস্তিত্বও নির্ভরশীল হলে একই জীবনে আত্মার পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু অবধারিত। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাহ্য ঘটনার দ্বারা আত্মার পরিধি ছোটো ও বড়ো হয় এবং আত্মার রূপান্তর ঘটে। এই বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিলে আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে চেতনার অবিচ্ছিন্নতা ছাড়া গুণগত সমত্বও আত্মার একটা প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এ দুটো কি পরিমাণ দরকার এবং এ দুয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ রক্ষিত হয় তার পরিষ্কার কোনো ধারণা আমাদের নেই। আরো গভীর ভাবে বিষয়টিকে দেখা যাক।

আত্মার একত্ব দুইভাবে দেখা যেতে পারে: ১. বাইরের অন্য দ্রষ্টার

কাছে একত্ব অথবা ২. নিজের চেতনায় একত্ব। এবং এই দুই প্রকার একত্ব সংযুক্তও থাকতে পারে অথবা অসংযুক্তও থাকতে পারে। বাইরের অন্য দ্রষ্টার কাছে আত্মার একত্ব অনেক সময়ই ধরা পড়বে না। কারণ আমরা দেখেছি বাহ্য ঘটনার স্রোতে অনেক সময় ব্যক্তির গুণগত সমত্ব বিঘ্নিত হয়। বাহ্য দ্রষ্টার দৃষ্টিতে একই ব্যক্তির ব্যবহার ও আচরণ ও ভাবধারা বিভিন্ন সময় সম্পূর্ণ অসম বলে প্রতিভাত হয়, এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সুতরাং নিজদৃষ্টিতে বা আন্তরদৃষ্টি দ্বারা একত্ব নির্ধারণ করাই হয়তো ঠিক পথ। স্মৃতির ধারাবাহিকতার মধ্যেই হয়তো এই একত্বনির্ণয়ের সূত্র থাকতে পারে। যে আত্মা নিজেকে এক বলে স্মরণ করে সেই আত্মা এক। স্মরণশীলতাই একত্ব। কিন্তু স্মৃতির ওপর আত্মা নির্ভরশীল হলে স্মৃতিভ্রংশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ মেনে নিতে হয়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে স্মৃতিশক্তির তারতম্য সব সময়ই ঘটে ; কখনো জীবনের একটা বিরাট অংশ বিস্মৃতির গহ্বরে প্রবেশ করে। অনেক সময়ই স্মৃতি দুর্বল ও অপরিচ্ছন্ন। নিদ্রাবস্থার স্মৃতি আমাদের থাকে না। অচৈতন্য অবস্থার স্মৃতিও আমাদের থাকে না। কখনো কখনো এমন দুইপ্রকার স্মৃতির উদ্ভব হয় যার একটার সঙ্গে আর-একটার কোনো সংযোগ নেই। আমাদের আত্মবোধের সঙ্গে আত্মস্মৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আত্মানুভব কোনো কারণে পরিবর্তিত হয়ে উঠলে সেই অনুভবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা সংযুক্ত স্মৃতির পুনরুজ্জীবন অসম্ভব হয়। এই-সব তথ্য অনুধাবন করলে শেষ পর্যন্ত মানতে হয় যে, একই ব্যক্তির দুই বা ততোধিক আত্মা সম্ভব। তার মানেই বর্তমানে আমি কি স্মরণ করছি শুধু তার ওপর আত্মার সমত্ব নির্ভর করে না। স্মৃতির সত্যতাও বিচার্য। অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব আত্মার আর-একটা দিক। তবে কতখানি ও কি প্রকার স্থায়িত্ব, এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা আমাদের নেই। এই স্থায়িত্ব-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দেওয়া যায় না। ব্যক্তিগত একত্বের মাত্রা বা তারতম্য আছে। নিরপেক্ষ ও সর্বকালীন ঐকাত্ম্যের কোনো অর্থ হয় না। কোনো একটা দিক থেকে ব্যক্তির সমত্ব রক্ষিত হয়েছে কি না, এ প্রশ্নের এক প্রকার উত্তর দেওয়া চলে। কিন্তু সাধারণভাবে সমত্ব আছে কি না, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।

আত্মাকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আত্মাকে সমস্ত

পরিবর্তন ও প্রভেদের বাইরে এক নিঃসঙ্গ নিষ্ক্রিয় পদার্থ হিসাবে মেনে নেওয়া। প্রশ্ন উঠবে এই সত্তার সঙ্গে ব্যক্তির জীবনের ঘটনাস্রোতের কি সম্বন্ধ? যে-সব তথ্য বা যে ঘটনাবলী বুঝাবার জন্য এই সত্তা স্বীকার করা হচ্ছে, সেই তথ্যাবলীর মধ্যেই সংগতি নেই। সুতরাং তাদের সঙ্গে এই কল্পিত সত্তার সম্বন্ধ নিরূপণ করা আরো দুঃসাধ্য। আর এই সত্তার যদি কোনো সম্বন্ধই না থাকে, এর কল্পনা নিষ্প্রয়োজন।

এ পর্যন্ত বিষয় ও বিষয়ীর প্রভেদ আমরা উপেক্ষা করে এসেছি। ব্যক্তির মধ্যে বিষয় ও বিষয়ী দুই প্রকার চৈতন্য আছে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও এষণা সবরকম চৈতন্যেরই, বিষয় ও বিষয়ী এই দুটো দিক আছে। বিষয়ী অর্থে আত্মার রূপ, ব্যক্তির সমগ্রচৈতন্যভূত আত্মার রূপ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বিষয়ী ও বিষয়-অর্থে আত্মা ও অনাত্মা শব্দের প্রয়োগে নূতন রকম জটিলতার উদ্ভব হয়। এই অর্থে আত্মা ও অনাত্মা শব্দ ব্যবহার করলে চৈতন্যের এক অংশ অহং-এ পরিণত হয় ও অন্য অংশ পরিণত হয় প্রকৃতিতে বা ইদং-এ অর্থাৎ আত্মার অর্থ সংকীর্ণতর হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক জ্ঞান ও এষণার ব্যাপারে বিষয় ও বিষয়ী এই দুই বিন্দুর প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তিই এমন অবস্থায় এক সময় ছিল বা আছে যেখানে বিষয় ও বিষয়ীর প্রভেদ জেগে ওঠে নি। কিন্তু চৈতন্যের মধ্যে, তা জ্ঞান-চৈতন্যই হোক বা এষণা-চৈতন্যই হোক ধীরে ধীরে এই দুই বিন্দু, এই দুই বিপরীত দিক জেগে ওঠে। অনেক সময় বহু লেখক অহংকে শুদ্ধ অহং বলে নির্দিষ্ট করে এই বলতে চেষ্টা করেছেন যে, এই অহং নির্গুণ। এমন কোনো অহং-এর উপস্থিতি আমরা অনুভব করি না বা অনুভবের মধ্যে পাই না, যা বর্তমানের অনুভবকে ছাপিয়ে উঠেছে। সেরকম অহং একটা কল্পনা মাত্র। যখন আমি কিছু দেখি, বুঝি বা অনুভব করি, তখনকার আমি অত্যন্ত প্রকটভাবে ও হয়তো বেদনাদায়ক ভাবে বাস্তব; 'আমি'র অনুভব সবসময় বর্তমানের রং দিয়ে গাঢ় ভাবে দাগ কাটা এবং আমি যখন কিছু ইচ্ছা করি বা আকাঙ্ক্ষা করি, তখনকার সমগ্র বেদনা দিয়ে আমার 'অহং' সম্পূর্ণরূপে ভরাট ও জমাট থাকে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে 'সমগ্র' চৈতন্যের কোন্ অংশ অহং বা বিষয়ী ও কোন্ অংশ বিষয় বা অনাত্মা? বিষয়ীচৈতন্যস্থিত এমন খুব কমই জিনিস আছে যেটা বিষয় রূপে চিন্তা করা বা ইচ্ছা করা

যায় না। আবার বিষয়চৈতন্যস্থিত প্রায় সব জিনিসই বিষয়ীর অনুভব বা ইচ্ছারূপে পরিণত হতে পারে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ কথা স্বীকার করা দরকার যে, এমন কতকগুলো জিনিস আছে যাদের পরস্পর স্থান-বিনিময় অসম্ভব। তবে বেশির ভাগ বিষয়, বিষয়ীর স্থান ও বিষয়ী, বিষয়ের স্থান গ্রহণ করতে সমর্থ। আমরা তাই এই সিদ্ধান্তে আসছি যে ব্যক্তির চৈতন্যস্থিত তথ্যাবলীর প্রায় সবই কখনো বিষয় ও কখনো বিষয়ী রূপে উপস্থিত হতে পারে। ব্যক্তির চৈতন্যসত্তার মধ্যে এমন কোনো অংশ নেই বললেই চলে, যা চিন্তা বা ইচ্ছার বিষয়ীভূত হয়ে অনাত্মারূপে প্রতিভাত না হতে পারে। সুতরাং আত্মাকে একটা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করা কঠিন। কারণ এক সময় মনে হয় সমগ্র ব্যক্তিচৈতন্যই আত্মা এবং তার মধ্যে দুই বিপরীত দৃষ্টি বা দিক ; আর এক সময় মনে হয় দুই বিপরীত দিকের মধ্যে মাত্র এক বিশেষ দিক আত্মা এবং এই দিক অন্য দিকটির সঙ্গে সংঘর্ষশীল।

এ পর্যন্ত আমরা যা বিচার করেছি তার ফল সংক্ষেপে এই ভাবে তা হলে বর্ণনা করা যায়। বিশেষ্য ও বিশেষণ, বস্তু ও গুণ, গুণ ও সম্বন্ধ, দেশ, কাল, গতি, সক্রিয়তা কোনোটার সম্বন্ধেই আমাদের ধারণা সংগতিপূর্ণ নয়। আমরা জনরব শুনেছিলাম যে আত্মার ধারণা সব কিছুর মধ্যে আবার সুশৃঙ্খলা এনে দেবে কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখা যাচ্ছে, আত্মা সম্বন্ধে কোনো পরিষ্কার ধারণা আমাদের নেই। প্রথমে ভাবা গেল, ব্যক্তির বর্তমান মুহূর্তের চৈতন্যস্থিত সমস্ত পদার্থকে আত্মা বলা যেতে পারে। দেখা গেল এ হতে পারে না। মনে হল ব্যক্তির চৈতন্যর গড় বা স্থূলরূপ ও অভ্যস্ত আচরণের মধ্যে হয়তো আত্মাকে পাওয়া যাবে। দেখা গেল এর মধ্যেও আত্মা নেই। এর পর চৈতন্যের সারাংশরূপী আত্মার অন্বেষণে বেরোনো গেল। এই অন্বেষণেও বিফলমনোরথ হতে হল। তার পর দেখা গেল আত্মার সমত্ব সম্বন্ধে ধারণাই আমাদের ঘোলাটে ধরনের। বিষয় ও বিষয়ী ভাবের প্রয়োগেও আত্মাকে পাওয়া গেল না। দেখা গেল বিষয়ী অর্থে আত্মার কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হয়ে এই ধারণার প্রান্তসীমায় আমরা শেষপর্যন্ত পৌঁচেছি যে তা হলে হয়তো আত্মাও পারমার্থিক বস্তু নয়।

একাদশ অধ্যায়

অহং বা আত্মার স্বরূপ

কোনো না কোনো অর্থে আত্মা একটা তথ্য। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে কোনো অর্থে আত্মা সত্য কি না, আত্মা তত্ত্ব কি না? বিচারের রাজত্বে আত্মার আত্মরক্ষার ক্ষমতা অতি অল্প।

হয়তো এ কথা বলা চলে অন্যান্য বস্তুর তুলনায় আত্মার সমত্ব বা একত্বের সম্বন্ধে আমরা অনেক নিঃসন্দেহ। কিন্তু এ জেনে আমাদের বিশেষ কোনো লাভ নেই। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে সমত্ব বলতে আমরা যা বুঝি তা বুদ্ধিগ্রাহ্য কি না এবং সমত্বের সত্য বর্ণনা আমরা দিতে সক্ষম কি না। যদি সমত্বের ধারণা দুর্বোধ্য হয় অথচ আমরা একত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হই তা হলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে আত্মা পারমার্থিক তত্ত্ব নয়। আমরা এমন কোনো অনুভব বা চেতনার সন্ধান পাই কি যা এক ও বহুর সুসংগত অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের বুঝতে সহায়তা করে? কিংবা এরকম চেতনা যদি না থাকে তা হলে বুঝবার যে কোনো প্রয়োজন নেই, এটা স্বীকার করা যায় কি? দুটো প্রশ্নেরই উত্তরে না বলতে হয়।

নির্বিকল্প সম্বন্ধহীন অনুভবের মধ্যে আত্মাকে পাওয়া যায় না। এই অনুভব পরে আত্মা ও অনাত্মা দুইরূপে বিকল্পিত হয়। সুতরাং নির্বিকল্প অনুভবকে আত্মদর্শনের পথ বলা চলে না। এমন-কি সুখদুঃখের অনুভূতিকেও শুধু আত্মিক বলা চলে না। তা ছাড়া এই অনুভব নিয়ত-পরিবর্তনশীল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; এই অনুভব দ্বারা সম্বন্ধের স্বরূপ বোঝা যায় না। এই অনুভব থেকে আমরা এমন কোনো নীতি পাই না, যার সাহায্যে আত্মার অবিচ্ছিন্ন সমত্ব সম্বন্ধে একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য চিত্র অঙ্কন করা যায়। সম্বন্ধ-চেতনার নিম্নের নির্বিকল্প অনুভব থেকে আমরা যেমন কোনও সাহায্য পাই না, সম্বন্ধচেতনার উর্ধ্বে যদি কোনো পরানুভূতি থাকে তাও আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করে না। পরানুভূতিও একটা তথ্য মাত্র। কেন ও কি ভাবে পরিবর্তনের মধ্যে আত্মা এক থাকতে পারে সে প্রশ্নের উত্তর কোনো তথ্য দেয় না।

আত্ম-জ্ঞান বলতে যদি এমন এক প্রকার জ্ঞান মনে করা যায় যাতে আত্মা (বিষয়ীরূপে) নিজেকে (বিষয়রূপে) সমগ্রভাবে জানে, তা হলে

এরকম জ্ঞান সম্ভব নয়। আত্মা (এর বিভিন্ন অর্থে) বিষয়রূপে জ্ঞাত হতে পারে; কিন্তু এই জ্ঞান অসম্পূর্ণ। বিষয়রূপী আত্মা কখনো বিষয়ীরূপী আত্মার সমান হয়ে উঠতে পারে না। বিষয়ীরূপী আত্মা একটা অনুভূতি। এই আত্মা কখনো নিজেকে নিঃশেষে বিষয়রূপী আত্মার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে না। বিষয়ী আত্মার মধ্যে বিষয় আত্মার চাইতে অনেক কিছু বেশি অনুভব থাকে এবং যতক্ষণ বিষয় ও বিষয়ীভেদ থাকে ততক্ষণ এই দুইয়ের মধ্যে অভেদ জ্ঞান, অর্থাৎ সত্যিকারের আত্মজ্ঞান অসম্ভব।

কেউ হয়তো বলবেন যে সংকল্পশক্তির প্রকাশের মধ্যে আত্মার সত্য বা তত্ত্ব নিহিত আছে। হয়তো সত্যই আছে, কিন্তু সংকল্পশক্তির প্রয়োগের বা কর্তৃত্বের কোনো সংগতিপূর্ণ ধারণা আমাদের নেই। সেইজন্যই বোধ হয় যাঁরা ইচ্ছাশক্তির গূঢ় অর্থ প্রকাশ করতে পারতেন তাঁরা সকলে নির্বাক!

বহু নিঃসঙ্গ পুরুষের কল্পনা (যেমন লাইবিজ দর্শনে) আমাদের বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে না। বহুর অস্তিত্ব স্বীকার করলে বহুর মধ্যে সম্বন্ধের প্রশ্ন ওঠে। বহুত্ব ও নিঃসঙ্গতা এই দুইএর একত্র সমাবেশ পৃথকত্ব সম্বন্ধ ব্যতিরেকে বোঝা যায় না; অথচ পার্থক্যের সম্বন্ধ, নিঃসঙ্গতার অর্থাৎ সম্বন্ধহীনতার পক্ষে বাধাস্বরূপ। এতদ্ব্যতীত, সম্বন্ধহীন কতগুলো পুরুষের কল্পনার দ্বারা কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। আর বহু পুরুষকে যদি এক পুরুষের অঙ্গীভূত বিবেচনা করা যায়, তা হলে শুধুমাত্র একত্বের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়; একত্ব কি করে সম্ভব তা বলা হয় না। সুতরাং আমরা আত্মা বলতে যা বুঝি তা পারমার্থিক দৃষ্টিতে সত্য নয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

অবভাসমাত্রবাদ

সংসারের বিভিন্ন বস্তুকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করবার সুমহান চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু যা-কিছু আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তার মধ্যে একটা একত্ব প্রয়োজন। যেহেতু অবভাস বা আপাত-সত্যের মধ্যে একত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, একত্ব সেই হেতু নিশ্চয়ই অজ্ঞাত কোনো

পারমার্থিক তত্ত্বের মধ্যে নিহিত, এরকম মনে করা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। এই অসম্ভব পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কেউ কেউ মনে করেন যে ব্যবহারিক সত্য বা আপাতসত্য বলে প্রতিভাত সত্তা ছাড়া অন্য কোনো সত্তা বা বস্তু বা তত্ত্ব নেই। ঘটনাবলী ও তাদের সংঘটনের ধারা এই দিয়েই সব কিছু। সংসারে সমত্ব বা একত্ব বলে কিছু নেই ; কোনো প্রচ্ছন্ন বা অতিরিক্ত সত্তা বা বস্তুও নেই। প্রশ্ন স্বাভাবিকতই ওঠে, সংসারে যদি কোনোরূপ একত্ব না থাকে তা হলে অবভাসমাত্রবাদীদের মতের সত্যতা সম্বন্ধেই বা নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কি করে? আমরা যা অনুভব করি তার মধ্যে পাই ঘটনা ও ঘটনার সম্বন্ধ, এই দুরকম পদার্থ। সম্বন্ধও এক প্রকার অবভাস। এই জাতীয় অবভাস ও ঘটনা-জাতীয় অবভাসের মধ্যে কি সম্বন্ধ তা এই মতবাদীদের ব্যাখ্যা করা উচিত ; কিন্তু তাঁরা এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। তা ছাড়া, অতীত ও ভবিষ্যৎ যতক্ষণ না ঘটছে ততক্ষণ ঘটনা নয়, সুতরাং তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হয়। ঘটনা একটা পরিবর্তন। অথচ কি পরিবর্তিত হচ্ছে তাও এই মতবাদীরা বলতে পারেন না। গতির জন্য একই পদার্থের নানা স্থান পরিবর্তন প্রয়োজন। গতি স্বীকার করলে বহুর মধ্যে একত্বের প্রশ্ন আবার জেগে ওঠে। ঘটনা-পুঞ্জের ব্যাখ্যাই বা একত্ব ছাড়া কি করে সম্ভব? অবভাসমাত্রবাদীরা বলবেন ঘটনার ব্যাখ্যা নিয়মের মধ্যে। ঘটনাগুলো নিয়মের দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু নিয়মগুলো অনুভূত ঘটনা নয় ; সুতরাং সেগুলোকে প্রতিভাত সত্য বলা চলে না। এই মত স্বতোবিরোধ-দোষে দুষ্ট। অবভাসমাত্রবাদীদের সম্মুখে তাই উভয় সংকট : হয় তাঁদের মানতে হয় বর্তমানের এই এক মুহূর্তের বাইরে তাঁদের যাওয়ার কোনো উপায় নেই, সুতরাং বিজ্ঞান অসম্ভব। নয়, অনুভবের সীমা অতিক্রম করে তাঁদের এক ও বহুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, একত্বকে আবার ডেকে ঘরে আনতে হয়। বস্তুত প্রপঞ্চমাত্রবাদীদের প্রচেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্বয়ংসৎ-বস্তুবাদ

অনুভবের সীমা অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। এবং বিশ্ব ও বস্তু সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে গেলে অনুভবের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে আমাদের যেতেই হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা এমন কোনো ধারণার পরিচয় পাই নি যার সংগতি অক্ষুণ্ণ। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হয়েছি যে, বিশ্ব যেন দ্বিধা-বিভক্ত। এক ভাগে সত্তা-বিরহিত অনুভব ও জ্ঞানের রাজ্য ও অন্য ভাগে জ্ঞান-বিরহিত বস্তু বা সত্তার রাজ্য। এক দিকে তার ভান বা অবভাস, যা অনুভব ও জ্ঞানের বিষয়, অন্য দিকে তার বস্তুসত্তা বা স্বয়ংসৎ-বস্তু, যা জ্ঞানের অগোচর। যা পরমবস্তু, তা অজ্ঞেয় অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা পরমতত্ত্বকে বোঝা যায় না, এরকম একটা বিশ্বাস অতিপ্রচলিত। কিন্তু বস্তু-সত্তা বা পারমার্থিকতত্ত্ব অজ্ঞেয় বলে যাঁরা মত প্রকাশ করেন তাঁরা শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হন না যে পরমার্থের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, তাঁরা আরো বলেন যে বস্তুসত্তা বা স্বয়ংসৎ-বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানও অসম্ভব। কিন্তু যা অজ্ঞেয় তা যে অজ্ঞেয়, এই জ্ঞান কি করে সম্ভব? কেউ যদি বলেন যে তাঁর ইন্দ্রিয়ের সমস্ত অনুভব-শক্তি তাঁর নিজ উদ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেইজন্য পার্শ্ববর্তী উদ্যানে গোলাপ ফুটেছে কি না তিনি জানেন না, তাঁর বলা যেমন অসংগতিপূর্ণ হবে, এই মতবাদ তেমনি অসংগতি-দুষ্ট।

বস্তু-সত্তা বা স্বয়ংসৎ-বস্তু যদি অজ্ঞেয় হয় তা হলে স্বয়ংসৎ-বস্তু যে বহু এরকম একেবারেই বলা চলে না। এই বস্তু আবার যদি গুণের অধিকারী হয় তা হলে দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ এখানে প্রযোজ্য হবে এবং পূর্ব অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত যাবতীয় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং এই স্বয়ংসৎ-বস্তু নির্গুণ। কিন্তু নির্গুণ বস্তু-সত্তা বা স্বয়ংসৎ-বস্তুও যা, শূন্যতাও তাই। সুতরাং বিশ্ব-সংসার শূন্য। অজ্ঞেয়বাদ শেষ পর্যন্ত শূন্যবাদে পর্যবসিত হয়। আবার যা কিছু আমাদের ব্যবহারিক চেতনায় অবভাসরূপে উদ্ভাসিত হয় তার একটা আপাতসত্যতা আছে। কারণ অবভাস বা ভান অসৎ এ কথা বলা চলে না। এই আপাতসত্যতা স্বীকার করেই আমাদের সাংসারিক

কাজ চলে যায়। কোনো স্বয়ংসৎ-বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হয়ে ওঠে। সুতরাং আমরা বলতে বাধ্য যে অজ্ঞেয় বস্তু-সত্তার কোনো প্রমাণও নেই এবং কোনো প্রয়োজনও নেই।

যা কিছু অনুভূত হয় তার একটা সত্তা আছে। সুতরাং অবভাস ও বস্তু-সত্তা পরস্পর-সম্বন্ধ। বস্তু-সত্তারই অবভাস হচ্ছে অনুভূত অবভাস। আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ হতে পারে; কিন্তু যা আছে বলে আমরা অনুভব করি বা জানি তার অস্তিত্ব একেবারেই নেই এ কথা নিরর্থক। এ জগৎ স্বপ্ন নয়। কিন্তু কি ভাবে পারমার্থিক তত্ত্ব বা সত্তা অবভাসিত বা ব্যবহারিক সত্তা রূপে আবির্ভূত হয় এবং অবভাসের আপাতসত্যতা কতখানি এবং অবভাস কি ভাবে পরম-সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত, এই-সব বিষয়ে আমরা এ পর্যন্ত কোনো ধারণা করে উঠতে পারি নি।

চতুর্দশ অধ্যায়

পরমসত্তার সাধারণ রূপ

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর আলোচনার পর এইটুকু আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, পরমসত্তাকে প্রচলিত কোনো ধারণার দ্বারা (যেমন দ্রব্যগুণ, সম্বন্ধ, আত্মা প্রভৃতি) বুঝতে গেলে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়; মনে হয় যেন অসংগতি ও স্বতোবিরোধের জন্য পরমসত্তা আমাদের প্রচলিত কোনো চিন্তাধারাকেই গ্রহণ করছে না। কিন্তু পরম সত্য বলে গ্রহণ করতে না পারলেও আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যা-সব পাই সেগুলো একেবারে শূন্য বা একেবারে অসৎ নয়। এগুলোর সঙ্গে পরমসত্তার একটা বোঝাপড়া অবশ্য দরকার। আমরা এই বলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি না যে এগুলো অসতের রাজ্যের মধ্যে কোথায়ও বিরাজ করে। যা সৎ বলে আবির্ভূত হচ্ছে তা অসতের রাজ্যে আছে, এ কথা আমরা চিন্তা করতে অক্ষম। পরমতত্ত্ব অবভাসকে কোনো না কোনো ভাবে ধারণ করেছে। পরমার্থের ওজন অব-ভাসের ওজনের চাইতে কম এ হতেই পারে না।

আমাদের এখন অন্বেষণ করতে হবে যে পরমসত্তার স্বরূপ কি ও কি

ভাবে অবভাস পরমসত্তার মধ্যে গৃহীত হয়ে আছে। সর্বপ্রথমে প্রশ্ন ওঠে পরমসত্তাকে জানবার কোনো মান বা নীতি আছে কি না? এর উত্তর আর-একটা প্রশ্ন দিয়ে আমরা দিতে পারি। তা হচ্ছে এই যে যদি কোনো নীতি বা মান পরমসত্তানির্ধারণের নাই থাকে, তা হলে অবভাসকে অবভাস বলে নিরূপণ করবার সম্ভাবনা কোথায়? এ পর্যন্ত যখনই কোনো ব্যাপারে স্বতোবিরোধ লক্ষ্য করেছি আমরা তখনই তাকে অসত্য বলে বিশ্বাস করেছি। চিন্তা করতে বসলেই সত্য ও অসত্যের দাবি মানতে হয় এবং অবধারণের সময় যা স্বতোবিরোধী ও অসংগতিপূর্ণ তাকে অসত্য বলে পরিত্যাগ করতে হয়। চিন্তা করতে হলে বিচার বা অবধারণ করতে হয়। বিচার বা অবধারণ করতে হলে সমালোচনা করতে হয় এবং সমালোচনা করতে গেলেই একটা মান বা নীতির কাছে নতিস্বীকার করতে হয়। পারমার্থিক তত্ত্ব তাই, যাতে কোনো স্বতোবিরোধ নেই। পারমার্থিক তত্ত্ব নিরূপণের এই হচ্ছে সনাতন নীতি বা মান।

এমন হয়তো হতে পারে যে নানা বা একাধিক মান আছে। কিন্তু তাই যদি থাকে সেগুলোকে পরস্পর তুলনা না করে আমরা থাকতে পারি না। এবং এ প্রশ্ন উত্থাপন না করেও পারি না যে সেগুলোর মধ্যে মিল আছে কি না? যদি সেগুলোর মধ্যে সংগতি না থাকে, অমনি আমরা সেগুলোকে পরিত্যাগ করতে চাই। সুতরাং সংগতির নীতিই হচ্ছে সত্য নির্ধারণের পরম ও চরম নীতি। এর ওপরে আর কোনো নীতি নেই।

সংগতি ও বাধাহীনতার নীতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও এ প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে যে কোনো পদার্থের বিষয়ে শুধু এইটুকু জানলেই কি যথেষ্ট কিছু জানা হল যে সেই পদার্থ অসংগতি সহ্য করতে পারে না? এই নেতিবাচক জ্ঞান দ্বারা পরমতত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। পরমতত্ত্বের সম্পূর্ণ প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অসম্ভব এই মত আমরা স্বীকার করতে পারি। কিন্তু পরমতত্ত্ব যে অসংগতির প্রতি অসহিষ্ণু তার থেকে এটা দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হয় যে, পরমার্থ হচ্ছে এক সুসমঞ্জস ও সুসংগত পদার্থ; আরো একটা জিনিস দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যা কিছু অবভাসরূপে আমাদের অনুভবের মধ্যে আবির্ভূত হচ্ছে তার প্রত্যেকটারই একটা সুসংগত ও সুসমঞ্জস স্বরূপ এই পরমতত্ত্বের মধ্যে আছে। রূপ, রস

বস্তু, গুণ, দেশ, কাল প্রভৃতি যা-কিছু আমরা পাই সবই পরমার্থের মধ্যে সংহতি ও সংগতি লাভ করেছে রূপান্তরিত হয়ে, ও নূতন ভাবে বিন্যস্ত বা সজ্জিত হয়ে। রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী, কারণ আমরা যে ভাবে পাই সে ভাবে এগুলো যদি থাকে তাদের পারস্পরিক সংগতি সম্ভব নয়, এবং সবরকম অবভাসের স্থিতি এইজন্য স্বীকার্য যে যা-কিছু সৎ তারই পরমসত্তার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ থাকতে বাধ্য।

সংক্ষেপে বলতে গেলে পরমসত্তা হচ্ছে একত্ব ও বহুত্বের এক অপূর্ব সমন্বয়, এক বিস্ময়কর শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলাকে বহু স্বতন্ত্র শৃঙ্খলার সংযোগ মনে করা যায় না, কারণ বহুত্ব ও স্বাতন্ত্র্য পরস্পরবিরোধী। ১. একমাত্র যা একক তাই সম্পূর্ণভাবে ও প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র হতে পারে। একত্বের পট-ভূমিকা ব্যতীত নানাত্বের কল্পনা বা চিন্তাই করা যায় না। একত্ব থেকে সরে আসলে নানাত্বও থাকে না, শুদ্ধ সত্তামাত্র থাকে। শুদ্ধ সত্তা ও শূন্যতা এক জিনিস। ২. সম্বন্ধহীন স্বাতন্ত্র্য অসম্ভব। স্বতন্ত্র পদার্থ বলতে আমরা বুঝি এমন পদার্থ যা সম্বদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সম্বন্ধের দ্বারা প্রভাবিত নয়। সুতরাং যেখানে নানা পদার্থ একত্র অবস্থান করছে সেখানে স্বাতন্ত্র্যের জন্যই সম্বন্ধ প্রয়োজন হবে। প্রাক্-সম্বন্ধ নির্বিকল্প অনুভবের বা 'আলোচনের' মধ্যে বহু যেভাবে অবস্থান করে, একাধিক পরমতত্ত্বও সেইভাবে সহাবস্থান করে এইরকম ধারণাও গ্রহণযোগ্য নয়। তার কারণ এই যে নির্বিকল্প অনুভবের অবস্থায় বহুত্ব একটা সমগ্র ঐক্যবোধের মধ্যে ধৃত হয়ে থাকে। তা ছাড়া সম্বন্ধ-জনিত অবভাসগুলোকে একেবারে এক ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে চলে না। এদেরও সত্যতত্ত্বের মধ্যে একটা স্থান দিতে হয়। সেইজন্য প্রাক্-সম্বন্ধ অনুভব কখনো পরমতত্ত্বের আদর্শ রূপ বা তুলনা বা মানদণ্ড হতে পারে না। সম্বন্ধের উৎপত্তি হয় একটা ঐক্যানুভূতির থেকে। নানাত্ব ও সম্বদ্ধতা হচ্ছে একত্বের দুই দিক। সেইজন্য বিচারে অগ্রসর হলে স্পষ্ট হয় এই কথা যে, বহু পরমতত্ত্ব অসিদ্ধ। পরমতত্ত্বের বহুবচন নেই। পারমার্থিক বস্তু অদ্বৈত ও অদ্বিতীয়। এর মধ্যেই বিবিধের মহান মিলন ঘটেছে সুসমঞ্জসরূপে ও সুষমরূপে। এক কথায়, পরম পদার্থ হচ্ছে এক সুগঠিত সুসংহত অখণ্ড সত্তা বা ব্যক্তি। একত্ব ও পৃথকত্ব উভয়েই এই অখণ্ডতত্ত্বের মধ্যে নির্বিঘ্নে ও নির্বিবাদে বিরাজ করে।

পরমতত্ত্বের একটা পরিলেখ তো পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন ওঠে এই তত্ত্ব কি ধাতু দিয়ে গড়া? এই পরিলেখের মধ্যে কি বস্তু আছে? এক কথায় এর উত্তর দিতে হলে বলতে হয় বিজ্ঞান, চৈতন্য বা অনুভব এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বস্তু। আমরা যাকে জ্ঞান, চেতনা বা সংবেদনা বলি তার বাইরে কোনোরকম অস্তিত্ব নেই। যে কোনো তথ্য বা অস্তিত্বের কথা ধরা যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে তা চৈতন্যের অংশ ব্যতীত আর-কিছু নয়; হয় এষণা না হয় জ্ঞান, না হয় অনুভূতি বা সংবেদনের বিষয়ীভূত ও তার থেকে উদ্ভূত বা তার সঙ্গে সম্পর্কিত। চেতনার এই গণ্ডী অতিক্রম করবার সামর্থ্য আমাদের নেই। যে বস্তু কোনো ভাবে অনুভূত হয় না বা কখনো প্রত্যক্ষ হয় না, সে বস্তুর কোনো অর্থ নেই। কিন্তু সত্তা ও চৈতন্য বা অনুভবের সমতা স্থাপন করে আমরা তার তাৎপর্য যেন এই না করে বসি যে দ্রষ্টা বা ভোক্তা পুরুষ হচ্ছে বিশ্বের বাইরে অবস্থিত এক বিশেষ পুরুষ এবং বিশ্ব এই বিশেষ পুরুষের মানসিক অবস্থার সমষ্টি মাত্র। দ্রষ্টা বা বিষয়ীকে সমগ্রের থেকে পৃথক বিশেষ্য কল্পনা করে সমগ্রকে এই বিষয়ীর চৈতন্যের বিশেষণে পরিণত করা এক মারাত্মক ভ্রম। চৈতন্য বা সংবেদন অর্থে আমরা বুঝি সমগ্র চৈতন্য যার মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়ের পার্থক্য কল্পনা করা যায়, কিন্তু বস্তুত যার মধ্যে বিষয় ও বিষয়ীর কোনো প্রভেদ নেই। চৈতন্যই সত্তা, এর অর্থ এই যে সমস্ত সত্তাই চৈতন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিষয় বা বিষয়ীরূপে সন্নিবিষ্ট। অনুভব ও অনুভূত বিষয়, চৈতন্য বা চৈতন্যের বিষয় এক বৃহত্তর অবিভাজ্য ও অখণ্ড চৈতন্যসত্তার অংশ। এই দিক থেকে সর্বপ্রকার সত্তাই চৈতন্যস্বরূপ। এ পর্যন্ত পারমার্থিক সত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে যা জানা গেল তা এই যে পারমার্থিক পদার্থ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বগ্রাহী ব্যক্তি বা পুরুষ যার চৈতন্যের মধ্যে যাবতীয় বিবিধের সমন্বয় সাধিত হয়েছে এবং সেখানে কোনোপ্রকার অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই, সেখানে সর্বপ্রকার অনুভূতি বা সংবেদন একটা সর্বগত বিরাটের অনুভূতির বিষয় হয়ে উঠেছে। জ্ঞানের এই দ্বন্দ্বহীন একতা থেকে অবশ্য এ কথা স্বতঃই প্রমাণিত হয় না যে এই অনুভূতি বা চৈতন্যের মধ্যে আনন্দের আতিশয্য আছে। জ্ঞানরূপে চৈতন্য সুসমঞ্জস হয়েও তার মধ্যে সুখানুভূতির চেয়ে দুঃখানুভূতি অধিকতর এইরকম কল্পনা করতে বাধা নেই। এমন কেউ নিশ্চয়ই নেই যিনি বিশ্বাস করেন যে দুঃখ, তা সে যতই

সুসমঞ্জস হোক না কেন, একটা বাঞ্ছনীয় জিনিস। দর্শনের বিচারে নেমে মনুষ্য-প্রবৃত্তির সব দিকের সঙ্গেই বোঝাপড়া করতে হয়। আমাদের স্বভাবের প্রধান প্রধান বৃত্তিগুলোর পরিপূর্ণতা পরমতত্ত্বে যদি অসম্ভব হয় তা হলে আমরা সত্য জানতে পেরেছি কি না এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। এ পর্যন্ত জ্ঞানের দিক থেকে আমরা পরম পদার্থকে দেখেছি এবং এই জানতে পেরেছি যে জ্ঞানগত সামঞ্জস্য তার স্বরূপ। কর্মের এমন কোনো নীতি আছে কি যা আমাদের আশ্বাস দেয় যে, আমাদের পূর্ণতম কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা এই পরম পদার্থের দ্বারা পূর্ণ হবে ? কর্মজগতের একটা নীতি আছে। সেই নীতিও সমন্বয়ের নীতি। বিবিধ বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সুসমঞ্জস ও সীমাহীন সার্থকতাই কল্যাণ। এই বিষয়ে বুদ্ধিমান সুখবাদীদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ বিরোধ নেই। যেহেতু পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারলে দুঃখের চেয়ে সুখের আধিক্য হতে বাধ্য। পরিপূর্ণতার অবয়ব আনন্দময়। পরিপূর্ণতা কিংবা বিশুদ্ধ সুখ কিংবা দুইএর সমন্বয়কে কর্মজীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করা যায় ; কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে এই আদর্শ পারমার্থিক পদার্থে বাস্তব হয়েছে বলে আমরা জানি কি এবং যদি জানি, সেই জ্ঞানের উৎস কি।

প্রথমত বিখ্যাত সত্তাসাধক যুক্তিটার কথা বিবেচনা করা যাক। তার বক্তব্য এই যে কল্যাণ-সম্বন্ধীয় ভাব বা প্রত্যয়ই প্রমাণ করে যে কল্যাণ বাস্তবিক। এই তর্কটিকে বিচার করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সাধারণ-ভাবে কথাটা সত্য যে পরিপূর্ণতার কোনো বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকলে তার সম্বন্ধে কোনো প্রত্যয় বা ভাব বা ধারণা সম্ভব নয়। কিন্তু এই পরিপূর্ণতা শুধু বুদ্ধিগত বা উপপত্তি-বিষয়ক হতে পারে। একটা ভাব দুই বা ততোধিক বস্তুর জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে ; সেইজন্য প্রত্যেক মিশ্রভাবের উপযোগী একটা মিশ্র বস্তু আছে এরকম ধারণা করা অসংগত। পরিপূর্ণতা ও আনন্দ-সম্বন্ধীয় ভাব, দুই বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞানের থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে। সেইজন্য জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং পরম-আনন্দময় কোনো সত্তা নাও থাকতে পারে। দুই ভাবের মিশ্রণ শুধু মানুষের মানসিক ব্যাপার হয়ে থাকতে পারে। জ্ঞানগত সুসংগতি যে আনন্দদায়ক এমন কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং প্রত্যয়মূলক যুক্তির সাহায্যে নৈতিক আদর্শের চরি-তার্থতা অর্থাৎ যা হওয়া উচিত তা হয়ে আছে এমন প্রমাণিত হয় না।

সাধারণত নৈতিক আদর্শ একটা অলব্ধ আদর্শ মাত্র। নৈতিক জীবন-যাপনের জন্য যে আদর্শ আমরা আমাদের সামনে ধরি, চরিতার্থতা-লাভ করে নি বলে সেটা আমাদের টানে। আধ্যাত্মিক বা ধার্মিক অনুভূতিতেও যে বস্তুকে শ্রেষ্ঠ বলে ধারণা করা হয়, তার অস্তিত্ব শুধু স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু ধর্মবোধস্থিত আদর্শের বা বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারলে ধর্মানুভূতিরও অবসান হয়। তা ছাড়া, কোনো একটা ভাব আমাদের মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে যে তার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হয়েও তার আনুগত্য স্বীকার করতে আমরা বাধ্য হতে পারি, যেমন কামাতুর পুরুষ অনেক সময় কোনো নারীর প্রেমের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়েও দুর্দম ও অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে তার দিকে ধাবমান হয়। বুদ্ধির ক্ষেত্রে শুদ্ধ সেই পদার্থ সত্য, শান্ত মুহূর্তে বিচার করে যাকে অসিদ্ধ বলা যায় না। যা সন্দেহ করা অসম্ভব, অর্থাৎ যা স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ংপ্রকাশ একমাত্র তাই বুদ্ধির কাছে সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য।

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে বুদ্ধির এই আধিপত্য স্বীকার করা হবে কেন? যাবতীয় স্বতঃসিদ্ধ নীতি বা সত্যই হচ্ছে মনুষ্যের ইচ্ছাবৃত্তির সৃষ্টি; যেহেতু সেগুলো সংকল্প বা সংস্কার মাত্র। যেমন ধরুন অবিরোধ নীতি। বুদ্ধি এই সংস্কার বা অভ্যাসের ক্রীতদাস মাত্র। বেশ, বুদ্ধির আচরণকে সংস্কার বলে গ্রহণ করা গেল। তাতে কি আসে যায়? বিচার করতে বসলে বিচারের জন্য কতকগুলো মান স্বীকার করে নিতে হয়, বস্তুর সম্বন্ধেও কতগুলো ধারণা স্বীকার করে নিতে হয়। বুদ্ধিগত বিচারে (দর্শনের বিচার মুখ্যত বুদ্ধিগত) বুদ্ধির স্বকীয় আদর্শের প্রতি অনুগত হতেই হয়। নৈতিক তত্ত্বের সত্যনির্ণয়ে কোনো অধিকার নেই। নৈতিক শাস্ত্র বলছে, 'এই প্রকার আচরণ করো, অর্থাৎ এই প্রকার হও নতুবা অসুখী হবে।' এই প্রকার আচরণ না করার জন্য আমি অসুখী থাকব, কিন্তু অসুখী হলেও আমি অবাস্তব বা স্বল্প-বাস্তব হব না। অসুখী হওয়ার জন্য আমার অস্তিত্বের হ্রাস হবে না। বুদ্ধিগত বিচারের আদর্শ অনুসরণ করে যাকে স্বীকার করতে আমি অক্ষম, তার বাস্তবতা বা সত্যতা আমার কাছে সন্দেহজনক। অথচ কর্মগত আদর্শ-অনুযায়ী যাকে আমি স্বীকার করতে অক্ষম তা যে অসত্য বা অবস্তু এ কথা বলা চলে না। নৈতিক বোধের মূলসূত্র কি আছে, তা নয়,

কি হওয়া উচিত তাই। সুতরাং প্রকৃত তথ্য যাই হোক না, ঔচিত্যবোধের ব্যাপারে ঔচিত্যই বড়ো কথা। সংক্ষেপে এই বলা চলে যে 'এই হও' নির্দেশের অর্থ এই নয় যে 'এই ধারণা করো'। এবং 'এই ধারণা করো' এই নির্দেশের অর্থ এই নয় যে 'এই হও'। বুদ্ধির ব্যাপারে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। হওয়া উচিত ও 'হয়ে আছে'র মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সুতরাং সংস্কারই হোক আর যাই হোক পরমার্থবিচারে বুদ্ধির নিয়ম বা আদর্শ মেনে অগ্রসর হতেই হবে। আমার ঔচিত্যবোধ থেকে পরমার্থতত্ত্বের স্বরূপনির্ণয়ে কোনো প্রত্যক্ষ সাহায্য পাওয়া যায় না। যা যা মানুষ চায় সবই পারমার্থিক সত্তার মধ্যে পাওয়া যাবে, এও একরকম স্বপ্ন-বিলাস হতে পারে।

অন্য ভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করা যাক। পারমার্থিক পদার্থে সবরকম দুঃখবোধ ছাপিয়ে একটা সামগ্রিক আনন্দ আছে কল্পনাতে যে সংগতির পূর্ণচ্ছবি পাওয়া যায় তার বিপরীত কল্পনায় তা নেই। পারমার্থিক পদার্থ দুঃখের ভারে সততক্লিষ্ট-কল্পনা করলে মানতে হয় যে ঔপপত্তিক সংগতি সত্ত্বেও পারমার্থিক পদার্থের মধ্যে অন্যপ্রকার অসংগতির কারণ নিহিত আছে ও পারমার্থিক পদার্থের মধ্যে পরিবর্তনের ও অশান্তির বীজ উপ্ত আছে। সুতরাং পারমার্থিক পদার্থ এক সান্ত পদার্থ হয়ে ওঠে। এ পর্যন্ত বিচার করে এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছে যে এই সত্তার মধ্যে ভাব ও অনুভবের পার্থক্য নেই। যা ভাব বা প্রত্যয়-রূপে আছে তা অনুভবরূপেও আছে, এতেই জ্ঞানগত সংগতি। কিন্তু অখণ্ডতত্ত্বের মধ্যে অভাব থাকলে এই সংগতি অসম্ভব। পরমতত্ত্বের জ্ঞানগত সংগতিও অসম্ভব যদি পারমার্থিক চৈতন্যের মধ্যে এমন কোনো অবস্থার ধারণা বা ভাব থাকে যার অনুরূপ অস্তিত্ব নেই। সামগ্রিক ও পূর্ণ সংগতি ব্যতীত বোধগত সংগতিও অসম্ভব, সুতরাং আমরা এমন পারমার্থিক পদার্থ বা তত্ত্ব স্বীকার করতে পারি না যার অনুভব দোষলেশহীন ও পূর্ণাঙ্গ অথচ বেদনা-ভারাক্রান্ত। সম্পূর্ণ সংগতি ও পূর্ণ অনুভবের সঙ্গে অভাবের অসংগতি আমরা ধারণা করতে পারি না। এইরকম সত্তা অচিন্তনীয়।

এবং এই-সব কারণে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে পারমার্থিক সত্তা আমাদের প্রকৃতির সমস্ত অভাব ও চাহিদা পূরণ করে। আমরা সত্য, সৌন্দর্য

ও কল্যাণ চাই ; এবং এই তিন প্রকার মৌলিক চাহিদাই আমাদের মেটাতে হবে। আমাদের তিন প্রকার মূল আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি হতে পারে এক সর্বময় সত্তার প্রত্যক্ষ অনুভব বা অভিজ্ঞতার মধ্যে। কিন্তু এই প্রকার অভিজ্ঞতার কোনো নিদর্শন আমরা পাই কি ?

অখণ্ডতত্ত্ব বা পরমতত্ত্বকে সম্যকভাবে জানতে হলে পরমতত্ত্ব হতে হয় ; তা হলে আমাদের সত্তার বিলুপ্তি ঘটে। সুতরাং জীবসত্তা রক্ষা করে পরমসত্তাকে সম্যক উপলব্ধি করবার চেষ্টা বৃথা। পরমতত্ত্বের অভিজ্ঞতার রস আস্বাদন করা অসম্ভব। কেউ যদি কখনো পরমতত্ত্বের রস আস্বাদন করে থাকে সে আর ফিরে এসে মানবীয় ভাষায় সেই স্বাদের সম্যক বর্ণনা দিতে পারে না। পরমতত্ত্ব নিত্য অনুচ্ছিষ্ট। তবে 'জানার' অর্থ যদি 'বাহ্য ধারণা করা' মনে করা হয় সেরকম জানা সম্ভব হতেও পারে। কিন্তু এই বাহ্যজ্ঞান এবং পারমার্থিক সত্তার নিজ অনুভবের মধ্যে বহু প্রভেদ। তবুও বুদ্ধিদ্বারা সসীম মানুষের পক্ষে এর বেশি অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

প্রাক্‌সম্বন্ধ নির্বিকল্প বা নির্বিশেষ অনুভব থেকে আমরা সম্বন্ধোত্তর নির্বিকল্প অনুভবের একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারি। সেই উচ্চতর অনুভবের মধ্যে এষণা, ভাব ও অনুভব একাকার হয়ে মিশে আছে। প্রাক্‌সম্বন্ধ ঐক্যবোধের জন্যই সম্বন্ধস্তরে সমস্ত পার্থক্যই এক বৃহত্তর শৃঙ্খলার সূচনা করে ; সেই শৃঙ্খলার মধ্যে সবরকম সম্বন্ধ নির্বিবাদে অবস্থান করতে পারে। কিন্তু সম্বন্ধস্তরে এই ঐক্যকে কিছুতেই সার্থকভাবে পাওয়া যায় না। কল্যাণবোধ ও সৌন্দর্যবোধও আমাদের এই ঐক্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই দুই প্রকার বোধ থেকেও শেষ পর্যন্ত সম্বন্ধোত্তর এক সমগ্র অনুভব বা অভিজ্ঞতার লক্ষণ বা আভাস আমরা পাই ; এই অখণ্ড অনুভব সর্ববিধ সম্বন্ধকে অতিক্রম করে এক মহান সুসংগতির মধ্যে আমাদের যাবতীয় ভাব ও অনুভবকে ধারণ করে থাকে। এই সুষম ও অখণ্ড অনুভবের কোনো অনুভব আমাদের নেই ; কিন্তু তার সম্বন্ধে একটা বাহ্য ধারণা আমাদের আছে ও হতে পারে। এই ধারণা বা জ্ঞান কাল্পনিক নয়। মানুষী জ্ঞানের পক্ষে এই বিষয়ে যতখানি সত্য ও সার্থক হওয়া সম্ভব ততখানিই সত্য ও সার্থক এই জ্ঞান।

বিচার ও বস্তু

সত্য ও সত্তার মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। বস্তু হল এক জিনিস এবং ভাব বা চিন্তা বা ধারণা হল আর এক জিনিস। অবধারণ বা বিচার হচ্ছে এক ব্যাপার এবং অনুভব হচ্ছে আর এক ব্যাপার। বিচারের বিষয় হল সত্য। অনুভবের বিষয় হল সত্তা।

প্রত্যেক বস্তুর দুই দিক আছে। আমরা সবসময়ই এই দুই দিক সম্বন্ধে মনোযোগী হতে পারি এবং এই দুই দিক থেকে বস্তুটার বর্ণনা দিতে পারি। 'তৎ'-এর দিক এবং 'কিম্'-এর দিক, অস্তিত্বের দিক এবং বর্ণনার দিক এবং এই দুই দিক হচ্ছে অবিভাজ্য। কোনো বস্তু শুধু থাকবে বা আছে অথচ কোনো বিশেষ ভাবে থাকবে না বা নেই এ হয় না; তেমনি কোনো বস্তুকে গুণান্বিত না করে একটা বিশেষ গুণ শুধু গুণ হিসাবে থাকবে বা আছে এও অসম্ভব। শুদ্ধ বিশেষ্য এবং শুদ্ধ বিশেষণ কোনোটাই নেই। সমস্ত বিশেষ্যই হচ্ছে বিশেষণ-যুক্ত এবং সমস্ত বিশেষণই হচ্ছে বিশেষ্য-যুক্ত। আমরা মনে মনে এই দুই দিককে পৃথক করে বিচার করতে পারি, কিন্তু বস্তুত এই দুই দিককে পৃথক করা অসম্ভব।

অথচ চিন্তন ব্যাপারটা হচ্ছে মূলত এই দুই দিকের পার্থক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভাব ব্যতিরেকে চিন্তা সম্ভব নয়। যখন 'তৎ'-কে 'কিম্'-এর থেকে আলাদা করে দেখা যায় তখন ভাবের উৎপত্তি হয়। 'তৎ'-এর সঙ্গে সম্পর্কহীন 'কিম্' শুধু একটা ভাব মাত্র। এইপ্রকার 'কিম্' বা গুণের অস্তিত্ব নেই। বস্তুত যা অবিভক্ত তাকে বিভক্ত বা বিশিষ্ট করাই হল ভাব ও চিন্তনের স্বভাব। বস্তুর একাংশ থেকে অপর অংশ পৃথককরণই হচ্ছে ভাব বা চিন্তা। সুতরাং ভাব ও স্মৃতিচ্ছবি এক পদার্থ নয়। স্মৃতিচ্ছবি হল অন্যান্য ঘটনার মতোই বাস্তব; তবে সেটা অন্য এক শ্রেণীর পদার্থ এই মাত্র।

অবধারণের স্বরূপবিচারে প্রবৃত্ত হলে এই জিনিসটা আরো সহজে বোধগম্য হয়। অবধারণে আমরা যা করি তা হচ্ছে এই যে, কোনো একটা ভাবকে একটা বস্তুর প্রতি প্রয়োগ করি। আমরা যা প্রয়োগ করি তা

একটা স্মৃতিচ্ছবি নয়। অবধারণে আমার মনের অন্তর্বর্তী একটা ক্ষুদ্র ঘটনাকে মনোবহিস্থ কোনো তথ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। অবধারণে আমরা বস্তুর প্রতি যা প্রযুক্ত করি তা একটা 'কিম্' ; এই কিম্ বস্তুর 'তৎ'-কে গুণান্বিত করে। এবং এই 'কিম্'-কে প্রয়োগ বা আরোপ করার অবস্থায় আমার মনের মধ্যে 'কিম্'-এর পশ্চাতে যে অনুভবের উদয় হয় সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অবান্তর। এইজন্য অবধারণ-ক্রিয়ার উৎপত্তির জন্য দরকার হয় দুইবার বিয়োগ বা বিশ্লেষণ। প্রথমবার অনুভূত বস্তুর সত্তাংশ থেকে গুণাংশকে বিয়োগ এবং দ্বিতীয়বার এই বিয়োগীকরণরূপ মানসিক ক্রিয়ার সত্তাংশ থেকে বিয়োজিতগুণের বা ভাবের বিয়োগ।

কোনো তর্ক বা অবধারণের অন্তর্বর্তী কর্তা বা ধর্মীর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ধর্মী হচ্ছে নিঃসন্দেহে অবস্থিত কোনো না কোনো সত্তা। যাকে আমরা 'তৎ' বলি সেটা হল কর্তা বা ধর্মী। 'এই অশ্বটা এক স্তন্যপায়ী জীব' এই তর্ক-বাক্যে 'এই অশ্বটা' একটা অনুভূত সত্তা। সমস্ত তর্ক-বাক্য সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। কেউ যখন তর্কে প্রবৃত্ত হন বা বাক্য ব্যবহার করেন তখন তিনি সন্দেহাতীতভাবে কোনো বাস্তব সত্তা সম্বন্ধে কিছু বলতে চান। ভাব উৎপত্তির সময় সত্তা ও গুণের বিচ্ছেদ হয় ; ভাবনায় বা অবধারণের সময়ে সেগুলোর আবার পুনর্মিলন ঘটে। বস্তুত যা— যাই ভাবত তাকে তাই করবার ব্যাপারের নাম অবধারণ। ভাবনার উদ্দেশ্য হল সত্য। চিন্তা বা ভাবনার সহায়তায় সত্তার প্রতি এমন গুণ আমরা আরোপ করতে চাই যার সঙ্গে সেই সত্তা অবাধে মিশে যেতে পারে। সত্য হচ্ছে সত্তা সম্বন্ধীয় এমন বর্ণনা যে বর্ণনা সম্পূর্ণ সুসংগত এবং সবরকম অসংগতি ও অস্থিরতার নাশক। অনুভূত সত্তা হল সর্বদাই অসংগতিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ; তার ফলে চিন্তা ক্রমশ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। ভাবনার মধ্যে ধর্মী (তৎ) ও ধর্মের (কিম্) প্রভেদটা হচ্ছে সতত বর্তমান ; সেইজন্য সত্য-জ্ঞান কখনো বস্তুর সঙ্গে সাযুজ্য এনে দিতে পারে না। সাযুজ্য সম্ভবপর হলে জ্ঞানের অবসান হয়। হওয়া ও জানার মধ্যে মিলন অসম্ভব। হয়ে জানা যায় না এবং জেনে হওয়া যায় না।

একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে তথ্যের মধ্যে ভাব নেই। তথ্য হল নিতান্ত ভাববর্জিত জিনিস। এবং ভাব-নামক পদার্থকে আমরা যেন

বিদেশ থেকে তথ্যের দেশে আমদানি করি। কিন্তু এই ধারণা একেবারে ভ্রমাত্মক। যে কোনো তথ্য পরীক্ষা করা যাক, তার মধ্যে ধর্মী ও ধর্মের বাঁধন শ্লথ ও শিথিল মনে হবে। অনুভবদত্ত বা অনুভবপ্রাপ্ত সত্তার ধর্মটা সবসময়ই অনুভবে অদত্ত বা অপ্রাপ্ত কোনো সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশেষের আকাঙ্ক্ষা করে। প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তের বা দত্ত ও অদত্তের এই পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা, অসীমের জন্য সীমার এই সতত ক্রন্দন, এটা একটা নিছক ভাবগত ব্যাপার নয়। ভাবগত বললে মনে হয় যেন এই অতিক্রম করবার প্রবৃত্তি হচ্ছে আমাদের ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। সমস্ত সসীম বস্তুর প্রকৃতিই হল এই যে, তার সত্তাকে তার ধর্ম অতিক্রম করে যায়।

দার্শনিক চিন্তায় আমরা এই আত্ম-অতিক্রম প্রবৃত্তিকে শেষ অবধি ঠেলে দিই। শেষ পর্যন্ত যে বিশ্ব আমাদের কাছে মুহুর্মুহুঃ নূতন নূতনরূপে অংশত অবভাসিত হচ্ছে তার গোটাটাই এক দিকে ধর্মী বা কর্তা হয়ে ওঠে। অন্য দিকে চিন্তনক্রিয়ার জন্য ধর্মকে ধর্মীর থেকে পৃথক রাখতে হয়। এবং সেইজন্য চিন্তন-দ্বারা গোটা বিশ্বকে লাভ করা যায় না। অবধারণ প্রক্রিয়ায় সত্তার প্রতি যে বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয় তা প্রযোজ্য হয়, কিন্তু তার কোনো নিজস্ব সত্তা নেই। এর থেকে বোঝা যায় যে, সত্য হল বস্তুর একবিধ ধর্ম মাত্র এবং সত্যের নিজস্ব কোনো সত্তা বা অস্তিত্ব নেই। বস্তুকে বর্ণনা করবার এক বিশেষ উপায় হল সত্য। সত্য যদি সত্ত্বান হয়ে ওঠে তা হলে সত্য উন্নততর বস্তুতে পরিণত হয়। সত্যে আমরা বাস্তবজীবনকে পাই না, সত্যে আমরা যা পাই তা হল বাস্তবের শব-ব্যবচ্ছেদ।

এবার অন্য একটা ভুল মতের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। একটা মত আছে যে চিন্তার অধিক কোনো বস্তু আছে ধারণা করা চিন্তার পক্ষে অসম্ভব। যা চিন্তার অধিক তা চিন্তার বাইরে। কিন্তু এই মত সত্য নয়। সমগ্রের একটা অংশ যদি চিন্তা হয় তা হলে চিন্তারূপী অংশ থেকে অপরাংশ সম্পূর্ণ অসংযুক্ত থাকবে এরকম ধারণা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সমগ্রের অংশ হয়েও চিন্তার পক্ষে নির্ণয় করা কিছু অসম্ভব নয় যে সমগ্র বস্তু তার (চিন্তার) চেয়ে বৃহত্তর ; এই বিচারে কোনো স্বতোবিরোধ নেই। চিন্তার অতীত (বাইরে) কোনো সত্তা বা বস্তু আছে এরকম চিন্তা অসম্ভব।

কিন্তু চিন্তার অধিক কোনো বস্তু বা সত্তা আছে এই চিন্তন হল অবাধিত ও নির্দোষ।

সত্তা ও ধর্মের দ্বৈতকে চিন্তার দ্বারা অতিক্রম করা অসম্ভব। অর্থাৎ কোনো অবধারণে ধর্মী ও ধর্মের সমতা বা একত্ব সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক সত্যিকারের তর্ক-বাক্যেই এক বিশেষ বস্তু হচ্ছে ধর্মী ; ধর্মী ধর্মকে অতিক্রম করে অবস্থান করে এবং ধর্ম হচ্ছে ধর্মীর একটা বিশেষণমাত্র। তবে চিন্তন-ক্রিয়াতেও এই ধর্মী ও ধর্মের মধ্যস্থিত ভেদ নিয়ে আমরা সব সময়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। কিন্তু এই প্রভেদ অতিক্রম করার বাসনা চিন্তার পক্ষে আত্মঘাতী। ভাব ও সত্যকে বস্তু বলা চলে না ; সেগুলো বস্তুর সম্পর্কে উল্লেখ মাত্র।

অবধারণের ধর্মী হল সাধারণত অশেষ-ধর্ম-সমন্বিত। এই বহু ধর্মের মধ্যে এক বা কয়েকটাকে নির্বাচিত করে ধর্মীর প্রতি আরোপ করার ব্যাপারকে অবধারণ ব্যাপার বলা হয়। কেউ হয়তো আপত্তি করবেন যে তর্ক-বাক্য বা অবধারণ একটা চিন্তার ব্যাপার এবং তর্ক-বাক্যের বা অব-ধারণের ধর্মীটা হল চিন্তার বিষয়, সেইজন্য চিন্তার অতিরিক্ত কোনো ধর্মীর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এইরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অবধারণের সময় তর্ক-বাক্যের মধ্যে চিন্তার বিষয়রূপে থাকে ধর্মী ও তার ধর্ম। কিন্তু মনোযোগ দিলেই দেখা যায়, চিন্তার বিষয়গত ধর্মী হল প্রকৃত পক্ষে চিন্তার অতিরিক্ত এক বস্তু ; তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় ও তার প্রতি চিন্তার বিষয়গত ধর্মকে আরোপ করা হয়। মনে হয় যেন এই ব্যাপারটা মূলত এক অখণ্ড ও জটিল অভিজ্ঞতার বা অনুভবের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ মাত্র। চিন্তার জন্য বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ের প্রয়োজন। যদি কোনোপ্রকারে এই দুয়ের সাম্য এসে যায় চিন্তা তা হলে অনুভূতিতে পরিণত হয়, তা আর চিন্তা থাকে না। এইজন্য আমরা বলেছি যে চিন্তার পক্ষে ধর্মী ও ধর্মের প্রভেদ অতিক্রম করার বাসনা আত্মঘাতী।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো বস্তু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হলেই কি সেই বস্তুর জ্ঞান ও সেই বস্তুর সত্তা একার্থবাচক হয়ে পড়ে? আর কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণ জানাই যদি সেই বস্তুর অস্তিত্বের সমান হয় তা হলে জানার প্রকৃতি কি বদলিয়ে যায় না? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে বিচার করে

দেখতে হয় যে কোনো বস্তুর জ্ঞানদ্বারা সেই বস্তুর সমস্ত দিকের সঙ্গে পরিচয় কি হয় ? সাক্ষাৎ অনুভূতির সংঘর্ষ ও তীক্ষ্ণ সুখ-দুঃখের বোধ এসব কোথায় যাবে ? এগুলোর সঙ্গে জ্ঞানের কোনো আবশ্যিক সংযোগ নেই। সুতরাং জ্ঞান যদি এগুলোর সঙ্গে মিশে যায়, জ্ঞান তা হলে তার স্বভাবচ্যুত হয়।

জানা দিয়ে বস্তুর সমান হতে গেলে ধর্মী ও ধর্ম, বিষয়ী ও বিষয় প্রভৃতি সম্বন্ধজনিত জ্ঞানের অপমৃত্যু ঘটে। যদি চিন্তার অন্তর্নিহিত দ্বৈত অতিক্রান্ত হয়, ভাব যদি সত্তায় পরিণত হয় তা হলে মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ও অনুভব এক উচ্চতর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। এই উচ্চতর চৈতন্যের মধ্যে সত্তা, সংবেদন, আনন্দ ও সৌন্দর্যের অপূর্ব পরিপাক ঘটে। মানুষের পূত বা অশুচি কোনো বাসনার অনলই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সেগুলো সবই এই উচ্চতর চেতনার অভ্যন্তরে এক বৃহত্তর সমন্বয়ের মধ্যে অনির্বাণ থেকে জ্বলে। এই পরিণতি লাভ করে চিন্তারও অবসান ঘটে। কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন যে চিন্তা তার পরিসমাপ্তি অচিন্তার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা করে কি করে ? কিন্তু নদীর অম্বুরাশি কি সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত হয় না ? আমি বা অহং-প্রত্যয়ের অবসান কি প্রেমের মধ্যে হয় না ? তা ছাড়া জ্ঞান, ইচ্ছা, আনন্দ, সংবেদন সবই যখন পারমার্থিক তত্ত্বের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে তখন সেগুলোর নিজস্ব পৃথক পরিণতি বলে কিছু থাকতে পারে না। একের পরিণতিই অন্যের পরিণতি হয়ে ওঠে।

কেউ হয়তো বলবেন আত্মচেতনার মধ্যে আমরা এমন অভিজ্ঞতা পাই যেখানে সত্তা ও সত্যের মধ্যে সমতার সেতু সংস্থাপিত হয়। কিন্তু এমন কোনো আত্মচেতনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, যেখানে বিষয় ও বিষয়ীর সম্পূর্ণ ঐকাত্ম্য আছে। অবিভক্ত অনুভবের একাংশ বা একটা দিক যখন গোটা অনুভবটার থেকে পৃথক হয়ে জ্ঞাত হয়, তখন আত্মচেতনার উদ্ভব হয়। কিন্তু গোটা অনুভবটা কখনো জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। আত্মসচেতনতার সময় সমগ্র অনুভবের একাংশ বিষয়রূপে আমাদের সামনে আসে। সমগ্র পটভূমিকাটাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করতে হলে দীর্ঘ ও একাধিক সমীক্ষা প্রয়োজন হয়। এবং এই একাধিক সমীক্ষার ফলকে একক অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত করা যায় না। এক কথায় জ্ঞানের

জন্য দরকার পৃথককরণ এবং এমন একক চৈতন্য অসম্ভব যার মধ্যে প্রত্যেক অংশ বা দিককে এক সঙ্গে পৃথক বিবেচনা করা যায়। যে কোনো মুহূর্তে বিষয়গত আমির চেয়ে বিষয়ী আমি অনেক বড়ো। সুতরাং আত্ম-সচেতনতার মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়ের ঐকাত্ম্য সাধিত হয় না।

আপনি হয়তো বলবেন কেউই সত্যিকারের বিশ্বাস করে না যে চিন্তার মধ্যেই সমস্ত সত্তা নিহিত আছে। তবে প্রকৃত অসুবিধা হচ্ছে এই যে, তার বিপরীতটা কিভাবে সমর্থন করা যায়। যে অপর সত্তার স্বরূপ চিন্তা নয়, তার বিষয়ে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি করে? এখন দেখা যাক এই অপর সত্তা বলতে আমরা কি বুঝি? কোনো তর্ক-বাক্যে ধর্মীরূপে যা উপস্থিত হয় তার একটা নিজস্ব সত্তা আছে; এই সত্তাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। তার বিষয় চিন্তা বা ভাব পোষণ করতে পারি, কিন্তু তাকে অবহেলা করতে পারি না।

আমাদের অনুভবে যা 'তৎ'-রূপে উদিত হয় তার সাধারণত দুই দিক আছে: ১. ইন্দ্রিয়-বোধজ অসীমতা, ২. প্রত্যক্ষতা। অনুভূত 'তৎ'-এর মধ্যে একটা সীমা-অসহিষ্ণুতা আছে, অন্য সত্তার প্রতি উল্লেখ আছে; মনে হয় যেন 'তৎ'-এর চতুর্দিক খাঁজকাটা এবং এটা যেন অন্য কোনো বৃহত্তর সত্তার থেকে কেটে নেওয়া। ধর্মীর স্বভাব হচ্ছে ক্রমশ সমগ্রের সঙ্গে মিলে যাওয়ার দিকে। ধর্মের স্বভাবের মধ্যেও সীমার মাত্রা অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়ার একটা প্রবণতা আছে। কারণ ধর্মও কৃত্রিম ভাবে পৃথককৃত ও নিজের বহিঃস্থিত পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু তবুও ধর্মের মধ্যে ধর্মীর অনির্দিষ্ট অসীমতা নেই। ধর্ম ও ধর্মীর মধ্যে এই একটা প্রথম পার্থক্য।

দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে প্রত্যক্ষতা নিয়ে। ধর্মী এমন একটা স্বাবলম্বী সত্তা-রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, যার প্রত্যক্ষ অনুভবের মধ্যে 'তৎ' ও 'কিম্'-এর সমন্বয় ঘটে আছে। কিন্তু আমরা সাধারণত ধর্মীরূপে যা কিছু পাই না কেন তার প্রত্যেকটারই মধ্যে 'তৎ' ও 'কিম্'-এর বিরোধ বা সংঘর্ষ দেখা যায়। ধর্ম অপর পক্ষে শুধুমাত্র বিশেষণ বা কিম্।

এখন ধর্মী ও ধর্ম, বিশেষ্য বা উদ্দেশ্য ও বিশেষণ বা বিধেয় এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তার বিনাশ যদি চিন্তার কাজ হয়, তা হলে অপরত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করতে পারি। ধর্মী কেন অপর

বলে প্রতিভাত হয় তার কারণ আমরা আঁচ করতে পারি। অপরত্বের ভাব নিরসন করতে হলে ধর্মীকে হতে হবে সম্পূর্ণ বা সম্যক আত্মসংগতিপূর্ণ এবং ধর্মকে হতে হবে প্রত্যক্ষ অনুভবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কিন্তু এ দুটোর কোনোটাই চিন্তা দ্বারা সম্ভব নয়। চিন্তা সমন্বয় ও সংগতি আকাঙ্ক্ষা করে ; কিন্তু সমন্বয় ও সংগতি সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার মৃত্যু বা লয় হয়। সংগতি ও সমন্বয় আকাঙ্ক্ষা করা চিন্তার ধর্ম। এই পরিণত সমন্বয়ের আদর্শই হল চিন্তার বিষয়ীভূত অপর পদার্থ।

অনুভূত একত্বের মধ্যে যে বহুত্ব স্ফুট হয়ে ওঠে সেই একত্ব ও বহুত্বের একটা আপস বা মিটমাট করা হয় সম্বন্ধের দ্বারা। বহুত্বের আপেক্ষিক স্বাধীনতা স্বীকার করতে হয় ; কিন্তু বহুত্বকে সম্বন্ধে পর্যবসিত করা যায় না। কারণ, তাতে বহুত্বও নষ্ট হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বহুত্বের অন্তর্গত সম্বন্ধও নষ্ট হয়। অথবা সম্বন্ধের মধ্যে অসংখ্য সম্বন্ধের উদ্ভব হয় ও অনবস্থা দোষ জন্মায়। সম্বন্ধের কয়েক দিক আছে : ১. প্রত্যক্ষতা ও স্বাবলম্বিত্বের দিক : সম্বন্ধের বিষয়গুলো সম্বন্ধ-দ্বারা সৃষ্ট নয়, সেগুলো হচ্ছে সম্বন্ধ-দ্বারা স্পৃষ্ট মাত্র ২. নানাত্বের দিক ও ৩. বহুত্ব-গ্রহণকারী ঐক্যের বা সমগ্রের দিক ; এতদ্ব্যতীত সম্বন্ধের একটা ৪. চঞ্চল সীমা-অতিক্রম-প্রবণতার দিকও আছে। বিবিধ ও একের মধ্যে মিলন সাধন করা চিন্তার স্বভাব। ঐক্যের দিক, বিবিধত্বের দিক কিংবা বহু বা বিবিধের মধ্যে ঐক্যের দিক, সবই চিন্তার কাছে পরিচিত। কিন্তু একটা মহান সমগ্রতার মধ্যে নানাত্ব কিভাবে বিধৃত হয় তার সুস্পষ্ট ধারণা করা চিন্তনের দ্বারা সম্ভব নয়। তবে আমরা কল্পনা বা ধারণা করতে পারি যে এমন সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ অনুভব থাকতে পারে যার সমগ্রতার মধ্যে নানাত্ব ও বিভিন্নতা অবস্থান করছে। চিন্তার সাহায্যেই আমরা বুঝতে পারি যে চিন্তার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল করতে গেলে তাকে তার সম্বন্ধাশ্রয়ী অভ্যাস অতিক্রম করতে হবে। অথচ সম্বন্ধকে আশ্রয় না করে চিন্তার পক্ষে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য যে চিন্তা এক উচ্চতর সাক্ষাৎকারের অনুভূতির মধ্যে লোপ পেয়ে সার্থক হবে। এই আকাঙ্ক্ষিত আত্ম-অতিক্রমা বা আত্মলোপই আমাদের কাছে অপরত্বরূপে প্রতিভাত হয়।

চিন্তা, অনুভূতি ও এষণা প্রত্যেকটারই মধ্যে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আছে।

এগুলো প্রত্যেকেই এক উন্নততর চৈতন্যসত্তার ইঙ্গিত দেয়। সেই উচ্চতর সত্তার মধ্যে সবকিছুই রক্ষিত হবে; বিশ্বের প্রতিটি অংশ অপর অংশের সঙ্গে সম্মিলিত হবে এই উচ্চতর পরমসত্তার মধ্যে এবং সেখানে সর্ব অংশেরই ঐশ্বর্য সঞ্চিত থাকবে। এই পরমতত্ত্বের মধ্যে প্রত্যেক অংশের পৃথক ও সর্ববিধ চৈতন্য এমন-কি প্রত্যেক অংশের সমগ্র-বিরোধী চেতনাও অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। এখানে আমার এইটুকুই বক্তব্য যে চিন্তার পক্ষে বুদ্ধির অতীত এইরকম অপর সত্তার ধারণা করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। তবে এরকম পরমতত্ত্বের সপক্ষে কি যুক্তি আছে তা বিচারের বিষয়।

ষোড়শ অধ্যায়

ভ্রমাত্মক জ্ঞান

এতক্ষণে আমরা পারমার্থিক তত্ত্বের একটা রেখাচিত্র অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছি। সাধারণ ভাবে এই তত্ত্বের স্বরূপ বর্ণনা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু পারমার্থিক তত্ত্বের সঙ্গে দৃশ্যমান জগতের অন্যান্য তথ্যের যে সংঘর্ষ তাকে কি করে অতিক্রম করা যায়? মানুষের জগতে ভ্রম-জ্ঞান আছে, অশুভ বা অমঙ্গল আছে, দেশ, কাল, আকস্মিকতা, অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তন আছে এবং 'ইহা' ও 'আমার' দুরতিক্রম প্রভাব আছে। এসবই তো পারমার্থিক তত্ত্বের বাইরে থেকে যায়। হয় এগুলোকে পারমার্থিক তত্ত্বের মধ্যে স্থান দিতে হয়, না হয় তাদের অস্বীকার করে উড়িয়ে দিতে হয়। কিন্তু দুটোর কোনোটাই সম্ভবপর নয়।

এর উত্তরে আমি বলব যে এইসব তথ্যের বা অবভাসের উৎপত্তির কারণ নিরূপণ করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। এবং এই কথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলব। সঙ্গে সঙ্গে এও বলব যে এদের উৎপত্তির কারণ বোঝবার কোনো প্রয়োজন বা সার্থকতা আছে বলেও আমি মনে করি না। পারমার্থিক তত্ত্বের মধ্যে এই অবভাসমালা কিভাবে অবস্থিত, এই বিষয়ে সসীম জীবের পক্ষে জ্ঞান হওয়া বা থাকা অসম্ভব। একমাত্র পারমার্থিক সত্তাই পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে পারে। জীবের পক্ষে পারমার্থিক সত্তার দৃষ্টিভঙ্গি

পাওয়া অসম্ভব। ব্রহ্মে বা পরমতত্ত্বে লীন হলে 'আমার' মৃত্যু ঘটে। সুতরাং আমার মুখে ব্রহ্মের বা পরমতত্ত্বের অভিজ্ঞতা বর্ণনা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত এদের উৎপত্তি বুঝতে না পারলেও পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব তাতে বিপন্ন হয় না। যদি কোনো বৃহৎ তত্ত্ব সাধারণ যুক্তির ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে কতগুলো তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে পারা যাচ্ছে না বলে সেই তত্ত্ব অসিদ্ধ, এমন কথা বলা তর্কশাস্ত্র-অনুমোদিত নয়। আমরা যা বুঝতে পারি না তাই দিয়ে সাধারণ তত্ত্বকে খণ্ডন করা যায় না। আমাদের যদি এমন কিছু বোঝা বা জানা থাকে যা এই তত্ত্বের বিরোধী তা হলেই এই তত্ত্ব বা বাদ অসিদ্ধ বা সংশয়াত্মক হয়ে ওঠে।

যে ব্যক্তি ভ্রম ও অশুভের অস্তিত্ব দিয়ে পারমার্থিক তত্ত্বকে খণ্ডন করতে চায় সে সর্বজ্ঞতার দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়। কারণ সে বলতে বাধ্য হয় যে, সে জানে যে ভ্রম ও অশুভ পরমতত্ত্বের সঙ্গে সংগতিহীন ও সংঘর্ষশীল ; একমাত্র সেই এ কথা বলতে পারে যার পরমতত্ত্ব ও সসীমের সম্বন্ধে সম্যক ও সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। আমার মতে মানুষের মনের এই দুঃসাহসিক কাজ করবার ক্ষমতা নেই। অজ্ঞতা যখন জ্ঞানের ভান নিয়ে উপস্থিত হয়, তখনই মাত্র এইরকম যুক্তি দেওয়া সম্ভবপর হয়। আমাদের অজ্ঞতাকে, আমাদের অক্ষমতাকে পারমার্থিক সত্তার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে খাড়া করা একটা মানবিক দৌর্বল্য মাত্র এবং এই দৌর্বল্য মোটেই শ্লাঘনীয় নয়।

ভ্রম-জ্ঞান হচ্ছে একটা অতি বিপজ্জনক বিষয়। আছে বা নাই এই দুই-এর মধ্যে কোনো ভুতুড়ে জগৎ স্বীকার করা অসম্ভব। অথচ ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বস্তুকে, না বলা চলে আছে, না বলা চলে নেই। এই বস্তু না থেকেও আছে এবং থেকেও নেই। ভ্রম-জ্ঞানে বস্তুর প্রতি আমরা এমন কিছু প্রয়োগ বা আরোপ করি যা বস্তুতে নেই। কিন্তু যেটা প্রতিভাত হয়, যাকে আমরা আরোপ করি তার প্রতিভাস অস্বীকার করা চলে না। কারণ, কিছু প্রতিভাসিত না হলে আমরা কাকে মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক বলি ?

মনস্তত্ত্ব ও ন্যায়শাস্ত্রের দিক থেকে ভ্রমের সমস্যা অত জটিল নয়। ভ্রমকে অযথার্থ অনুমান বলা চলে এবং একটা প্রতিরূপ আদর্শের সঙ্গে তুলনা করা চলে এবং কিভাবে এর উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে তাও দেখানো যেতে পারে। কিন্তু এই-সব অনুসন্ধান আমাদের বর্তমান বিচারে কোনো

সাহায্য করে না, যদিও এই অনুসন্ধানগুলো বেশ চিত্তাকর্ষক হতে পারে। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান আমাদের আরো প্রত্যক্ষভাবে করবার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের এই রহস্য ভেদ করতে হলে দাঁড়াতে হবে ভাব ও বস্তুর পার্থক্যের ওপর।

ভ্রম একপ্রকার মিথ্যা অবভাস। অবভাস হচ্ছে ভাব ও বস্তুর মাঝখানে সমতার অভাব। যখন ভাব অর্থাৎ কিম্, সত্তা থেকে অর্থাৎ তৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন উৎপত্তি হয় অবভাসের। এই অর্থে সত্যও এক-প্রকার অবভাস, কারণ সত্যতেও ভাবের বিচ্ছিন্নতা দরকার সত্তা থেকে। সত্য বিচারে যে ভাব, বস্তুর প্রতি বিশেষণরূপে আরোপিত হয় সেই ভাব বস্তু কর্তৃক গৃহীত বা স্বীকৃত হয়। বস্তুর গুণের সঙ্গে আরোপিত ভাবের সামঞ্জস্যই সত্য বিচারের স্বরূপ। ভাবের সত্তা কর্তৃক গৃহীত হওয়া ছাড়াও আর-এক দিক আছে, এর নিজস্ব অস্তিত্বের দিক। ভাব ভাবরূপে সাধারণ, কিন্তু এর ব্যক্তিগত সত্তাও একটা আছে; যেহেতু ভাব একটা চৈতন্যজগতের ঘটনা মাত্র। ভাব ধর্ম-রূপে, তার ঘটনা-রূপ থেকে বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন। অখণ্ড অনুভূতির এক বা ততোধিক দিক যখন আরোপিত হয় তখন আরোপিত গুণগুলো বা বিশেষণগুলো অনুভূত সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সত্তার সঙ্গে গুণের অবিচ্ছিন্নতা থাকে না; কিন্তু যে গুণটি আরোপিত হয় সেটি আর-একটা বিচ্ছিন্ন সত্তা-বিশেষ নয়। 'চিনি মিষ্ট' এই বাক্যে যে মিষ্টত্বের আরোপ আমরা করি সে মিষ্টত্ব আমার মনের মিষ্টত্ব-ভাবের অন্তর্নিহিত আর-একটা ঘটনা মাত্র নয়। নিজের অস্তিত্বের অর্থাৎ মানসিক ঘটনা হিসেবে অস্তিত্বের তুলনায়, ভাব একটা অবভাস মাত্র। এই বিচ্ছেদ-ধর্ম আরো স্পষ্ট হয় যখন সেই-সব ভাবের বিষয় আলোচনা করা যায় যেগুলো প্রত্যক্ষ অনুভব থেকে না এসে, স্মৃতির পথে আমাদের মনে উদয় হয়। সেই অবস্থায় ভাবকে স্মৃতিপটে অঙ্কিত ছবির সঙ্গে সমীকরণ করা চলে না। আমরা সেইপ্রকার ভাব যখন কোনো সত্তার প্রতি প্রয়োগ করি তখন তৎসম্পর্কীয় স্মরণজাত প্রতিচ্ছবি-টিকে নিশ্চয়ই আরোপ করি না। এই ছবিকে আমরা উপেক্ষা করেই থাকি।

যখন গুণ ও বস্তু, বিশেষণ ও বিশেষ্য কিম্ ও তৎ এই দুই ধারায় অখণ্ড অনুভব বিভক্ত হয় তখন অবভাসের জন্ম হয়। এই ধারা-দুটোর জমে

শক্ত হয়ে দুটো পৃথক অস্তিত্বে পরিণত হওয়ার দিকে প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। যে অবভাসে ভাব তার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য এক তথ্যের সহিত সম্বদ্ধ হয়ে সেই তথ্যকে গুণান্বিত করে সেই অবভাস বা অধ্যাসের নাম সত্য। মানস-ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্নতার দিক থেকে ভাব একটা সত্য অবভাস বা অধ্যাস, কিন্তু অন্য সত্তার বিশেষণরূপে অবস্থানকালে একটা বস্তু। ভ্রমাত্মক ভাবও তার মানস-ঘটনারূপী তথ্য থেকে বিচ্ছিন্ন একটা বিশেষণ, কিন্তু এই বিশেষণ অন্য যে বস্তুর সম্পর্কে প্রযুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে সংঘর্ষশীল। ভ্রমাত্মক জ্ঞানে যা হয় তা এই যে, প্রযোজ্য সত্তা প্রযুক্ত ভাবকে অস্বীকার করে; বিশেষ্যের বিমুক্ত বিশেষণকে গ্রহণে অসম্মতির নাম ভ্রম-জ্ঞান। সেইজন্য ভ্রমও একপ্রকার অবভাস কিন্তু মিথ্যা অবভাস। ভ্রমের অন্তর্গত ভাব তার ঘটনারূপী নিজস্ব সত্তা থেকে পৃথক; এবং অন্য বস্তুর বিশেষণ হতেও অপারগ। তা হলে প্রশ্ন ওঠে, ১. এই ভাবকে বস্তু বর্জন করে কেন এবং ২. পরম বস্তুর মধ্যে এই মিথ্যা অবভাসের স্থান কি, যেহেতু এর একপ্রকার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য? ৩. বস্তু তখনই একটা ভাবকে বর্জন বা অস্বীকার করে যখন ভাবটির মধ্যে কোনো স্বতোবিরোধ বর্তমান। যা বস্তুস্থানীয় তা সংগতিপূর্ণ। সুতরাং কোনো ভাবে অসংগতি থাকলে বস্তুর সঙ্গে তাকে খাপ খাওয়ানো যায় না। অন্য ভাবে বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, যখন কোনো গুণ আরোপ করার ফলে কোনো বস্তুর ধর্মে বিরোধ উপস্থিত হয় তখন সেই আরোপকে ভ্রমাত্মক অভিহিত করা চলে। যেখানে সত্তার মধ্যে বিবদমান গুণ আছে সেখানে এই গুণকে সত্তার প্রতি আরোপ করলেই ভ্রমাত্মক বিচারের উদ্‌ভব হবে।

ভ্রম-সম্বন্ধীয় এই সাধারণ মত স্পষ্টতর হয়ে উঠবে যদি এর বিরোধী যুক্তিগুলোর আলোচনা করা যায়। অনেকে মনে করেন অনুভব থেকে বিচ্যুতির নামই ভ্রমজ্ঞান। অনেক সময় এও বলা হয় যে স্মৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে গ্রহণ করবার জন্যই ভ্রম জন্মায়। এই-সব যুক্তি অতি অগভীর ও অকিঞ্চিৎকর।

প্রথমত আমাদের জ্ঞানের কতটা অনুভবপ্রাপ্ত এটা সহজে বের করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত বর্তমান অনুভবকে সত্যের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করাও অসম্ভব। তৃতীয়ত এটা আমাদের অদ্ভুত কুসংস্কার যে প্রত্যক্ষ

বাহ্য অনুভব কখনো মিথ্যা হতে পারে না। এবং বাহ্য ঘটনার মতো আন্তর ঘটনাও যে একটা তথ্য হতে পারে এ কথা না বুঝতে পারা এক মারাত্মক অন্ধত । অনুভবে যা আমরা পাই তার ধর্মে যদি অসংগতি থাকে তা হলে আমরা যে অর্থেই অনুভবপ্রাপ্ত তথ্যকে নিই না কেন সেই ধর্ম কখনো বাস্তব বলে গৃহীত হতে পারে না। অনেকে আপত্তি করবেন যে অনুভবের মধ্যে কখনো অসংগতি নেই। এমন হতে পারে যে কোনো বিষয় সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান কিছুই না থেকে আমাদের শুদ্ধ অজ্ঞান থাকতে পারে। কোনো এক বাক্যকে হয় সত্য হতে হবে, নয় হতে হবে মিথ্যা। কিন্তু এই বিশেষ মুহূর্তে আমার পক্ষে একটা বাক্য সত্য বা মিথ্যা কিছুই না হতে পারে। তবুও এ কথা আমরা জানি যে যদি কোনো বাক্য মিথ্যা বিবেচিত হয় তার কারণ হল সেই বাক্যস্থিত ধর্মের আত্ম-অসংগতি। আপত্তিকারক বলবেন, এ মত অগ্রাহ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বাক্য নেওয়া যাক : যে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে একটা ঘটনা হয় ঘটেছে না হয় ঘটে নি। এই বাক্য ভ্রমাত্মক বিবেচিত হবে যখন বাহ্য ঘটনার সঙ্গে তার অমিল দেখা যাবে, বাক্যের অন্তর্গত কোনো আত্ম-অসংগতির জন্য নয়। এর উত্তরে আমরা বলব যে বাহ্য ঘটনার সঙ্গে মিল না থাকাতে বাক্য বা অবধারণকে ভ্রমাত্মক বিচার করবার জন্য অতিরিক্ত হেতু আছে। হেতু না থাকলে আমরা ঘটনার সঙ্গে অমিলকে দোষ হিসাবে গণ্য করি কেন ? একই ঘটনার ঘটা এবং না ঘটা একই নির্দিষ্ট কালে যদি অসংগতিপূর্ণ না হয় তা হলে শুদ্ধ অমিলের উপর ভিত্তি করে বাক্যটি ভ্রমাত্মক এ কথা কি বলা চলে ? মনে করুন, ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল কিন্তু আমি বলছি নরেনের ফাঁসি হয়েছে। (এখানে ব্রেডলি, জন ও উইলিয়মের ফাঁসির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন) আমার বাক্য মিথ্যা হবে, যেহেতু ক্ষুদিরাম ও নরেন দুজনের ফাঁসি সত্য হতে পারে না এবং ক্ষুদিরামের ফাঁসির ঘটনা একেবারে সংশয়াতীত ; সুতরাং আমার ভ্রম হচ্ছে এইজন্য যে ক্ষুদিরামের ফাঁসি ও নরেনের ফাঁসি এই দুটো ঘটনার অস্তিত্ব সম্ভব নয়, অথচ আমি বলতে চাইছি এই দুটোই ঘটেছে। এই দুটো ঘটনার মধ্যে যে বিরোধ আছে আমি লক্ষ্য করছি না। যখনই পরস্পরবিরোধী বর্ণনা বস্তুর সম্পর্কে দেওয়া হয় তখনই ভ্রমের উৎপত্তি। কোনো বিশেষণ আরোপ করতে গিয়ে যদি বিরোধের উৎপত্তি হয় তখনই ভ্রম উপস্থিত হয়।

ভ্রমের সঙ্গে পারমার্থিক বস্তুর সম্বন্ধ কি? ভ্রম নেই এ কথা বলা চলে না। কিন্তু কি অর্থে তার সংগতি সম্ভব পারমার্থিক পদার্থের সঙ্গে? ভ্রমকে ধিক্কার দিতে পারি, কিন্তু ধিক্কার তো আর যাদুর কাজ করতে পারে না। ধিক্কারের ফলে ভ্রম উড়ে যায় না। সুতরাং ভ্রমকেও বস্তুর সীমানার মধ্যে স্বীকার করে নিতে হবে। ভ্রমও সত্য, তবে ভ্রম অংশত সত্য। অসম্পূর্ণ ও আংশিক বলেই অসত্য। আমরা ভ্রমবশত যা কিছু আরোপ করি পরমতত্ত্বের ওপর তার সবই সত্য। কিন্তু আমাদের দোষ হচ্ছে আমরা এর পরিপূরক অবস্থার কথা ভুলে যাই। মিথ্যা অবভাসের সংঘর্ষও পরম-তত্ত্বের মধ্যে গৃহীত হয়। কিন্তু যা আমাদের কাছে বিরোধ ও সংঘর্ষ-রূপে আসে তা এক বৃহত্তর সমন্বয়ের মধ্যে স্থান পায়। কিন্তু কি প্রকারে এই বিরোধকে সমন্বয় গ্রাস করে তা মানুষী বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটা ভ্রম ও সংঘর্ষ কিভাবে পারমার্থিক বস্তুর মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে সামগ্রিক সমন্বয়ে পরিণত হয়, সে সম্বন্ধে বিশদ ধারণা করতে আমরা পারি না। কিন্তু একটা সাধারণ ধারণা করা সম্ভব। যে নিয়ম বা ধারা-অনুযায়ী এই সমন্বয় সাধিত হয় সে সম্বন্ধে একটা অসম্পূর্ণ ধারণা আমরা করতে পারি।

বিরোধ নিরসনের একমাত্র পথ হচ্ছে বৃহতের মধ্যে মৃত্যু-স্বীকার। একটা ক্ষুদ্র বিরুদ্ধ সত্তার পার্থক্যের পরিবর্তে যখন বৃহত্তর সত্তার মধ্যে একটা প্রভেদ পাওয়া যায় তখন বিরোধ-জনিত সংঘর্ষের অবসান হয়। মনে করুন 'ক' সত্তার মধ্যে 'খ' ও 'গ' গুণ আছে, যারা পরস্পরবিরোধী। এখানে যাকে আমরা 'ক' সত্তা বলেছি সেটা যদি আসলে আরো জটিলতর সত্তা হয়ে থাকে যেমন 'ক+চ', তা হলে এই বিরোধের মীমাংসা সম্ভবপর। কারণ 'ক'-এর মধ্যে 'খ' গুণ ও 'চ'-এর মধ্যে 'গ' গুণ অবস্থান করতে পারে।

উপমা দিয়ে যুক্তির কাজ সারা যায় না; কিন্তু একটা উপমা দিলে হয়তো ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মনে করা যাক, একদল বিদেহী আত্মা তাদের দেহ ত্যাগ করে নিশীথে ভ্রমণে বেরিয়ে নূতন নূতন সম্বন্ধ সংস্থাপন করে, পরের দিন সকালে এসে নিজের নিজের দেহে প্রবেশ করল। এই ব্যাপারটা হল অনেকটা সত্যের সামিল। আর

যদি বিদেহী আত্মাদের মধ্যে কেউ তার অর্জিত অভিজ্ঞতা নিয়ে অন্যের দেহে প্রবেশ করে বসে, তা হলে ব্যাপারটা হবে ভ্রমের সমতুল্য। অপর পক্ষে এই বিদেহী আত্মাদের দলের যে সম্রাট সে এই পরবর্তী ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত বিরোধটা কেন ঘটেছে স্পষ্টই বুঝতে পারল এবং এই পরিস্থিতির মজাটা সম্পূর্ণ উপভোগ করল। সে বুঝল ভ্রমটার উৎপত্তি হয়েছে এইজন্য যে, প্রত্যেকেই 'ইহা' ও 'আমার' বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে।

আপত্তি উঠবে যে আমাদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ। ভ্রমে সংঘর্ষের শুধু নেতিমূলক দিকটাই নেই, এর মধ্যে একটা অস্তিমূলক দিকও আছে; সুতরাং যা কিছু ভ্রমে ধরা পড়ছে সবই পারমার্থিক তত্ত্বের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে স্থান পেলে সমস্যাটা থেকেই যায়। আমি যে ভ্রমাত্মক জ্ঞানের অধিকারী তার একটা বিশিষ্ট রূপ ও অস্তিবাচক সত্তা আছে। আমি ভ্রমে যা পাচ্ছি, আমি যে ভাবে পাচ্ছি সেই ভাবে এটা পরমতত্ত্বের মধ্যে আছে কি? সুতরাং ভ্রমের উপাদানগুলো বৃহত্তর সত্তার মধ্যে আছে মেনে নিলেও ভ্রমের বিশিষ্ট বোধটাও যে তার মধ্যে আছে তা মানা হয় না।

আমরা আগেই এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে পারমার্থিক বস্তু শুধু সম্বন্ধের শৃঙ্খলা নয়। পরমবস্তু হচ্ছে শৃঙ্খলার অতিরিক্ত এক সমন্বয়ী বোধ বা সামগ্রিক অনুভব এবং শৃঙ্খলা তার অন্তর্গত মাত্র। সুতরাং ভ্রমের অস্তিবাচক সত্তা অর্থাৎ তার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সত্তাও যে পারমার্থিক বোধের সমন্বয়ের দ্বারা অনুগৃহীত হবে এই কথা আমাদের বিশ্বাস করতে হয়।

এইটুকু বললেই ভ্রম-সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। তবে আমাদের প্রধান সমস্যার একটা সমাধান হয়েছে। ভ্রম ও সত্য দুইই আছে এবং প্রতীয়মান বা আবভাসিক সত্তারূপে কোনোটাই তত্ত্ববস্তু নয়, পরমার্থ নয়। পরমতত্ত্বের বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে নূতন রূপে সজ্জিত হয়ে ভ্রমের উপাদানগুলো সত্যে পরিণত হয়। ভ্রমের একদেশদর্শিতার মধ্যে লক্ষিত হয় কোনো এক অংশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার অত্যধিক প্রবণতা। এই প্রবণতার বৃহত্তর প্রয়োজন আছে।

প্রত্যেক ভ্রম কিভাবে পরমতত্ত্বের মধ্যে স্থান পায় তা আমাদের পক্ষে দেখানো অসম্ভব। কিন্তু আমাদের বর্তমান মতবাদটি অসম্ভব কিংবা দুর্বোধ্য নয়। এই মত সম্ভবপর; এর সম্ভাব্যতার ওপর আমরা জোর দিচ্ছি। পরম-

তত্ত্ব সংগতিপূর্ণ ও সমন্বয়ময় হতে বাধ্য। ভ্রমের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমাদের প্রতিপক্ষ এই প্রমাণ করতে চান যে, যেখানে যা নেই তাও আছে বলে প্রতিভাসিত হচ্ছে সেখানে পারমার্থিক বস্তুর সুসামঞ্জস্য বাধিত হতে বাধ্য। আমরা এই দেখাতে চেয়েছি ভ্রমের পক্ষে সংশোধিত হওয়া সম্ভবপর এবং পরমতত্ত্বের বৃহত্তর চৈতন্যের মধ্যে ভ্রমের অন্তর্ধান হওয়াও সম্ভবপর। আমাদের প্রতিপক্ষের এমন কোনো জ্ঞান নেই যার থেকে তিনি বলতে পারেন যে ভ্রম-প্রত্যক্ষ পরমতত্ত্বের সংগতি বাধিত করছে। আমরা বিভিন্ন-রূপে যেসব ভুল দেখছি বা বুঝছি সেগুলো সবই পরমতত্ত্বের চৈতন্যের অঙ্গ হয়েও সেই চৈতন্য ভ্রমহীন অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত থাকতে পারে। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, যা হওয়া সম্ভবপর এবং সাধারণ নীতি-অনুযায়ী যা হতে বাধ্য তা নিশ্চয়ই আছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

অশুভ বা অনিষ্ট বা অমঙ্গল

পারমার্থিক তত্ত্বের সঙ্গে ভ্রমের সংঘর্ষের একটা সামঞ্জস্য করা গিয়েছে। অনিষ্টের বেলাতেও এইরকম সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

আমরা সাধারণত ধারণা করি যে ঈশ্বর বা পরমসত্তা হচ্ছে এক নীতি-মান পুরুষ। এই ধারণা থাকলে অনিষ্টের সঙ্গে পরমতত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরমসত্তা যে শুভ ও অশুভ, ইষ্ট ও অনিষ্টের শাসন মেনে চলে এরকম কল্পনা করবার কোনো যুক্তি নেই; সুতরাং আমরা যে-সব নৈতিক তত্ত্বের কথা বলি সেগুলোর অনুশাসন পরমতত্ত্ব মানতে বাধ্য নয়। এইটুকু বললেই অবশ্য সমস্যাটা খুব সহজ হয়ে ওঠে না। সেইজন্য এই বিষয়ে আমাদের কি জিজ্ঞাস্য তার আলোচনা করা যাক।

অনিষ্ট তিন প্রকার: ১. দুঃখ ২. কাম্য বস্তুলাভে অসামর্থ্য বা অপারগতা ও ৩. অনৈতিকতা বা দুর্নীতি। তৃতীয় প্রকার অশুভের বিষয় পরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচনা করা যাবে।

কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে দুঃখ আছে। এবং আমি অবশ্য স্বপ্নেও এ কথা বলব না যে দুঃখ অশুভ বা অনিষ্ট বা অমঙ্গল নয়। দুঃখ যদি থাকে, তা হলে পরমসত্তা বা ব্রহ্মেরও কি দুঃখবোধ আছে? পরম চৈতন্যের অন্তরে প্রবেশ করে দুঃখের কি কোনো রূপান্তর ঘটে যার ফলে সেখানে দুঃখ থেকেও দুঃখরূপে অনুভূত হয় না?

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করলে দেখতে পাই দুঃখের শক্তি হ্রাস সম্ভব। বৃহত্তর সুখবোধের মধ্যে ক্ষুদ্র দুঃখবোধের হারিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। এবং এই-সব ক্ষেত্রে দুঃখবোধ যে একেবারে নষ্ট হয়ে যায় এমনও বলা চলে না। স্থান-বিশেষে দুঃখবোধ সত্ত্বেও মোটামুটি বৃহত্তর স্বাচ্ছন্দ্য বা সুখবোধের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। দুঃখবোধের অপেক্ষা সুখবোধের আধিক্য থাকলেই আমরা মোটামুটি সুখী। পরমতত্ত্বের নিরতিশয় বা পূর্ণ চৈতন্যে, দুঃখানুভূতির তুলনায় সুখানুভূতির অপেক্ষাকৃত আধিক্য আছে এই আমরা আশা করি এবং তা থাকলেই যথেষ্ট।

দুঃখ-প্রাধান্যবাদী বলবে, 'হাঁ, সুখ ও দুঃখ দুইই আছে : কিন্তু বিশ্বে দুঃখ বেশি, সুতরাং পরমচৈতন্য দুঃখভারাক্রান্ত।' দুঃখ-প্রাধান্যবাদের আলোচনা করতে গেলে দুঃখ-প্রাধান্যবাদ ও সুখ-প্রাধান্যবাদ এই দুইপক্ষের মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিগুলোর পর্যালোচনা দরকার। আমার মতে উভয় পক্ষের যুক্তি আলোচনা করে দুঃখ-প্রাধান্যবাদ সমর্থন করা যায় না। নিরপেক্ষ বিচার করলে বিশ্বে দুঃখের চাইতে সুখের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, যদিও সুখ ও দুঃখের তারতম্যের পরিমাণ নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যায় না। চতুর্দশ অধ্যায়ে আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি, যে পারমার্থিক চৈতন্য আনন্দময়, তাতে দুঃখের চাইতে সুখের অনুভব বেশি। এ ছাড়া সংসারেও আমরা দেখতে পাই দুঃখের চাইতে সুখ বেশি। বিনা দ্বিধায় আমরা দুঃখ-প্রাধান্যবাদকে বর্জন করতে পারি।

পরমসত্তায় দুঃখের নিরসন হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমরা দেখেছি। এবং আমাদের অভিজ্ঞতাতেই বৃহত্তর সুখের অংশরূপে দুঃখ যে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয় তার সমর্থনও পাই। তা ছাড়া সাধারণ যুক্তিতে পরমসত্তায় বা পরমতত্ত্বে দুঃখের চাইতে সুখ অধিক, এই সিদ্ধান্তে আমরা এসেছি।

সুতরাং ভ্রমের বেলাতে যেমন এখানেও তেমন, যা হওয়া সম্ভব ও হওয়া অবশ্যম্ভাবী তা নিশ্চয়ই আছে।

অনেকে হয়তো আরো একটু অগ্রসর হয়ে বলতে চাইবেন পরমতত্ত্বে দুঃখ শুধু তার বৈশিষ্ট্য হারায় না, দুঃখ সুখবোধকে তীক্ষ্ণতর করতে সাহায্য করে। এবং হয়তো তাও হতে পারে ; কিন্তু তাই যে হয় এ কথা বলবার মতো কোনো যুক্তি দেখি না। সসীম জীবের অভিজ্ঞতায় আছে বিমিশ্র সুখ ; জীব ছাড়া অন্য কোনো সসীম সত্তার বোধ হয় সুখবোধ নেই ; সুতরাং পরমতত্ত্বে অবিমিশ্র সুখ কল্পনা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। পরমতত্ত্বে দুঃখ-অনুভূতির চেয়ে সুখ-অনুভূতির আধিক্য থাকলেই তার পরিপূর্ণতা বজায় থাকে। পরিমাণ বা মাত্রার বৃদ্ধিতে পরিপূর্ণতা আরো বেশি নির্দোষ হয় এ ধারণা ভুল।

এবার ব্যর্থতা, অপচয় ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় আলোচনা করা যাক। সমস্ত বিশ্বকে আকস্মিকতার এক দুর্জ্ঞেয় ক্রীড়া বলে মনে হয়। আমাদের জীবনে ও প্রকৃতিতে যে সংগ্রাম নিয়ত চলে তার মধ্যে শত শত উদ্দেশ্য অসিদ্ধ থাকে, হয়তো মাত্র একটা উদ্দেশ্য সফল হয়। এইতো হল আমাদের পুরানো নালিশ বিশ্ব সম্বন্ধে। চতুর্দিকে ব্যর্থতা ছড়ানো আছে কেন ? কিন্তু নালিশের উত্তরে একটা সন্দেহ জাগে। প্রকৃতির কি সত্যিকারের কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে ? যদি কোনো উদ্দেশ্য না থাকে তা হলে যে-অর্থে ব্যর্থতা শব্দের আমরা ব্যবহার করছি সেই-অর্থে কোনো অনিষ্ট বা অশুভের অস্তিত্ব নেই। এই বিষয়ে আলোচনা বর্তমানে স্থগিত রাখা যাক। যখন প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করব তখন এই বিষয়ে আবার মনোনিবেশ করা যাবে। আমি শুধু বর্তমানে, যাঁরা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কল্পনা করে তার ব্যর্থতার ভিত্তিতে প্রকৃতি ও পরমতত্ত্বকে অভিশপ্ত করেন, তাঁদের মতবাদের আলোচনা করব। প্রথমত আমরা বলতে পারি যে, যে-সব উদ্দেশ্য প্রকৃতির উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হয় সেগুলো আমাদের ভ্রমাত্মক বিচারের ফল। এই-সব কল্পিত উদ্দেশ্য খুবই সংকীর্ণ এবং যদি সেগুলোকে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের অংশীভূত করা হয় তা হলে ব্যর্থতার অভিযোগ আর করা চলে না ; যে-সব ব্যর্থ উদ্দেশ্য আমাদের চোখে পড়ে সেগুলো এক বৃহত্তর সার্থকতার মধ্যে স্থান পেয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। যেমন ভ্রমাত্মক জ্ঞানের

বেলা আমরা লক্ষ্য করেছি যে ক্ষুদ্র ভ্রম বৃহত্তর জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করে, ভ্রমরূপ পরিত্যাগ করে, তেমনি ক্ষুদ্র অশুভ বা অনিষ্ট বা অমঙ্গল বৃহত্তর ইষ্টের বা মঙ্গলের অঙ্গীভূত হয়ে অনিষ্ট বা অমঙ্গল আর থাকে না। প্রকৃতিতে ও মনুষ্যজীবনে আংশিক উদ্দেশ্য বা পুরুষার্থ লাভের বেদনা বা সংঘর্ষ পূর্ণ ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য ও সার্থকতার মধ্যে এই একই ভাবে সংগতি লাভ করে। ভ্রমের বেলায় যেমন ভ্রমের একদেশদর্শিতারও পরমতত্ত্বে স্থান আছে, সেইরকম আমাদের ব্যর্থতা ও বেদনাও বোধ হয় পরমতত্ত্বের পরিপূর্ণ সংহতির সহায়ক। কিন্তু সমস্ত বেদনা ও ব্যর্থতা পরমতত্ত্বের মধ্যে কিভাবে চরম সার্থকতায় পরিণত হয় তার বিশদ বর্ণনা আমরা দিতে পারি না। তবে যেহেতু পরমসত্তা পূর্ণ, সুতরাং সুষম সামঞ্জস্য তার স্বরূপ হতে বাধ্য।

এবার নৈতিক দোষ বা ত্রুটির কথা বিবেচনা করে দেখা যাক। এটা শুধু ব্যর্থতার ব্যাপার নয়, ব্যর্থতা আসে যখন ভাবের উপযোগী সত্তার উদয় না হয়। কিন্তু নৈতিক দোষ বা ত্রুটির মধ্যে আছে প্রকৃত বিরোধ ও সংঘর্ষ। নৈতিক দুষ্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একটা ভাব সত্তায় রূপান্তরিত হতে চাচ্ছে কিন্তু সত্তা ভাবকে রূপ দিতে পাচ্ছে না, শুধু মাত্র এই নয়, সত্তা ভাবের বিরোধিতাও করছে। নৈতিক সংগ্রামের মধ্যে শুধু ব্যর্থতা নেই, বিরোধ বা সংঘর্ষও আছে। ধর্ম কি জেনেও ধর্মে প্রবৃত্তি না হওয়া, এই তো হচ্ছে নৈতিক সংগ্রামের আদিম রূপ। অন্য পক্ষে এটাও ঠিক যদি এই ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রাম না থাকে তা হলে নৈতিক জীবনও থাকে না।

নৈতিক বিচারে যা অশুভ বা অমঙ্গল তা শুধু নৈতিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত এবং নৈতিক অভিজ্ঞতা অসংগতিতে পূর্ণ। এক দিকে নৈতিক জীবনে অধর্মকে সম্পূর্ণ জয় করে আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে ধর্ম ও অধর্মের বাইরে যেতে চাই ; অন্য দিকে ধর্ম ও অধর্মের বিরোধ না থাকলে নৈতিক জীবন সম্ভবপর নয়। এইখানেই নৈতিক অভিজ্ঞতার অসংগতি। এক দিকে অধর্মের পরাজয় চাই, অন্য দিকে অধর্মের বিদ্যমানতা চাই। এই বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আবার আলোচনা করা যাবে। নৈতিক জীবনে ধর্মকে আশ্রয় করেই আমরা ধর্ম ও অধর্মের দ্বন্দ্বাতীত অতিনৈতিক ক্ষেত্রে উপনীত হই। অতিনৈতিক স্তরে এসে নৈতিক জীবনের অবসান হয়।

নৈতিক জীবনের এই অতিক্রম করবার ও ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃত্তি স্বীকার করে নিলে দুর্নীতির অস্তিত্বজনিত অভিযোগগুলোর একটা সদুত্তর পাওয়া যায়। নৈতিক সংগ্রামের জন্য যে ভাবকে ইষ্ট বা মঙ্গলের বিরুদ্ধে অনিষ্ট বা অমঙ্গল-রূপে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি সেই অনিষ্ট নৈতিক জীবনের এক বৃহত্তর পরি-বেশের মধ্যে সংগতিলাভ করতে সমর্থ, এটা আমরা বুঝতে পারি। আমরা (না বুঝে) সাধারণত এই তত্ত্বের কথাই বলে থাকি, যখন বলি যে অধর্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অধর্ম বৃহত্তর ধর্ম বা ইষ্টের অঙ্গ হিসাবে কাজ করে এবং অধর্মও এই অর্থে ধর্মের সহায়ক হয়। তবে নৈতিক ইচ্ছার সঙ্গে তুলনা করলে অধর্ম কতটা ও কিভাবে ইষ্ট তা পরে বিচার করা যাবে। তবুও এইটুকু বুঝতে পারলেই যথেষ্ট যে ঈশ্বরের ইচ্ছা রাম ও কৃষ্ণের মধ্য দিয়ে যতখানি পূর্ণ হয় রাবণ ও কংসের মধ্য দিয়েও ততখানিই পূর্ণ হয়। (ব্রেডলি এখানে কাটিলাইন ও বর্জিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।) এর কারণ ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে আমাদের নীতির বিচার দিয়ে ধরা যায় না, সেই অভিপ্রায় অতিনৈতিক। আমাদের নৈতিক আদর্শ অসম্পূর্ণ ও ক্ষুদ্র।

কিন্তু হয়তো কেউ বলবেন যে, নৈতিক ত্রুটির মধ্যে শুধু অসম্পূর্ণতা ও সংকীর্ণতা নেই, তার মধ্যে একটা সংঘর্ষের বা সংগ্রামের রূপও আছে। এই বিরুদ্ধতার স্থান কোথায়? যেমন ভ্রমের আলোচনায় আমরা দেখেছি, সেইরকম নৈতিক ত্রুটির মূলে যে ধনাত্মক বিরুদ্ধ-ভাব আছে সেটাও হয়তো পরমতত্ত্বের সংগতি-সংগীত সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে। যেমন কোনো যন্ত্রের মধ্যে তার বিভিন্ন অংশের চাপ ও বাধা সেই যন্ত্রের সামগ্রিক সাফল্যের অনুকূল, যেমন কোনো অংশবিশেষের সংঘর্ষ, সমগ্র যন্ত্রের বৃহত্তর উদ্দেশ্য সার্থক করতে সমর্থ, তেমনি নৈতিক সংগ্রামের সংঘর্ষমূলক বোধও বৃহত্তর পরিপূর্ণতার উপযোগী হতে পারে। এটা খুবই সম্ভব সুতরাং এই সামঞ্জস্য যখন সম্ভব ও নিতান্ত প্রয়োজন তখন এই সামঞ্জস্য নিশ্চয়ই আছে— এইটুকু বলেই আমরা ক্ষান্ত হব।

আর-একটা আশঙ্কার কথা আছে। আমরা বারবার একই যুক্তি প্রয়োগ করছি বিভিন্ন বিষয়ের মীমাংসার জন্য। আমরা বলে আসছি, সমস্ত বিভেদ পারমার্থিক তত্ত্বের মধ্যে এসে রূপান্তরিত হয়ে সামঞ্জস্য লাভ করে। পরমতত্ত্বে এসে সমস্ত সম্বন্ধের অবসান হয়, এবং সেগুলো এই তত্ত্বের

মধ্যে লীন হয়। কিভাবে হয়, আমরা জানি না। এই সময় এই আপত্তি উঠতে পারে যে, যখন সমস্ত প্রকার সত্তাই পরমতত্ত্বের মধ্যে একাকার হয়ে লয় প্রাপ্ত হয় তখন এই তত্ত্বে কোনো বৈচিত্র্য নেই; কারণ এই তত্ত্ব সর্ব-প্রকার পরিচয়গ্রাসী ও বৈচিত্র্যগ্রাসী। সুতরাং পরমতত্ত্ব একপ্রকার শূন্য নিরাভরণ নিষ্প্রয়োজন পদার্থ। আমরা বলব এই যুক্তি যাঁরা দেন তাঁরা আমাদের বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারেন নি। এ কথা সত্য, আমরা জানি না সম্বন্ধোত্তর অনুভবের স্বরূপ কি; কিন্তু সম্বন্ধের অবসান হলেই যে অনুভবের ঐশ্বর্য কমে যাবে তা বলা যায় না। বিশেষ বিশেষ বিরোধ যে কি প্রকারে সমন্বয় প্রাপ্ত হয় তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু সেটা স্বীকার করলেই কি এও স্বীকার করা হয় যে পরমতত্ত্বের বা পরমার্থের মধ্যে যাবতীয় সত্তার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় না? এবং পরমতত্ত্ব একটা নিছক একঘেয়ে, স্বাদহীন ও রসহীন বস্তু? এই বিষয়ে আমাদের উত্তর এই যে, যদিও কিভাবে সমগ্রের মধ্যে সমস্ত রক্ষিত হয় আমরা জানি না, এইটুকু আমরা জানি যে সমস্তই সমগ্রের মধ্যে স্থান পায় এবং সমগ্রকে পরম ঐশ্বর্যশালী করে। পরমতত্ত্বের স্বাদ, পরম স্বাদ। প্রত্যেক সংঘর্ষ ও বিরোধ পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মের সমন্বয়ী-অনুভবের অংশ হয়ে সেই অনুভবকে আরো রসাত্মক করে, পরিপুষ্ট করে। মানুষকে এই আশ্বাস দেওয়া যেতে পারে যে, দৃশ্যমান জগতের রূপ, রস, বর্ণ ও গন্ধ প্রত্যেকটাই পরমতত্ত্বে মিলিত হয়ে আরো অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। সেগুলো হারিয়ে গিয়ে মরে না, অমৃত হয়ে ওঠে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

দৈশিক ও কালিক অবভাস

দেশ ও কাল, কোনোটাকেই বস্তু বলে স্বীকার করা যায় না, এ আমরা দেখেছি। দুটোর মধ্যেই এমন অসংগতি আছে যে এগুলোকে তত্ত্ব বলে গ্রহণ করা চলে না। দেশ ও কাল অবভাসবিশেষ। কিন্তু অবভাস হলেও দুটোর একপ্রকার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং পারমার্থিক বস্তুর মধ্যে

এগুলোর কোনো একপ্রকার স্থান দিতেই হবে; কিন্তু তারা পারমার্থিক তত্ত্বের গুণ কিভাবে হতে পারে?

দেশ ও কালের অবভাসের উৎপত্তি কি করে হয় এবং কি করে অসংগতিদুষ্ট দেশ ও কাল পরমতত্ত্বের মধ্যে বাস্তব হতে পারে, এর জ্ঞান মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এবং আমরা বলতে চাই যে, এই অসম্ভব জ্ঞানের প্রয়োজনও নেই। আমরা যা জানতে চাই তা হচ্ছে এই যে, দেশ ও কালের অবভাসের সঙ্গে পরমতত্ত্বের মিলন হয়েছে কি না। আমাদের প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, পরমতত্ত্বের মধ্যে দেশ ও কালের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হওয়া নিতান্ত দরকার এবং পরমতত্ত্বের পক্ষে এই দ্বিবিধ অবভাসের অসংগতিগুলো অতিক্রম করে বৃহত্তর সমন্বয়ের মধ্যে সেগুলোকে ধারণ করা সম্ভব; সুতরাং দেশ ও কাল পরমতত্ত্বের সঙ্গে সংগতি লাভ করেছে, এই সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রেও মানতে হবে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সময়ের জন্ম সময়হীন অনুভব থেকে হয়েছে এ দেখানো সম্ভব নয়। নিম্নস্তরের ও অতি-প্রাথমিক অবস্থার সময়ের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করেও দেখানো সম্ভব নয় যে তার মধ্যে প্রথম থেকে কালের অনুভূতি ছিল না। তত্ত্বদর্শনের পক্ষে এইরকম অনুসন্ধানের কোনো গুরুত্বও নেই। সময় যদি অবস্তুই না হয়, তা হলে অপরিবর্তনশীল পরমতত্ত্ব তো বিকৃত মনের কল্পনা মাত্র। অপর পক্ষে সময়কে একেবারে অবস্তু বললেও চলে না। কারণ আমাদের মতো সসীম জীবের অভিজ্ঞতায় পরিবর্তনের অনুভব হল অতি-প্রত্যক্ষ। সুতরাং সময় এমন একটা তথ্য যাকে পুরো বোঝা যায় না। অপরিবর্তনশীল পরমতত্ত্বের সঙ্গে পরিবর্তনের সামঞ্জস্য কিভাবে রক্ষিত হয় তা আমাদের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। কিন্তু সময় কেন ও কিভাবে অবাস্তব যদি না বুঝে থাকতাম তা হলে এইজন্য নিদারুণ অসুবিধায় পড়তে হত। কিন্তু আমরা জেনেছি যে সময় অবস্তু যেহেতু সময়ের ধারণা অসংগতি-পূর্ণ এবং সেইজন্য কালকে আমরা অবভাস বলেছি। এইটা বুঝতে যখন পেরেছি তখন আমরা ধারণাও করতে পারি যে কালের অসংগতি পরমতত্ত্বের মধ্যে দূরীভূত হওয়া সম্ভব। সত্য-নির্ণয়ে শুধু অনুভব বা অভিজ্ঞতার দোহাই দিলে চলে না। একটা কিছু আমার মধ্যে বা বিশ্বে আছে এই প্রত্যক্ষ অনুভবের ওপর ভিত্তি করে বলা চলে না যে, যা আছে বলে আমি অনুভব করছি তা বস্তু। তত্ত্ববিচারের সময় কোনো অনুভবই বিচারের উর্ধ্বে নয়;

এবং তত্ত্বদর্শনে যাকে আমরা সত্য বলে সম্মান দেখাতে বাধ্য হই, একমাত্র তাকেই সত্য বলে স্বীকার করি। তত্ত্বদর্শনে অন্ধ সম্মানের বিষয় কিছুই নেই। সেখানে বিচার-ফলে যা প্রতিষ্ঠিত হবে সেটাই স্পষ্টত ও অবিসংবাদিত ভাবে গৃহীত হবে।

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে কালের অন্তর্গত স্বতোবিরোধের রূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। আমরা এখন দেখবার চেষ্টা করব কাল নিজেকে অতিক্রম করে কালোত্তর এক বৃহত্তর বস্তুর ইঙ্গিত দেয় কিভাবে।

পরিবর্তন কখনোই সম্ভব নয় যতক্ষণ না অপরিবর্তনশীল ও স্থায়ী কিছু স্বীকার করা যায়। পরিবর্তনের পারম্পর্য বুঝতে গেলে পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে এক বস্তুর দাবি আসে ; অবশ্য এই দাবির মধ্যে কিছু অসংগতি আছে। অসংগতি থাকলেও স্থায়ী বস্তুর প্রয়োজন স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। সুতরাং যা পরিবর্তনরূপে প্রতিভাত হয় তা অপরিবর্তনশীলতাকে চায় ; এবং পরিবর্তনকে রক্ষা করতে গিয়ে কাল করে আত্মহত্যার চেষ্টা ; কারণ, নিজের স্বভাব অতিক্রম করে কাল উচ্চতর এক বস্তুর মধ্যে গৃহীত হতে চায়।

অন্য একবিধ অসংগতি থেকেও আমরা এই একই সিদ্ধান্তে আসি। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সঙ্গে বর্তমানের সম্বন্ধ পর্যালোচনা করলে কালের মধ্যে এই স্বধর্ম-অতিক্রমণ করবার প্রবণতা পুনর্লক্ষিত হয়। যখনই কোনো স্থিতি-কালকে সময়ের একক অংশ বা খণ্ডরূপে গ্রহণ করা হয় তখনই তা বর্তমান রূপে অনুভূত হয়। এবং তখন মনে হয় যেন এই গোটা কালটা এখনই ছিল। তা না হলে এই স্থিতিকালকে আমরা একটা জিনিস কি করে বলি ? সত্তা আছে বলেই তার বৈশিষ্ট্য বা ধর্মও আছে এই কথা বলবার অধিকার আমাদের হয়। এবং বর্তমান না হয়ে কোনো জিনিস বিদ্যমান হতে পারে কি অর্থে তাও আমরা বুঝতে পারি না। বিজ্ঞান এক দিকে সময়ের অস্তিত্ব মেনে নেয়, অন্য দিকে তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলে। বিজ্ঞানে অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্তমানের সঙ্গে সমতুল্য একটা পদার্থ বা জিনিস বলে বিবেচনা করা হয়। (নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অতীতে কোনো জিনিসের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম কি ছিল এবং ভবিষ্যতে তার কি সম্ভাবনা এগুলোর দ্বারা সেই জিনিসের ধর্ম নির্ধারিত করা হয়। কিন্তু কি করে অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমান না হয়ে বাস্তব বা বিদ্যমান হতে পারে?

তা ছাড়া বিজ্ঞানে কোনো নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবার ব্যাপারে সমস্ত তথ্যগুলোকে সময়ের সঙ্গে অসম্পর্কিত ভাবে গ্রহণ করা হয় এবং সেগুলোকে সমান মূল্য দেওয়া হয়। বিজ্ঞান কল্পনা করে, যেন সময়ের প্রবাহ থেমে গিয়েছে। বিজ্ঞানের বিচারে যাকে বস্তু বিবেচনা করা হয়, তা যেন কালাতীত এবং সেখানে আনুপূর্বিকতার কোনো মূল্য বা অধিকার নেই এবং তাকে অবভাস-মাত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

অন্য এক ক্ষেত্রেও এইরকম অতিক্রমপ্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের মনের ধারাই হচ্ছে সময়কে উপেক্ষা করে চলবার দিকে। বুদ্ধিদ্বারা যা একবার সত্য বলে গৃহীত হয় তা চিরকালকার সত্য বলে স্বীকৃত হয়। এবং অনুষঙ্গ-নামীয় যাবতীয় ঘটনাবলীতেও এই কালাতীতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দুই বা বহু মানসিক ঘটনার আসক্তি বা সংযুক্তি শুধু সেই তথ্যগুলোর অন্তর্নিহিত সাধারণ প্রত্যয় বা ভাবের দ্বারাই সম্ভব এবং আসক্ত ভাব-নিচয় কালের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় বলেই নূতন ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে কালকে আমরা কেবল অবভাস-রূপে গ্রহণ করি। আমাদের মনের মধ্যেই আছে সময়কে উপেক্ষা করে কালাতীতের দিকে অগ্রসর হওয়ার অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তি। মনে হয়, আমরা যেন কালকে কালাতীতের মিথ্যা অবভাস-রূপে গ্রহণ করছি।

আপনি হয়তো আপত্তি তুলবেন এই ভাবে কালকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের মনের নিম্নতম স্তরের অন্ধকারে যে-সব সনাতন সম্বন্ধ ক্রিয়াশীল কিংবা যে-সব সনাতন কালাতীত সম্বন্ধ বিজ্ঞানে সচেতন ভাবে আদৃত সে-গুলোর মধ্যেও পারম্পর্য থাকতে পারে। বিজ্ঞানের নিয়মে শুধু দুই ঘটনার সহভাবের কথাই বলা হয় না, অনেক সময় দুই ঘটনার মধ্যে আনুপূর্বিকতাও নির্দিষ্ট করা হয়। এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা ও সারবত্তা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য; কিন্তু এই আপত্তি-দ্বারা সময়ের স্বতোবিরোধ-দোষ খণ্ডন করা যায় না। কার্যকারণ-সম্বন্ধের মধ্যে কালের পারম্পর্য স্বীকার করলেও এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, নিজেকে অতিক্রমণ করবার দিকে সময়ের স্বাভাবিক প্রবণতা; কাল সব সময়ই কালাতীতের গুণরূপে প্রতিভাত হতে নিষ্ফল চেষ্টা করে।

এ পর্যন্ত আমরা যা বিচার করেছি তার থেকে এই পাচ্ছি যে, কাল

বাস্তব নয়। কালাতীতের গুণরূপে বা বিশেষণরূপে প্রতিভাত হওয়ার স্বতোবিরোধী প্রয়াসের দ্বারা কালের অবাস্তবতা প্রমাণিত হয়। পারমার্থিক বস্তুতে কালের রূপান্তর ঘটে ; ফলে, রূপান্তরের পর পরমতত্ত্বের মধ্যে কাল স্থান পায়। বৃহত্তর সমন্বয়ের মধ্যে মিলিত হয়ে কাল সত্য হয়ে ওঠে। পরমতত্ত্ব কালাতীত। পরমতত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্নরূপে কালের একপ্রকার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু পরমতত্ত্বে মিশে কালের বিশিষ্টস্বভাব হারিয়ে যায়।

সময়ের অবাস্তবতা দেখাবার জন্য আমি আরো দু-এক কথা বলতে চাই। কতগুলো ব্যাপার আছে যা লক্ষ্য করলেও কাল যে নিরেট পদার্থ নয় তা প্রমাণিত হয়।

প্রথমত সময়ের ঐক্য সম্বন্ধে চিন্তা করা যাক। কাল যে এক ও অভিন্ন আনুপূর্বিক প্রবাহ এরকম ধারণা করবার কোনো সংগত কারণ নেই। অর্থাৎ সমস্ত ঘটনা কালের একটা ধারাবাহিক প্রবাহের অন্তর্গত এরকম ধারণা করার পক্ষে যুক্তি নেই। যেহেতু যা কিছু আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় সবই ঘটনা, আমরা এই কল্পনা করি যে বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা একটা কালের ধারাবাহিক স্রোতের মধ্যে অবস্থিত এবং সেইজন্য ঘটনাগুলো হয় একটা আর একটার পূর্বে না হয় পরে, না হয় সমকালীন। কালের এইরকম একটা ধারা কল্পনা করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। এমনও তো হতে পারে যে একাধিক কালপ্রবাহ আছে যার ফলে কোনো এক-প্রবাহ-অন্তর্গত ঘটনাবলীর মধ্যে আনুপূর্বিকতা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রবাহের মধ্যে কোনো কালিক সম্বন্ধ নেই ? এরকম ধারণা করাতে বুদ্ধিগত কোনো বাধা নেই। বিশ্বে একাধিক এমন ঘটনাপ্রবাহ থাকতে পারে যেগুলোর পরস্পরের মধ্যে কালের বন্ধন নেই ; অর্থাৎ এক-প্রবাহ-অন্তর্গত ঘটনা অন্য-প্রবাহ-অন্তর্গত ঘটনার পূর্বে, পরে বা সমকালীন নয় এবং পারমার্থিক পদার্থে বিভিন্ন কালপ্রবাহের মধ্যে ঐক্য-সেতু কাল দিয়ে গঠিত নাও হতে পারে।

আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বপ্নের বা কল্পনার কথা উল্লেখ করছি। স্বপ্নে আমাদের মন ইতস্তত বাধাহীনভাবে বিচরণ করে বেড়ায় ; কল্পনায় কেবল কাল্পনিক ঘটনাবলীর আনুপূর্বিকতা বা ইতিহাস আমরা অনুধাবন করি। এই-সব 'অবাস্তব' ঘটনাবলীর মধ্যেও ধারাবাহিকতা আছে ; কিন্তু যদি এর এক প্রবাহের সঙ্গে অন্য প্রবাহের তুলনা করি এই বিভিন্ন

STATE ... West Bengal.
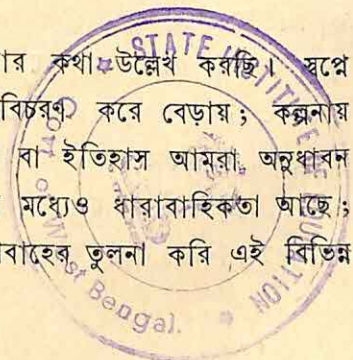
প্রবাহের মধ্যে কোনো কালের সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলীর কালস্রোত ও কাল্পনিক কাহিনীর ঘটনাস্রোতের মধ্যে কোনো আনুপূর্বিকতা নেই। এবং এই অবাস্তব ঘটনাবলীর কালপ্রবাহের সঙ্গে তথাকথিত 'বাস্তব' ঘটনাবলীর কালস্রোতেরও কোনো সম্বন্ধ নেই। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন 'দুর্গেশনন্দিনী'র ঘটনাস্রোতের সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র ঘটনাস্রোতের কালিক সম্বন্ধ কি এবং এই ঘটনাবলীকে পূর্বাপর ধারায় বিন্যস্ত করা যায় কি না; কিংবা কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন 'শেষের কবিতা'র ঘটনাবলী ও আমার গত বৎসরের স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলী ও বাস্তব ঘটনাবলীর মধ্যে আনুপূর্বিকতা আছে কি না? আমি বলতে বাধ্য হব যে, এই-সব প্রশ্ন আমার কাছে অর্থহীন। (এখানে ব্রেডলি ইমোজেনের কাহিনী এবং সিন্দাবাদ নাবিকের কাহিনীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন) এই-সব বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে কালের সম্বন্ধ ধারণা করা যায় না; কারণ এগুলো এক-একটা স্বতন্ত্র প্রবাহ। এই ঘটনাবলীর তারিখ এবং আমার মনোজগতে সেগুলোর উদয়ের তারিখকে সমান ধারণা করলে আরো উদ্ভট অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। তা হলে কল্পনা করতে হবে যে পাঠাগারের বই-গুলোতে যে-সব ঘটনার উল্লেখ আছে সেগুলোর ধারাবাহিকতা হচ্ছে বই-গুলোর প্রকাশনের তারিখ-অনুযায়ী; কিন্তু ঐ ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতাকে বইগুলোর পরবর্তী সংস্করণেও ঠিক একই রূপ থাকতে হবে এটা অসম্ভব।

উত্তরে তর্ক করা যেতে পারে যে, সমস্ত কাল্পনিক ও বাস্তবিক ঘটনা-প্রবাহই আমার মনের মধ্যে মানসিক ঘটনারূপে প্রথমে উদিত হয়; মানসিক ঘটনা হিসেবে সেগুলোর একটা ধারাবাহিকতা আছে; তা ছাড়া মনের বাইরে একটা বাস্তব কালপ্রবাহ আছে। যতবারই আমার মনে একটা কাহিনী উদিত হোক না কেন, সেই কাহিনী-অন্তর্গত ঘটনাবলীর একটা নিজস্ব কালপ্রবাহ আছে এবং সেই প্রবাহ আমার মানস-ঘটনার আনুপূর্বিকতা দিয়ে নির্দিষ্ট নয়। এই তর্কের যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু বর্তমান যুক্তি স্বীকার করলে আরো স্বীকার করতে হয় যে, আমার অবাস্তব কালপ্রবাহের অন্তর্গত ঘটনাবলীর মধ্যে কালের সত্যিকারের কোনো প্রভাব বা বন্ধন নেই। তা নাহলে একই ঘটনাবলীর বিষয় আমি পুনঃপুনঃ ও বিভিন্ন সময়ে কল্পনা করতে পারি কি করে?

তা ছাড়া আরো একটা দিক আছে। এক অর্থে এটা ঠিক যে আমরা সমস্ত ঘটনাকে একটা কালপ্রবাহের মধ্যে সংস্থাপনা করে থাকি। কিন্তু তার থেকে প্রমাণিত হয় না যে সমগ্র বিশ্বে মাত্র একটা ধারা আছে। তার থেকে প্রমাণিত হয় না যে বিশ্বের সমস্ত বিষয় কালের বন্ধনী দিয়ে আবদ্ধ। আমার ঘটনাবলীর বেলায় যা সত্য, অন্য ঘটনাবলীর বেলায় তা সত্য নাও হতে পারে। তা ছাড়া আমরা যেভাবে ঘটনাবলীকে একসূত্রে আবদ্ধ করি, পারমার্থিক পদার্থে সে প্রকার সূত্র ব্যতীত অন্য প্রকার সূত্র নেই, এই বা আমরা বলি কি করে?

আমরা সাধারণত যে ঘটনাবলীকে বাস্তব বলি সেগুলোকে একটা ক্রম-বর্ধমান কালের ধারার মধ্যে সজ্জিত করে থাকি। এই ধারার একতা নির্ভর করে আমাদের আত্মিক একতার ওপর। আমাদের বর্তমান অনুভবকে বাস্তব ধারণা করে তার সম্মুখে ও পশ্চাতে আমরা কালের একটা ধারার কল্পনা করি। এবং সংযোগসূত্র হিসাবে গ্রহণ করি সেইসব ভাবকে যে-গুলোর মধ্যে ঐক্য বা মিল আছে। কল্পনা-সৃষ্ট এই ধারাকে আমরা কালের ধারা বলি এবং যে কোনো ভাব বা অনুভব এই ধারার সঙ্গে খাপ না খায়, তাকে অসম্ভব বলে অবহেলা করি। একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে এই বিন্যাস ব্যাপারের সার্থকতা আছে। এক বিশেষ প্রকার ঘটনার বাস্তবতার জন্য কালের বন্ধন প্রয়োজন। কিন্তু সর্বপ্রকার ঘটনাই কালের ধারার মধ্যে অবস্থিত, এ অন্য কথা; এবং এই কথার সপক্ষে যুক্তি নেই। যে-সব ঘটনা আমার সৃষ্ট কালস্রোতের মধ্যে স্থান পায়, শুধু সেগুলোই বাস্তব এরকম বিশ্বাস করতে হলে, কল্পনার জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে কালের কোনো ধারাবাহিকতা নেই বিশ্বাস করতে হয়। এবং বলতে হয় যে কাল্পনিক ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা অবাস্তব। কিন্তু অবাস্তব বলেই সেইসব ঘটনার ধারাবাহিকতা উড়ে যায় না। মানসিক রোগবিশেষের ফলে সময়জ্ঞানের বিকৃতি হতে দেখা যায়, এই তথ্যও এখানে মনে রাখা দরকার। সব বিষয় বিবেচনা করলে কালের বিভিন্ন ধারায় বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য। আমার সৃষ্ট কালস্রোতের বাইরে, আমার তীক্ষ্ণতম অনুভবের নাগালের বাইরে অন্যপ্রকার কালস্রোত থাকা সম্ভব এবং ঘটনাবলীর পরিবর্তন সেই স্রোত অনুযায়ী হতে পারে; এতে অসম্ভব কিছুই নেই। যতদূর আমরা

বুঝতে পারছি তাতে পারমার্থিক পদার্থের ভিতরে এমন অনেক কালস্রোত থাকতে পারে যেগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কালগত সম্বন্ধ নেই।

বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে ঐক্যের সম্বন্ধ নেই এ হতে পারে না। কিন্তু কালগত সম্বন্ধই একমাত্র সম্বন্ধ নয়। পারমার্থিক বস্তুর মধ্যে মধ্যে অন্যবিধ ঐক্য সম্ভবপর। এবং পারমার্থিক পদার্থ কালাতীত হলেও বিভিন্ন স্বতন্ত্র কালের ধারার অধিকারী পরমার্থ হতে পারে।

এবার কালের গতির বিষয়ে আলোচনা করে দেখা যাক। সমস্ত ঘটনারই একপ্রকার গতিমুখ আমরা কল্পনা করে থাকি। সমস্ত ঘটনাই যেন ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎই যেন কালের গতিপথ নির্ধারিত করছে এই আমরা সাধারণত ভেবে থাকি। কিন্তু এই ধারণাও ঠিক নয়। কারণ গতিমুখ এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে প্রভেদের ধারণা আমাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। যে দিক থেকে নূতন অনুভব আসে তাকে আমরা ভবিষ্যৎ বলি। আমাদের অনুভবের মধ্যে প্রত্যহই কিছু কিছু নূতন ঘটনার উদয় হয় ও কিছু অনুভূত ঘটনার অন্তর্ধান হয়; এই অভিজ্ঞতার থেকেই পরিবর্তনের ধারণার উৎপত্তি হয়। আমরা এই অভিজ্ঞতা-অনুযায়ী কল্পনা করে থাকি ঘটনাবলী অতীত থেকে ভবিষ্যৎ কালের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিংবা ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমানের দিকে আসছে। নূতন ঘটনাবলীর উদয়ের পথ লক্ষ্য করে আমরা কালের গতিমুখ এক নির্দিষ্ট দিকে কল্পনা করে থাকি। এই যদি সত্য হয় তা হলে কালপ্রবাহের গতিমুখ একটা নিতান্ত আপেক্ষিক জিনিস। এ কথা বলা অসম্ভব যে বস্তুত কালের প্রবাহ বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে।

তবে এমন-কিছু আছে পরম-বস্তুর মধ্যে যার জন্য অন্যের ও আমাদের সমস্ত ঘটনাবলীকে আমরা এক ধারায় বা শৃঙ্খলায় সজ্জিত বা বিন্যস্ত করতে বাধ্য হই, যার জন্য আমাদের প্রকৃতি এই নির্দিষ্ট ধারা ব্যতীত অন্য ধারায় অনুভবলব্ধ ঘটনাবলীকে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু এই এমন-কিছুকে যে বস্তুত একটা নির্দিষ্ট গতিমুখ হতে হবে তার কি মানে আছে? সেরকম ভাববার কোনো যুক্তি নেই। আমরা ধরে নিই যে প্রত্যেক সসীম জীবের অনুভবরাশি কল্পিতনিরপেক্ষ এক কালপ্রবাহের মধ্যে অবস্থিত এবং প্রত্যেকের কালপ্রবাহের গতিমুখও একপ্রকার; অতীত থেকে বর্তমানের

দিকে ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সমর্থন-যোগ্য নয়। ধরুন, কোনো জীব বা প্রাণী আমাদের পরিচিত জগতের সংস্পর্শে একেবারেই আসে নি; তার জীবনের গতিমুখ আমাদের অভিজ্ঞতার গতিমুখের বিপরীত দিকে হতে পারে, ধারণা করা কিছু অসম্ভব নয় এবং অর্থশূন্যও নয়। অবশ্য এটা ঠিক যে, এইরকম জীবের জগৎ আমরা বুঝতে পারব না। জগতে জন্মের আগে আসবে মৃত্যু, বেদনার পরে আসবে আঘাত এবং ঐ ধারা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকবে। তবে এও হতে পারে আমাদের জীবনের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর দৃষ্টিতে বিচার করলে হয়তো আমরা দেখতে সমর্থ হব যে গতিমুখ কোনো সত্যবস্তু নয়, এবং বস্তুত মাত্র কতগুলো গুণ বা ধর্ম আছে এবং সেগুলোর ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন জীবের অভিজ্ঞতার বা জীবনের গতিমুখ বিভিন্নরূপে নির্দিষ্ট হচ্ছে, কিন্তু পারমার্থিক পদার্থে এই নানা গতিমুখের মধ্যে সামঞ্জস্যের কোনো অভাব নেই।

আমাদের অনুভব ও অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তাই বলে এও কি বলা চলে যে সমগ্র বিশ্ব আমাদের অভিজ্ঞতার সম্ভাব্য বিষয়? আমার ব্যক্তিগত অনুভব বা অভিজ্ঞতার মধ্যে যে ব্যক্তিসমূহ বা বস্তুনিচয়কে পাই কেবলমাত্র সেগুলোর সমষ্টিই তো সমগ্র বিশ্ব নয়। একের অধিক জগৎ থাকতে পারে; সেগুলোর মধ্যে দেশগত সম্বন্ধ নাও থাকতে পারে। একের অধিক অভিজ্ঞতার ধারা থাকতে পারে, সেগুলোর মধ্যে কালগত সম্বন্ধ নাও থাকতে পারে। এরকম ধারণা না করতে পারার একমাত্র কারণ হল আমাদের কুসংস্কার ও বহুযুগের পুঞ্জীভূত অভ্যাস। আমরা যেরকম ঐক্য দেখতে অভ্যস্ত সেইরকম ঐক্য ছাড়া অন্যরকম ঐক্য থাকা সম্ভব এবং শুধু সম্ভব নয় অন্যরূপ ঐক্য থাকা অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং পরমতত্ত্বে মনুষ্য-ধারণার অতীত অন্যবিধ উচ্চতর ঐক্য আছে।

পরমতত্ত্বের মধ্যে এমন একাধিক কালস্রোত কল্পনা করা কিছু কঠিন নয়, যেগুলোর প্রত্যেকের এক-একটা আপেক্ষিক গতিমুখ আছে অথচ যে স্রোত-গুলোর সাধারণ ও নিরপেক্ষ কোনো গতিমুখ নেই। এবং এও সহজে কল্পনা করা যায় যে, এই-সব কালস্রোতের মধ্যে প্রত্যেকটা স্রোতের মুখ অন্য স্রোত-গুলোর থেকে ভিন্ন দিকে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা এইরকম একটা বিন্যাস কল্পনা করতে পারি।

ক	খ	গ	ঘ
খ	ক	ঘ	গ
গ	ঘ	ক	খ
ঘ	গ	খ	ক

উপরিবর্ণিত ক্ষেত্রের অন্তর্নিহিত উপাদানগুলোকে সমষ্টির দিক থেকে বিচার করলে সমগ্র ক্ষেত্রের কোনো গতি বা পরিবর্তন নেই, এ কথা সহজেই বোধগম্য। অথচ এই ক্ষেত্রের ভেতরে যে ধারাগুলো আছে সেগুলোর প্রত্যেকটা, সমগ্রের বিশেষ বিশেষ অংশ প্রকাশ করছে; এবং পরিবর্তনের অনুভব এই আংশিক ধারাগুলোর মধ্য দিয়ে উদিত হচ্ছে। ক্ষেত্রস্থ বিভিন্ন স্রোতগুলোর প্রত্যেকটার নিজস্ব ও পৃথক পৃথক ধারা আছে। সমগ্রের দৃষ্টিতে এই দিকগুলোর কোনো অর্থ বা তাৎপর্য নেই। এই ধারাগুলোর এক-একটাকে এক-এক শ্রেণীর জীবের জীবনের ধারারূপে কল্পনা করা যাক। দেখা যাবে প্রত্যেক শ্রেণীর জীবসমূহের অনুভবধারা অনন্য; তাদের জীবনে অনুভবরাশি যেভাবে একটার পর একটা আসছে তার ওপর তাদের কাল-প্রবাহের গতিমুখ নির্ভর করছে; এবং সব শ্রেণীর জীবের পৃথক ও নিজস্ব অনুভবের ধারাগুলো সমগ্র ক্ষেত্রের মধ্যে নির্বিবাদে অবস্থান করছে। এই ভাবে নানাবিধ অনুভবরাশি পরমতত্ত্বের মধ্যে নিশ্চয়ই স্থান পাবে ও তাকে সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু পরমতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে একপ্রকার অনুভব অন্যপ্রকার অনুভব দ্বারা রূপান্তরিত হতে বাধ্য। সুতরাং পারম্পর্যের বিবিধ অনুভবরাশি রূপান্তরিত হয়ে পরমতত্ত্বের মধ্যে ঐক্য-লাভ করে এবং সেগুলোর প্রত্যেকটার সংকীর্ণ ও নিজ বৈশিষ্ট্য লোপ পায়।

কল্পনার বল্গা শিথিল করে ভাবা যেতে পারে যে, আমাদের প্রত্যেকের অনুরূপ আর এক ব্যক্তি আছে। তার জীবনের ধারা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের ইতিহাস যে ভাবে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত ভাবে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের জীবন ও আমাদের কল্পিত দোসরের জীবনের উপাদানগুলো একই হবে; কিন্তু উপাদানগুলোর আবির্ভাবের ধারা দুজনের দুইরকম হবে এবং সেইজন্য এই দুই জীবনের অনুভূতির মধ্যে অনেক প্রভেদ হবে; এবং এই অনুভববৈশিষ্ট্যের জন্য

দুইজনের ব্যক্তিত্বও বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে। কিন্তু পরমতত্ত্বে ধারাদুটো যখন মিলিত হবে তখন পারম্পর্য ও গতিমুখ কিছুই থাকবে না।

এই দৃষ্টান্ত দিয়ে এইটুকু বুঝতে চেষ্টা করছি যে বিভিন্ন কালপ্রবাহের মধ্যে কালিকসম্বন্ধগত ঐক্য আছে কিংবা বিভিন্ন কালপ্রবাহের গতিমুখের মধ্যে একটা সমতা বা সামঞ্জস্য আছে, এরকম ধারণা করবার সপক্ষে কোনো যুক্তি নেই। যত বৈচিত্র্যই থাকুক না কেন, সব বৈচিত্র্যের পক্ষে রূপান্তরিত হয়ে পরমতত্ত্বে অবস্থান করা সম্ভব এবং এই ব্যাপারে সম্ভাবনা আছে প্রমাণ করতে পারলেই অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে গেল।

পরমতত্ত্ব হল সম্বন্ধের উর্ধ্বে। সেইজন্য আমরা এমন কোনো সম্বন্ধজাত ঐক্যের চিত্র আঁকতে পারি না যা পরমতত্ত্বের ঐক্যের অনুরূপ। কিন্তু সাধারণ নীতি বা যুক্তির ভিত্তিতে পরমতত্ত্বের শাশ্বত কালাতীত ঐক্য স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। তা ছাড়া আমরা এখন দেখতে পারছি যে সময়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেও পরমবস্তু কালাতীত, এই অবধারণ করতে কোনো বাধা নেই।

অবশিষ্ট আরো একটা অসুবিধার বিষয়ে আমার কিছু বলা দরকার। কেউ কেউ হয়তো আপত্তি করতে পারেন যে, কার্যকারণসম্বন্ধের মধ্যে কালের যে আনুপূর্বিকতা আছে তার বিপর্যয় অসম্ভব এবং বিশ্বকে যে বিভিন্ন সম্বন্ধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয় সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই মূলত আনুপূর্বিকতা বা সমকালীনতার সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কাল পরমতত্ত্বের কালাতীতকে বাধিত করে। বর্তমান আপত্তির উত্তরে বলব যে আপত্তিটা অসার।

যদি ধরেও নেওয়া যায় যে কার্যকারণ-সম্বন্ধে কোনো গলদ নেই, তবুও এ কথা স্বীকার করা অসম্ভব যে, সমস্ত অবভাস বা সংঘটনের মধ্যে একই কার্যকারণ-সম্বন্ধ অনুস্যূত হয়ে আছে। বিভিন্ন কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ একাধিক জগতের একসঙ্গে থাকা এমন কিছু অসম্ভব নয়। পরমতত্ত্বে এই-সব বিভিন্ন জগৎ পারস্পরিক কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত না হয়েও একত্র থাকতে পারে। তা ছাড়া আমাদের জগতেই দেখতে পাই যে, কার্যকারণসম্বন্ধের আনুপূর্বিকতা কিরকম মিথ্যা। এ কখনো সত্য নয় যে শুধু ক, শুধু খ'এর উৎপত্তির কারণ। যখন এই ঘটনা দুটোর পশ্চাদ্‌বর্তী অনির্দিষ্ট পটভূমিকাটাকে

স্বীকার করে নেওয়া হয় তখনই মাত্র বাক্যটি সত্য বলে স্বীকার করা সম্ভব। প্রকৃত ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এইরকম : অ (ক) হচ্ছে অ (খ)'এর উৎপত্তির কারণ। কিন্তু হয়তো অ (ক) ও অ (খ)'এর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, এবং আনুপূর্বিকতা ও পার্থক্যটা হয়তো অবভাস মাত্র। হয়তো এই অবভাস আমাদের একদেশদর্শী ও সংকীর্ণ দৃষ্টির ফল। আনুপূর্বিক সম্বন্ধগুলো শেষ পর্যন্ত পরমতত্ত্বের একত্বের আংশিক ও অসম্পূর্ণ প্রকাশ হতে পারে।

এতদ্‌ব্যতীত মনে করা দরকার যে, সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে কার্য-কারণসম্বন্ধের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে তার মীমাংসার জন্য এক উচ্চতর সত্যের প্রয়োজন। অন্তর্দ্বন্দ্বটার ছবি আরো সুস্পষ্ট করবার চেষ্টা করব। কার্যকারণসম্বন্ধ স্বীকার করলে পরিবর্তনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু পরিবর্তন ব্যাপারটাই বোঝা যায় না। কেউ যদি বলেন যে, ক পরিণত হচ্ছে খ' এ, কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যে কোনো স্থায়ী পদার্থ নেই, তাঁর এই বাক্য অর্থশূন্য হবে। পরিবর্তনের জন্য একটা কিছুর দরকার যা পরিবর্তিত হচ্ছে ; অর্থাৎ পরিবর্তন সম্ভব, যেহেতু এমন কিছু আছে যা স্থায়ী বা অপরিবর্তনশীল। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে পরিবর্তনের ভাব আরোপ করা যায় কি করে ? অ (ক), অ (খ)'তে পরিণত হচ্ছে, কিন্তু অ যদি প্রথমে ক থাকে ও পরে খ'এ পরিণত হয় তা হলে ক'এর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে অ' এর মধ্যে একটা পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনের জন্য দৃশ্যত আমাদের আর একটা অপরিবর্তনশীল সত্তার প্রয়োজন স্বীকার করতে হয়। অপর পক্ষে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যদি কল্পনা করা হয় যে অ (ক) পরিবর্তিত হয় নি, তা হলেও আমরা মারা পড়ি। কারণ তা হলে ক ও খ কে যুগপৎ অ' তে আরোপ করতে হয় ; এবং সমকালীন আরোপের অর্থ হয়ে দাঁড়ায় এই যে পূর্বাপরতা বা আনুপূর্বিকতা বলে কিছু নেই। যে ঘটনাদুটো দৃশ্যত আনুপূর্বিক, তারা বস্তুত অ'এর মধ্যে সহাবস্থান করছে।

অন্যভাবে বলতে গেলে বাক্যটা দাঁড়ায় এরকম : অ প্রথমে অ (ক) এবং পরে অ (খ)'ও বটে। কিন্তু 'পরে খ'ও বটে' সত্য হতে পারে কি করে যদি পূর্বে 'শুদ্ধ ক' সত্য ছিল ? আমরা হয়তো বলব 'না না, শুধু

ক কেন ? এটা শুধু অ (ক) কেন হবে ? পূর্বে ছিল অক (গ), যা পরে খ' ও বটে হয়েছে' ; কিন্তু এই উত্তরেও সমস্যার মীমাংসা হয় না। কারণ পূর্বেকার প্রশ্নটা থেকেই যায়। যা অক (গ) পূর্বে ছিল তাই যদি পরে অ (খ) হয় তা হলে এ শব্দগুলোর পার্থক্য করা যায় কি করে ? সেগুলোর মধ্যে প্রভেদ থাকুক বা প্রভেদ নাই থাকুক কোনো অবস্থাতেই বাক্যটা টিঁকতে পারে না। কারণ সেগুলোর মধ্যে যদি প্রভেদ থাকে তাকে সমর্থন করা যায় না এবং সেগুলোর মধ্যে যদি প্রভেদ না থাকে তা হলে তাদের পৃথক্-করণ সমর্থন করা যায় না। এই গোলমাল থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হল উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের একত্ব স্বীকার করে নেওয়া এবং পরিবর্তন ও পরিচ্ছিন্নতাকে অবভাস বলে গ্রহণ করা। পরিবর্তন ও পৃথক্‌করণের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই সমগ্রের মধ্যে স্থান দিতে হবে কিন্তু কি-ভাবে এগুলো পরমতত্ত্বের সঙ্গে সমন্বিত বা পরমতত্ত্বে সত্য তা আমরা ধারণা করতে অক্ষম। কোনো এক উচ্চতর একত্বের মধ্যে তারা লয়প্রাপ্ত হয় এইটুকু মাত্র বলা যায়।

বর্তমান ক্ষণের বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থা তার অব্যবহিত পরক্ষণের বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থার কারণ, এই উক্তি বা বাক্যের মধ্যেও একই প্রকার স্বতো-বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। 'ক' এক অবস্থা, 'খ' আর-এক অবস্থায় পরিণত হতে পারে কি করে ? এই পরিণতির একটা হেতু থাকা উচিত অথচ হেতু স্বীকার করলে হেতুটাই একপ্রকার নূতন 'ক' হয়ে দাঁড়ায় এবং এইভাবে অনবস্থা দোষে আমরা জড়িত হয়ে পড়ি ; কার্য ও কারণের কাল-সম্বন্ধোপেত বিশিষ্ট সত্তা স্বীকার করলে সেগুলোকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে, আমরা এই মত অবলম্বন করতে বাধ্য হই যে কার্যকারণরূপ হল একটা আংশিক রূপ ; আমরা কার্য ও কারণরূপে যা পাই তা এক বিমিশ্র বা জটিল সমগ্র সত্তার অন্তর্নিহিত কতগুলো উপাদানের পরিবর্তন মাত্র। কিন্তু এই মতেও সমস্যার পূর্ণ মীমাংসা হয় না। শেষ পর্যন্ত, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে বিশ্বের সমগ্র অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব। ধীরে ধীরে মানতে রাজী হই আংশিক পরিবর্তন কোনো সত্যিকারের পরি-বর্তন নয়, সমস্ত আংশিক পরিবর্তন সমগ্রের মধ্যে কাটাকাটি হয়ে যায় এবং সমগ্র সত্তা অপরিবর্তনশীল ; পারম্পর্য একবিধ অবভাস এবং তার বিশেষ

তাৎপর্য যে কি তা আমরা জানি না। অপর পক্ষে, কার্যকারণসম্বন্ধের আনু-পূর্বিকতার অন্তর্নিহিত স্বতোবিরোধ নিরসন করতে আমরা এক কালাতীত তত্ত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হই; এর দ্বারা বেশ প্রমাণিত হয় যে আনুপূর্বিকতার সঙ্গে শাশ্বত বস্তুর কোনো অন্তর্বিরোধ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই।

পরিবর্তনে বিশ্বাস করলে শাশ্বত তত্ত্বে বিশ্বাস করা যায় না, এই ধারণাই ভ্রমাত্মক। শাশ্বত তত্ত্ব থাকতে বাধ্য ও এখন দেখছি থাকা সম্ভব। সুতরাং শাশ্বত তত্ত্ব আছে। পরমার্থের বস্তুত্ব সংশয়াতীত।

এই অধ্যায় শেষ করবার আগে দেশের প্রকৃতি সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা দরকার। দেশের ধারণার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে আমাদের পক্ষে বলা অসম্ভব। এবং জড় জগৎকে আমরা কিভাবে দেখব সে আলোচনা বর্তমানের জন্য স্থগিত রাখা হোক। আমাদের এখনকার প্রশ্ন এই যে, দেশের বা স্থলের অস্তিত্বের সঙ্গে পরমতত্ত্বের বাস্তবতার কোনো বিরোধ আছে কি?

দেশের ধারণা প্রাথমিক কিংবা অপ্রাথমিক এই প্রশ্নের উত্তরের উপর বড়ো বেশি কিছু এসে যায় না। কারণ প্রাথমিকই হোক আর অপ্রাথমিকই হোক দেশের যে আকারে আমরা সবকিছুকে দেখি সেটাকে আমাদের মেনে নিতেই হয়। অপ্রাথমিক বলে প্রমাণিত করতে পারলে আমরা এইটুকু বড়ো জোর বলতে পারতাম যে, উচ্চতর বিকাশের সঙ্গে দেশের আকার বা দেশপ্রত্যক্ষের রীতি অন্যতর ও উচ্চতর এক অনুভূতিতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু এই অনিশ্চিত ভিত্তির উপর কোনো যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত না করাই ভালো। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি যে, দেশের মৌলিক প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে দেশের ধারণাই হল অসংগতিপূর্ণ। দেশগত স্বতোবিরোধ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এক উচ্চতর সত্তা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। দেশের অন্তনির্হিত দ্বন্দ্বের উপশম একমাত্র এমন এক উচ্চতর অনুভবের মধ্যেই সম্ভবপর যেখানে বৈচিত্র্যকে বর্জন করার দরকার হয় না। তবে দেশের আকারের অনুভূতি কি করে অ-দৈশিক উচ্চতর অনুভূতিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে তা অবশ্য আমরা বলতে পারি না; কিন্তু এই রূপান্তর সম্ভবপর এবং এই সম্ভাব্য পরিণতিটা হল নিতান্ত প্রয়োজনও বটে।

উনবিংশ অধ্যায়

ইহা ও আমার

আমরা দেখেছি যে দেশ ও কালের আকারের জন্য পরমতত্ত্বের অখণ্ডব্যক্তিতা বাধিত বা অসিদ্ধ হয় না। তবে দেশ ও কালের চাইতেও কঠিনতর বাধা আছে ; এখনো পর্যন্ত তার মোকাবিলা আমরা করি নি। সেটা হচ্ছে 'ইহা ও আমার' বন্ধনজাত বা সীমাজাত সমস্যা। 'ইহা ও আমার' অনুভব স্বীকার না করে উপায়ান্তর নেই ; অথচ কোনো মতবাদ দিয়েই এগুলোর ব্যাখ্যা করা যায় না।

'ইহা ও আমার' অনুভব বলতে আমরা প্রকারান্তরে অনুভূতির সাক্ষাৎ-রূপের কথাই উল্লেখ করি। এমন কোনো 'আমার' অনুভব পাওয়া কঠিন যার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে 'ইহা'র অনুভব নেই ; এবং এমন কোনো 'ইহা'র অনুভব নেই যা কোনো-না-কোনো ভাবে 'আমার' অনুভবের সঙ্গে অসংযুক্ত। প্রত্যেক ঘটনাই সাক্ষাৎ অনুভবের মধ্যে অনন্যরূপে উদিত হয়। আমাদের বর্তমান প্রশ্ন এ নয় যে, আমরা 'ইহা ও আমার' সংকীর্ণ গণ্ডী কি করে অতিক্রম করতে সমর্থ হই ? সেই বিষয়ে একবিংশতি অধ্যায়ে আলোচনা করা যাবে। আমরা এখন এই মেনে নিচ্ছি যে অসংখ্য 'ইহা আমার' অনুভব আছে এবং বর্তমান প্রশ্ন হচ্ছে, এই অসংখ্য 'ইহা আমার' অনুভবের সঙ্গে পরমতত্ত্বের সামঞ্জস্য সম্ভব কি না ?

'ইহা ও আমার' অনুভবের দুই দিক আছে : ১. অস্তিত্বের দিক ও ২. অনস্তিত্বের দিক। প্রথমে অস্তিমূলক রূপের দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক। 'ইহা ও আমার' বিশেষণ দিয়ে আমরা সসীম জীবের সাক্ষাৎ অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ নির্দেশ করে থাকি। অনুভব বলতে সর্ববিধ প্রাক্‌সম্বন্ধ অনুভব এবং যে কোনো অপরোক্ষ অনুভব এই দুই প্রকার অনুভবকেই বোঝাতে পারে। যখনই আমরা কোনো কিছু করি কিংবা হই কিংবা কিছু আমরা ভোগ করি তখনই চেতনা এক অখণ্ড অবস্থার রূপ ধারণ করে। এই-সব অবস্থায় আমাদের অনুভব হয় নিরংশ ও সম্পূর্ণ। যা কিছু সেই মুহূর্তে অনুভূত হয়, যাবতীয় সম্বন্ধ ও পার্থক্য ও ভাবগত বিষয় আমাদের তাৎকালিক অনুভবের মধ্যে নিহিত থাকে ; কিন্তু সেগুলোর

কোনো স্বতন্ত্র অনুভব হয় না; সেগুলো সব সেই মুহূর্তের অনুভবগত বস্তুর বিশেষণরূপে প্রত্যক্ষ হয়। তা ছাড়া এই অখণ্ড অনুভূতির বিশেষ বিশেষ যে অংশের প্রতি তখন মনোনিবেশ করা যায়, সেই অংশই অখণ্ডরূপে প্রতীয়মান হয়।

এইভাবে যা কিছু প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয় তাইই যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভবটা কল্পিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত 'ইহা ও আমার' রূপ ধারণ করে থাকে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রত্যক্ষের মধ্যে আমরা বাস্তবতার একটা আত্যন্তিক বোধ বা অনুভূতি পাই। অনেকে হয়তো বলবেন যে, কি করে 'ইহা আমার' বোধ অতিক্রম করা সম্ভবপর হয় তা ন্যায়শাস্ত্র বুঝতে পারে না, এবং তাঁরা আরো বলবেন যে 'ইহা আমার' বহুত্বও অসম্ভব। কিন্তু আমরা এখনকার জন্য ধরে নিয়েছি যে একের অধিক 'ইহা আমার' আছে। 'ইহার' বোধই বস্তুর সম্বন্ধে একমাত্র স্পষ্ট বোধ। এই বোধে কোনো মিথ্যাত্ব বা ভ্রম নেই। কারণ সর্ববিধ জ্ঞানের উৎপত্তিস্থল হল 'ইহা'। আমাদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার একমাত্র দ্বার হচ্ছে 'ইহা' এবং বিশ্বের প্রত্যেক উপাদানকে সৎ বলে স্বীকৃত হবার জন্য 'ইহা' রূপে প্রথমে প্রতিভাত হতে হয়। 'ইহা'র মধ্যে পরমতত্ত্বের স্বভাব খানিকটা আছে; তা ছাড়া 'ইহা'র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও কিছু আছে। 'ইহা' আমাদের পক্ষে যত বাস্তব, তত বাস্তব অন্য আর কিছুই নয়।

যে সত্তার সঙ্গে ধর্ম নিঃশেষে এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকে তার নাম নিত্যবস্তু। 'ইহা'র বোধে আমরা পরমবস্তুর এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার ছায়া দেখতে পাই। নিত্য বস্তু এবং 'ইহা', দুটোই স্বপ্রকাশ বা সাক্ষাৎ উপলব্ধ। পারমার্থিক সত্তা স্বপ্রকাশ, যেহেতু পরমার্থ সমস্ত সম্বন্ধ ও পার্থক্যের ঊর্ধ্বে থেকে সেগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। ইহা স্বপ্রকাশ যেহেতু তার মধ্যে প্রভেদ পরিস্ফুট নয়। 'ইহা'র উপাদানগুলো হল সংযুক্তমাত্র, সেগুলো সম্বদ্ধ নয়। প্রত্যেক 'ইহা'র মধ্যে একটা অখণ্ড ঐক্য আছে তবে 'ইহা'র ঐক্যের মধ্যে অস্থৈর্য আছে, সেইজন্য 'ইহা' স্বভাবতই নিজেকে অতিক্রম করতে চায়। সর্ববিধ ব্যক্তিগত ও অনন্য সত্তাবোধের ভিত্তিই হল এই 'ইহা'র বোধ। প্রশ্ন ওঠে এই, 'ইহা'র বোধ পরমতত্ত্বের সঙ্গে কতদূর সংগতিপূর্ণ।

প্রত্যেক 'ইহা' থেকেই আমরা এক বিশেষ উপাত্তের অনুভূতি লাভ করি ; একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একক বিষয়ের অনুভূতিই হল 'ইহা'র অনুভূতি। এই অনুভূতির মধ্যে আমরা যা পাই তা নিঃসন্দেহে অস্ত্যর্থক। এই দিক থেকে দেখলে 'ইহা'র সঙ্গে পরমতত্ত্বের কোনো সংঘর্ষ বা অসংগতি হবার হেতু নেই।

তবে অনুভব আমাদের কাছে কেন ১. সসীম 'ইহা' রূপে ও ২. বিভিন্ন ও বহু সসীম জীবের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে উদিত হয় তা অজ্ঞেয়। কিন্তু আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, যে বিভিন্ন ও বহু জীবের কাছে বিভিন্ন রূপে বিশ্ব আবির্ভূত হয়। এবং আমরা মেনে নিতে পারি যে অনুভবের বৈচিত্র্য ও নানাত্ব পরমতত্ত্বকে সমৃদ্ধতর করে। তবে বিভিন্ন সসীম জীবের অনুভবের বিচিত্রতা কিভাবে পরমতত্ত্বের মধ্যে রূপান্তরিত হয় তা আমরা জানি না। আমাদের যুক্তি-অনুসারে বহুজীব এক পরমতত্ত্বের মধ্যে স্থান পেতে বাধ্য এবং আমরা দেখেছি যে তাদের স্থান পাওয়া অসম্ভব নয়। এক হল বহুর ঊর্ধ্বে এবং বহুর দ্বারা বিশিষ্ট।

পরমতত্ত্ব শুধু ভাবের বিন্যাস বা শৃঙ্খলা নয়। শুধু বুদ্ধিগত ভাবের সংমিশ্রণে আমরা এমন কিছু পেতে পারি না যা 'ইহা'র সমতুল্য। পরমতত্ত্ব শুধু বুদ্ধিগত বা উপপত্তিবিষয়ক সাধারণ ভাবের সমষ্টি নয়। পরমতত্ত্ব হল একটা সমগ্র অনুভব ; তার মধ্যে বোধি, বেদনা ও এষণা সব ওতপ্রোতভাবে মিলে এক সরস সৎবস্তু গঠিত হয়েছে। পরমতত্ত্বের স্বরূপ হল এই। সুতরাং তার সঙ্গে 'ইহা'র বিরোধ কোথায় ? বিভিন্ন সসীম জীবের বিচিত্র অনুভব-রাশি পরমতত্ত্বের মধ্যে বিলীন হয় এই সিদ্ধান্তে কিছু অসম্ভবতা নেই। বরঞ্চ এই বিলয়প্রাপ্তির ব্যাপার অতি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়। সুতরাং পরম সার্থকতা শুধু কাহিনী নয় ; পরম সার্থকতা হল অত্যন্ত বাস্তব জিনিস।

এবার জিজ্ঞাসা যে 'ইহা ও আমার' মধ্যে যে বিরোধিতার বা নাস্ত্যর্থক দিক আছে সেই দিকের সঙ্গে কি পরমতত্ত্বের সামঞ্জস্য সম্ভবপর ? অর্থাৎ বহু কি বহুরূপেই পরমতত্ত্বের মধ্যে স্থান পেতে পারে ? প্রত্যেক জীবের যে অনন্যতা 'ইহা ও আমার' মধ্যে পরিস্ফুট বা প্রকাশিত, সেই অনন্যতা স্বীকার করলে পরমতত্ত্বের একত্ব স্বীকার করা যায় কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলা চলে যে কোনো এক সসীম জীবের ভিন্নতা বা

অনন্যতা যদি অন্য এক সসীম জীবের সঙ্গে বিরুদ্ধতার ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকে তা হলে বৃহত্তর ও অসীম পরমতত্ত্বের মধ্যে তাদের উভয়ের বিরোধ থাকবার কথা নয়। কারণ এই ভিন্নতা হল আপেক্ষিক।

সুতরাং 'ইহা'কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'ইহা'র অন্তর্গত অস্তিসূচক উপাদানটা কোনো কিছুর বিরুদ্ধতা করে না; 'ইহা' এই দিক থেকে হল একবিধ সার্থক অনুভবমাত্র। কিন্তু যখন 'ইহা'র সঙ্গে 'উহা'র তুলনা করা হয় তখন বিরোধ উপস্থিত হয়। এই হচ্ছে 'ইহা'র অন্য দিক। পূর্ববর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, বিরুদ্ধতার সম্বন্ধ একটা বৃহত্তর ঐক্যের ক্ষেত্রের মধ্যেই সম্ভব, অন্যত্র নয়। 'ইহা' নিজেকে অতিক্রম না করে 'উহা'র বিরুদ্ধতা করতে পারে না। সম্পূর্ণ আত্মনিহিত ও অসম্বদ্ধ 'ইহা'র পক্ষে 'উহা'র বিরুদ্ধতা করা অসম্ভব। যখন উভয়েই এক বৃহত্তর তত্ত্বের অধীনস্থ, তখনই কেবল বিরোধ সম্ভবপর। সোজা কথায়, 'ইহা' যে 'উহা' নয় এই অবধারণের জন্যও 'ইহা'কে স্বস্থান পরিত্যাগ করে বাইরে যেতে হয়। বিরোধী বহু 'ইহা'র পরমতত্ত্বে মিলনের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল এই আত্মঅতিক্রমপ্রবণতা।

'অনন্য' বলে যদি 'ইহা'কে সর্বগামী এক সত্তা রূপে ধারণা করা হয় তা হলে এই বিষয়ের বেশি আলোচনা দরকার নেই। 'অনন্য' শব্দের অর্থ যদি করা হয় এই যে কেবল 'ইহা— আমার' ব্যতীত অন্য কিছুই সত্য নয় তা হলে সেই বিষয়ে একবিংশতি অধ্যায়ে আলোচনা করা যাবে। এবং 'অনন্য' বলতে যদি এই ধারণা করা হয় যে, যা একবার অনুভূত হয়েছে তা আর দ্বিতীয়বার অনুভূত হবে না, সেইরকম ধারণাকে মোটামুটি সমর্থন করা যায় না; সেই প্রকার অনন্যতা বিশ্বে নেই। তবে বিশেষ ক্ষেত্র বা ধারার অন্তর্গত অবস্থানের জন্য একপ্রকার অনন্যতা আসতে পারে। এইরকম অনন্যতার সঙ্গে পরমতত্ত্বের ঐক্যের কোনো বিরোধ নেই। ক্ষেত্র বা ধারার নানাত্ব যে বিরোধাত্মক সম্বন্ধের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার থেকেই বৃহত্তর ঐক্য প্রমাণিত ও সমর্থিত হয়।

সসীম জীবের আত্মভরিতাও পরমতত্ত্বের পূর্ণতার পরিপোষক। আত্মভরিতার ফলে সসীম জীব পরমতত্ত্বের বিরুদ্ধতা করতে চায়। কিন্তু বিরুদ্ধতা বা বিদ্রোহের আগুনও সসীম জীব পরমতত্ত্বের কাছ থেকে ধার করে পায়। এ বিষয়ে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা যাবে।

মোটামুটি ফল দাঁড়াচ্ছে এরকম : প্রথমে মনে হল 'ইহা' বুঝি সর্ব-বিরোধী ; দেখা গেল 'ইহা'র বিরোধ আপেক্ষিক। তার পরে দেখা গেল, 'ইহা'র অন্তর্গত অস্তিসূচক অংশ কোনো কিছুর বিরোধী নয়। 'ইহা'র মধ্যে অসংগতি আছে, কিন্তু যখনই 'ইহা'র ভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তখনই বৃহত্তর ঐক্যর পরিবেশের মধ্যে তাকে গ্রহণ করতে হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে, 'ইহা'র মধ্যে এমন কিছু বিপরীত গুণ আছে, যার জন্য পরমতত্ত্বের বৃহৎ ঐক্যের সঙ্গে 'ইহা'র সামঞ্জস্য হতে পারে না। এর উত্তরে আমরা বলব যে আমরা যত চেষ্টা করি না কেন এমন কোনো অনুভব বা সংবেদন আমাদের জানা নেই যা কেবল 'আমার' ; এবং 'ইহা'র অনুভবের সম্বন্ধে আমরা যখনই কোনো উক্তি করতে যাই বা বাক্য ব্যবহার করতে যাই তখনই অনুভূতির অখণ্ডতাকে অতিক্রম করে সাধারণ ও সামান্য ভাব প্রয়োগ করতে আমরা বাধ্য হই। আমাদের এমন কোনো অনুভব নেই যা চার দেওয়ালের মধ্যে চিরকালের জন্য বন্দী এবং যার সঙ্গে অন্য পদার্থের কোনো সম্বন্ধ অসম্ভব। সুতরাং 'ইহা—আমার' অনুভবের মধ্যে কোনো অনমনীয় বা অদ্রবনীয় বৈশিষ্ট্য নেই কোনো প্রমাণ নেই যে 'ইহা আমার' পরমতত্ত্বের ঐক্য খণ্ডিত করে।

বিংশ অধ্যায়

সার-সংকলন

এ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি তার সারনির্ণয় করা এখন দরকার। বিশ্বকে সাধারণত যে-সব আকারে আমরা দেখি সেগুলোর বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট হয়েছে যে সেগুলো নিতান্তই অসংগতিপূর্ণ। এইজন্য আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে এইসব আকার ও প্রকারের কোনো বাস্তবিক সত্তা নেই। কিন্তু আরো গভীর ভাবে চিন্তা করলে আমাদের এই মনে হয়, এই-সব আকার ও প্রকারের সত্যতা আমরা যখন অস্বীকার করছি তখন নিশ্চয়ই সত্য ও পরমার্থ সম্বন্ধে আমাদের একটা স্পষ্ট ও অস্ত্যর্থক ধারণা বা জ্ঞান আছে। সেই জ্ঞান কি? যার মধ্যে

কোনো অসংগতি নেই এবং যা অবভাসমাত্র নয় এবং যার মধ্যে সর্ববিধ বৈচিত্র্যের সমন্বয় ও সর্বপ্রকার আপাতদৃশ্য বিরোধ ও সংঘর্ষের রূপান্তর বা বিলোপ ঘটতে বাধ্য ও ঘটা সম্ভব তাকে পরমতত্ত্ব বলা চলে। পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ অনুভব-স্বরূপ ; এই অনুভবের উপাদান শুধু জ্ঞান বা শুধু ইচ্ছা নয় ; পরমচৈতন্যের মধ্যে দুঃখবোধের চাইতে সুখবোধ অধিকতর। পরমসত্তা হল চিন্ময়, সুখী ও সর্বতোভাবে পূর্ণ।

বিভিন্ন প্রকারের সসীমত্ব পরমতত্ত্বের মধ্যে কিভাবে গৃহীত হতে পারে সেই সম্বন্ধেও আমরা বিচার করেছি। আমরা জেনেছি যে বিশ্বের সমস্ত প্রকার অবভাসের অন্তর্গত অসংগতি শেষ পর্যন্ত দূরীভূত হয় এবং সেগুলো পরমতত্ত্বে সম্মিলিত হয়। কিন্তু কিভাবে এই রূপান্তর ঘটে তা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। মানুষী বুদ্ধির পক্ষে এই মহাবিন্যাসের সম্পূর্ণ ধারণা করা অসম্ভব। তবে আমরা বুঝেছি যে এই পুনর্বিন্যাস অবশ্যম্ভাবী। আমরা আরো অনুসন্ধান করেছি যে এমন কোনো সসীম অবভাসের দৃষ্টান্ত আছে কি না যা পরমতত্ত্বকে বাধিত করে, অর্থাৎ এমন কোনো প্রতীয়মান সত্তা আছে কি না যার সঙ্গে পরমার্থের সমন্বয় অসম্ভব। আমরা দেখেছি সেইরকম কোনো দৃষ্টান্ত নেই। সুতরাং পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সংশয় করবার কোনো অধিকার নেই। পরমতত্ত্বের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করবার সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই এবং পরমতত্ত্ব আমাদের একান্ত প্রয়োজন সুতরাং পরমতত্ত্ব বাস্তব ; আমাদের যুক্তির সারকথা হল এই।

এই সম্পর্কে দেখে নেওয়া দরকার যে পরমতত্ত্বের বাস্তবতা বা নিত্যতা ও পূর্ণতা কি নেতিমূলক মাত্র, না সেগুলো অস্তিসূচক। কেউ কেউ বলেন যে অনস্তিত্ব নিত্যতা মানে শুদ্ধ অপ্রকাশ বা অনবভাস এবং পূর্ণতা মানে দুঃখ ও অসাম্যের অভাব এবং ঐক্য মানে বহুত্বের অভাব। কিন্তু শুদ্ধ অভাব হল অর্থহীন। কোনো এক ভাবের অনস্তিত্ব স্বীকার করার মানেই অন্য এক ভাবে অস্তিত্ব স্বীকার করা।

অস্ত্যর্থক প্রত্যয় ব্যতীত অনস্ত্যর্থক উক্তি করা যায় না। তা ছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে, যে-সব নেতিমূলক বর্ণনার উল্লেখ আমরা করেছি সেগুলোকেও কোনো-না-কোনো অর্থে পরমতত্ত্বের প্রতি আরোপ করতে আমরা বাধ্য। সেগুলোকেও পরমবস্তুর বিশেষণরূপে স্বীকার করতে হয়।

পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও স্পষ্ট করা হয়েছে। অনেক সময় পূর্ণতার মধ্যে পরিমাণের ধারণা আনা হয়। নিরতিশয় বা বৃহত্তম হল পূর্ণ। এরকম একটা ভুল ধারণা আমরা অনেক সময় করি। পূর্ণ হচ্ছে সুষম; সেইজন্য কেবল কলেবর বা আয়তনবৃদ্ধির জন্য কিংবা কেবল পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্য পূর্ণতার বৃদ্ধি হয় না। আয়তনে ক্ষুদ্রতম সত্তাও আয়তনে বৃহত্তম সত্তার সমান পূর্ণ হতে পারে। পূর্ণতার অবয়বের ধারণা হচ্ছে একপ্রকার কুসংস্কারের কুফল। আমরা প্রথমে এক পূর্ণসত্তার কল্পনা করি। তার পর তার পাশে আর একটা বৃহত্তর পূর্ণতার ছবি কল্পনা করি এবং এই বিকৃত কল্পনার প্রভাবে আমাদের অজ্ঞাতসারেই বৃহত্তর পূর্ণতার তুলনায় পূর্ণ সত্তাটি ত্রুটিযুক্ত মনে হয়। আমার মনে রাখি না যে কোনো সত্তার পূর্ণতাকে যদি অপর আর এক সত্তা অতিক্রম করবার সামর্থ্য রাখে তা হলে সেই সত্তা কখনো পূর্ণ হতে পারে না। পূর্ণতার কোনো মাত্রা নেই। এই কারণেই একটা বৃহৎ ও একটা ক্ষুদ্র ছুটো পূর্ণসত্তা হতে পারে না। ছুটো পূর্ণ সত্তা কল্পনা করলে তারা সসীম সত্তায় পরিণত হয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বাহ্যসম্বন্ধ কল্পনা করতে হয় এবং এক পূর্ণসত্তাকে অপর পূর্ণসত্তার অপেক্ষায় থাকতে হয়। সেইরকম অবস্থায় তারা কেউই পূর্ণসত্তা থাকে না। যে সত্তার মধ্যে সব কিছু আছে একমাত্র সেই সমগ্র সত্তাই পূর্ণ হতে পারে। পরমার্থই হল একমাত্র অখণ্ড ও পূর্ণ ব্যক্তি; অন্য আর কিছুই পূর্ণতা ও অখণ্ডব্যক্তিতার অধিকারী হতে পারে না।

একবিংশ অধ্যায়

নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদ

দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত আমরা শুধু অবভাস-তত্ত্বের বা ভান-তত্ত্বের আলোচনা করেছি। তার পর থেকে পরমার্থের স্বরূপ-নির্ণয়ে আমরা প্রচেষ্ট হয়েছি। এর পর আমরা এই আলোচনাই করব যে বিশ্বের প্রধান প্রধান অংশগুলো ও পরমতত্ত্বের মধ্যে কি সম্বন্ধ। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদের আলোচনা করব।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের নিজ নিজ আত্মার বাইরে কোনো সত্তা আছে এ বিশ্বাস করবার কোনো হেতু আছে কি? আমাদের আত্মার বাইরে কোনো সর্বসাধারণ জগৎ আছে বলে যে বিশ্বাস আমরা করি তা মস্তিষ্কের বিকারও তো হতে পারে? এই প্রশ্নের একটা সদুত্তর আমাদের দিতেই হবে। আমাদের সকলকেই এক আত্ম-অনপেক্ষ জগতে বিশ্বাস করতেই হয়; অথচ এই বিশ্বাস যদি ভ্রমাত্মক বলে প্রমাণিত হয় তা হলে কলঙ্কের সীমা থাকবে না।

নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদের যুক্তি এইরকম: স্বকীয় অনুভব ছাড়া অন্য কোনো প্রকার অনুভব নেই, আমি আমার স্বকীয় অনুভব ও অভিজ্ঞতা অতিক্রম করতে পারি না। সুতরাং প্রমাণিত হয় আমার স্বকীয় অনুভব ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছু নেই। যা-কিছু ঘটছে সবই আমার বিজ্ঞান বা সংবিদের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র।

উপর্যুক্ত যুক্তিটা অংশত এক ভ্রমাত্মক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং খানিকটা অস্পষ্টতাদোষে দুষ্ট। অভিজ্ঞতা দুইরকম: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভব হল উপাত্ত দ্বারা সীমিত। প্রত্যক্ষের মধ্যে যা কিছুর সাক্ষাৎ অনুভব বা সংবেদন হয় তার বাইরে আমরা যাই না। পরোক্ষ অভিজ্ঞতা বলতে আমরা বুঝি 'ইহা ও আমার' ভিত্তির ওপর গঠিত বা অনুমিত অন্যান্য যাবতীয় তথ্য। অভিজ্ঞতার এই দুই অর্থের কোনো অর্থেই নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদ সমর্থন করা যায় না।

প্রথমে প্রত্যক্ষ অনুভব বা অভিজ্ঞতার কথা ধরা যাক। আমরা নবম অধ্যায়ের আলোচনায় দেখেছি যে প্রত্যক্ষ অনুভবের মধ্যে আমরা অনাত্মাকে সব সময়েই পাই, অথচ কখনো এমন কোনো স্থিতিশীল আত্মা বা আত্মা-রূপীয় বস্তু পাই না যে বিভিন্ন বিষয়ের বা বিভিন্ন বিজ্ঞানের অবস্থার অধিকারী। এ কথা সাধারণত বলা হয় যে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভব আছে, এবং আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করি যে বিশ্বের যাবতীয় অবভাস বা সমুৎপাদ আত্মার বিশেষণ মাত্র। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সাক্ষাৎ অনুভবে তাৎকালিক অনুভবের সীমা অতিক্রম করে কোনো স্থায়ী সত্তাকে আমরা কখনো পাই না। আমাদের এমন কোনো ইন্দ্রিয় নেই যার সাহায্যে বর্তমান ক্ষণের অনুভবের বাইরে স্থিতিশীল কোনো আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান হওয়া সম্ভব। (দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) সাক্ষাৎ

অনুভবের প্রমাণের ওপর নির্ভর করলে 'ইহা' রূপী ক্ষণিক সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো সত্তা স্বীকার করা চলে না। এই মত বিশ্বাস করলে সর্বাত্মক সংশয়ে জড়িত হয়ে পড়তে হয়। নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদী যে আত্মার বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে, সেই আত্মার অস্তিত্বেরই কোনো প্রমাণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে নেই। বিষয়ী ও বিষয়ের প্রভেদ আমরা উপাত্তরূপে পাই না। সুতরাং সমস্ত বিশ্বের তথ্যকে যে আত্মার বিজ্ঞানমাত্রে পরিণত করা হয় সে আত্মা এক অনুমিত সত্তা। অপরপক্ষে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে বিষয়ী ও বিষয়ের জ্ঞান অনুভবের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা হলেও বিশেষ সুবিধা হয় না। বিষয়ী ও বিষয় স্বীকার করলে দুটো তত্ত্ব স্বীকার করতে হয়; এবং মানতে হয় তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তার দ্বারা মোটেই প্রমাণিত হয় না যে, এই দুটোর মধ্যে একটা হল তত্ত্ববস্তু ও অন্য আর সব-কিছু বিশেষণমাত্র। কারণ উপাত্ত দুটো তত্ত্বকে একটা তত্ত্বে পর্যবসিত করতে হলে অনুভবকে অগ্রাহ্য করে অনুমান ও বিচারের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই ভাবে একার্ধকে পরমতত্ত্ব ও অপরার্ধকে প্রথমার্ধের অবভাস বিচার করেই জড়বাদ ও বিজ্ঞানবাদের উৎপত্তি হয়। কিন্তু জড়বাদ ও বিজ্ঞানবাদ দুটো মতবাদই ভ্রমাত্মক অনুমানের ওপর স্থাপিত। এবং দুই ক্ষেত্রেই অনুমান হল অনুভব দ্বারা অসমর্থিত। এ ছাড়া আরো একটা ব্যাপারের উল্লেখ এখানে করা দরকার। আত্মা ও অনাত্মার মধ্যবর্তী সীমা ক্রমাগত স্থান-পরিবর্তন করে। তাদের মধ্যে কোনো স্থায়ী সীমারেখা নেই। 'আত্মা' কখনো 'অনাত্মা' রূপে উদয় হয়; সেইরকম অনাত্মাও অনেক সময় আত্মারূপে উপস্থিত হয়। সব কিছুই যদি আত্মার বিজ্ঞানমাত্র হত তা হলে আত্মা ও অনাত্মার এই নিরন্তর স্থান-পরিবর্তন অসম্ভব হত। নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদ সত্য হলে আত্মা ও অনাত্মার সীমা সব সময়ই নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত থাকা উচিত।

প্রত্যক্ষ অনুভবের সাক্ষ্যের ওপর দাঁড়াতে হলে 'ইহা ও আমার' স্বীকার করতে হয়। 'ইহা'র বিশেষণ রূপে 'আমার' কিংবা 'আমার' বিশেষণ রূপে 'ইহা'র কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদ সমর্থন করতে হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অনুপাত্ত বস্তুতে বিশ্বাস আমাদের করতে হয়। এইরকম অতিক্রমণ সম্ভব কি না এবং এই

অতিক্রমক্রিয়া নিজসংবিদমাত্রবাদকে সমর্থন করে কি না এই দুটো প্রশ্ন এখন ওঠে। আমাদের উত্তর এই যে, প্রত্যক্ষ অনুভবের বাইরের বস্তুতে বিশ্বাস করা শুধু সম্ভব নয়, একান্ত আবশ্যকও বটে ; এবং যেই অতিক্রম মেনে নিই অমনি আমরা স্বীয় অভিজ্ঞতার গণ্ডীর বাইরে সর্বসাধারণ জগতে উপস্থিত হই। স্বীয় সংবিদের কূপের মধ্যে মণ্ডুক হয়ে আবদ্ধ থাকার কোনো ন্যায়সংগত যুক্তি নেই।

এবার আমাদের আরো দেখতে হবে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চতুঃসীমার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকা সম্ভব কি না। কোনো এক বিশেষ অনুভবের মধ্যে কোন্‌টা উপাত্ত এবং কোন্‌টা উপাত্ত-অতিরিক্ত তা সব সময়ই নির্দিষ্ট করে দেখানো কঠিন। 'ইহা'র অনুভবের মধ্যে কতখানি যে অতীতের অনুভব তাও অনেক সময় সঠিকভাবে বলতে পারা খুব শক্ত। তা ছাড়া বর্তমানের অনুভবের মধ্যে প্রত্যয় বা ভাবের সক্রিয়তাজনিত অংশটুকুকে বিয়োগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি এই-সব ব্যাপারকে নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে প্রয়োগ করতে চাই না। আমি শুধু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের প্রভেদটার ওপর জোর দিতে চাচ্ছি। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাইরে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নয় এমন কোনো বস্তুর সত্তা কি স্বীকার করা যায় না ? মানুষের পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব নয় কি যে, সে এই মুহূর্তে যা অনুভব করছে তদতিরিক্ত আরো বস্তু বা সত্তা আছে ? এবং বর্তমানের প্রত্যক্ষ অনুভবের মধ্যে উপাত্ত বা প্রাপ্ত সত্তাই কি একমাত্র সত্তা ?

আমরা দেখেছি যে বর্তমান মুহূর্তের 'ইহা'র অনুভবের সীমার মধ্যে সত্তাকে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। অনুভব-দ্বারা প্রাপ্ত 'তৎ' স্বতঃই তার সীমার বহিঃস্থিত 'কিম্'-এর আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে 'ইহা' থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়ার দিকে। সেইজন্য কেবল 'ইহা'র অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা বৃথা। কেবল 'ইহা'র মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা সম্ভবও নয় এবং সমর্থনীয়ও নয়। (পঞ্চদশ ও উনবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

আপত্তি তোলা যেতে পারে যে মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 'ইহা'কে অতিক্রম করার দিকে হলেও যে 'ইহা'কে আশ্রয় করে আরোপ-ক্রিয়া আরম্ভ হয় সেই 'ইহা' আমার অনুভবে উপাত্ত 'ইহা' ব্যতীত অন্য কোনো অতিরিক্ত বিষয় নয়। সত্তাকে (ইহা) ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমার

বর্তমান অনুভবের মধ্যেই পাই; অন্যত্র নয়। এই আপত্তির সারবত্তা আমি স্বীকার করি, এই অর্থে যে সত্তাকে জানবার পথ হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পথ। কিন্তু এর বেশি যদি বলা হয় এই যুক্তির পক্ষে তা আমি স্বীকার করতে অক্ষম। যদি এই কথা বলা হয় যে অনুভবে যা পাওয়া যায় তা কেবল আমার অনুভব ব্যতীত আর কিছুই নয়, এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। 'আমার' অনুভব ও আমার অনুভবের চেয়ে বৃহত্তর অনুভবের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব নেই। 'আমার' অনুভব ছাড়া আরো এক বৃহত্তর অনুভব বা বিজ্ঞান থাকতে পারে; বৃহত্তর অনুভবের মধ্যে আমার স্বকীয় অনুভব এবং আরো অনেক কিছু নির্বিঘ্নে থাকতে পারে। আমরা দেখেছি যে পরমতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত হল এক সমন্বয়ী ও সর্বগ্রাহী সাক্ষাৎ অনুভবের মালা বা সূত্র। এই পরমতত্ত্ব 'আমার' অনুভবের মধ্যে ধরা পড়ে ও সেইজন্য আমার অনুভব এবং বিশ্ব একার্থবাচক বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিশ্বকে অস্বীকার করে আমরা যে ভুল করে বসি নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদের সেইটাই হল মৌলিক ভুল। আমার প্রত্যক্ষ অনুভব হচ্ছে বিশ্বাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভবের অংশ মাত্র। সুতরাং 'আমার' অনুভবের অতিরিক্ত বৃহত্তর বিজ্ঞান আছে। প্রত্যেক সসীম জীবের 'আমার' অনুভব হচ্ছে পরমতত্ত্বের সর্বসমন্বয়ী 'আমার' অনুভবের অবিচ্ছেদ্য খণ্ডবিশেষ।

তবে দেখতে হয় 'ইহা'র মধ্যে এমন বেয়াড়া কোনো কিছু আছে কি না যা পরমাত্মার বৃহত্তর অনুভব কর্তৃক একেবারেই গৃহীত হতে পারে না। আমরা ঊনবিংশ অধ্যায়ের আলোচনায় দেখেছি সেরকম একান্ত অগ্রহিতব্য কোনো তথ্য নেই। 'ইহা'র পরিধিকে বিস্তৃত করে সেই পরম চৈতন্যের অভিজ্ঞতা লাভ করবার অসামর্থ্য হচ্ছে আমার অপূর্ণতার ও সসীমতার লক্ষণ। যেহেতু জানালা ভেঙে ফেলে পরমসত্তাকে মুখোমুখি সমগ্রভাবে দেখবার সামর্থ্য আমার নেই, সেইহেতু জানালার মধ্য দিয়ে দেখাই সব, এরকম ধারণা অযৌক্তিক। মুহূর্তের গবাক্ষ দিয়েই যাকে অনুভব করি তাই আমাদের পাওয়া একমাত্র পরমার্থ। কিন্তু তাই বলে এ ধারণা ভুল যে মুহূর্তের অনুভবের মধ্যে যে সত্তাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তার অধিক বা অতিরিক্ত পরমসত্তা নেই কিংবা মুহূর্তের অনুভবের মধ্যে প্রাপ্ত বা উপাত্ত সত্তাটুকুই হল পরমসত্তার সব।

এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে অভিজ্ঞতা বলতে যদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মনে করা হয় এই প্রকার অভিজ্ঞতা দ্বারা আমার আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আমরা আরো দেখেছি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করেও বস্তুর সত্তা আমরা নিরন্তর স্বীকার করে থাকি। নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদী বলবে যে প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে আমি আমার আত্মাকে স্বীকার করতে পারি, তার বেশি নয় এবং একক নিজ-আত্মা ব্যতীত অন্যান্য বহু আত্মা স্বীকার করবার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। এই উক্তির প্রতিবাদে আমরা বলব এক আত্মা যদি সিদ্ধ হয় বহু আত্মাও তা হলে সিদ্ধ।

তত্ত্ববিদ্যায় ভাবের উৎপত্তির আলোচনা করবার প্রত্যক্ষ কোনো সার্থকতা নেই। তত্ত্ববিদ্যায় শুধু ভাবগুলোর সত্যতা কিংবা অসত্যতা নির্ণয় করা হয়। আমার আত্মা ছাড়া আরো বহু ও বিভিন্ন আত্মা আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাসের স্বপক্ষে যুক্তি হল এই : আমার নিজের দেহ আমার চেতনার মধ্যে একটা পৃথক অনুভব-সমষ্টিরূপে অবস্থান করে ; কিন্তু এই সমষ্টিটার সঙ্গে সুখ, দুঃখ, সংবেদনা ও এষণা যেরূপ সাক্ষাৎভাবে ও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে অন্য কোনো সমষ্টির সঙ্গে সেরূপ সম্পর্ক নেই ; আমার শরীরের সদৃশ অন্যান্য অনেক সমষ্টি আছে ; সেই-সব সমষ্টির সঙ্গেও সুখ দুঃখ ইত্যাদির বোধ এই একই ভাবে জড়িত থাকতে বাধ্য ; আমার অনুভূতি ও এষণার সঙ্গে সেই সমষ্টিগুলোর কোনো সাক্ষাৎ বা ঘনিষ্ঠ সংযোগ নেই ; বরঞ্চ আমার অনুভূতি ও ইচ্ছা এই-সব সমষ্টির পক্ষে প্রায়শই অবান্তর ও নিরর্থক এবং কখনো কখনো সেগুলোর প্রতিকূল বা পরিপন্থী; তা ছাড়া এই-সব সমষ্টির নিজেদের মধ্যে ও আমার দেহরূপী সমষ্টির সঙ্গে বিরোধ আছে ; সুতরাং এই-সব মৎ-সদৃশ দেহসমষ্টির সঙ্গে পৃথক পৃথক মৎ-সদৃশ আত্মা আছে। এই যুক্তি নির্দোষ নয় এইজন্য যে, বিভিন্ন দেহের মধ্যে সাদৃশ্য কখনো সম্পূর্ণ নয় এবং বিভিন্ন দেহের মধ্যে সাদৃশ্য যদি সম্পূর্ণও হয় তা হলেও পৃথক পৃথক দেহের সঙ্গে সংযুক্ত পৃথক পৃথক আত্মা যে আমার আত্মার সদৃশ হবে এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে যুক্তিটা কার্যত সিদ্ধ।

ওপরে যে প্রকার যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, সেই প্রকার যুক্তির বলেই নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে প্রমাণ করতে হয়। নিজবিজ্ঞানমাত্র-বাদীরা বহু ও বিভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের সময় এই প্রকার অনুমান

ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করে ; কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব প্রমাণের সময় তারা যে অনুমানের আশ্রয় নেয় তার স্বরূপও এই একই প্রকার। আমার অতীত 'অহং' ও বর্তমান 'অহং'-এর মধ্যে যতখানি ভেদ, আমার 'অহং' ও অন্য এক ব্যক্তির 'অহং'-এর মধ্যেও ততখানি ভেদ। আমার বর্তমান 'অহং' ও অতীত 'অহং' এই দুই 'অহং' কালের ব্যবধানের জন্য সম্পূর্ণ সদৃশ বা সম বা এক, কখনোই হতে পারে না। তা ছাড়া আমার বর্তমান 'অহং' ও অতীত 'অহং'-এর মধ্যে গুণগত পার্থক্য অনেক সময় এত অধিক হয় যে অতীত 'অহং' বর্তমান 'অহং'-এর ঘৃণা ও উপেক্ষার বিষয় হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় অনুমানের বলে অতীত 'অহং'কে স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে অতীত আত্মা এক যন্ত্রণাদায়ক ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং দোষহীন অভিন্নতা ব্যতিরেকেও অনুমান করা হয়। নিশ্চয় প্রমাণ সম্ভব নয় বলে কার্যকরী প্রমাণের জোরেই অতীত 'অহং'কে বা অহং-পদার্থকে আমি মেনে নেই। তাই যদি হয়, কার্যকরী প্রমাণের ভিত্তিতেই মৎ-ভিন্ন অন্য ও বহু আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করাও গর্হিত বিবেচনা করা যায় না। দুই ক্ষেত্রেই অস্তিত্ব হচ্ছে অনুমিত অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রেই অস্তিত্বটা আমাদের বুদ্ধির রচনা-বিশেষ। এবং দুই ক্ষেত্রেই এইরূপ তথ্যের বেলায় অনুমানের পক্ষে যতখানি নির্দোষ ও নিশ্চিত হওয়া সম্ভবপর সেটা ততখানিই নির্দোষ ও নিশ্চিত। হয় এক ক্ষণের নির্বাক অনুভবই সব ; নতুবা আমিও সত্য এবং আমার অতিরিক্ত জগৎ ও অন্যান্য জীবও সত্য। যে ভাবেই দেখা যাক না কেন নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদ অসিদ্ধ।

স্মৃতিও একপ্রকার অনুমানবিশেষ ; সেইজন্য স্মৃতি অভ্রান্ত নয়। সুতরাং স্মৃতিগত সত্তাকে অনুমিত সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু মনে করা অসংগত। আমাদের 'ব্যক্তিত্ব' বা অস্মিতা কোনো মৌলিক সত্তা নয় ; এটা একটা কৃত্রিম সৃষ্টি ; সংবেশন বা কৃত্রিম-নিদ্রার অবস্থায় অভিভাব দ্বারা স্বাভাবিক অস্মিতার পরিবর্তন করে অন্যবিধ অস্মিতার সৃষ্টি সম্ভবপর, এই তথ্যই হল তার প্রমাণ।

এই পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে প্রত্যক্ষ অনুভব বা অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য স্বীকার করলে নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদ প্রমাণিত হয় না। এও দেখলাম যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করেও এই মতের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। কারণ স্বকীয় আত্মা স্বীকার করলে একই যুক্তির বলে অন্য আত্মাও

স্বীকার করতে হয়। এবং অন্য আত্মার অস্তিত্ব যদি স্বীকার নাই করা হয় তবুও অনাত্মাকে অস্বীকার করা যায় না। প্রাথমিক ও অখণ্ড অনুভবের একাংশকে বিয়োজিত করে অনাত্মারূপে সংকল্পিত করার সঙ্গে অপরাংশ আত্মা বা অহং রূপে কল্পিত বা উদিত হয়। এই অবস্থায় আত্মার পক্ষে অনাত্মাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। অনাত্মা ব্যতিরেকে আত্মা নেই।

এই প্রসঙ্গে আর একটা ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। কেউ হয়তো বলবেন যে যা-কিছু আমি অনুভব করি, সবই আমার মনের ব্যাপার সুতরাং আমি আমার মনের অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই জানতে পারি না। এ কথা সত্য যে, যে-অনুভবের মধ্যেই আমি কিছু পাই, সেই অনুভবই আমার মনের একটা অবস্থাবিশেষ বা ক্রিয়াবিশেষ ; এমন-কি পরমতত্ত্বকে পেতে হলেও আমার মনের ক্রিয়া বা অবস্থার মধ্যে দিয়ে পেতে হয়। কিন্তু এই তথ্য-দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, অনুভবের মধ্যে অবভাসিত বা সমুৎপন্ন বস্তুটার কোনো অতিরিক্ত সত্তা নেই। অভিজ্ঞতা বা অনুভব আমার ; তাই বলে অনুভবকে আমার মনের অবস্থামাত্র বিবেচনা করা যুক্তিসংগত নয়। এইরকম ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি হল একপ্রকার দুষ্ট কল্পনা। বস্তুত সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ; তথাপি আত্মাকে বিশ্বের বাইরে এক বিচ্যুত, স্বতন্ত্র ও অযুক্ত সত্তারূপে কল্পনা করাই হচ্ছে সেই দুষ্ট কল্পনা। কল্পনার এই বিকৃতির শোধন করতে পারলেই নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদ-ব্যাধির অবসান হয়।

এই অধ্যায় শেষ করবার আগে নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদের অন্তর্নিহিত সত্যগুলোর দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই মতবাদের মধ্যে তিনটে সত্য পরিস্ফুট হয়েছে : ১. আমার অভিজ্ঞতা বা অনুভব ও সমগ্র বিশ্ব এক নয়, তবুও একথা সত্য যে বিশ্ব আমার মনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে অবভাসিত হয়। ২. একমাত্র 'ইহা'র সাক্ষাৎ অনুভবের ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথেই আমরা বিশ্বকে জানতে পারি। এই পথে সত্তার যে তপ্ত স্বাদ আমরা পাই তার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র বৃহত্তর জগৎ। ব্যক্তিগত অনুভব ও সংবেদনই হল সর্ববিধ জ্ঞানের উৎস বা উৎপত্তিস্থল। ৩. যদিও আমার আত্মা নিঃসন্দেহে পরমাত্মা নয় ; তবুও স্বীয় অনুভবরাশির সাহায্যেই পরমার্থের স্বরূপ আমি জানতে পারি।

প্রকৃতি

'প্রকৃতি' শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'প্রকৃতি' শব্দ আমি জড়-জগতের অর্থে ব্যবহার করব। এই জগৎ জড়বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। সমস্ত রকম সত্তা থেকে চৈতন্যের অংশ কেটে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই প্রকৃতি। ব্যাপ্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুণাবলী আমাদের বর্ণিত প্রকৃতির ধর্ম। আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে একদা এই প্রকৃতির জগতের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ব্যাপ্তির বোধের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা না করেও আমরা স্বীকার করতে পারি যে চৈতন্য থেকে এই জগৎ যে পৃথক এই বোধ প্রথম থেকেই থাকে না। জড়জগতের অস্তিত্ব যে ভাবেই কল্পনা করা যাক তা যে আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই সমগ্র বিশ্বের এক নির্বাচিত বা কল্পিত অংশ সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কতিপয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমগ্রের মধ্যে আমরা প্রধানগুণ-বিশিষ্ট ও অপ্রধানগুণ-বিশিষ্ট এবং চৈতন্যবহির্ভূত এক জড়জগতের মূর্তি ধারণা করি। এই জগৎ কারো সুখদুঃখ বা চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত নয়; সকলের জন্যই যেন তা একরকম; এই জড়জগত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার একমাত্র উপায় বা যন্ত্র হল আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি। সমস্ত জীবের অবর্তমানেও জড়জগৎ একই রকম থাকে। এই হল জড়জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণার রূপ। সাধারণ মানুষকে যদি বলি প্রকৃতি সম্বন্ধীয় এই ধারণা হল অর্থহীন 'হযবরল'র সমান, সে বলবে আমি কাণ্ডজ্ঞানহীন।

তার পর চিন্তাশীল মানুষ যখন প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করতে প্রবৃত্ত হয় তখন তার সাধারণ, সহজ ও স্বাভাবিক বিশ্বাস আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও সংশয় ও সন্দেহ তাকে বিচলিত করে। কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে সে চলবার চেষ্টা করে। একজন সাধারণ লোক প্রকৃতিকে যে দৃষ্টিতে দেখে, একজন পদার্থবিৎ বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিকে সেই দৃষ্টিতে দেখে না; তবে বৈজ্ঞানিকও বিজ্ঞান-সাধনার বাইরে তার দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতিকে প্রকৃতি যা হতে পারে না তাই বলে বিশ্বাস করে চলে। পর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা

প্রধান ও অপ্রধান গুণের সমস্যাগুলোর আলোচনা করেছি। আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি এই দুই শ্রেণীর গুণকে সমান সত্য বলাও যেমন অসম্ভব, তেমন এক শ্রেণীর গুণের থেকে সম্পূর্ণ অসংযুক্ত অবস্থায় অন্য শ্রেণীর গুণ যে সত্য তাও বলা অসম্ভব। বিশুদ্ধ জড়জগতের বেচারা সমর্থক কোনো-রকমে চোখ বুজে গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেন। তিনি বলতে বাধ্য হন যে তিনি যা-কিছু জানেন তা-সবই হল তাঁর জীবদেহের বিকার এবং তাঁর জীবদেহের বিকারও হল, এরকম আর-এক শ্রেণীর বিকার। অর্থাৎ সংক্ষেপে এই বলতে হয় যে, এক জড়পদার্থ হল অন্য জড়পদার্থের ক্রিয়ার ফলবিশেষ এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো (বলা যেতে পারে) তা নিজেরই ক্রিয়ার পরিণতিমাত্র।

এই সমস্যাটা একটা পরস্পরবিরোধী যুক্তির সাহায্যে স্পষ্টতর করে দেখা যেতে পারে। ১. প্রকৃতি হল আমার দেহের ক্রিয়ার ফলবিশেষ এবং ২. আমার দেহ হল প্রকৃতির ক্রিয়ার ফলবিশেষ।

১. নয়রূপে এই কথা বলা চলে, বহির্জগতের জ্ঞান মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং বহির্জগত হল আমার মস্তিষ্কের অবস্থামাত্র।

২. প্রতিনয়রূপে এই কথা বলা চলে, আমার দেহের জ্ঞান নির্ভর করে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের ওপর; এবং কোনো বিশেষ এক ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের উৎপত্তি হয় অন্য আর এক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার বা প্রতিক্রিয়ার ফলে। সুতরাং আমার দেহ হচ্ছে বস্তুত ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়ার বা অবস্থার সমষ্টি-মাত্র এবং এক ইন্দ্রিয় হচ্ছে অন্য আর এক ইন্দ্রিয়ের অবস্থামাত্র।

উপর্যুক্ত জটিলতাটা কি অস্বীকার করা যায়? ব্যাপ্তি ও আয়তন হল ইন্দ্রিয় অনুভবের বিষয়। দেহের ব্যাপ্তি ও আয়তন কোনো অলৌকিক ও যোগজ অনুভূতির আবিষ্কার নয়। প্রকৃতপক্ষে সেরকম কোনো অনুভূতির পরিচয় বা প্রমাণ আমরা পাই না। ঈদৃশ অনুভবের অস্তিত্ব মেনে নিলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে জড়বিজ্ঞানের বিচারে এই অনুভবও হল কতগুলো জড় স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া বা উত্তেজনা মাত্র। বাধার সাক্ষাৎ বোধ থেকে দেহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ধারণাটাও হচ্ছে আজগুবি। কারণ, বাধার বোধের মধ্যে ফুটে ওঠে একটা জিনিসের সঙ্গে আরো একটা জিনিসের সম্বন্ধ; মনে হয় দুটো জিনিস পরস্পরকে বাধা দিচ্ছে। বাধা

দেওয়ার অবস্থায় কোনো জিনিসটারই অপর জিনিসটার থেকে স্বতন্ত্র সত্তা নেই। বাধা থেকে কোনো বস্তুর নিরপেক্ষ সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। বাধার বোধ হচ্ছে মূলত দুই পদার্থের মধ্যে এক বিশেষ সম্বন্ধ-সঞ্জাত বোধ।

আমরা সেইজন্য এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে জড়জগতের জন্য বিভিন্ন ভৌতিক পদার্থের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রয়োজন এবং বিভিন্ন পারস্পরিক সম্বন্ধের জন্য বিভিন্ন জড় পদার্থের প্রয়োজন। এক কথায় দুই বা ততোধিক অজ্ঞাত বস্তুর মধ্যে একপ্রকার আপেক্ষিক ও আপাতদৃশ্য সম্বন্ধের নাম প্রকৃতি।

কিন্তু সম্বদ্ধ বস্তুগুলোর স্বরূপ যখন অজ্ঞাত তখন সেগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের অস্তিত্বই বা কল্পনা করা যায় কি করে? স্বীকার না করে উপায় নেই যে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব হচ্ছে শুধু আমার ইন্দ্রিয়ের কাছে, কিন্তু একটা ইন্দ্রিয়, কি তার সম্বন্ধে আমরা যা জানি তার অতিরিক্ত অন্য কিছু? এবং এক ইন্দ্রিয়ের বিষয় জানতে হলে অন্য আর এক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য আর কোনো পথ আছে কি? এমন কোনো ইন্দ্রিয় আমাদের নেই যার অস্তিত্ব সম্বন্ধনিরপেক্ষ; প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে অন্য আর একটা কিছুর প্রতিক্রিয়া বিকার বা অবস্থা মাত্র এবং সেই অপর কিছুটা অন্য আর একটি কিছুর বিকার বা অবস্থা; প্রকৃত বস্তুটা সব সময়ই আমাদের নাগালের বাইরে। মস্তিষ্কের আশ্রয় গ্রহণ করলেও একই সিদ্ধান্তে আসতে হয়। বাহ্য জগৎকে যদি আমার মস্তিষ্কের ক্রিয়া বা স্পন্দন রূপে কল্পনা করা যায় তা হলে আমার মস্তিষ্কটা কি? আমার মস্তিষ্কটাও হচ্ছে মস্তিষ্কের স্পন্দন। কিন্তু কার মস্তিষ্কের স্পন্দন? আমার মস্তিষ্ক ছাড়া অন্য কোনো মস্তিষ্কের স্পন্দন হতে পারে না। সুতরাং মস্তিষ্কটা কোনো বস্তু নয়; সেটা হয় একটা সম্বন্ধ কিংবা একটা বিশেষণ, কিন্তু কার বিশেষণ, কিসের সঙ্গে সম্বন্ধ? সেগুলোর স্বরূপ আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

এই চক্রক থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। একটা দ্বৈত স্পর্শজ অনুভবের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। মনে করুন, যুগপৎ দুটো স্পর্শজ অনুভব 'অ ও আ' উদিত হয়েছে। এখানে 'অ'এর অনুভব 'ক' নামক ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ ও 'আ'এর অনুভব 'খ' নামক ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ; কিন্তু

আপনি যদি 'ক' ও 'খ' নামক ইন্দ্রিয় দুটোর সত্তা প্রমাণ করতে চান, আপনাকে অন্য আর এক ইন্দ্রিয় 'গ' বা 'ঘ'এর সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে। আপনি কখনো এমন এক বস্তুর সন্ধান পাবেন না যা স্বয়ং হচ্ছে বিশেষ্য; আপনাকে এক বিশেষণ থেকে আর এক বিশেষণের দিকে যেতে হবে। এবং কল্পিত দৃষ্টান্তে 'অ ও আ'এর স্পর্শজ অনুভব দ্বারা প্রমাণ করা যায় না যে এই দুই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে দুটো স্বতন্ত্র ভৌতিক পদার্থ আছে। দুটো যুগপৎ অনুভব থেকে আমরা শুধু বুঝতে পারি যে অনুভূতি দুটো নির্ভরশীল; কিন্তু সেগুলো যার ওপর নির্ভরশীল তার স্বরূপ আমরা জানতে পারি না।

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাতেও উপর্যুক্ত অন্যোন্যাশ্রয়ী যুক্তির এক পক্ষকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবার কোনো প্রমাণ বা সমর্থন পাওয়া যায় না। প্রকৃতির সত্তা ও আমার দেহের সত্তা প্রকৃতি ও আমার দেহের অন্তর্গত এক অন্যোন্যাশ্রয়ী সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নয়। পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারা যায় এগুলোর কোনো একটার সত্তা অপরের সঙ্গে সম্বন্ধহীন অবস্থায় শূন্যমাত্র। আমাদের স্বীকার করতে হয় যে জড় বা ভৌতিক জগৎ অবভাসমাত্র, তার মাত্র আপাতদৃশ্য সত্তা আছে; কিন্তু সম্বন্ধ-বিশেষকে জড়-জগৎ বলে অভিহিত করলেও সেই সম্বন্ধ দ্বারা যে বস্তুনিচয় গ্রথিত হচ্ছে সেগুলোর স্বরূপ আমাদের অজ্ঞাত। সুতরাং সেই বস্তুগুলোকে বহু বলবার কোনো অধিকার আমাদের নেই; এমন-কি সেগুলো যে সম্বদ্ধ এরূপ অব-ধারণ করবার অধিকারও আমাদের নেই। গুণ ও সম্বন্ধের আকারে প্রাপ্ত যে জ্ঞান তা হচ্ছে অপূর্ণ ও হীন। পরমতত্ত্বের মধ্যে বর্তমান সংশয় ও জটিলতার নিরসন কিরূপে হয় তা মানুষের পক্ষে বলতে পারা অসম্ভব। জড়জগৎ পরমতত্ত্বের এক অবভাস; জড়জগতের সত্তা স্বতোবিরোধ, ভ্রম ও অপূর্ণতা দ্বারা ক্লিষ্ট। তার বৈচিত্র্য যে ভাবে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয় সেই ভাবে সত্য নয়, কিন্তু কোনো এক অর্থে এই জগৎ নিশ্চয়ই সত্য ও পরমতত্ত্বের মধ্যে এই জগতের বৈচিত্র্যের নিশ্চয়ই একটা সংস্থান ও সার্থকতা আছে।

কিন্তু দেহ ও প্রকৃতির মধ্যে ভিত্তিহীন চক্রক সম্বন্ধটাকে তা হলে কি আমরা ভ্রমাত্মক বলে বর্জন করব? কখনোই না। কারণ এই চক্রক সম্বন্ধ হল আপাত-

দৃশ্য সত্তাগুলোর উদয়ের রীতি বা ধারা। আপাতসত্য জগতের এটা একটা নিয়ম বা ধারা যে, ব্যাপ্তির বোধ দেহরূপ অন্য এক ব্যাপ্ত পদার্থের সংস্পর্শেই শুধু সম্ভব ; সেইরকম রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণের বোধ অন্যান্য গুণের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থাতেই মাত্র সম্ভব। অবভাস-সমূহের উদয়ের ধারাগুলোকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হয়। কতগুলো প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন আপাতসত্য তথ্যের আনুপূর্বিক উদয়ের ধারা বর্ণিত হয়, আবার কতগুলোতে সেগুলোর সমকালীন উদয়ের ধারা বর্ণিত হয় এবং এই নিয়মগুলো সর্ববিধ অবভাসের মধ্যে মাত্র কতগুলোর সম্বন্ধে খাটে। সুতরাং প্রকৃতির সত্তা হল আপাত-গ্রাহ্য বা ব্যবহারিক। প্রকৃতিকে এর বেশি কিছু ধারণা করলে গোলক-ধাঁধার মধ্যে আবার পথ হারিয়ে যেতে হয়। বাহ্য জড়জগৎকে জীবদেহের বিশেষণরূপে কল্পনা করতে হয়। অথচ জীবদেহের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব হল অসিদ্ধ : এক জীবদেহের অস্তিত্ব অন্য আর-এক বাহ্য পদার্থের অবস্থাদির ওপর নির্ভরশীল। এতদ্‌ব্যতীত, যেসব গুণকে প্রধান বলে অভিহিত করা হয়, অপ্রধান গুণাবলীর থেকে পৃথক ও অসংযুক্ত অবস্থায় সেগুলোকে সৎ বলা যায় না : এবং দেখা যায় যে আমার সংবেদনের বাইরে অপ্রধান গুণনিচয়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। অদ্বিতীয় পরমচৈতন্যের সমৃদ্ধ ঐকানুভূতির বাহ্য প্রকাশ হল ভিন্ন ভিন্ন আপাতসত্য অবভাস-সমূহ। অবভাসিত ও আপাত-দৃশ্য প্রভেদগুলো পরমচৈতন্যে দ্রবীভূত হয়ে আছে। সমগ্র অনুভবের মাত্র একাংশকে আমরা চিন্তা বা কল্পনা দ্বারা পৃথক করে প্রথমে প্রকৃতিকে পাই : পরে ঔপপত্তিক প্রয়োজনের তাগিদে প্রকৃতির ধারণার আরো পরিবর্তন সাধন করা হয়। প্রথমে প্রকৃতি হল মূর্ত অনুভব থেকে দ্বিধাকৃত এক অমূর্ত কল্পনাবিশেষ। পরে এই কাল্পনিক আংশিক সত্তাকে আমরা স্বয়ংসৎ ও স্বতন্ত্র বলে দাঁড় করাই। বিজ্ঞান পথভ্রষ্ট হয়ে আরো এক মারাত্মক ভুল করে থাকে। আপাতগ্রাহ্য অবভাসসমূহের উদ্ভবের কল্পিত নিয়ম-গুলোকে বিজ্ঞান স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসৎ বিবেচনা করে এবং এই কল্পিত নিয়ম-গুলোকে একমাত্র নিত্যপদার্থ বলে আমাদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করে। এইভাবে এক আপেক্ষিক সত্যকে বিজ্ঞান নিতান্ত ভ্রমে পর্যবসিত করে এবং যে সত্য ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আপাতগ্রাহ্য ও অনস্বীকার্য তাকে পারমার্থিক রূপ প্রদান করে তার চরম সর্বনাশ করে।

কেবল বা শুদ্ধ প্রকৃতি বলে কোনো বস্তু বা পদার্থ নেই। নিত্য বস্তুর একপ্রকার প্রকাশ বা অবভাসের নাম হল প্রকৃতি। জড়জগৎ একটা প্রকল্প-বিশেষ। কতগুলো উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রকৃতিকে পৃথক কল্পনা করা হয়; কিন্তু বস্তুত জড়জগৎকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী বিবেচনা করতে গেলে স্বতোবিরোধের পাকে জড়িয়ে পড়তে হয়। এইবার সাধারণ সিদ্ধান্তটার আরো বিস্তৃত আলোচনা করা যাক।

বিস্তৃত আলোচনা করবার আগে আরো একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমরা এ পর্যন্ত জড়জগৎকে ব্যাপ্তিগুণসম্পন্ন বা বিস্তার-গুণসম্পন্ন ধারণা করেছি। কিন্তু এই ধারণা যে সত্য ও নিঃসংশয় একথা কি বলা চলে? কেউ হয়তো বলতে পারেন যে ব্যাপ্তি প্রকৃতির মৌলিক গুণ নয়; যা কিছু ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত তাই যে ভৌতিক বা জড় হবে এবং যা-কিছু ভৌতিক বা জড় তাই যে বিস্তৃত হবে এমন হয়তো বলা যায় না। এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করবার চেষ্টা করা যাক। প্রথমত একথা ঠিক যে সর্ববিধ বিস্তৃতিই প্রকৃতির অংশ নয়, যেমন যেসব বিস্তৃতি আমি কল্পনা করি বা স্বপ্নে দেখি সেগুলো জড়জগতের অংশ নয়, যদিও সেগুলোর বিস্তৃতিরূপ অস্বীকার করা যায় না। যে বিস্তৃতিকে আমরা কল্পনাদৃষ্টিতে বা স্বপ্নে দেখি তারও একটা সত্তা আছে। ইন্দ্রিয়জ ভ্রম প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে সচরাচর যে সব ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি উপস্থিত হয় সেগুলোকে মিথ্যা বললেও সেগুলো অসৎ নয়। জলে নিমগ্ন ঋজু যষ্টিটি যখন বক্রাকারে প্রতিভাসিত হয় তখন সেই বক্রযষ্টির প্রাতিভাসিক সত্তা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। সুতরাং এই দিক থেকে বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে সর্ববিধ বিস্তারগুণসম্পন্ন সত্তা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং প্রকৃতির প্রধান গুণ দৈশিক ব্যাপ্তি নয়, অ-দৈশিক অন্য-কিছু, এরকম অনুমান সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে আসে।

ওপরের সিদ্ধান্তটা সাধারণভাবে আমি স্বীকার করি। প্রকৃতির সার বৈশিষ্ট্য হল এই: প্রকৃতি হচ্ছে চৈতন্যের রাজ্যের বাইরে এমন এক আপাত-সত্য ও প্রতীয়মান রাজ্য যেখানে চৈতন্যাশ্রয়ী ঘটনার থেকে বিশ্লিষ্টরূপেই পরিবর্তন ঘটে ও পরিবর্তন ঘটানো যায়; প্রকৃতি সব সময়ে আত্মার ক্রিয়া-কলাপের ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল নয়; প্রকৃতির ধারণা হল আত্মা ও অনাত্মার প্রভেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত; আমাদের অভিজ্ঞতার যে-অংশ সুখদুঃখ

প্রভৃতি আত্মার অংশ রূপে উদিত হয় সেই-অংশ থেকে, প্রকৃতি হল বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট ; এক আত্মা ও অন্য আত্মার মধ্যে যোগস্থাপন সম্ভব হয় শুধু প্রকৃতি-নামীয় আপাতগ্রাহ্য অবভাস-সমষ্টির সাহায্যে ; কিন্তু প্রকৃতিরূপী অবভাসসমূহের একপ্রকার স্বাতন্ত্র্য আছে ; যার ফলে সেগুলো বিভিন্ন আত্মার সুখদুঃখ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয় না এবং সেগুলোর আবির্ভাবের কতগুলো নিজ নিয়ম আছে ; এই আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যই হল প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাই যদি হয়, তা হলে প্রকৃতি বা জড়জগৎ বিস্তারগুণবিশিষ্ট, এই মতই হয়তো সত্য নয়। বিস্তারহীন জড়জগতের সম্ভাবনা আমরা স্বীকার করি। আমরা এমন এক জড়জগতের কল্পনা করতে পারি যেখানে শুধু বর্ণ, গন্ধ, রস ও শব্দ আছে এবং এই গুণগুলোই যেখানে আত্মার বাইরে পৃথক থেকে ও জীবের সুখদুঃখ ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বতন্ত্ররূপে একটা নিয়মরক্ষা করে অবভাসিত হচ্ছে ; সেখানে এই গুণগুলোই অনাত্মা-স্থানীয় বলে মনে হবে। এই কল্পিত জগতে স্থল বা ব্যাপ্তি থাকবে না। আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রাকৃতিক জগতে আমরা সাধারণত বর্ণাদি অপ্রধান গুণগুলোকে প্রথমে একটা বিশিষ্ট দেশ বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করি ও তার পর সেগুলোর ভৌতিক সত্তা স্বীকার করি। কিন্তু কথা হচ্ছে সেগুলোকে কোনো বিশেষ স্থানের মধ্যে স্থাপন করা কি একান্তই প্রয়োজন ? আমার মনে হয় এই গুণগুলোকে একটা নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে স্থাপন যে করতেই হবে, এমন বলা চলে না। অপ্রধান গুণাবলীকে দেশের আকারে বিন্যস্ত না করেও সেগুলোকে ভৌতিক পদার্থ বা অনাত্ম-পদার্থ কল্পনা করতে কোনো স্বতোবিরোধ দোষ নেই। অবিস্তৃত ও অ-দৈশিক জড়জগৎ অসম্ভব নয়।

প্রকৃতি আমাদের পক্ষে হল একবিধ অবভাসমাত্র। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে জড়জগৎকে আমরা পাই তার বিস্তার আছে। এক অবিস্তৃত জড়জগৎ কল্পনা করে বিস্তারের অনুভবের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা যায় না। প্রশ্ন থেকেই যায় অবিস্তৃত জড়জগৎ কিভাবে ব্যাপ্তিরূপে আবির্ভূত হয়। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত হবে এই : প্রকৃতি যে মূলত বা মুখ্যত ব্যাপ্তিগুণসম্পন্ন এ বাক্য সমর্থন করা যায় না ;

তবে আমাদের জড়জগৎ দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত সুতরাং অন্যবিধ জড় জগতের কল্পনায় আমাদের কৌতূহল নেই ; দেশের আকারে উদিত প্রকৃতিই হল আমাদের আলোচ্য বিষয়।

কতগুলো ছোটোখাটো প্রশ্ন এখন ওঠে। প্রথম প্রশ্ন, প্রকৃতির মধ্যে অজৈব পদার্থ বলে কিছু আছে কি না। অজৈব বলতে আমরা বুঝি কোনো সসীম জীবের সঙ্গে সম্পর্কহীন। অবশ্য তত্ত্ববিদ্যায় এই বিষয়সম্পর্কিত অনুসন্ধানের কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ, এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা অজ্ঞতাবশত প্রকৃতির অংশবিশেষকে অজৈব কল্পনা করি এবং অজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই আমাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হয়। কিন্তু তত্ত্ববিচারে এই অজ্ঞতার থেকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, প্রকৃতির কতক অংশ জৈব, যেহেতু সে-বিষয়ে আমাদের অস্ত্যর্থক ও নিশ্চয় বোধ আছে। অপর পক্ষে, প্রকৃতির মধ্যে সত্যই অজৈব কিছু আছে কি না এ জানবার কোনো উপায় বা পথ নেই। এবং তত্ত্ববিদ্যার দিক থেকে আমাদের এই অসামর্থ্য এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। সসীম জীবও হল একপ্রকার অবভাস ও তার নানাত্ব পরমতত্ত্বে অতিক্রান্ত হতে বাধ্য। সুতরাং যদি অজৈব বলে কিছু বাস্তবিক থাকে, পরমতত্ত্বে জীবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে তারও রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনাতে এবার আসা যাক। আমরা আগেই সিদ্ধান্তে এসেছি যে অনুভব বা অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত না হয়ে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই; সমগ্র প্রকৃতিই পরমসত্তার পূর্ণ চৈতন্যের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু অভিজ্ঞতা বা অনুভবেই সত্তার প্রতিষ্ঠা এই অবধারণ স্বীকার করলেও আর একটা প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। প্রশ্নটা হল এই যে সসীম জীবের অনুভবের বাইরে কোনো প্রকৃতি আছে কি না অর্থাৎ প্রকৃতির এমন কোনো অংশ আছে কি না যা কোনো সসীম জীবের অনুভবের বিষয় নয় বা হতে পারে না? প্রকারান্তরে প্রশ্নটা এইভাবে উত্থাপন করা যায়। পরমতত্ত্বের মধ্যে এমন কোনো ভৌতিক বা জড়-গুণের অনুভব আছে কি যার অনুরূপ অনুভব কোনো সসীম জীবের নেই? এর উত্তরে আমরা অবশ্য বলতে পারি যে সেরকম যদি কোনো

গুণ থাকেও তার সম্বন্ধে আমাদের কোনো বোধ থাকা অসম্ভব। কিন্তু প্রকৃত প্রশ্নটা হচ্ছে যে এইরকম গুণ আছে বলে আমরা মানতে পারি কি না এবং মানতে বাধ্য কি না? ১. এমন কোনো জড় পদার্থের থাকা সম্ভব কি বা যা কোনো সসীম জীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয় নয় এবং ২. এই প্রকার জড়পদার্থকে বাস্তব বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় কি না?

১. প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে চাই জড়পদার্থের যেসব গুণ সাধারণত কল্পনা করা হয় সেগুলোর সবই সসীম জীবের ইন্দ্রিয়জ অনুভবের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং সসীম জীবের অবর্তমানেও যে এইসব গুণ থাকবে এই বাক্য সমর্থন করবার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। অপর পক্ষে আমরা যদি স্বীকার করেও নিই যে পরমচৈতন্যের মধ্যে এমন বিষয়ের অনুভব আছে যার সদৃশ অনুভব সসীম জীবের নেই, তা হলেও পরম চৈতন্যের অনুভব-অন্তর্গত এই অতিরিক্ত বিষয়কে জড়জগতের বা প্রকৃতির অংশ ধারণা করার কোনো বাধ্যবাধকতা আমাদের নেই। এটা কিছু অসম্ভব নয় যে পরম চৈতন্যের মধ্যে এমন অনুভব আছে যার অনুরূপ অনুভব কোনো সসীম জীবের নেই। কিন্তু সেই অনুভবকে জড়প্রকৃতির পর্যায়ে ফেলা অন্য আর এক ব্যাপার। প্রকৃতির অনুভব দ্বৈতের অনুভব। অনুভবের মধ্যে প্রভেদ ও সংঘর্ষ সক্রিয় হলে তবেই প্রকৃতির ধারণার উদ্ভব হয়। সুতরাং সসীম জীবের অভিজ্ঞতার বাইরেও, অর্থাৎ পরমচৈতন্যের অদ্বৈত অনুভবে প্রকৃতি আছে এই কল্পনা অসমর্থনীয়। সসীম জীবের অনুভবের বাইরে প্রকৃতি শূন্য নয়; তবে তার স্বরূপ অন্যপ্রকার; তাকে আর জড় বা ভৌতিক পদার্থ বলে অভিহিত করা যায় না।

২. সসীম চৈতন্য-বিষয়ীভূত না হয়েও প্রকৃতির একাংশের অস্তিত্ব সম্ভব, এই অর্থে যে সসীম চৈতন্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াতে প্রকৃতির উদ্ভব হয় বলে আমরা নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারি না যে, সসীম-চৈতন্য-সংযোগ ব্যতীত প্রকৃতির উদ্ভব অসম্ভব। হয়তো হতে পারে এমন কতগুলো গুণ আছে যেগুলো সসীম জীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে ধরাই পড়ে না কিন্তু সেগুলো পরমচৈতন্যের মধ্যে আছে। এইরকম কল্পনাতে কোনো স্বতোবিরোধ নেই; সুতরাং শুদ্ধ সম্ভাবনার দিক থেকে এই

বাক্যকে আমাদের স্বীকার করতে বাধা নেই। কিন্তু কেউ কেউ বলে থাকেন যে সসীম চৈতন্যের অ-বিষয়ীভূত প্রকৃতি শুধু সম্ভবই নয়, এইরকম প্রকৃতি আছে ধারণা করতে আমরা বাধ্য। তাঁদের যুক্তি হল প্রকৃতি এক বিরাট সত্তা; সমস্ত সসীম জীবের চৈতন্যের মধ্যেও এই বিরাট সত্তার থাকবার যথেষ্ট স্থান নেই; প্রকৃতির কতক অংশ একেবারেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, যেমন জীবিত অবস্থায় আমার মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে সব বিষয় জানা যায়, সেগুলোও সাধারণত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; বিজ্ঞানে যে সব অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থের অবতারণা করা হয় সেগুলোরও প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নয়; এই পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর জীবাদি যখন ছিল না, কোনোরকম প্রাণীরই যখন জন্ম হয় নি তখনও ঐসব অভ্রংলিহ পর্বতমালা ছিল কিন্তু তখন সেগুলোকে কে প্রত্যক্ষ করত? এই-সব যুক্তি শুনে আমাদের মনে হয় তা হলে হয়তো প্রকৃতির অস্তিত্বের জন্য সসীম আত্মার অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে প্রয়োজন নয় এবং চৈতন্য-নিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র জড়জগৎ নিশ্চয়ই আছে।

ওপরের আপত্তিগুলো ভালো করে বিবেচনা করা দরকার। প্রথমে আমাদের একটা ধারণা স্পষ্ট করতে হবে। জড়জগতের অস্তিত্ব, আমি জড়জগৎকে অনুভব করছি কিংবা না করছি, তার ওপর নির্ভরশীল নয়। আমি দেখি আর না দেখি হিমালয় পর্বত থাকেই (এখানে ব্রেডলি শুধু পর্বতের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন)। এই বিচার সেইজন্য সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বাক্যটার দুই বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। ১. প্রথম অর্থ, হিমালয় পর্বতকে প্রত্যক্ষকালে যেমন ভাবে প্রত্যক্ষ করা হয় হিমালয় পর্বত ঠিক তেমনই। ২. দ্বিতীয় অর্থ, হিমালয়পর্বত সবসময়ই আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতিরিক্ত অন্য-কিছু, এবং তাকে যখন প্রত্যক্ষ করা যায়, তখনই মাত্র তার পরিচিত রূপ ফুটে ওঠে। এই দ্বিতীয় অর্থে, হিমালয় পর্বতের দুটো রূপ আছে; একটা স্থায়ী বা অদৃশ্য রূপ যা দর্শকের অনুভূতিতে কখনো ধরা পড়ে না, এবং আর একটা অস্থায়ী এবং পরিচিত বা দৃশ্য রূপ যা দর্শকের অনুভূতির বিষয়।

আগে স্বাতন্ত্র্যের প্রথম অর্থে আপত্তিগুলোর আলোচনা করা যাক। এ কথা আপত্তিকারী বলবেন যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অনুভবে আমরা

প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র হিসেবে পাই ; সুতরাং প্রকৃতির স্বাধীন সত্তা আছে, আমাদের সসীম চৈতন্যের বাইরে প্রকৃতির অস্তিত্ব আছে। এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলতে পারি যে আপত্তিকারীর যুক্তিটা অজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এমন হয়তো হতে পারে আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি না বা করতে পারি না তখন অন্যপ্রকার সসীম জীব প্রকৃতিকে আমরা যে ভাবে প্রত্যক্ষ করি ঠিক সেইভাবেই প্রত্যক্ষ করে। এমন কোনো ইন্দ্রিয় হয়তো থাকতে পারে যার কাছে মস্তিষ্কের মতো জিনিসও সব সময়ই ধরা পড়ে। এবং ঐ পুরাতন পর্বতমালা আমার কাছে আজ যেভাবে আপাতদৃশ্য হচ্ছে হয়তো চিরকালই কোনো-না-কোনো জীবের কাছে ঠিক সেইভাবেই প্রত্যক্ষ হয়ে আসছে। আমাদের এই যুক্তি খণ্ডন করা সহজ না হলেও যুক্তিটা উদ্ভট। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে অন্য কোনো চৈতন্য প্রকৃতিকে ঠিক আমাদের মতো করে সব সময়ই প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু এইরকম কাল্পনিক যুক্তির ওপর আমাদের দাঁড়াবার কোনো দরকার নেই। আপত্তিকারীদের উত্তরে আমরা বলব যে প্রত্যক্ষ অনুভবগত বিষয় ছাড়াও চিন্তাগত বিষয় আছে। যেসব বিষয় সম্বন্ধে আমরা অনুভব এবং চিন্তা করি শুধু সেগুলোর মধ্যেই প্রকৃতির রাজত্ব সীমিত নয়, যে সব বিষয় কেবলমাত্র চিন্তার অধিগত সেগুলোর শেষ সীমা পর্যন্ত প্রকৃতির রাজ্য বিস্তৃত। এই ভাবে নিলে আমাদের বুদ্ধির সীমাই হচ্ছে প্রকৃতির সীমা। প্রকৃতির অস্তিত্ব আমাদের জানার ওপর নির্ভরশীল ; কিন্তু এই জানা প্রত্যক্ষ হতে পারে এবং অপ্রত্যক্ষ হতে পারে। এই প্রশস্ত অর্থে 'জানার' সীমার বাইরে প্রকৃতির কোনো স্থান নেই।

ওপরের বর্ণিত আমাদের যুক্তি আরো পরিস্ফুট করলে বোঝা যায় যে প্রকৃতি বলতে আমরা যা বুঝি তার সত্তা দ্বিবিধ : মূর্ত সত্তা ও অমূর্ত সত্তা। প্রকৃতির মূর্ত সত্তা হল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত এবং অমূর্ত সত্তা হল চিন্তা বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত। যখন জগতে কোনো প্রাণীর উদ্ভব হয় নি তখনো প্রকৃতি ছিল আমরা ভাবতে পারি। কিন্তু বাক্যটার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে যখন আমরা যেসব প্রাণীকে জানি তারা ছিল না, তখনো প্রকৃতি ছিল ; কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। এবং অবধারণটি শুধু আপাতগ্রাহ্য আবভাসিক

সত্তা সম্বন্ধে সত্য। কারণ পরমতত্ত্বের মধ্যে ইতিহাস বা ক্রমবিকাশ বলে কিছু থাকতে পারে না। (ষড়বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) সংক্ষেপে তা হলে এই বলা যায় যে চৈতন্য-বিরহিত প্রকৃতি হল বিজ্ঞানের একটা ভাবগত সৃষ্টি এবং পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই ভাবগত সত্তা মাত্র আংশিকরূপে সত্য। পদার্থবিদ্যার অদৃশ্য পদার্থগুলোরও পারমার্থিক সত্তা নেই। সেগুলো হল স্বতোবিরোধপূর্ণ; সুতরাং সেগুলোর সত্তা আপাতসত্য ও ও আবভাসিক। সেগুলো শুধু মানুষের চিন্তার বিষয়রূপে আছে। কোনো সসীম জীব সেগুলোকে কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। সুতরাং অনুভবের বিষয়-রূপে সেগুলোর অস্তিত্ব নেই; সেগুলোর আছে শুধু ভাবগত ও অমূর্ত সত্তা।

আমাদের সিদ্ধান্ত সেইজন্য এই দাঁড়ায় যে, সসীম জীবের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত না হয়েও প্রকৃতির কোনো অংশ থাকতে পারে; কিন্তু সসীম জীবের বুদ্ধির বা চিন্তার বিষয়ীভূত না হয়ে প্রকৃতির কোনো অংশের অস্তিত্ব নেই। পরমতত্ত্বে হয়তো এরকম খানিকটা অনুভব বা অভিজ্ঞতা থাকতে পারে যার অনুরূপ অভিজ্ঞতা সসীম চৈতন্যে নেই; কিন্তু সেই অনুভবকে জড়প্রকৃতির অনুভব বলা চলে না; (সপ্তবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কারণ জড়প্রকৃতির অনুভবের জন্য সসীম চৈতন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এইভাবে প্রকৃতিকে সসীম চৈতন্যের বুদ্ধিগত বা ভাবগত বিষয়ে পরিণত করাতে নূতন এক প্রকার জটিলতার উদ্ভব হয়। এক দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় যে জড়জগতের বাস্তবতা শুধু ভাবগত হতে পারে না; যে-জড়-জগৎ শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় সেই-জড়-জগৎকে আমরা বাস্তব বলে স্বীকার করতে পারি না। অপর দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়ীভূত না হয়েও থাকার কিংবা ভাবগত রূপে থাকার অর্থ হচ্ছে অবস্থাসাপেক্ষ অস্তিত্ব; অর্থাৎ এই দৃষ্টিতে প্রকৃতি সব সময়ই প্রকৃতি নয়, তার খানিকটা অংশ হল শুধু সম্ভাবনা বা অন্য-কিছু এবং এই অংশটা কতগুলো বিশেষ অবস্থার উদ্ভবে আবার প্রকৃতিরূপে উদ্ভাসিত হয়। ফলে সব সময়েই প্রকৃতির এক অংশ অজড় বা অভৌতিক বলে স্বীকার করতে হয় এবং সেই অংশকে তথ্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। এই অবাঞ্ছিত পরিণতিটাকে আমাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে

খাড়া করা যায়। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত মানলে তার এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। যে-প্রকৃতি শুধু আমাদের অনুভবের বিষয় নয়, কেবল ভাবনার বিষয় এবং যে-প্রকৃতিকে আমরা শুধু অননুভব্য বলে কল্পনা করি, প্রকৃতি শব্দের যথার্থ অর্থে তাকে প্রকৃতি বলা চলে না।

তবে ওপরের পরিণতিতে বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই। চতুর্বিংশ অধ্যায়ে যখন অবস্থাসাপেক্ষ অস্তিত্বের বিষয় আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব তখন বিষয়টা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। এখানে সংক্ষেপে বর্তমান জটিলতার সম্পর্কে আলোচনা করব। সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম: এক দিকে প্রকৃতিকে বাস্তব বলে স্বীকার করতে হয় এবং বাস্তব হতে গেলে সমস্ত প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া উচিত; অন্য দিকে প্রকৃতির এক অংশ নিঃসন্দেহে শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য। বর্তমান জটিলতার মীমাংসা সহজেই হয়ে যায় যদি আমরা স্বীকার করে নিই যে সসীম জীবের পক্ষে যা শুধু বুদ্ধিগত বা ভাবগত পরমতত্ত্বের পক্ষে তা ঘনিষ্ঠরূপে ও একান্তরূপে অনুভবগত। আমরা যা-কিছু ভাবরূপে পাই পরমতত্ত্বে তা অনুভবরূপে বিদ্যমান আছে। পরমতত্ত্বে সমস্ত ভাব ও সমস্ত তথ্য এক সুমহান ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে রসায়িত হয়ে অবস্থান করে।

আমরা যে-বিষয়ে শুধু ভাবি তা কখনো সম্পূর্ণরূপে বাস্তব নয়; যেহেতু ভাবনার মধ্যে 'তৎ' ও 'কিম্'এর প্রভেদ থাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার করতে হয় যে চিন্তাক্রিয়া মাত্রেরই একটা বাস্তবিকতার দিক আছে। চিন্তার বাস্তবিকতা প্রত্যক্ষ অনুভবের বাস্তবিকতার চেয়ে কিছু কম নয়। সেইজন্য ভাবগত বা চিন্তাগত বা বুদ্ধিগত প্রকৃতিরও একপ্রকার বাস্তব সত্তা আছে। যে-প্রকৃতি আমাদের বুদ্ধির বিষয়, পরমতত্ত্বে সেই-প্রকৃতি বোধির বিষয়; আমরা যে-প্রকৃতিকে ভাবের মধ্যে পাই, পরমতত্ত্বে সেই-প্রকৃতি অনুভবে রূপান্তরিত। বিশ্বের অন্যান্য অংশের সঙ্গে একস্থ হয়ে প্রকৃতি পরমসত্তার ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। প্রকৃতিকে আমরা যা ভাবি প্রকৃতি আসলে মাত্র তা নয়। ভাববার পর প্রকৃতিকে আমরা যেরূপে প্রত্যক্ষ করি প্রকৃতি আসলে মাত্র তাও নয়। প্রকৃতি হল অন্য আর-কিছু; বিশেষ কতগুলো অবস্থার উদ্ভবে এই অন্য আর-কিছু আমাদের কাছে ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে ওঠে। পরমসত্তা প্রকৃতিকে কিভাবে অনুভব করে তা সসীম

জীবের পক্ষে জানা সম্ভবপর নয় ; তবে পরমতত্ত্বে প্রকৃতিও সত্য ; সেইজন্য স্বীকার করতে হয় যে প্রকৃতি অলীকবস্তু নয় ; প্রকৃতি যখন সসীম জীবের ইন্দ্রিয়গোচর হয় তখন তাকে আমরা জড়পদার্থ বলে যথার্থই অভিহিত করি। এইসব কারণের জন্য, প্রকৃতিকে আমরা অবস্থাসাপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র তথ্য বলে বিশ্বাস করি। প্রকৃতির অস্তিত্ব আমার বা আপনার কল্পনা বা কৃপার ওপর নির্ভর করে না, যদিও প্রকৃতির যাবতীয় উপাদান সসীম চৈতন্যের বিষয় ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে সসীম জীবের চৈতন্যে যা আছে তার অতিরিক্ত কিছু না থাকলেও, পরমচৈতন্যের সমন্বয়ী অনুভবের কোনো লাঘব বা হ্রাস হবে না ; কারণ সসীম চৈতন্যের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলোর রূপান্তরের দ্বারাই পরম-চৈতন্যের পূর্ণতাপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় যে যা সসীম চৈতন্যে নেই তা প্রকৃতিতেও নেই কিংবা পরমতত্ত্বেও নেই। সসীম চৈতন্যের অভিজ্ঞতার বাইরে প্রাকৃতিক বা অন্য কোনো জগৎ নেই।

এখন আবার আপত্তি উঠতে পারে যে আমাদের উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধী। সাধারণ মানুষের ধারণা যে, সসীম জীবে প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করুক চাই নাই করুক প্রকৃতি সব সময়ই তাকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় ঠিক সেই ভাবেই বিদ্যমান থাকে অথচ আমাদের বিচারে জড়জগতের এক অংশ প্রকৃতপক্ষে জড় নয়। এই আপত্তিটা খাঁটি। কিন্তু এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলব যে জনসাধারণের যে ধারণাটা কাণ্ডজ্ঞান বলে প্রচলিত, সেটা সংগতিপূর্ণ মোটেই নয়। কারণ, যাঁরা এই সাধারণ ধারণার সমর্থক তাঁরাই স্বীকার করতে ইতস্তত করবেন যে রসনা-ইন্দ্রিয়ের বাইরে মিষ্টস্বাদ বা অম্লস্বাদের অস্তিত্ব আছে। যিনি রসনা-ইন্দ্রিয়ের বাইরে স্বাদের অস্তিত্ব, নীরন্ধ্র অন্ধকারে বর্ণের অস্তিত্ব ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বাইরে সংগীতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারেন একমাত্র তিনিই লৌকিক ধারণার বলে আমাদের এ সিদ্ধান্তটাকে উড়িয়ে দিতে পারেন। কেউ যখন দেখবার নেই, তখনো ফুলের সৌন্দর্য আকাশ আলো করে থাকে এবং কেউ যখন ঘ্রাণ গ্রহণ করবার জন্য নেই তখনো ফুলের সুগন্ধ চতুর্দিকে আনন্দের হিল্লোল ছড়াতে থাকে, এইরকম যিনি বিশ্বাস

করতে পারেন একমাত্র তাঁরই আমাদের সিদ্ধান্তটার বিরোধিতা করবার অধিকার আছে। কিন্তু তাঁর মতটা কি তিনি বলুন। তাঁর মত এত তুচ্ছ যে দার্শনিক বিচারে সেটা বিবেচনারও অযোগ্য। যে কোনো সত্যিকারের মত কোনো না কোনো জায়গায় সাধারণ ধারণার পরিপন্থী হতে বাধ্য; এবং লৌকিক মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যের দিক থেকে বিচার করলেও আমাদের সিদ্ধান্তটা অন্যান্য অনেক সিদ্ধান্তের চেয়ে প্রকৃষ্টতর।

আমাদের মতে প্রকৃতির এক বৃহৎ অংশ তাকে আমরা যে-ভাবে প্রত্যক্ষ করি ঠিক তাই। এই মতে, অপ্রধানগুণগুলো জড়জগতের অন্তর্ভুক্ত; এবং যে চিনি আমরা খাই তা সত্যই মিষ্ট ও মধুর; শুধু তাই নয়, আমাদের এই মতে প্রধান গুণের মতোই তথ্যগত বাস্তবতা আছে প্রকৃতির সৌন্দর্যে। (ষড়বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী জড়জগতের যা-কিছু আমরা অনুভব করি বা উপভোগ করি তারই প্রকৃতির রাজ্যে স্থান আছে; প্রকৃতির যে-অংশ একমাত্র আমাদের চিন্তা বা ভাবনার বিষয় এবং যেটা আমাদের বিচারে কোনো জীব কখনো প্রত্যক্ষ করতে পারে না, শুধু সেই-অংশ সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে সেটা তথ্য নয়। সুতরাং লৌকিক ধারণার সঙ্গে আংশিক অসংগতি স্বীকার করেও আমরা এই মন্তব্য জোরের সঙ্গে করতে চাই যে লৌকিক ধারণা ও আমাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্যের পরিখাটি খুব সংকীর্ণ।

আমরা এতক্ষণে বুঝতে পারছি যে অজৈব জগৎ বলে হয়তো কিছু নেই। অজৈব জগতের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু আমরা বলতে পারি না অজৈব বাস্তব কি না। কিন্তু সসীম চৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত অন্যপ্রকার; সেইরকম প্রকৃতিকে বাস্তব বলে গ্রহণ করার পক্ষে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না এবং সেইরকম জগৎ সম্ভবপর বলাও চলে না। অপর পক্ষে আমরা বলতে বাধ্য যে এই-সব প্রশ্নের ওপর অসংগত ভাবে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ, এই-সব প্রশ্ন যে প্রভেদগুলোর ওপর নির্ভরশীল সেই-সব প্রভেদ পরমতত্ত্বে অতি-ক্রান্ত হবেই। সমস্ত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিই কি সসীম জীবের চৈতন্যের অন্তর্বর্তী? জড়জগতে এমন কি কোনো গুণ আছে যার সঙ্গে জীব-চৈতন্যের সম্বন্ধ নেই? এ সব প্রশ্নের ওপর খুব বেশি কিছু আসে যায় না। তার

কারণ, এ-সব প্রশ্নের সম্যক উত্তর আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় এবং যেটুকু উত্তর আমরা দিতে পারি তার খুব বেশি মূল্যও নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিভিন্ন জীবদেহের অন্তর্বর্তী সম্বন্ধের প্রশ্ন, কিংবা অজৈব জগৎ ও জৈবজগতের প্রভেদের প্রশ্ন কিংবা বিভিন্ন সসীম জীবের অভিজ্ঞতার পার্থক্যের প্রশ্ন কিংবা সসীম চৈতন্যের ও পরম চৈতন্যের পার্থক্যের প্রশ্ন এই-সব প্রশ্নের কোনোটাই অর্থপূর্ণ নয়। সব আপাতসত্য ও আবভাসিক বৈচিত্র্য পরম-চৈতন্যে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং সেগুলো পরম চৈতন্যকে ঐশ্বর্যশালী করে রাখে। এই-সব প্রশ্ন ব্যবহারিক জগতের প্রশ্ন এবং এগুলোর উত্তর সসীম জীবের দৃষ্টি থেকে আমাদের দিতে হয়; পরমতত্ত্বের দৃষ্টি থেকে এগুলোর উত্তর হতে পারে না; তা ছাড়া সমস্যাগুলোর সমাধান অংশত অসম্ভব।

আরো একটা আপত্তির বিষয় আলোচনা হওয়া দরকার। আপত্তি উঠতে পারে যে আমাদের বর্ণিত প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিই নয়। কারণ, আমাদের এই মত-অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে প্রকৃতির রূপ হল বিভিন্ন এবং বিভিন্ন রূপের মধ্যে সাদৃশ্য থাকতে পারে; কিন্তু প্রকৃতি নামক কোনো একক পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব। উত্তরে আমরা বলব যে এই আপত্তিটার উৎস হচ্ছে একটা অন্ধ কুসংস্কার। আমাদের মত-অনুযায়ী প্রকৃতির ঐক্য থাকতে পারে না বিশ্বাস করবার হেতু নেই। আপত্তিকারী ধরে নিয়েছেন যে বিভিন্ন জীবের চৈতন্যের বিষয়ের মধ্যে সমত্ব অসম্ভব, সেই-জন্য তিনি এই কাল্পনিক আপত্তিটা তুলেছেন। অন্ধ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তিনি এইরকম ধরে নিয়েছেন।

কুসংস্কারের ফলে আপত্তিকারী ধারণা করতে অক্ষম যে বিভিন্নকেন্দ্রাশ্রয়ী হয়েও অভিজ্ঞতার মধ্যে সমত্ব সম্ভব। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে এই বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। সমত্ব স্বীকার করতে পারলেই প্রকৃতির একত্ব থেকে যায়। যে-দুটো জিনিসের গুণগত একত্ব আছে সে-দুটো জিনিস এক হতে বাধ্য; এইরকম দুটো জিনিস যদি পৃথক দেশ, পৃথক কাল কিংবা পৃথক আত্মায় নিহিত থাকে তবুও সেগুলোর সমত্ব নষ্ট হয় না। অবশ্য নানাত্ব বা বৈচিত্র্যের জন্য একত্বের প্রকারভেদ হয় এবং প্রকারভেদ ব্যতীত সমত্ব সম্ভবও নয়। বৈচিত্র্য থাকলে সমত্ব অসম্ভব এই উক্তি সত্য হলে চিন্তা এবং অস্তিত্ব দুইই অসম্ভব হয়ে ওঠে। বৈচিত্র্যকে

সমত্ব-বিরোধী বিশ্বাস করলে সমগ্র বিশ্বই অন্তর্হিত হয়। শেষ পর্যন্ত, এক ও নানা কি ভাবে পরমতত্ত্বের মধ্যে মিলে যায়, সে বিষয়ে আমাদের কোনো জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। তবে আমরা নিঃসন্দেহ যে পরমতত্ত্বে এক ও বহু, কিংবা বৈচিত্র্য ও সমত্বের প্রশ্নের একটা সুমীমাংসা নিশ্চয়ই হয়েছে।

প্রকৃতির বহুরূপিত্ব হল একটা আপাতসত্য মাত্র। পরমসত্তার চৈতন্য-স্থিত এক প্রকৃতিই বিভিন্ন জীব-চৈতন্যে অসংখ্য প্রকৃতিরূপে উদ্ভাসিত হচ্ছে। বহু জীবে যখন প্রকৃতিকে সমান ভাবে দেখে তখন এই সমান-ভাবে-দেখা প্রকৃতিকে একই বলতে হবে। তা ছাড়া, বিভিন্ন জীবাত্মার দিক থেকে একত্বের প্রশ্নটার বিচার করলেও খুব যে অসুবিধা হয় তা নয়। আমরা প্রত্যেকেই প্রকৃতিকে সাধারণত যেভাবে প্রত্যক্ষ করি, প্রকৃতি প্রধানত তাই। এবং মূলত প্রকৃতি একটা সসীমচৈতন্যনিরপেক্ষ সর্বসাধারণ সত্তা। এর বেশি কিছু কি আমাদের দরকার ? কোনো এক জীব যদি বিশেষ কোনো এক গুণ অনুভব করে যে গুণ অন্য কেউ অনুভব করে নি, তা হলে তার অনুভূত এই গুণটা তার মনের একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামাত্র বলে গৃহীত হবে। কিন্তু এরকম ব্যক্তিগত ও অ-সাধারণ অনুভূতির সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। প্রকৃতির আর একটা দিকের কথা অবশ্য এই সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। মনে হয় প্রকৃতির এক অংশ কোনো জীবাত্মার ইন্দ্রিয়গোচর নয়। প্রকৃতির এই অংশ আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় না হয়েও চৈতন্য-নিরপেক্ষ রূপে অবস্থান করে। এই স্থানেই হল লৌকিক মতের থেকে আমাদের মতের পার্থক্য। কিন্তু এই কারণে আমাদের মতকে উপেক্ষা করা সংগত নয়। কেউ আবার বলতে পারেন যে আমরা প্রকৃতির শক্তিরূপটা একেবারেই অবহেলা করেছি, আমরা তাঁদের আপত্তির একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেব। আমরা পূর্ববর্তী এক অধ্যায়েই দেখিয়েছি যে পারমার্থিক দৃষ্টিতে শক্তি বলে কিছু নেই এবং শক্তিকে পারমার্থিক তত্ত্বরূপে স্বীকার করা যায় না। তবে কতগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটবার আপাতসত্য ধারাকে যদি শক্তিনামে অভিহিত করা হয় ঘটনার সেইরকম শৃঙ্খলা স্বীকার করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই দৃশ্যমান ও আপাতগ্রাহ্য শৃঙ্খলা থেকে সসীমচৈতন্যনিরপেক্ষ কোনো অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্বের অনুমান অসংগত।

আরো একটা সমস্যার বিষয় আলোচনা করতে হবে। এই সমস্যাটার

উল্লেখ পূর্বেই কয়েকবার করা হয়েছে। কেবল জড়প্রকৃতি বলে কিছু নেই। জড়বিজ্ঞানের জগৎ, চৈতন্য-নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র কোনো বস্তু নয়। অখণ্ড অনুভবের একটা ক্ষুদ্র অংশ হল আমাদের এই জড়জগৎ। এবং যথার্থ অর্থে, জীব-চৈতন্য-ব্যতিরিক্ত কোনো জগৎকে জড়জগৎ বলা যায় না। কিন্তু তাই যদি সত্য হয় তা হলে জড়বিজ্ঞানের কি সার্থকতা? জড়বিজ্ঞানে প্রকৃতিকে চৈতন্যহীন ও স্বতন্ত্র পদার্থরূপে কল্পনা করা হয়। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্তকে জডবিজ্ঞানের মৌলিক বিশ্বাসের প্রতিকূল বলে মনে হয়। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়বিজ্ঞানের প্রকৃত কোনো বিরোধ নেই। আপাতদৃশ্য বিরোধটার মূল হল একটা ভ্রমাত্মক ধারণা। জড়বিজ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যা এই দুইএর উদ্দেশ্যই হল সম্পূর্ণ পৃথক। জডবিজ্ঞানে পরমসত্যকে জানবার চেষ্টা করা হয় না। এবং জড়বিজ্ঞানের কারবার হচ্ছে আপাতসত্য তথ্যাবলী নিয়ে। বিজ্ঞানের কল্পনা ও প্রত্যয় দ্বারা পরমতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। সেইজন্য জড়বিজ্ঞানের প্রত্যয় ও প্রকল্প-গুলোকে তত্ত্ববিদ্যার দিক থেকে বিরূপ সমালোচনা করা সংগত নয়। অপর পক্ষে জড়বিজ্ঞানের প্রত্যয় ও প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে তত্ত্ববিদ্যার সমালোচনাও অসংগত হবে। জড়বিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা, এই দুই বিদ্যার উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি হল একেবারে আলাদা। জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো পরমসত্য নয়। এবং পরমসত্যতার দাবিও জড়বিজ্ঞানে করা হয় না। সুতরাং জড়বিজ্ঞানের অনুমানগুলো স্বক্ষেত্রে কার্যকরী এবং উপযোগী কি না এইটাই একমাত্র বিচার্য। এই দিক থেকে জড়বিজ্ঞানের অনুমানগুলোর সার্থকতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। দৃশ্যমান জগতের ঘটনাবলীর পারম্পর্য ও সহাবস্থান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন করবার জন্য জড়বিজ্ঞানে জড়বস্তু, গতি, শক্তি প্রভৃতি তত্ত্বগুলোকে কার্যকরী তত্ত্বরূপে বিশ্বাস করা হয়। এই-সব ধারণা বা প্রত্যয় দিয়ে দেশজ ঘটনাবলীর সম্পর্ক ও সংঘটনের ধারা বোঝবার চেষ্টা করা হয়। অসংগতিপূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী বলে সেগুলোকে সমালোচনা করা অবান্তর ও অশোভন। বৈজ্ঞানিক ধারণা ও প্রকল্পকে পারমার্থিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না; কিন্তু এই উক্তিকে বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক সমালোচনা বলে গ্রহণ করলে আমরা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রকাশ করব।

সুতরাং প্রকৃতিকে যদি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তারূপে কল্পনা করা হয় তা হলে তত্ত্ববিদ্যার বলবার কিছুই নেই। কারণ কোনো একশ্রেণীর আপাতসত্য ও আবভাসিক ঘটনাসমূহকে পরীক্ষা করবার ও বোঝবার জন্য অনেক সময় সেগুলোকে পৃথক করে ও স্বতন্ত্র সত্তা রূপে কল্পনা করবার দরকার হয়। এইরকম করাতে প্রকৃতি যে জীব-চৈতন্যের বৃহত্তর অভিজ্ঞতার এক অংশ মাত্র, সেই সত্য অস্বীকার করা হয় না। শুধু বিশেষ কার্যক্ষেত্রে প্রকৃতির এই বৃহত্তর পরিবেশকে উপেক্ষা করা হয়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে যখন আমরা জীবহীন কালের কথা বলি তখন সেই-সব জীবের অবর্তমানতার কথা মনে করি যাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি এবং আরো মনে রাখা উচিত যে এই উক্তি বিশ্বের মাত্র একাংশের প্রতি প্রযোজ্য। অন্তত কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে এ উক্তি দ্বারা পরমসত্তার কোনো ক্রমবিকাশ বা ইতিহাসের কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বৈজ্ঞানিক কল্পনাগুলো হল কতগুলো প্রতীয়মান তথ্যকে অন্যান্য তজ্জাতীয় তথ্যাবলী থেকে পৃথক করে বিবেচনা করবার সুবিধাজনক এক উপায় মাত্র। আমরা তাই বলতে পারি যে যতক্ষণ পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা, কিংবা তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান স্বক্ষেত্র অতিক্রম না করে, ততক্ষণ দুই বিদ্যার মধ্যে কোনো বিরোধ বা সংঘর্ষ উপস্থিত হয় না। এই দুই বিদ্যার পরস্পরের লক্ষ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার জন্যই যত গোলমাল।

কিন্তু জড়বিজ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যা অনেক সময়েই বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছে। কেবল প্রকৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞান, পরমতত্ত্বের সম্পর্কে উক্তি করতে প্রয়াসী হয়েছে। তার ফলে পর-মত-অসহিষ্ণু, ও সারশূন্য একপ্রকার তত্ত্ববিদ্যা জন্মগ্রহণ করছে। উদাহরণস্বরূপ, সেই মতের কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বে মন বা চৈতন্যের আগে জড় পদার্থের উদ্ভব হয়েছিল; যাঁরা এইরকম বলেন তাঁদের মতে পরমসত্তারও আনুপূর্বিক ক্রমবিকাশ বা ইতিহাস আছে। (ষড়্‌বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই মতকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত বলা চলে না এবং বিজ্ঞানের স্বকীয় সাধনার জন্য এই মত সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। শক্তি, জড়্‌বস্তু বা গতিকে কার্যকরী প্রত্যয় বা ভাবের অতিরিক্ত কিছু মনে করলেও বিজ্ঞান যে লাভবান হয় তা নয়। এই ভাবনিচয় বা প্রত্যয়সমূহ দেশজাত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যানের জন্য

উপযোগী। সেগুলোর যদি পারমার্থিক কোনো যাথার্থ্য থাকেও তাতেই বা বৈজ্ঞানিকের কি দরকার? কারণ, বৈজ্ঞানিকের এই-সব ধারণা বা ভাবের প্রয়োজন শুধু আপাতদৃশ্য ও আবভাসিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যানের জন্য; ব্যাখ্যানের জন্য বৈজ্ঞানিককে এই প্রত্যয়গুলোকে ব্যবহার করতে হয়। যে প্রত্যয়গুলোকে ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সেগুলোর মূল্য এক। তবে বৈজ্ঞানিকের সীমা লঙ্ঘন করবার প্রবৃত্তির কয়েকটা হেতু আছে। প্রথমত এরকম একটা অস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত যে পরমসত্য অনুসন্ধানই যেন প্রত্যেক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে পরম সত্যের চাইতে অনেক কম সত্য হলেও চলে এবং প্রকৃতপক্ষে অনেক কম সত্যই চাওয়া উচিত, এই নীতিটা সকলে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। দ্বিতীয়ত তত্ত্ববিদ্যা অনেক সময় জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছে; ফলে জড়বিজ্ঞানী আত্মসমর্থনের তাগিদে তত্ত্ববিৎ হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তত্ত্ববিদ্যার হস্তক্ষেপ অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্র হল সীমাবদ্ধ। যতক্ষণ বিজ্ঞান দৃশ্যমান জগতের আপাত-সত্য ঘটনাসমুদয় ও সেগুলোর সংঘটনের নিয়মাবলী নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, ততক্ষণ তত্ত্ববিদ্যার দিক থেকে বিজ্ঞানকে সমালোচনা করবার কোনো হেতু নেই। তবে আপেক্ষিক সত্যকে, জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, যখন পরমসত্য বলে পরিবেশন করবার চেষ্টা করা হয় তখন সমালোচনা অত্যন্ত দরকার। নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায় যে, আজকাল বিজ্ঞানে যে-সব মত প্রচলিত আছে সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই তত্ত্ববিদ্যার দৃষ্টিতে সমর্থনীয় নয়। কিন্তু বর্তমান পুস্তকে এই আলোচনার স্থান বা অবকাশ নেই। প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখনো আলোচনার জন্য অবশিষ্ট আছে। সেগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক।

বিস্তৃতিসম্পন্ন বা ব্যাপ্তিসম্পন্ন জগৎ এক না বহু এবং যদি এক হয়, কি অর্থে? এই প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টাদশ অধ্যায়ে কালের ঐক্য নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। সেই সম্বন্ধে মূল সিদ্ধান্তগুলো এখানে স্মরণ করলে ভালো হয়। আমরা বুঝেছি যে সমুদয় কাল-প্রবাহ পরমতত্ত্বে সম্মিলিত হয়ে ঐক্যলাভ করে কিন্তু পরম ঐক্যটার স্বরূপ কাল-গত নয়।

আমরা দেখেছি যে একাধিক কাল-প্রবাহ থাকা সম্ভবপর ; সেগুলো পরস্পর-কাল-সম্বদ্ধ নাও হতে পারে এবং সেগুলোর ঐক্য কাল-জনিত নাও হতে পারে। ব্যাপ্তির ক্ষেত্রেও একই কারণে আমাদের সিদ্ধান্ত একই প্রকার হতে বাধ্য। জড়জগৎ বা ভৌতিক জগৎ কোনো প্রকার ভৌতিক পদার্থগত ঐক্যের জন্য এক নয়। পারস্পরিক-দেশগত-সম্বন্ধহীন একাধিক জড়জগৎ থাকা সম্ভবপর এবং একাধিক জড়পদার্থের পক্ষে একই স্থানের মধ্যেও থাকাতে কোনো বাধা নেই।

প্রথমে মনে হয় যেন মাত্র একটা দেশ আছে এবং সমুচয় ব্যাপ্তিগুণ-সম্পন্ন পদার্থ এই এক দেশ বা স্থলের অংশবিশেষ। কারণ, সমস্ত স্থান ও সমস্ত জড় পদার্থ পারস্পরিক দেশগত সম্বন্ধে আবদ্ধ। কিন্তু এই ধারণা বিচারসহ মোটেই নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আমাদের স্বপ্নগত প্রকৃতিরও ব্যাপ্তিগুণ আছে। এ ছাড়া আমাদের চিন্তারাজ্যে ও কল্পনা রাজ্যে হাজারও ব্যাপ্তিগুণসম্পন্ন জড়জগৎ আছে। কিন্তু স্বপ্ন বা কল্পনা বা চিন্তার এই-সব জড়জগতের নিজেদের মধ্যে কিংবা সেগুলোর ও বাস্তব জড়জগতের মধ্যে কোনো দেশগত সম্বন্ধ নেই। এবং স্বপ্নাদিতে দেখা জড়বস্তুসমূহ ও সেগুলোর দেশগত সম্বন্ধকে অসৎ বলা বৃথা। কারণ সেগুলোর অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা চলে না এবং সত্যিকারের ব্যাপ্তিগুণ সেগুলোর না থাকলেও আমি মানতে বাধ্য যে সেগুলো ব্যাপ্তি-গুণসম্পন্নরূপে প্রতিভাত বা উদ্ভাসিত হয়। স্বপ্নাদিতে দৃষ্ট জড়জগতের জড়ত্ব ও ব্যাপ্তিত্ব দুইই হল প্রত্যক্ষ তথ্য অথচ এই জড়জগৎ বাস্তব দেশের মধ্যে অবস্থিত নয়। কিন্তু পরমতত্ত্বে এই বিভিন্ন জড়জগৎ একতা লাভ করে এই উক্তি স্বীকার করতে হয়। সুতরাং পরমতত্ত্বের অন্তর্নিহিত মূল ঐক্য দেশগত ঐক্য নয়। ব্যাপ্তিগুণসম্পন্ন বিভিন্ন জড়জগতে ব্যাপ্তি-গুণের রূপান্তরের পর পরমতত্ত্বে সেই জগৎগুলো ঐক্যলাভ করতে পারে। পরমতত্ত্বে জড়জগৎসমূহের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য একান্তরূপে পরিবর্তন হতে বাধ্য ; এবং সেইজন্যই পরমার্থের অ-দেশগত ঐক্যের মধ্যে এই জড়জগৎ-সমূহ স্বীকৃত হতে পারে।

সাধারণত যে প্রকৃতিকে আমরা 'বাস্তব' বলে বিবেচনা করি সেই প্রকৃতি হল আমার দেহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ও ব্যাপ্তিগুণসম্পন্ন এক জগৎ।

আমার এই দেহের সঙ্গে যে যে পদার্থের দেশগত সম্বন্ধ আছে সেই সেই পদার্থের ব্যাপ্তিকে 'বাস্তব' বলে আমি গ্রহণ করি। কিন্তু আমার দেহ বলতে আমরা কোন দেহকে বুঝি? জাগ্রত অবস্থায় যে দেহকে প্রত্যক্ষ করি সেই দেহ, না, স্বপ্নে যে দেহকে প্রত্যক্ষ করি সেই দেহ, না, কল্পনাগত দেহ? যে দেহকে আমরা কল্পনায় দেখি তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষগত দেহের দেশজনিত কোনো সম্বন্ধ নেই। তেমনি স্বপ্নদৃষ্ট দেহ এবং 'বাস্তব' দেহ এক জিনিস নয় ও সেগুলোর মধ্যে দেশজনিত কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিশ্লেষণের ফলে বোঝা যায় যে 'বাস্তব' দেহ বলতে আমরা জাগ্রত অবস্থায় যে দেহকে ইন্দ্রিয়-দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, মাত্র সেই দেহকে বুঝি। জাগ্রত অবস্থায় প্রত্যক্ষীভূত দেহের সঙ্গে যে সব জিনিসের দেশগত সম্বন্ধ আছে সেগুলো দিয়ে গঠিত শৃঙ্খলাকে সাধারণত 'বাস্তব' জগৎ বিবেচনা করা হয়। এবং যা-কিছু এই রাজ্যের বাইরে অবস্থিত তাকে কাল্পনিক মনে করা হয়। নির্দিষ্ট কয়েকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এরকম দৃষ্টিভঙ্গি মন্দ নয়। কিন্তু পারমার্থিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে অন্যান্য সর্ববিধ দেশের অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। কারণ কল্পনার বা স্বপ্নের দেশও একটা তথ্য এবং কোনো তথ্যকে তত্ত্ব-বিচারে উপেক্ষা করা চলে না। আরো গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় পারস্পরিক-দেশজনিত-সম্বন্ধহীন অবস্থায় এমন একাধিক জড়জগৎ থাকতে পারে যেগুলোর প্রতিটার যাবতীয় দেশগত সম্বন্ধ হল নিজ চতুঃসীমার মধ্যে এবং কোনোটারই বাহ্য জগতের সঙ্গে কোনো দৈশিক সম্পর্ক নেই। সুতরাং সর্ববিধ প্রকৃতি এক অখণ্ড ও একক দেশের মধ্যে অবস্থিত এই ধারণা অমূলক।

পরস্পরের মধ্যে দেশজনিত-সম্বন্ধহীন অবস্থায় একাধিক জড়জগতের অস্তিত্ব যখন সম্ভবপর তখন প্রশ্ন ওঠে জগৎগুলোর মধ্যে দেশগত সম্বন্ধ না থাকলেও সেগুলো পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে কি না। আমরা বলব যে এইসব ক্ষেত্রে অন্যোন্য-ক্রিয়া সম্ভবপর যে নয় তা নয়। কিন্তু এই অন্যোন্য-ক্রিয়াকে অন্তঃপ্রবেশরূপে ধারণা করলে অসংগত হবে। এই রকম জগৎ-সমূহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াটা যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন সেই ক্রিয়াকে অন্তঃপ্রবেশ বলা চলবে না। কারণ, এই-সব জগৎ পৃথক পৃথক দেশে অসম্বদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত ও সেগুলোর মধ্যে দেশজনিত সংস্পর্শ

সম্ভবপর নয়। কিন্তু প্রত্যেকটা জড়জগতের নিজ সীমার মধ্যে এক জড়পদার্থের পক্ষে অন্য আর এক জড়পদার্থের অন্তঃপ্রবেশ করা হয়তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি এবার এই ব্যাপারটা বুঝাতে চেষ্টা করব।

আমার মনে হয় গ্রীসদেশীয় তত্ত্ববিদ্যা থেকে আমরা ধারণাটা পেয়েছি যে প্রকৃতি হল মহাশূন্যে অবস্থিত এক ঘন জড়পদার্থ। এবং খুব কম লোকে উপলব্ধি করে যে ধারণাটা কত ভঙ্গুর। এখানে আমি পদার্থবিদ্যা বা পদার্থবিদ্যায় স্বীকৃত ধারণাগুলোর কথা ভাবছি না, আমি প্রচলিত ও লৌকিক তত্ত্ববিদ্যার ধারণাটার কথা বলছি। এই লৌকিক তত্ত্ববিদ্যাকে শিক্ষিতদের হাটে-বাজারে প্রচলিত তত্ত্ববিদ্যা বলা চলে।

লৌকিক ধারণাটা থেকেই আর একটা ধারণার জন্ম হয়েছে। একটা জড়দ্রব্য আর-একটা জড়দ্রব্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এই ধারণাটা হল কুসংস্কারের ফল। এক জড়দ্রব্য অন্য আর এক জড়দ্রব্যের মধ্যে অন্তঃপ্রবেশ করতে পারে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর জড়পদার্থের সংজ্ঞার ওপর নির্ভর করে। ভিন্ন দ্রব্যসমূহের মধ্যে দেশগত প্রভেদ না থাকা সত্ত্বেও সেগুলো ভিন্ন থাকতে পারে স্বীকার করতে পারলে সেগুলোর অনুপ্রবেশ সম্ভবপর। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন যে জড়দ্রব্যকে একমাত্র দেশগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বর্ণনা করা যায়। তাঁদের মত সত্য হলে এইরূপ পার্থক্যের অভাবে জড়দ্রব্যও থাকতে পারে না। অর্থাৎ কেউ যদি ধারণা করে নেন যে জড় দ্রব্যের পক্ষে ব্যাপ্তি এত মৌলিক গুণ যে সেই গুণ ব্যতীত জড়দ্রব্যের ভিন্নতা অসম্ভব তা হলে জড়দ্রব্যসমূহের মধ্যে অন্তঃপ্রবেশও অসম্ভব। আর একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

একই স্থলের দুই ভিন্ন অংশের মধ্যে অন্তঃপ্রবেশ অসম্ভব। কারণ, অংশদুটোর ব্যাপ্তিগুণ-অতিরিক্ত আরো অন্যগুণ থাকা সত্ত্বেও ধরে নেওয়া হয় যে শুধু অন্যগুণের অস্তিত্ব একটা পদার্থের অস্তিত্বের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং কোনো পরিবর্তন-ক্রিয়ার ফলে যদি দুই শ্রেণীর অন্যগুণ একই ব্যাপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েও পড়ে, তবুও আমরা বলি না যে দুই বিভিন্ন ব্যাপ্তিগুণসম্পন্ন জড় পদার্থের সম্মিলন হয়েছে। কারণ, আমরা মনে করি যে এই ব্যাপারে একটা ব্যাপ্তিগুণসম্পন্ন জড়দ্রব্য অন্তর্হিত হচ্ছে; ফলে দুটো ব্যাপ্তি-সম্পন্ন দ্রব্য

থাকছে না। অতএব অনুপ্রবেশ অসম্ভব। অন্তঃপ্রবেশের জন্য দুটো দ্রব্যেরই অস্তিত্ব দরকার। শুদ্ধ দেশের কথা বাদ দিয়ে দুটো সগুণ দ্রব্যের কথা বিবেচনা করা যাক। যতক্ষণ দ্রব্যগুলোর পার্থক্য সেগুলোর বিস্তার-গুণের পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে বলে বিশ্বাস করা যায় ততক্ষণ বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে অনুপ্রবেশের কথা চিন্তা করা অসম্ভব। কারণ এই বিশ্বাস সত্য হলে দুই শ্রেণীর বিভিন্ন গুণের সমাবেশকে দুটো দ্রব্যের সমাবেশ বলা যায় না। প্রশ্ন ওঠে যে আমাদের ধারণা, বিশ্বাস বা কল্পনাটা কতদূর যুক্তিসহ। কোনো দ্রব্যের পার্থক্য কি একমাত্র দেশজনিত পার্থক্যের ওপর নির্ভরশীল? এবং অন্য গুণাবলীর পার্থক্যকে কি সব সময় ব্যাপ্তি-গুণের সঙ্গে সংযুক্তরূপে দেখতে হবে? প্রশ্নগুলোর উত্তরে বলা উচিত যে কোনো এক স্থলের দুই অংশে যদি অন্য এমন গুণগত পার্থক্য থাকে যার দ্বারা দুই অংশে স্থিত দুই দ্রব্যকে পৃথক বলে বিবেচনা করা সম্ভবপর তা হলে দ্রব্য দুটোর দেশজনিত পার্থক্য লোপ পেলেও সে দ্রব্য দুটোর দ্বিত্ব অস্বীকার করা উচিত নয়; এবং এই মত সত্য হলে পারস্পরিক অন্তঃপ্রবেশ সম্ভব। কারণ অন্তঃপ্রবেশের অর্থই হল একস্থানে দুই বিশিষ্ট সত্তার অস্তিত্ব। দুটো জিনিস একই জায়গায় থেকেও কি দুই থাকতে পারে না?

ওপরের প্রশ্নটার মীমাংসা না হওয়া অবধি স্বীকার করে নেওয়া যায় না যে জড়জগতের প্রতি অংশ অপর অংশের প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধী; বিভিন্ন জড়দ্রব্য যে পরস্পর পরস্পরকে বাধা দেয় এ বিশ্বাস অনিবার্য নয়। জড়-জগৎকে এইভাবে দেখলে পরমশূন্যতার কোনো অর্থ হয় না। পরমশূন্যতার ধারণা হল এক অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ধারণা। অন্তঃপ্রবেশ বিশ্বাসযোগ্য হলে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জড়দ্রব্যের আপেক্ষিক শূন্যতা সম্ভবপর মনে হয়: যেমন মনে করা যায় যে এক জড়দ্রব্যের সঙ্গে সংমিশ্রণে আর এক জড়দ্রব্যের ব্যাপ্তিগুণ যখন চলে যায়, তখন দ্বিতীয় দ্রব্যটা শূন্যে অবস্থিত। এই ধারণা দ্বারা প্রত্যক্ষ সুবিধা কিছু না হলেও পরমশূন্যতার ধারণার থেকে আমরা অন্তত রক্ষা পাই।

আমরা জেনেছি যে প্রকৃতির ঐক্য একমাত্র পরমতত্ত্বের মধ্যে সত্য, অন্য কোথায়ও নয়। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে প্রকৃতি কি সসীম না অসীম। প্রকৃতিকে অসীমরূপে কল্পনা করলে একই পদার্থকে যুগপৎ আছে

ও নাই ধারণা করতে হয়। কারণ যে পদার্থের মূর্ত অস্তিত্ব আছে সে পদার্থ সসীম হতে বাধ্য কিন্তু প্রকৃতিকে যদি সসীমরূপে অবধারণ করা যায় তাতেও অসুবিধা আছে। কারণ তা হলে মনে করতে হয় যে প্রকৃতির অন্ত আছে অথচ জড়জগতের অন্ত কল্পনা করা যায় না; কোনো জড়দ্রব্যের সীমা কল্পনা করতে গেলে সীমার বাইরে ব্যাপ্তির কল্পনা করতে হয়। এইভাবে প্রকৃতিকে বস্তু ও অবস্তুর এবং সীমা ও সীমাহীনের দুর্বোধ্য সংমিশ্রণ বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রকৃতি যে অসীম এই সিদ্ধান্ত আমাদের না মেনে উপায় নেই। এবং কেবল আমাদের জড়জগৎ নয় অন্য সর্ববিধ সম্ভবপর ব্যাপ্তিসম্পন্নজগৎ যে অসীম তা ধারণা করতে আমরা বাধ্য। সীমার স্বরূপই এমন যে তাকে নির্ধারিত করতে গেলেই তাকে অতিক্রম করতে হয়। এবং এই সীমাহীনতা যে শুধু বর্তমানকালস্থিত জগতের বেলায় সত্য তা নয়। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের দিক থেকেও জগতের কোনো দেশগত নির্দিষ্ট সীমা নেই। এবং সীমা-অসহিষ্ণুতা কেবলমাত্র ব্যাপ্তির বৈশিষ্ট্য নয়। গুণ ও সম্বন্ধের অসম্পূর্ণ সংযোগ দ্বারা জ্ঞাত যে কোনো সসীম সমাহারের এই একই ধর্ম। তবে ব্যাপ্তির মধ্যে আত্ম-অতিক্রমণ-প্রবণতা হল সব চেয়ে বেশি স্পষ্ট।

কিন্তু জড়জগৎ অসীম, এই উক্তির এমন অর্থ নয় যে কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে এক জগতে এক নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অস্তিত্ব আছে। এইরকম উক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক। এই উক্তি সত্য হলে স্বীকার করতে হবে যে জড়জগৎ থেকেও নেই। সুতরাং প্রকৃতি সসীম এই সিদ্ধান্তে পুনরায় আমাদের ফিরে আসতে হয়। এই উভয় সংকট প্রমাণ করে যে প্রকৃতির অবভাস মিথ্যা। পরমবস্তুর একাংশ মাত্র প্রকৃতি রূপে আবির্ভূত হয়। সমগ্রসত্তার মধ্যে রূপান্তরিত অবস্থায় প্রকৃতির ধারা হল সত্য। কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তারূপে প্রকৃতি অসংগতিপূর্ণ ও বিরোধক্লিষ্ট। আপেক্ষিক সত্তার ধর্মই হল যুগপৎ সীমা অন্বেষণ করা এবং সীমাপ্রাপ্তির পর স্বতো-বিরোধে জড়িত হয়ে পড়া। অন্য দিক থেকে প্রকৃতির সীমাহীনতা প্রমাণ করে যে সে এক অস্থির, অস্থায়ী, অসম্পূর্ণ ও ভাবগত বা কাল্পনিক পদার্থ। পরমবস্তুর থেকে পৃথকরূপে আপাতসত্য অবভাসরূপে প্রকৃতি হল একাধারে

সসীম ও অসীম এবং সেইজন্য অসত্য। পরমতত্ত্বস্থিত প্রকৃতি হল সীমা ও সীমাহীনতার দ্বন্দ্বের অতীত।

এইবার প্রকৃতির সমত্বের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। তত্ত্ব-বিদ্যার দিক থেকে এই বিষয়ে আলোচনার বিশেষ সার্থকতা নেই। সমত্বকে আমরা যে-অর্থে বুঝি সেই-অর্থে সমত্ব আছে কি না যথেষ্ট সন্দেহ। যে কোনো একটা জড়জগতে বা সমস্ত জড়জগতে সমুদয় জড়পদার্থ ও গতির পরিমাণ সর্বদা একই থাকে এই সাধারণ প্রত্যয় প্রমাণ করা অসম্ভব। কিংবা কোনো জড়জগতের গুণরাশিও যে সর্বদা অভিন্ন থাকে তারই বা প্রমাণ কি? আমাদের কার্যনির্বাহের জন্য দরকার ১. পরমতত্ত্বের সমত্ব বা অভিন্নত্ব এবং ২. দৃশ্যমান জগতের শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার জন্য বিশুদ্ধ সমত্ব নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতির শৃঙ্খলা বলতে আমরা যা বুঝি তার জন্য তিনটে জিনিস থাকলেই চলে। প্রথমত বিশ্বের সর্ববিধ পরিবর্তনের সঙ্গে অপরিবর্তন-শীল ও অভিন্ন পরমসত্তার সামঞ্জস্য দরকার। দ্বিতীয়ত আপাতসত্য অবভাস-সমূহের উদয়ের ধারা এমন হওয়া দরকার যে সসীম জীবের পক্ষে সেগুলো গ্রহণ করা সম্ভব। এইজন্য সংবেদনগুলোর আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ও সমত্বই যথেষ্ট। তৃতীয়ত কার্য-কারণ-বাদ এই অর্থে সত্য হওয়া দরকার যে সম কারণের উদ্ভবে সম কার্যও উৎপন্ন হবে। কার্যকারণনীতি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না যে অভিন্ন ও একই কারণ এবং অভিন্ন ও একই কার্য সর্বদা ঘটে চলেছে। এই নিয়ম বলে যে একটির বর্তমানতায় অন্যটি থাকতে বাধ্য। সেইরূপ প্রকৃতির সমত্বের সূত্র দ্বারা সূচিত হয় না যে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জগৎ এক ও অভিন্ন। এই বিষয়ে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে পুনরায় আলোচনা করা যাবে।

প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আরো অন্যান্য প্রশ্নের আলোচনা আমরা আবার পরে করব। এ পর্যন্ত বিচার করে আমরা জানতে পারছি যে পরমতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্ররূপে ও স্বাধীনভাবে প্রকৃতির কোনো বস্তুসত্তা নেই। প্রকৃতির বস্তুসত্তা হল পরমতত্ত্বের অবভাসরূপে। ভাবনা ও অনুভবের অখণ্ডতা থেকে দ্বিধাকৃত ও বিশিষ্ট প্রকৃতি হল একটা অসত্য একদেশী ভাব বা প্রত্যয় মাত্র এবং ব্যবহারিক জীবনে যে আমরা সব সময়ে প্রকৃতিকে এই সংকীর্ণরূপে দেখি তাও নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য এই দ্বিধাকরণ প্রয়োজন ও সমর্থনীয়। দৃশ্যমান

জগতের অন্তর্বর্তী জড় ঘটনাবলীর পারম্পর্য ও সহাবস্থান সম্বন্ধগুলোর সম্যক ধারণা করবার জন্য সেগুলোর নিমিত্তসমূহের পৃথক ও স্বতন্ত্র অনুসন্ধান করতে হয়। কিন্তু নিমিত্তগুলোকে বা নিমিত্তস্থানীয় তত্ত্বগুলোকে পৃথক কল্পনা করা এক জিনিস এবং সেগুলোকে পৃথক বস্তুরূপে বিবেচনা করা আর এক জিনিস। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নিমিত্তগুলোকে বা নিমিত্তস্থানীয় তত্ত্বগুলোকে পরম সত্য ও স্বপ্রতিষ্ঠ মনে করা একরকম বুদ্ধিহীন ও বর্বর তত্ত্ববিদ্যা।

পরমসত্তার থেকে বিশ্লিষ্টরূপে প্রকৃতিকে কল্পনা করলে প্রকৃতি শূন্যমাত্র; যে আভ্যন্তরিক দ্বিধাকরণ-ক্রিয়ার ফলে সমগ্র ব্যবহারিক বা আবভাসিক জগতের উৎপত্তি, তারই ফলে প্রকৃতির উদ্ভব। দ্বিধাকরণ-ক্রিয়ার দ্বারা অখণ্ড অনুভব, আত্মা ও অনাত্মা এবং সৎ ও চিৎ এই দুই বিপরীত বিন্দুতে বা ভাগে বিভক্ত হয়। এই দুই বিন্দুর এক চরমবিন্দু হল প্রকৃতি। ঐক্য ও আত্মনির্ভরশীলতার দিক হল আত্মার দিক; বহুত্ব ও পরনির্ভরশীলতার দিক হল প্রকৃতির দিক। প্রকৃতির রাজ্যে যাবতীয় ঘটনাবলী ঘটে উদ্দেশ্যহীন পথে ও বাহ্য শক্তির প্রভাবে; আত্মার রাজত্বে ঘটনাবলী ঘটে উদ্দেশ্যসাধনের পথে ও আত্মশক্তির প্রভাবে। পুরুষার্থ হল আত্মার দিকে; আকস্মিকতা হল প্রকৃতির দিকে। এই বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা হল অবাস্তব, ইচ্ছাকৃত ও কাল্পনিক। প্রকৃতি ও পুরুষার্থ এবং দেহ ও আত্মার বিষয় আমরা আবার পরে আলোচনা করব।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

দেহ এবং আত্মা

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের অভিজ্ঞতা হল যে দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ নির্ণয় করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার, আমি অভিজ্ঞতার এই শিক্ষা মেনে নিয়েছি। আমার মনে হয় যে শেষ পর্যন্ত এই দ্বিবিধ সত্তা ঠিক কিভাবে পরস্পরসম্বদ্ধ তা বর্ণনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের এই অসামর্থ্য প্রমাণ করে যে পরমবস্তুসম্বন্ধীয় আমাদের

সিদ্ধান্ত যথার্থ। কারণ দেহ ও আত্মা সমগ্রসত্তার দ্বিধাকৃত দুই রূপ; উভয়কে পৃথকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং পৃথককৃত দেহ ও আত্মা হচ্ছে আপাতগ্রাহ্য অবভাস মাত্র। এই দুই সত্তার অন্তর্বর্তী সম্বন্ধের সম্পূর্ণ ধারণা করতে হলে আমাদের শেষ পর্যন্ত জানতে হয় যে দেহ ও আত্মা পরমবস্তুতে কিভাবে মিলিত হয়। কিন্তু মানুষের পক্ষে এই পারমার্থিক জ্ঞান অসম্ভব। সুতরাং মানতে হবে যে দেহ ও আত্মার সংস্রবসম্বন্ধীয় আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ হবেই।

কিন্তু এই অপারগতার জন্য পরমতত্ত্বসম্বন্ধীয় আমাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করা অসংগত। যেহেতু কয়েকটা ব্যাপারে 'কি প্রকারে' প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না সেইজন্য আমাদের সিদ্ধান্ত বা মতবাদ যে অসিদ্ধ এরকম বিশ্বাস করা অশোভন। কোনো মত বা পথের মধ্যে যতক্ষণ কোনো অসংগতি না পাওয়া যায় ততক্ষণ তার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা যায় না। কোনো সাধারণ মত বা সিদ্ধান্তের প্রকৃতি যদি এমন হয় যে তার দ্বারা একটা বিশেষ সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত অথচ সেই সমস্যা যদি ঐ মত দ্বারা অব্যাখ্যাত থেকে যায়, তা হলে ঐ মত হল আপত্তিজনক। তার পর ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা করবার মতো কোনো তথ্য যদি থাকে তা হলে ঐ সিদ্ধান্তের অবস্থা হয় আরো শোচনীয়। কিন্তু আমাদের মূল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এইরকম আপত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে এসেছি সেই সিদ্ধান্ত অনুধাবন করলেই বোঝা যায় কেন সর্ববিধ প্রশ্নের উত্তর অসম্ভব। তা ছাড়া দেহ ও আত্মার সম্বন্ধের মধ্যে এমন কোনো তথ্য নেই যার দ্বারা আমাদের সাধারণ মত বাধিত হয়। আমি দেখাবার চেষ্টা করব যে, দেহ বা আত্মা বা উভয়ের মধ্যে সংস্রব কোনোটারই দ্বারা পরমতত্ত্বের বস্তুসত্তার বিরুদ্ধতা করা যায় না।

বর্তমান সমস্যাটা প্রধানত একটা কারণের জন্য উদ্ভব হয়েছে। সেই কারণটা এই যে, দেহ ও আত্মাকে দুই ভিন্ন শ্রেণীর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তারূপে চিন্তা করা হয়েছে। দুই পৃথক ও স্বাধীন সত্তারূপে কল্পনা করার ফলে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ বা সংস্রব দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে এবং এক সত্তা অন্য সত্তাকে কি করে প্রভাবিত করে তা বুঝতে আমরা হয়রান হয়ে যাই। তার পর যখন উভয়ের সম্বন্ধ নিরূপণে আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হই তখন বিরক্ত

হয়ে নিশ্চয় করি যে দেহ ও আত্মার মধ্যে কোনো সংযোগই নেই। কখনো কখনো আমরা ভেবে থাকি যে দেহ ও আত্মারূপী দুই ঘটনার ধারা সংস্রবহীন পাশাপাশি ঘটে চলেছে এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াটা হল একটা মিথ্যা আরোপ মাত্র। কিন্তু পাশাপাশি অবস্থানের জন্যই একপ্রকার সংস্রব স্বীকার করতে হয়। বাধ্য হয়ে প্রত্যক্ষ সংস্রবের পরিবর্তে পরোক্ষ সংস্রব কল্পনা করতে হয়। আমরা কল্পনা করি যে দুটো ধারারই আশ্রয়স্থল হল একটা বস্তু এবং পরোক্ষ সংস্রবটা হল এই অন্তর্নিহিত বস্তুর একতা-জনিত। এই পরিণতিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে যতক্ষণ দেহ ও আত্মাকে স্বতন্ত্র বস্তুসত্তা-রূপে গ্রহণ করা হয়, ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে সংস্রব কল্পনা করা যায় না এবং যখনই উভয়ের মধ্যে সংস্রব কল্পনা করা হয় তখনই দেহ ও আত্মার বস্তুসত্তা নষ্ট হয়ে যায় এবং সে দুটো আপাতদৃশ্য ও আবভাসিক সত্তায় পরিণত হয়। এই শেষোক্ত পরিণতির জন্য আমরা অনেকেই প্রস্তুত নই। তাই আমরা মনে করি দেহ ও আত্মা দুটোই হয়তো বস্তু নাও হতে পারে, তবে দেহ নিশ্চয়ই বস্তু; কারণ, আত্মা ছায়াধর্মী এবং আত্মাই বস্তু হলেও হতে পারে। এইভাবে বিচার করে আমরা নিরীহ আত্মাকে জলাঞ্জলি দিই, পারস্পরিক প্রভাবের কথাও পরিত্যাগ করি, এবং বলি যে দেহই হল বস্তু বা বিশেষ্য এবং আত্মা হল তার আশ্রিত এক বিশেষণ মাত্র। তবে বিশেষণের ধর্মই হচ্ছে বিশেষ্যকে গুণান্বিত করা। সেইজন্য কল্পনা করি যে আত্মা দেহের কোনো অঙ্গবিশেষের এক প্রকার অশরীরী ক্ষরণ মাত্র। আশ্চর্যের বিষয় জড়পদার্থের আপাতগৃহ্য ও আবভাসিক সত্তা ব্যতিরেকে অন্য কোনো সত্তা নেই জানবার পরও এই ক্ষরণবাদী মত পরিত্যাগ করতে আমাদের মায়া হয়। প্রায়শই দেখা যায় যে শরীরকে ভাব ও অনুভূতি মাত্র স্বীকার করেও আত্মাকে শরীরের অশরীরী ও অবান্তর ক্ষরণরূপে কল্পনা করতে অনেকেরই একেবারে বাধে না।

দেহ ও আত্মার স্বরূপ ও উভয়ের সম্পর্ক-সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতবাদের বর্ণনা দেওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ এই-সব মতবাদ থেকে আমাদের শেখবার বিশেষ কিছুই নেই। আমরা এতক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি যে দেহ ও আত্মার সত্তা হল প্রতীয়মান বা আবভাসিক মাত্র। এই দুই সত্তার স্বরূপ কি ও কোন্ বিশিষ্টরূপে এই দুই আপাতদৃশ্য ও আবভাসিক সত্তা

পরস্পরকে প্রভাবিত করে তা এখন আমি দেখাবার চেষ্টা করব। সর্বপ্রথমে দেহ ও আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক।

দেহটা কি? পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই প্রশ্নের উত্তরের একটা আভাস পাওয়া গেছে। প্রাকৃতিক জগতের এক ক্ষুদ্র অংশ হল আমার দেহ। কিন্তু প্রকৃতি স্বতন্ত্র সত্তারূপে সম্পূর্ণ অবস্তু। সমগ্র সত্তার মাত্র একাংশ হল প্রকৃতির অন্তর্বর্তী উপাদানগুলো। কতগুলো অর্থসিদ্ধির জন্য সমগ্র অনুভবের একাংশকে যখন সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্নরূপে ভাবনা করা হয় এবং স্বতন্ত্র সত্তারূপে কল্পনা করা হয় তখন প্রকৃতির জন্ম হয়। সুতরাং দেহ হচ্ছে প্রকৃতির এক ক্ষুদ্র অংশ, এই বাক্য দ্বারা আমরা বোঝাতে চাই যে দেহের কোনো বস্তুসত্তা নেই, দেহের সত্তা মাত্র আবভাসিক ও আপাতস্বীকৃত। এক কল্পিত সত্তার কল্পিত ভেদের নাম দেহ। জড়পদার্থরূপে দেহের সাধারণ রূপ হল এই। বিজ্ঞানে জৈব-পদার্থরূপে জীব-দেহের যে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে আমি এখানে কিছু না বলাই ভালো মনে করি। আমাদের দৃষ্টিতে দেহ হল আনন্তর্যশীল ও অনির্দিষ্ট একটা বিন্যাস; তার কিছুটা গুণগত ঐক্য বা সমতা আছে। তত্ত্ববিচারের দিক থেকে দেহের অস্তিত্বের জন্য আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ হল অবশ্যস্বীকার্য; এটা বলে রাখা ভালো (ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এইখানে আমরা দেহের আপাতস্বীকৃত বা আবভাসিক রূপের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। যে ভৌতিক উপাদানের দ্বারা দেহ তৈরি সেই উপাদানের অস্তিত্বই নির্ভর করে অনুভবের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সংযুক্তির ওপর। সমগ্র অনুভবকে দ্বিধাকৃত করার ফলে ভৌতিক উপাদানের কল্পনা সম্ভবপর হয়; সেইজন্য তার সত্তা সংগতিপূর্ণ নয়। পৃথক ও স্বতন্ত্ররূপে জড়পদার্থ হচ্ছে দুই অনবগত বস্তুসত্তার অন্তবর্তী এক সম্বন্ধ মাত্র। সুতরাং দেহ যে উপাদানসমূহ দ্বারা গঠিত সেগুলোর অস্তিত্বই কাল্পনিক ও ভাবগত। এইভাবে সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারি যে বিশেষ কতগুলো অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য ও এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমগ্র সত্তার এক অংশকে পৃথক ও স্বতন্ত্র দেহসত্তা রূপে আমরা কল্পনা করি। দেহের স্বরূপ এর বেশি আর কিছু নয়।

অন্য দিকে আত্মাও কোনো স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বাধীন সত্তা নয়। আমরা পূর্ব-বর্তী এক অধ্যায়ে দেখেছি যে আত্মারূপে আমরা যে সত্তাকে পাই তারও

সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ বস্তুসত্তা নেই। আত্মাও হল এক কল্পিত, অসম্পূর্ণ ও প্রতীয়মান সত্তা মাত্র। আমরা দেখেছি যে আত্মা ও পরমবস্তুর মধ্যে অনেক প্রভেদ। সুতরাং আত্মা শব্দকে আমরা কি অর্থে ব্যবহার করব সেটাই আমাদের আলোচ্য। আত্মা হল প্রত্যক্ষ অনুভবের সসীম কেন্দ্রবিশেষ ; তার কিছুটা আনন্তর্য ও কিছুটা গুণগত সমতা আছে। এই বর্ণনার মধ্যে "প্রত্যক্ষ" শব্দটা লক্ষণীয়। যখন চৈতন্যগত ঘটনাবলীকে কালের অন্তর্গত বলে ধরা হয় তখন আত্মাকে চৈতন্যগত ঘটনার সমষ্টিমাত্র বলা যেতে পারে। আত্মাকে এইভাবে দেখবার সময় জ্ঞাতা, কর্তা বা ভোক্তার চেতনাস্থিত ঘটনাবলীর বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। কারণ, বিষয়ের উল্লেখ হল নিঃসন্দেহে চৈতন্যস্থিত ঘটনাবলীর বহিঃস্থ কোনো পদার্থসমূহের দিকে। যে-কোনো এক মুহূর্তের সমগ্র অনুভবরাশিকে অর্থাৎ সমগ্র 'ইদমধুনা'কে (ইদম্ + অধুনা) যে-ভাবে আসছে আসতে দিন এবং কালের ধারার মধ্যে এই অনুভবরাশি কি ভাবে পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও অপরিবর্তিত থাকছে লক্ষ্য করুন এবং অনুভবরাশির বিষয়গুলো থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে সেগুলোর ঘটনারূপের দিকে নিবদ্ধ করুন, দেখতে পাবেন সেগুলো কেমন অবিশ্রান্তধারায় ঘটে চলেছে এবং বিনা বাহ্য প্রভাবে নূতন নূতন অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা আপনি আত্মাকে বুঝতে পারবেন।

পরমবস্তু নয়, অতএব আত্মা হল কেবল আপাতস্বীকৃত বা আবভাসিক এক সত্তা, এই স্বীকার করলেই সমস্ত গোলমাল মিটে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা ও বিশ্বের অন্যান্য অংশের মধ্যে সম্বন্ধের বিষয়ে আমরা একটা কার্যকরী ধারণা না করতে পারি ততক্ষণ শুধু সম্মূঢ় হয়ে থাকতে হয়। অনেক সময় মানসিক বা চিন্ময় শব্দের সংজ্ঞা এত অসম্ভবরূপে বিস্তীর্ণ করে ধরা হয় যে সেই সংজ্ঞা ব্যবহারের দ্বারা কোনো ফল পাওয়া যায় না। এক দৃষ্টিতে যে কোনো অর্থ বা বিষয় আমার চৈতন্যের সম্মুখে উপস্থিত হয় তাই আমার আত্মা বা মনের অবস্থা মাত্র। যদি এই বিস্তীর্ণ অর্থে 'চিন্ময়' শব্দের ব্যবহার করা যায় তা হলে সমগ্র বিশ্ব চিন্ময় হয়ে পড়ে। এমন-কি আমার অস্মিতাও দুর্বোধ্যরূপে স্বীয় চেতনার বিকার মাত্রে পরিণত হয়। এই বিষয়ে সব চেয়ে দরকার হচ্ছে মনে রাখা যে ক. আত্মার অস্তিত্ব ও খ. যা কিছু আত্মার অস্তিত্ব বা জীবনকে ভরে রাখে, এই দুটো জিনিসের মধ্যে প্রভেদ আছে।

প্রায়ই দেখা যায় যে আমরা এই প্রভেদ ভুলে যাই। বিশ্বে আত্মা ব্যতীত আর কিছু নেই এই কল্পনা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় সমস্যার কোনো মীমাংসা হয় না। প্রশ্ন থেকেই যায় আত্মা তা হলে কোথায় আছে? দেহ ও বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথকরূপে আত্মার অস্তিত্ব আমাদের দরকার।

প্রশ্নটা দুই দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমে প্রশ্নটা যিনি বিবেচনা করছেন সেই ব্যক্তির নিজ ও আন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখা যেতে পারে। তার পর দেখা যেতে পারে অন্যান্য পুরুষ বা আত্মার বাহ্য দৃষ্টি দিয়ে।

অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যে অনুভব আমার কাছে এই মুহূর্তে উপাত্ত বা আপ্ত বলে মনে হচ্ছে কিংবা এইমাত্র যে 'ইহা'র অনুভবটা 'আমার' বলে প্রতীতি হচ্ছে সেই অনুভবটাই কি আমার আত্মা বা অহং? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি না, কখনোই না। কারণ, এইরকম অস্তিত্ব অতি ক্ষণস্থায়ী। আমার আত্মা কেবল এক ক্ষণের জন্য স্থায়ী নয়, কালের পরিবর্তনের মধ্যে আত্মা সমতা রক্ষা করে চলে। অবশ্য আমি একথা বলতে পারি না যে আত্মা সবসময়ই নিজের অভিন্নতা বা ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন। এবং আত্মার অস্তিত্বের জন্য কতখানি সমত্ব বা স্থায়িত্বের প্রয়োজন সেই বিষয়েও আমি এখানে কিছু বলব না। এই বিষয়ে আমি প্রয়োজনমত পরে আলোচনা করব। আমাদের বিচারের সারাংশ হল এই যে আত্মাকে আত্মা হতে হলে এক ক্ষণের অভিজ্ঞতা বা অনুভবের অধিক স্থায়ী তাকে হতে হয়; সুতরাং ক্ষণস্থায়ী, প্রত্যক্ষ ও উপাত্ত অভিজ্ঞতা বা অনুভব আত্মা নয়।

বিজ্ঞান বা অনুভবকে অন্য অর্থে গ্রহণ করলেও আমাদের অসুবিধা কমে না। বিজ্ঞান বা অনুভবকে এক ক্ষণের অনুভব ধারণা করে যে বিপত্তির উদ্ভব হয়েছে অনুভবকে বিস্তীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলেও সেই বিপত্তি থেকে যায়। আমি নিজের দিক থেকেই দেখি কিংবা অন্য কেউ বাইরে থেকেই দেখুক, আমার চৈতন্যবৃত্তি এবং আমার চৈতন্যস্থিত বিষয়গুলো সমান ও সগোত্র নয়। আমরা যতদূর জানি, অন্যান্য আত্মা, অন্যান্য দেহ, এমন-কি ঈশ্বর পর্যন্ত এক অর্থে আমার চৈতন্যের বিকার বা অবস্থা মাত্র। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্যান্য জীব ও ঈশ্বরও আমার চৈতন্যের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। বাধ্য হয়ে সেইজন্য আমরা চৈতন্যের অবস্থার মধ্যে দুই দিকের প্রভেদ স্বীকার করতে সম্মত হই। ১. মানসিক বৃত্তি

বা ঘটনার অস্তিত্বের দিক এবং ২. ঐ বৃত্তি বা ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা বিষয়ের দিক। আমরা স্পষ্টই লক্ষ্য করি যে আমাদের অভিজ্ঞতা বা বিজ্ঞান প্রধানত ও মূলত ভাবমুখী বা প্রত্যয়াত্মক। আমাদের সংবিদ বা বিজ্ঞানের মধ্যে যে ভাবপ্রবণতা আছে তারই ফলে প্রাথমিক অনুভবের অখণ্ডতা বিশ্লিষ্ট বা দ্বিধাকৃত হয়ে পড়ে ; বিশ্লেষের ফলে আত্মা ও অনাত্মার ধারণার উদয় হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন অংশের প্রভেদ ও সেগুলোর মধ্যে ও আমার আত্মার মধ্যে প্রভেদও এই ভাবনির্মাণক্রিয়ার ফলে আমরা পাই। বিশ্বের বিরাট ইমারতটাই গড়া হয় এইরূপে ভাব ও অস্তিত্বের বিয়োজনক্রিয়া দ্বারা। সুতরাং চৈতন্যের অবস্থা দ্বারা আমি যে-বিষয়কে নির্দেশ করি বা উল্লেখ করি সেই-বিষয়টা একটা চিন্ময় বৃত্তিমাত্র নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিলে তত্ত্বটা পরিষ্কার হতে পারে। আমার দেহ বা আমার ধেনুর বিষয় চিন্তা করা যাক (এখানে ব্রেডলি দেহ ও অশ্বের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন)। নিঃসন্দেহে এই উভয় বস্তুই অন্তত আমার পক্ষে অনুভব ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। কারণ, যার বিষয়ে আমার কোনো অনুভব নেই তার অস্তিত্ব আমার কাছে নেই। এবং আমাকে যদি এই দুই বস্তুর আপ্ত বা উপাত্ত সত্তাকে খুঁজে বার করতে হয় তা হলে সেগুলোকে আমার অনুভবের মধ্যে ছাড়া অন্যত্র কোথাও পাওয়া যাবে না। এই দুই বস্তুকে আমি যখন প্রত্যক্ষ করি বা চিন্তা করি তখন আমার চৈতন্যস্থিত অনুভব বা বিজ্ঞানের বাইরে কোনো সত্তা বা তথ্যকে পাই না। কিন্তু আমার অনুভব বা বিজ্ঞানের অবস্থারূপী তথ্যটা নিশ্চয়ই আমার দেহরূপী বা আমার ধেনুরূপী তথ্য নয়। আমার দেহের অস্তিত্ব ও আমার ধেনুর অস্তিত্ব বলতে আমি যা বুঝি তা আমার চৈতন্য বা অনুভবের মধ্যে যা আছে তাই নয়, আমার চৈতন্য বা অনুভবের সামনে যা আছে তাই।

আমার দেহ ও আমার ধেনুর অস্তিত্ব হল তৎ-সম্পর্কিত চৈতন্যবৃত্তির অস্তিত্ব থেকে পৃথক একটা বিষয় বা ভাব। পদার্থদুটোর অস্তিত্ব হল এমন একটা 'কিম্' যা 'তৎ'কে অতিক্রম করেছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে সত্য তথ্যের তথ্যতা হল ভাবগত বা প্রত্যয়গত মাত্র। এইজন্য বিশ্ব ও বিশ্বের উপাদানগুলোকে চৈতন্যের বা মনের বিকার বা অবস্থামাত্র বলা চলে না। বরঞ্চ বিপরীত বলা সংগত হবে যে এইসব বিষয়ের অস্তিত্ব তখনই সম্ভব হয় যখন মানস-ঘটনাগুলোর ঘটনারূপী অস্তিত্বটা নষ্ট হয়ে

যায়। কারণ, বস্তু বা বিষয়গত জ্ঞানের জন্য চৈতন্যবৃত্তি বা মানস-ঘটনার দ্বিধাকরণ প্রয়োজন ; তার ফলে, চৈতন্যবৃত্তি বা মানস-ঘটনা থেকে অর্থ বা বিষয় বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে ; এবং ধারণা করা সংগত হবে যে বিচ্ছেদ বা বিভাজনের দ্বারা চৈতন্যবৃত্তিটা নস্যাৎ হয়। সিদ্ধান্তটাই তা হলে হল এই : অনুভবের অবর্তমানে জ্ঞেয় বস্তু বা বিষয় থাকে না ; অপর পক্ষে মানসিক অনুভবরূপে অনুভবের অবর্তমানেই জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভবপর। সুতরাং 'তৎ' বা তথ্য দুরকম ; 'কিম্'-সংযুক্ত 'তৎ' বা জীবন্ত তথ্য এবং 'কিম্'-বিযুক্ত 'তৎ' বা মৃত তথ্য।

আমার চৈতন্যের বিভিন্ন অবস্থার অন্তর্বর্তী তাৎপর্য বা বিষয়গুলোকে আমার আত্মা বলা যায় না। অপর পক্ষে এই বিষয়গুলো বাদ দিলেও আমার আমিত্ব থাকে না। কারণ, এই বিষয়গুলোর জন্যই আমার আত্মার বৈশিষ্ট্য। তাই আমরা বলি যে, একজন মানুষ যা অর্থাৎ যে বিষয়ে ভাবে মানুষটা তাই। যাদৃশী মানুষের ভাবনা তাদৃশী তার সিদ্ধি। ভাবের ক্রিয়াশক্তি প্রত্যেক মানুষের মনের ঘটনারাশিকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। নৈর্ব্যক্তিক ভাব বা ধারণার প্রভাবে চৈতন্যস্থিত ঘটনাগুলো এক বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয়। ন্যায়শাস্ত্র বা নীতিবিদ্যার নিয়মগুলো বা সূত্রগুলো আমার মনের মধ্যে এইরূপে কার্যকরী হয়। আত্মার অংশ না হয়েও এই নিয়মগুলো মনের অবস্থাগুলোর পারম্পর্য নির্ধারিত করে। এই সম্বন্ধে আমি পরে আবার আলোচনা করব। প্রকৃতপক্ষে এই আলোচনা মনস্তত্ত্বের বিষয়। কি কি কারণের জন্য মানসিক ঘটনাগুলোর পারম্পর্য নির্দিষ্ট হয় মনস্তত্ত্বে তার বিস্তৃত আলোচনা দরকার। এখানে শুধু মৌলিক প্রভেদটার গুরুত্ব স্বীকার করলেই যথেষ্ট হবে। বিষয়রূপী ভাবগুলো নিঃসন্দেহে আমার চৈতন্যে উপস্থিত হয়; সেগুলো আমাকে বা আমার স্বকীয়তাকে পুষ্ট ও প্রভাবিত করে। কিন্তু তবুও বলা যায় না যে আমার স্বকীয়তা বা আত্মা হল আমার মনের বিভিন্ন ভাবের সমষ্টি মাত্র।

আমরা দুটো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। আমার অনুভবের অন্তর্বর্তী যাবতীয় বিষয়ের সমাহারকে আমার আত্মা বলা যায় না। অপর পক্ষে শুধু প্রত্যক্ষ অনুভবগুলোও আমার আত্মা নয়। 'ইহা'র সাক্ষাৎ অনুভবের স্বরূপ হল এই যে তা 'তৎ' ও 'কিম্'-এর ঐক্যবদ্ধ এক অনুভব ; এই অনুভব এবং

আত্মা একার্থক নয়। তবে আত্মা কি? তা হলে বোধ হয় আত্মাকে বর্ণনা করা চলে না। আত্মা কেবল এক মুহূর্তের অনুভবের কেন্দ্রবিশেষ নয়। আত্মা একটা স্থায়ী পদার্থ। আমরা আত্মা বলতে বুঝি দীর্ঘস্থায়ী, কিছুটা গুণগতসমত্বসম্পন্ন ও চৈতন্যস্বরূপ এক পদার্থকে। আত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা সম্ভবপর নয়। কারণ আমাদের আত্মা হল মুহূর্তের অনুভবের সীমার অতীত কল্পিত একটা ভাববিশেষ। তবে ভাবনির্মাণ খুব বেশিদূর এগোলে আত্মার কল্পনা বিনষ্ট হয়। ভাবসৃষ্টির কাজে খানিকটা এগিয়ে তার পর থমকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে আত্মাকে পাওয়া যায়। কোনো এক মুহূর্তের আপ্ত বা উপাত্ত অনুভবের ওপর দাঁড়িয়ে সেই অনুভবের সঙ্গে অন্যান্য সদৃশ অনুভবগুলোর ভিত্তিতে অভিন্ন অনুভবশীল এক পদার্থের অনুমান করুন, তার পর অতীত ও বর্তমান অনুভবগুলোকে একটা পারম্পরিক ধারার মধ্যে কল্পনা করুন ; তার পর কালের সেই ধারার মধ্যে আকস্মিকতার স্থলে একটা কার্যকারণপ্রবাহ কল্পনা করুন ; তার পর আপনার কল্পনাকে আর এগোতে দেবেন না। এখানে থেমে যে ধারণাটা আপনার হল সেটাই আত্মার ধারণা। কিন্তু চিন্তার দৌড় যদি এর পরেও চালিয়ে যান আত্মাকে ফেলে আপনি অনেক দূরে চলে যাবেন। আত্মাকে বাঁচাতে হলে মধ্যপথে অসংগতির ভঙ্গিতে আপনাকে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কারণ কালের রাজ্যের অন্যান্য 'বস্তু'-র মতো আত্মার বস্তুত্ব মূলত ভাবগত। আপ্ত বা উপাত্ত রূপে আমাদের কাছে যা কিছু আসে, বাস্তব অনুভবরূপে মুহূর্তের পর মুহূর্ত আমরা যা কিছু পাই, সব কিছু ছাড়িয়ে ও ছাপিয়ে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় ; যে অনুভবের সম্ভাবনা পর্যন্ত নেই তাকেও অতিক্রম করে, আত্মা আছে এরকম বিশ্বাস করা হয়। চৈতন্যের মধ্যে আনুপূর্বিকতা ও সহভাব সম্বন্ধের প্রভাবে আত্মা নিয়মানুগত একটা ভাবগত পদার্থে পরিণত হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে আত্মা এক শাশ্বত পদার্থ হয়ে ওঠে। আর বেশি এগোলে আত্মার কল্পনার কোনো ব্যবহার থাকে না। এখানে এসে চিন্তার অগ্রগতি বন্ধ না করলে জীবনের ওপর আত্মার আর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না এবং স্বকীয়তা বলেও কিছু থাকে না। সেইজন্য এই পর্যন্ত এসে আমরা থেমে যাই। এই পর্যন্ত এসে আত্মা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা ও বিশ্বাস হয় তা হল এই : আত্মা কালের প্রবহমান ধারার মধ্যে

বেঁচে আছে এবং চৈতন্যস্থ ঘটনাগুলোর মধ্যে থেকেও সে কালাতীত। আত্মার অন্তর্গত ভাবগুলোর কালের প্রবাহকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা আছে এবং সেগুলো কালের প্রবাহকে নিয়ত প্রভাবিত করে থাকে। আত্মার এই স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে দুটো পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির একটা কৃত্রিম ও কার্যকারী সামঞ্জস্যের ওপর ভিত্তি করে আত্মার ধারণা প্রতিষ্ঠিত। একটা বিশেষ অভিপ্রায়ে ও বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে আমরা আত্মাকে লাভ করি। আত্মার স্থায়িত্ব বা নিরবচ্ছিন্নতা হল শুধু একটা ভাবগত তথ্য ; অথচ আমরা এমন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করি যেন আত্মার স্থায়িত্ব বা আনন্তর্য একটা অনুভূত তথ্য। অসংগতিটা আরো ধরা পড়ে যখন চৈতন্যের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলোকে আমরা যেভাবে ব্যবহার করি তার দিকে দৃষ্টি দিই। চৈতন্যের বিষয়ের কোনো শেষ বা সীমা নেই। গোটা বিশ্ব ও বিশ্বের সমুচয় তথ্য চৈতন্যের বিষয় হতে পারে ; সেগুলো আবার চৈতন্যের বিভিন্ন বৃত্তির বিষয় হতে পারে। সেইজন্য আমার চৈতন্যের বিষয়গুলোর সমষ্টিকে বা ভাবগুলোর সমাহারকে আত্মা বলা অর্থহীন ; অথচ এক অর্থে এও ঠিক যে আমার অস্মিতা বিষয়গুলোর দ্বারাই গঠিত ও প্রভাবিত। আত্মার এই দ্বি-মুখীরূপে বিশ্বাস করতে হয় ; সেইজন্য ভান করতে হয় ভাবের দুই মুখ। ১. এক দৃষ্টিতে ভাবগুলো যেন আমার চৈতন্য-স্রোতের ভিতর থেকে তাকে প্রভাবিত ও পুষ্ট করছে এবং আত্মার বাস্তব আনন্তর্য রক্ষা করেছে এবং ২. অন্য দৃষ্টিতে ভাবগুলো যেন শুধু আত্মার সম্মুখে উদিত হয়ে চলেছে। এক প্রকার আত্মবঞ্চনার ওপর আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। ব্যবহারিক জীবনে এ ধরণের বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কতগুলো তথ্যকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার কৌশলের ওপর আত্মার অস্তিত্ব নির্ভর করে। অতএব আত্মা হল এক আপাতস্বীকৃত অবভাসমাত্র। আত্মার কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই।

পরমতত্ত্বের দিক থেকে এই প্রশ্নটা বিবেচনা করলে হয়তো আরো কিছু জানতে পারা যাবে। পরমাত্মার চৈতন্যে যা কিছু আছে তা কোনো না কোনো জীবাত্মার চৈতন্যের অংশীভূত। (সপ্তবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই বাক্য সত্য হলে জীবাত্মার বস্তুসত্তাও কি পরমসত্য বলে প্রতিপন্ন হয়? উত্তরে বলতে

হয়, না। কারণ, জীবাত্মার অবস্থান হল ভ্রম ও ভানের রাজ্যের মধ্যে। জীবাত্মাকে আমরা যে-ভাবে জানি সেই-ভাবে জীবাত্মা পরমতত্ত্বের মধ্যে সত্য নয়। রূপান্তরিত হবার পর জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মেলে। এই রূপান্তরের ফলে জীবাত্মার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। (ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কারণ, পরমসত্তার মধ্যে ভাব ও তথ্যের কোনো প্রভেদ নেই। আমাদের অখণ্ড অনুভব হল অসম্পূর্ণ; সেই অনুভব ভেদ করে পার্থক্য ও সম্বন্ধের ভাবগুলোর উৎপত্তি হয়; পরমতত্ত্বের অখণ্ড অনুভব হল পূর্ণ; সেই অনুভবের মধ্যে পার্থক্য ও সম্বন্ধের ভাবগুলোর বিলয় হয়। সসীম জীবাত্মা ও পরম-চৈতন্য, এই দুটোকে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত দুই বস্তু বলে কল্পনা করা যাক; তা হলে বোঝা যাবে যে, অন্তর্বর্তী প্রদেশটা হল প্রথম স্তর থেকে দ্বিতীয় স্তরে যাবার একটা রাস্তাবিশেষ; এই মধ্যপ্রদেশে যতরকম বিরোধ ও যতরকম বিবাদ। এই অন্তর্বর্তী প্রদেশে যতরকম ভাব নিকৃষ্ট তথ্য থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে উচ্চতর তথ্যে মিলতে চায় ও যায়। আমাদের কল্পনার মধ্যে একটু দোষ আছে। আমরা ধরে নিয়েছি যে নিম্নস্তরের অনুভব একেবারে ভেদহীন ও সংগতিপূর্ণ; কিন্তু যথার্থত সবরকম আপ্ত অনুভবই ভেদ-গর্ভিত। তবে ত্রুটিটাকে উপেক্ষা করা যাক ও আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবকে 'বাস্তব' বলে কল্পনা করা যাক ও দেখা যাক আমরা কি জানতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে জীবের নিম্ন অনুভব বা পরমসত্তার উন্নত অনুভব কোনোটাকেই আমার 'আত্মা' বলতে পারা যায় না। কারণ আমার প্রত্যক্ষ অনুভব হল এক নিমেষের জন্য এবং পরম সত্তার অনুভব শাশ্বত ও কালাতীত। সুতরাং 'আত্মা' হচ্ছে ভ্রম ও ভানের দেশের অধিবাসী। আত্মার বহুত্বও শুধু আপাত-সত্য; বহু আত্মার অস্তিত্ব পারমার্থিক বিচারে সত্য নয়। নিম্নতর ভাব উচ্চ-তর ভাবের দিকে স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হয়; ভাবের এই স্বচ্ছন্দ গতির দ্বারাই আত্মা গঠিত হয়; এবং আত্মার ধারণা গঠিত হবার পরও আত্মার মধ্যে ও বাইরে ভাবের ক্রিয়া সমানভাবে চলতে থাকে; সেইজন্যই আত্মাকে নিম্নস্তরের বস্তুর সগোত্র বলা যেতে পারে এবং তাকে কালের ধারার মধ্যে অস্তিত্ববান এক পদার্থরূপে বর্ণনা করা হয়। এক অর্থে, আত্মার অস্তিত্বের ওপরই পদার্থের বাস্তবতা নির্ভর করে। কারণ, নিম্নতর ভাবের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা উচ্চতর ভাব-নির্মাণ সম্ভবপর হয়। ভাবনির্মাণ নিজ গতিতেই

চলে, কিন্তু স্বচ্ছন্দ নির্মাণ-ক্রিয়া আত্মাকে ঘনিষ্ঠভাবে প্রভাবিত করে। তার ফলে মনে হয় যেন সব-কিছুই আত্মার মধ্যে ঘটছে এবং সব-কিছুই যেন আত্মার বিভিন্ন অবস্থা। দেখবার এই ভঙ্গিটার বা রীতিটার প্রয়োজন আছে ; কিন্তু পারমার্থিক বিচারে এই দৃষ্টিভঙ্গিটা স্বতোবিরুদ্ধ। চরম সংগতি আনতে গেলে আত্মার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যায় না। স্বীকার করতে হয় যে দেহের মতো আত্মাও আপাতসত্য অবভাসের অতিরিক্ত আর কিছুই নয়।

যতই চিন্তা করা যায় ততই আমরা চক্রাকারে আবর্তিত হই এবং পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেহের বেলায় আমরা দেখেছি এক দিকে দেহ হল প্রকৃতির অংশ, অন্য দিকে প্রকৃতির অস্তিত্বই হল দেহের সঙ্গে সম্বন্ধের ওপর নির্ভরশীল। সেইরকম আত্মার বেলাতেও আমরা লক্ষ্য করছি এক দিকে ভাব ও ভাবনা হল আত্মার অবস্থাবিশেষ বা ক্রিয়াবিশেষ এবং আত্মার একরকম সৃষ্টি, অন্য দিকে আত্মা হল ভাব ও ভাবনা দ্বারা নির্মিত এক পদার্থ। যে বস্তুরূপী আত্মার অবস্থা বা ক্রিয়া হল বিভিন্ন ভাব ও ভাবনা সেটাই হল শেষ পর্যন্ত একটা ভাবগত পদার্থ মাত্র এবং সেইজন্য কল্পনার একটা সৃষ্টিবিশেষ। আবার চেতনার একটা কেন্দ্রকে আশ্রয় না করে কল্পনা কাজ করতে পারে না এবং কল্পনাটা এই কেন্দ্রের এক অবস্থাবিশেষ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই চক্রক হল দুর্নিবার ; এর থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। আবার দেখা যায় যে দেহের অস্তিত্ব হল আত্মার অনুভবের ওপর নির্ভরশীল এবং দেহের অভিন্নতাও হল একটা ভাবগত ব্যাপার মাত্র। অথচ ভাবনির্মাণ ব্যাপারটা হল আত্মার অন্তর্গত একটা ঘটনা এবং দেহের সঙ্গে সম্বদ্ধরূপেই হল আমার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন। মনে হয় আমরা কেবলই যেন এক অজ্ঞাত বস্তু থেকে অন্য আর একটা অজ্ঞাত বস্তুর দিকে আবর্তিত হচ্ছি ও ঘুরে মরছি এবং যা আমরা পাচ্ছি তা শুধু বিভিন্ন অনবগত বস্তুর মধ্যে কতগুলো সম্বন্ধমাত্র। এই পরিণতির থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় যে আমরা প্রতীয়মান সত্তার বা অবভাসের রাজ্যে ঘুরছি। এই রাজ্যে সত্তা ও ভাবের মধ্যে প্রভূত গরমিল আছে এবং এখানে যেসব ভাব বা রচনা পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোর শুধু রূপকসত্তা আছে, বাস্তবসত্তা নেই। বিশ্বের প্রকৃতির মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যার প্রভাবে আমরা

প্রচলিত আকার ও প্রকারে বিশ্বকে পেতে বাধ্য হই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই আকার ও প্রকারগুলোর নিশ্চয়ই একটা তাৎপর্যও আছে। কিন্তু সেগুলোর পারমার্থিক তাৎপর্য কি আমাদের পক্ষে জানতে পারা অসম্ভব। দেহ ও আত্মাকে আমরা যে আকারে পাই সেই আকারে সেগুলো অসংগতিপূর্ণ ভাবমাত্র। সেগুলোর স্থান শুধু আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রের মধ্যে। সেইজন্য সেগুলোকে শুধু অবভাস-শ্রেণীয় ও আপাতস্বীকৃত সত্তারূপে স্বীকার করা চলে। দেহ ও আত্মার অন্তর্নিহিত বস্তুসত্তাকে দেহ বা আত্মা এই দুটোর কোনো একটা নামেই অভিহিত করা যায় না। কারণ দেহ ও আত্মার অধিক যে সত্তা সেটাকে কখনো দেহ বা আত্মা সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। সুতরাং দেহ ও আত্মার সত্তা হল কল্পিত বা ভান-করা। এই কল্পনা বা ভান জীবন-নির্বাহের জন্য সমর্থনযোগ্য ও প্রয়োজন। কিন্তু পারমার্থিক বিচারে দেহ বা আত্মা কারো বস্তুসত্তা নেই।

আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে দেহ ও আত্মা হল দুটোই ব্যবহারিক ভাবমাত্র। এইবার সে-দুটোর মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের স্বরূপ নির্ণয় করতে হয়। এই কাজে অগ্রসর হওয়ার আগে কতগুলো আপত্তির নিরসন দরকার। ১. প্রথম আপত্তি ওঠে যে আত্মার সত্তা আপাতসত্য বলাতে আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু থাকে না। আত্মাকে যদি কতগুলো চিন্ময় ঘটনার ধারার সামিল মনে করা হয় তা হলে আত্মা হয়ে পড়ে স্থায়ী শরীরের এক নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন অংশমাত্র। কারণ চিন্ময় ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনো আনন্তর্যের বন্ধন দেখতে পাওয়া যায় না। ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কোনো এক বিশেষ দিকে চলার কোনো প্রবৃত্তি বা প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং আত্মা দেহের এক বিশেষণরূপে পরিণত হয়। ২. দ্বিতীয় আপত্তি ওঠে যে চৈতন্যের ধারা রক্ষা করবার জন্য এক অলৌকিক ও পারমার্থিক বস্তুরূপে আত্মার দরকার। ৩. তৃতীয় আপত্তি ওঠে যে আমাদের চেতনার মধ্যে এমন তথ্য থাকতে পারে যা প্রপঞ্চমাত্র নয়। সুতরাং আমরা আত্মার যে সংজ্ঞা দিয়েছি তা ভ্রান্ত। এই তিনটে আপত্তির উত্তরে কিছু বলবার প্রয়াস করতে হবে।

১. আত্মাকে দেহের বিশেষণমাত্ররূপে ধারণা করা যায় না এই যুক্তির সপক্ষে আমার যা বক্তব্য তা একটু পরে প্রকাশ করব। সুতরাং এই বিষয়ে

এখানে এখন কিছু বলব না। কিন্তু হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে, 'আত্মাকে কেবল চৈতন্যের ঘটনা দিয়ে বর্ণনা করবার এই অপপ্রয়াস কেন ? দেহের সাহায্য নিতে কি বাধা ? যে-সব মানসিক ঘটনা এক জীবদেহ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অনুভূত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে আত্মা বলে অভিহিত করলে কি আরো ভালো হয় না ?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব যে দেহ দ্বারা আত্মার সংজ্ঞা অসম্ভব। মনোবিদ্যায় আত্মা বা অহং শব্দের এইরকম সংজ্ঞা দিলে দোষ নেই। তৎসত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য যে এই সংজ্ঞা ভ্রমাত্মক ও সমর্থনের অযোগ্য। কারণ, নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যে জীবদেহের একত্ব নির্ণয় করা সহজ নয়। তা ছাড়া জীবদেহের একত্বকেই হয়তো আত্মার একত্ব দিয়ে বর্ণনা করবার প্রয়োজন অনুভূত হতে পারে। সেরকম হলে আমরা চক্রকের আবর্তে গিয়ে পড়ব। তার ওপর এটাও নিশ্চিত নয় যে দেহের একত্বই হল আত্মার একত্ব। আমার মনে হয় যে কেহই নিঃসন্দেহে বলতে পারে না যে এক আত্মার একাধিক দেহ থাকতে পারে না এবং একটা জীবদেহ যে একাধিক আত্মার বাসস্থান হতে পারে না, তাও আমরা নিশ্চিতরূপে জানি না ; একই দেহের মধ্যে একাধিক চৈতন্য-কেন্দ্র থাকা অসম্ভব কিছুই নয় ; আবার একাধিক দেহ কোনো উচ্চতর আত্মার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়স্বরূপ বা অঙ্গ-স্বরূপ হতেও পারে। এই সম্ভাবনাগুলোতে কোনো স্বতোবিরোধ নেই। সেগুলোকে নেহাৎ কল্পনার বিলাস বলে তাচ্ছিল্য করা হয়তো যায় ; কিন্তু মনোবিকারজাত তথ্যগুলোকে অগ্রাহ্য করা চলে না। অনেক ক্ষেত্রে এমন সব তথ্য পাওয়া যায় যেগুলো অনুধাবন করলে আত্মার অবিচ্ছিন্ন ঐক্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ হয় ; সেই তথ্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে আত্মা এক এরকম বলাই অসংগত মনে হয়। তা ছাড়া প্রশ্ন করা যায় যে সব ক্ষেত্রেই কি আত্মার অস্তিত্বের জন্য জীবদেহের একান্ত প্রয়োজন। অন্তিম প্রশ্নটার সম্বন্ধে পরে আমি আলোচনা করব। এই-সব বিষয় বিবেচনা করলে হয়তো বোঝা যায় জীবদেহকে জড়িয়ে আত্মার সংজ্ঞা দেওয়া অযৌক্তিক।

কিন্তু জীবদেহকে বাদ দিলে আত্মার কি থাকে ? পুনরায় আপত্তি ওঠে, 'যদি জীবদেহকেই বাদ দেওয়া হল তা হলে যখন কোনো চৈতন্য থাকে না তখন আত্মার কি হয় ? অ-চৈতন্য অবস্থায় আত্মার স্বাভাবিক অভ্যস্ত প্রবৃত্তি-গুলোর কি হয়। কারণ, চৈতন্যের ধারা অবিচ্ছিন্ন নয় এবং প্রবৃত্তিগুলোকে

মানসিক ব্যাপার বলা চলে না। সুতরাং দেহকে এক অবিচ্ছিন্ন আশ্রয়স্থল-রূপে স্বীকার করতে কি আমরা বাধ্য নই ?' এই আপত্তিগুলো খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ ; এবং এগুলোর উত্তরে আমরা যা বলব তা হয়তো যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু এই আপত্তিগুলোকে সম্পূর্ণ সন্তোষজনকরূপে খণ্ডন করা যায় না।

আরম্ভ করবার আগে অবিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা দরকার। বাস্তব সত্তা (আমরা স্বীকার করতে বাধ্য) হয় আছে কিংবা নেই। সেইজন্য, কোনো বাস্তব সত্তা যদি কালাধীন হয় সেটা অন্তর্হিত হয়ে পুনরায় আবির্ভূত হতে পারে না ; এবং সেটা সেই কারণে নিরবচ্ছিন্নরূপে থাকতে বাধ্য। কিন্তু আমরা প্রমাণ করেছি যে বাস্তব সত্তা বস্তুত কালের অধীন নয় ; বাস্তব সত্তাকে কালের অন্তর্গত বলে প্রতীয়মান হয় মাত্র। যে সত্তাসমূহকে কালের মধ্যে উদিত হচ্ছে মনে হয় সেগুলো হচ্ছে অবভাস মাত্র। তাই যদি হয়, তা হলে একই বাস্তব সত্তার পক্ষে কালের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন না থেকেও তার মধ্যে অন্তর্হিত হওয়া ও পুনরুদিত হওয়া অসম্ভব কেন হবে ? ধরুন, কতগুলো নিমিত্ত বা উপলক্ষের প্রভাবে 'ক' নামক সত্তা আছে-রূপে অবভাসিত হল ; তার পর নিমিত্তগুলোর পরি-বর্তন হল ; তার ফলে 'ক' নামক সত্তা নেই-রূপে অবভাসিত হল ; কিংবা অংশত অদৃশ্য হল ; তার পর নিমিত্তগুলোর পরিবর্তন হল তার ফলে 'ক' নামক সত্তা আবার আছে-রূপে বা অংশত আছে-রূপে অবভাসিত হল এই দৃষ্টান্তে অদৃশ্য অবস্থাতেও 'ক' নামক সত্তা অবিচ্ছিন্নরূপে থাকে এইরকম বিশ্বাস করবার প্রয়োজন কি ? এইটুকু বিশ্বাস করলেই কি যথেষ্ট নয় যে যথাযোগ্য অবস্থার উদ্ভবে 'ক' নামক সত্তা আমার ইন্দ্রিয়ের দরজায় এসে আবার করাঘাত করবে ? আপনি হয়তো বলবেন যে আমার মত গ্রহণ করলে পূর্ববর্তী 'ক' ও পরবর্তী 'ক' যে একই বস্তু বা সত্তা তা স্বীকার করা যায় না। এই সংশয় কোন্ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত আমি বুঝছি না। আপনি কি বলতে চান যে প্রথম উদয় ও দ্বিতীয় উদয়ের মধ্যবর্তী অবস্থাতেও 'ক' নামক পদার্থ থাকে ? কিন্তু কোন্ যুক্তির বলে আপনি এরকম বলেন তা আমি ধারণা করতে অপারগ। জলপ্রপাত, ইন্দ্রধনু বা জল জমে বরফ হওয়ার মতো প্রতিদিনের ব্যাপার কিংবা ঘটনার জন্য কই আমরা তো অবিচ্ছিন্নতার কোনো প্রয়োজন অনুভব করি না? এইসব

ব্যাপার ও ঘটনার বেলায় কাজের সুবিধার জন্য যা বিশ্বাস করা দরকার তাই মেনে নিই। অণু-পরমাণুর নৃত্যের কোনো বিরাম নেই; তারা তাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করে চলে; আমাদের এই ধারণাও কার্যকরী বলেই স্বীকৃত ও আদৃত। তাই বলে অণু-পরমাণুকে পারমার্থিক বস্তুরূপে গ্রহণ করা যায় না। অনেকে অস্তিত্বের অব্যক্ত রূপ আছে বলে ধারণা করে থাকেন। সেই ধারণাটা হল অলস কল্পনার একবিধ বিকার মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জীবদেহের ঐক্যের কথা ধরা যাক। জীবদেহের অন্তর্গত অণু ও পরমাণুগুলোর অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব কল্পনা না করে একমাত্র গুণগত সমত্বের দ্বারাই আমরা তার ঐক্য নিরূপিত করি। যখন কোনো একটা জীবদেহ বরাবর মোটামুটি একই রকম গুণের অধিকারী বলে মনে হয় তখন সেই দেহের একত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোনো সংশয় থাকে না। বিচ্ছিন্নতা বা ব্যবধানের জন্য ঐক্য কেন মারা যাবে বুঝতে পারি না। আমাদের ব্যবধান-ভীতি কোনো বলবান যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কালাধীন ও প্রতীয়মান সত্তার পক্ষে একবার তিরোহিত হয়ে পুনরায় গঠিত হওয়াতে কোনো বাধা নেই। তা ছাড়া জৈব বস্তুর একত্ব কোনো জড়বস্তুর অবিচ্ছিন্ন সংস্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করে না। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অবিচ্ছিন্নতার নীতি নির্দয়ভাবে পরিত্যক্ত হচ্ছে।

আরো একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি যে প্রকৃতির একাংশের প্রকৃত কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতির কিছুটা অংশের অস্তিত্ব হচ্ছে অন্তত কিছু সময়ের জন্য কেবল অবস্থা-সাপেক্ষ। এই অস্তিত্বটা হচ্ছে সম্ভাবনার নামান্তর মাত্র। জীবদেহের সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য। অবিচ্ছিন্নরূপে থাকতে হলে আমার দেহের বস্তুসত্তা থাকা উচিত। অথচ এই বস্তুসত্তাকে যদি ব্যক্তরূপে বা মূর্তরূপে থাকতে হয় তা হলে কি আর অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব সম্ভবপর? আমার দেহের সারভূত গুণগুলো যাই কিছু হোক না কেন, সেগুলোর সম্বন্ধে সর্বদা আমার কোনো প্রত্যক্ষ অনুভূতি থাকা সম্ভবপর নয়। যখন এই গুণগুলো অনুভবের বিষয়রূপে না থাকে তখন সেগুলো চিন্তনের বিষয়রূপে থাকে; এবং চিন্তার বিষয়রূপে থাকার সময় জীবদেহের ব্যক্ত বা মূর্ত অবিচ্ছিন্নতা খণ্ডিত হয়। বর্তমান বিচারের ফলে আমরা এক সাংঘাতিক সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হই। কালের আনন্তর্য

কেন প্রয়োজন আমরা জানি না ; বরঞ্চ আমরা জানি যে জৈব পদার্থের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা নেই। অনেক সময়ই দেহের অস্তিত্ব হল শুধু অবস্থাসাপেক্ষ এক সম্ভাবনা মাত্র। কিন্তু অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে কোনো প্রকারে ব্যক্ত, অনুভূত ও যথার্থ অস্তিত্ব বলা চলে না।

আমরা আত্মার যে সংজ্ঞা দিয়েছি তার বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি আছে সেগুলোর দিকে এবার মনোনিবেশ করা যাক। চিন্ময় ঘটনারাশির ধারাকে আমরা আত্মা নামে অভিহিত করেছি। এ সংজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে যে আমাদের সংজ্ঞা যদি সত্য হয় তবে কোনো এক মুহূর্তে আত্মা কি তা আমাদের পক্ষে বলা অসম্ভব। আমি উত্তর দেব যে কোনো এক ক্ষণের বর্তমান চেতনারূপে যা পাওয়া যায়, চেতনার ভূত অবস্থা এবং চেতনার সম্ভাবনা এই তিনটিকে নিয়ে আত্মা। সম্ভাব্য অস্তিত্ব বলতে আমরা কি বুঝি পরে দেখা যাবে। যতক্ষণ এই প্রকার অস্তিত্বের অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম না করতে পারি ততক্ষণ মোটামুটিভাবে আত্মাকে বর্তমান ও বিগত চিন্ময় ঘটনারাজির ধারারূপে কল্পনা করা চলে। তবে এই বর্ণনা দুষ্ট ; কারণ এখানে যা-আছে তাকে যা-নাই তাই দিয়ে বিশিষ্ট করবার চেষ্টা সুপরিস্ফুট এবং এই বর্ণনা শেষ পর্যন্ত ভ্রমাত্মক। কিন্তু আত্মা কোনো চরমতথ্য বা পরমবস্তু নয়। আত্মা এক বিশেষ প্রকার আপাত-স্বীকৃত সত্তা বা অবভাস। সুতরাং আত্মার বর্ণনাতে অসংগতি থাকতে বাধ্য। আপত্তিকারীকে অনুরোধ করছি অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি উল্লেখ না রেখে কোনো এক গতিশীল পদার্থের সংজ্ঞা তিনি দিন। তিনি দেখবেন যে এরকম পারা যায় না।

আত্মার প্রকৃতি বলতে আমরা কি বুঝি সে সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কিছু বলা হয় নি। ভিন্ন ভিন্ন আত্মার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। হয় এই প্রকৃতি স্বভাব-সিদ্ধ নয় সেটা শিক্ষালব্ধ। এবং আমরা মনে করি যে, যে ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস সেই ব্যক্তির প্রকৃতিও সেইরকম। আত্মার সংস্কারগুলোকে বা অভ্যাসগুলোকে মানসিক ঘটনা বলা চলে না ; অথচ এগুলোই হল আত্মার প্রকৃতির সারীভূত অংশ। সংস্কারগুলো (আপত্তিকারীর মতে) হল কতকগুলো শারীর তথ্য। উত্তরে আমরা বলব যে আত্মার সংস্কার প্রভৃতিকে শারীর তথ্য বলে অভিহিত করলেই

যে সেগুলো ব্যক্ত ও প্রত্যক্ষ তথ্য হয় এমন নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ভূত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কহীনরূপে এবং সম্ভাবনার কথা উল্লেখ না করে এই-সব সম্ভাবনার তথ্যের বর্ণনা সম্ভবপর না হয় ততক্ষণ সেগুলোকে জড় তথ্য বলে বিবেচনা করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। যখন আমরা আত্মার বিশিষ্ট প্রকৃতির কথা বলি তখন কতকগুলো বর্তমান ও অতীত মানসিক তথ্যকে ধর্মী মনে করে অন্য কতকগুলো সম্ভাবিত মানসিক তথ্যকে সেগুলোর ধর্মরূপে কল্পনা করি। কতকগুলো বিশেষ কারণ বা অবস্থার উদয়ে কতকগুলো বিশেষ মানসিক তথ্যের জন্ম হয়; এই কারণ-গুলোর একাংশ হল যেন আত্মা; সেইজন্য আত্মা ও বাকী কারণগুলো যখন একসঙ্গে উদিত হয়, তখন আকাঙ্ক্ষিত মানসিক তথ্যগুলোর আবির্ভাব হয়। এই দিক থেকে দেখলে আত্মাকে আকাঙ্ক্ষিত কতগুলো চিন্ময় ঘটনার বাস্তব সম্ভাবনা বলা যেতে পারে; যেমন অন্ধকারের জড়দ্রব্যগুলোকে বর্ণের সম্ভাবনা বলে বর্ণনা করা যায়। এই বর্ণনাকেও শেষ পর্যন্ত সত্য বলে সমর্থন করা যায় না। চিন্তার সুবিধার জন্য আমরা এইভাবে বর্ণনা করি। কতগুলো ঘটনা বা তথ্য যখন একভাবে আসে বা এসেছে তখন ভবিষ্যতে সেগুলো আবার কি ভাবে আসতে পারে সেই সম্বন্ধে আমাদের অনুমানকে সংক্ষেপে প্রকাশ করবার একটা পদ্ধতি হচ্ছে এই বর্ণনাটা। বর্ণনাটা বিশেষ ও সুবিধাজনক একপ্রকার বচনভঙ্গি মাত্র। কিন্তু সংস্কারগুলোর মূর্ত কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতি হল কতগুলো মানসিক ব্যাপারের সম্ভাবনার নাম মাত্র।

এবার অন্য আর একটা আপত্তির বিষয় আলোচনা করা যাক। কালের ধারার অন্তর্বর্তী আত্মার অস্তিত্ব বিচ্ছেদহীন নয়। চৈতন্যের ধারার মধ্যে মধ্যে ছেদ আছে এই তথ্য আমি অস্বীকার করবার চেষ্টা করব না। আমরা যদি বলি যে এই ছেদগুলো অচেতন সংবেদন প্রভৃতি দিয়ে পূরিত থাকে, আমাদের উক্তিকে অসত্য প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে। কিন্তু এরকম উক্তিকে সমর্থন করবার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। সেইজন্য স্বীকার করে নিচ্ছি যে চৈতন্যস্রোত এখানে সেখানে খণ্ডিত ও কর্তিত।

প্রত্যুত, ছেদ স্বীকার করলে কোনো মারাত্মক অসুবিধা হয় না। আত্মার বিদীর্ণ অস্তিত্বের জন্য তার একত্ব বাধিত হয় না। স্মৃতি থাক চাই নাই

থাক চেতনার বিচ্ছিন্ন অংশগুলোর মধ্যে যদি গুণগত সমত্ব থাকে তা হলেই সেগুলোকে এক বলা উচিত এবং সেই অবস্থায় সেগুলোকে এক না বলার যথেষ্ট ও সংগত কোনো কারণ নেই। অনেকে বলেন যে, চেতনার বিরতির বা বিচ্ছেদের সময় আত্মা অন্যত্র কোথায়ও থাকে এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদ পড়লে চেতনার ঐক্য থাকতে পারে না। আমার মনে হয় এরকম ভাববার বিশেষ কোনো সংগত হেতু নেই। এ ছাড়া মনে রাখা দরকার যে একত্বের জন্য যে কী পরিমাণ গুণগত সমত্ব দরকার সেই সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। (দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অতএব আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে চেতনার ধারার বিচ্ছেদ দ্বারা আত্মার একত্ব প্রনষ্ট হয় না।

পুনরায় প্রশ্ন করা যেতে পারে, "তা হলে অন্তর্বর্তী বিরতির সময়ে আত্মা আছে বলা চলে কি?" আমি বলব, "যখন আত্মা আছে বলে প্রতীয়মান হয় না তখন আত্মা নিশ্চয়ই থাকে না।" ভাষার যথার্থ ব্যবহার করতে হলে বলতে হয় যে বিচ্ছেদকালে আত্মা থাকে না; তার পূর্বে আত্মা ছিল এবং পরে হয়তো আবার থাকবে। থাকার পর না-থাকা একটা অপরাধ নয়। এইপ্রকার খণ্ডিত অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি করার কিছুই নেই। তবে কাজের ও চিন্তার সুবিধার জন্য দরকার হলে আমরা কল্পনা করে নিতে পারি যে চেতনার ছেদের সময়েও আত্মার অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে। দরকার হলে ধরে নিতে পারি যে, যে-সব নিমিত্ত বা কারণের উদ্ভবে অহং-চেতনার উদয় হবে সেই-সব কারণের মধ্যে সে (আত্মা বা অহং) অদৃশ্য হয়ে আছে। কিন্তু দেহ এই-সব নিমিত্তের বা অবস্থার একটা খুব বড়ো অংশ; সুতরাং দেহ এবং অব্যক্ত আত্মা হল একই জিনিস; এই অনুমান যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এখানে মনে রাখা উচিত যে পূর্ববর্ণিত কল্পনাটা সুবিধাজনক হলেও সত্য নয়। কারণ, ১. নিমিত্ত বা কারণ এক জিনিস এবং ব্যক্ত ও অনুভূত তথ্য আর এক জিনিস; ২. চৈতন্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-কোনো মতই গ্রহণ করা যাক না কেন, সেগুলোর কোনোটাই দেহকে চৈতন্যের উৎপত্তির সমগ্র ও একমাত্র কারণ বলে না; যেসব কারণ বা নিমিত্তের জন্য চেতনার উদ্ভব হয়, দেহ সেগুলোর এক অংশ মাত্র, এবং পরিবেশ হল সেগুলোর আর-এক প্রধান অংশ। ৩. "অহং"-এর উদয়ের জন্য যে কারণগুলো প্রয়োজন, সেগুলোর মধ্যে "অহং" অব্যক্ত রূপে অবস্থান করে এই উক্তি যদি সত্য হয় তা হলে

দেহের অস্তিত্বের বেলাতেও ঐ একই রকম উক্তি করা চলে। তা হলে বলতে হয় যে চেতনার বিরতির সময় দেহ ও আত্মা—দুটো সত্তাই লয়প্রাপ্ত হয়ে কতগুলো কারণসামগ্রীর মধ্যে অব্যক্তরূপে থাকে। যথাযোগ্য সময়ে সেগুলো আবার উৎপন্ন হয়। সুতরাং মূলগত কারণগুলোকে প্রকৃতপক্ষে দেহ বলা চলে না। তা ছাড়া, দেহের অদৃশ্য হওয়া, দেহের পুনরায় উৎপন্ন হওয়া প্রভৃতি ব্যাপারগুলো কাল্পনিক। এইসব ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। তবে ঘটনাগুলো অসম্ভব নয়। অতএব আমার সিদ্ধান্ত এই যে, চৈতন্যের উৎপত্তির জন্য যে কারণগুলোর প্রয়োজন একমাত্র ব্যবহারিক সৌকর্যে সেগুলোকে দেহ বলা চলে; এবং আত্মার সমত্ব বা একত্বের জন্য যে দেহের অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে দরকার এই মত ভ্রান্ত।

আমরা এতক্ষণ আত্মার আনন্তর্য ও সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। অন্য আর-একটা আপত্তির বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করবার আগে একটা ভ্রান্ত ধারণা যাতে না জন্মায় তার চেষ্টা করব। আত্মাকে একপ্রকার ভাবগত পদার্থ বলে আমরা আখ্যায়িত করেছি। কিন্তু এই ভাবের নির্মাতা কে? আমরা কি বলতে পারি যে আত্মার অস্তিত্ব শুধু নিজের প্রত্যক্ষ অনুভবের মধ্যে? এরকম বিচার ভুল হবে। কারণ, স্মৃতির অবর্তমানেও আত্মার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। আত্মার অস্তিত্ব সব সময় আত্মার কাছে; কিন্তু সব সময় নিজের কাছে নয়। আত্মা হচ্ছে ভাবের বা ভাবনার একপ্রকার নির্মাণ। কারণ দেহের মতো আত্মা হল কালের ধারার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষণে অবভাসিত একরকম সত্তা, এবং শুধু একক্ষণের চৈতন্যের ঘটনামাত্র নয়। সবরকম আপাত-স্বীকৃত ও আবভাসিক সত্তার বেলাতেই এই অসুবিধাতে পড়তে হয়। ভূত ও ভবিষ্যৎ এবং অ-প্রত্যক্ষ প্রকৃতির অস্তিত্ব, যে ব্যক্তি সেগুলোর বিষয় চিন্তা করছে তার কাছে। (দ্বাবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কিন্তু এই বাক্যের অর্থ এমন নয় যে সেগুলোর বস্তুসত্তা কেবল ভাবগত; এবং যুগপৎ একথাও বলা দরকার যে সসীম জীব-চৈতন্যের বাইরে সেগুলোর কোনো অবস্থান নেই। আমাদের ব্যক্ত অনুভবের সঙ্গে ভাবনাকে সংযোজিত করলেও বস্তুসত্তাকে পাওয়া যায় না। কালের আকারযুক্ত প্রত্যক্ষ অনুভব ও কালের আকারহীন ভাবনা বা চিন্তন দুটোই

হল মিথ্যা অবভাস। ভাব ও অনুভব সেগুলোর নিজ বৈশিষ্ট্য হারাবার পর পরমসত্তায় মিলতে পারে। একক্ষণের অনুভূতি কিংবা ভাবনির্মাণ কিছুই পরমতত্ত্বে নেই। পরমসত্তা হল উভয়ের সম্মিলিত এক বৃহত্তর ও অভেদ ঐক্য। (চতুর্বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ২. স্পষ্ট হওয়া উচিত যে আত্মার প্রতীয়মান বা আপাতদৃশ্য সত্তাকে আমরা দেহের বিশেষণ বলে অবমাননা করি নি। এবার দেখা যাক অন্যান্য আপত্তিগুলো খণ্ডন করা যায় কি না। আপত্তি তোলা যেতে পারে যে চৈতন্যের ঐক্যরক্ষার জন্য এক পারমার্থিক আত্মার প্রয়োজন। কিন্তু এইরকম পারমার্থিক-অহং স্বীকারের দ্বারা আমাদের সমস্যা আরো জটিল হয়ে ওঠে। যখন ধারা আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তখন ধারারূপী অবভাসকে পরমসত্তার অবভাসরূপে গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আত্মা পরমবস্তু। অন্য কথায়, আত্মা পারমার্থিক বস্তু না হয়েও আত্মার অবভাস সম্ভবপর। একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে অহং-প্রত্যয় হচ্ছে সসীম এবং সেইজন্য অন্যান্য সসীম পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধের বন্ধনে অহং হল জড়িত ও কলুষিত। পারমার্থিক-অহং চেতনার ঘটনা-গুলোকে ঐক্যবান করতে পারে না; তার ফলে, পারমার্থিক-অহং বহুর মধ্যে এক এবং সেইজন্য এক সসীম পদার্থ হয়ে দাঁড়ায়। পারমার্থিক আত্মার দ্বারা চেতনার প্রতীয়মান ধারাগুলো কিভাবে শৃঙ্খলায় পরিণত হয় তা কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না। ব্যাখ্যা সম্ভবপর হলেও অস্বস্তির হেতু থেকে যায়। স্বীকার করতে হয় পরমাত্মা অন্যান্য সসীম জীবাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ও একটা সসীম সত্তাবিশেষ। পারমার্থিক বিচারে এইরকম প্রতীয়মান পরমাত্মা হল চিন্তা-বিভ্রমের এক বিষময় ফল মাত্র। তত্ত্ববিদ্যায় কার্যকরী প্রত্যয়রূপে পারমার্থিক আত্মার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ তত্ত্ববিদ্যায় কার্যকারিতা বড়ো কথা নয়, সত্যই হল বড়ো কথা। মনোবিজ্ঞান নামক ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এই কল্পনার দ্বারা লাভবান হওয়া যায় কি না সেই বিচার এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর।

৩. আত্মা-সম্বন্ধীয় আমাদের ধারণাকে হয়তো মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে ধর্ষিত করা যেতে পারে। বলা যেতে পারে যে, এমন কতগুলি মানসিক ব্যাপার বা অনুভূতি আছে যার দ্বারা আত্মাসম্বন্ধীয় আমাদের ধারণার মিথ্যাত্ব সহজেই প্রতিপন্ন করা যায়। এই আপত্তির উত্তরে আমি

বলব যে মানসিক ঘটনার অতিরিক্ত যদি কোনো আত্মা-সম্পর্কিত তথ্য থাকে সেই তথ্যটাও মানসিক ঘটনা হতে বাধ্য।

৪. আমরা দেখেছি যে আমার চৈতন্যের দশার দুই দিক আছে : ১. ব্যক্তিগত অনুভূতির দিক এবং ২. ব্যক্তি-অতিরিক্ত বিষয়ের প্রতি উল্লেখের দিক। অনুভূতির মধ্যে থেকে যখনই কোনোরকম ভাবনার আরম্ভ হয় তখনই "তৎ" থেকে আচ্ছিন্ন এক "কিম্" উত্থিত হয় এবং "কিম্" কখনো ঘটনামাত্রটা নয়। বরঞ্চ এক ধারার অন্তর্গত অংশরূপে ঘটনাটার স্বরূপ হল এই : সেটা তার নিজ অস্তিত্ব থেকে উৎক্রান্ত এক পদার্থ। এবং এই উৎক্ষেপ আরো স্পষ্ট হয় যখন পরিবর্তনের পরম্পরার মধ্যে দিয়ে একই প্রকার গুণ প্রতীয়মান বা অবভাসিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক মানসিক বা চিন্ময় ঘটনার মধ্যেই ঘটনা-অতিরিক্ত কোনো এক বিষয়ের প্রতি প্রেক্ষা আছে এবং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কালের অন্তর্গত প্রত্যেক 'ইহার' মধ্যেই নিজেকে উৎক্রমণ করে বাইরের দিকে যাবার ঈহাই সুপরিস্ফুট ; কিন্তু এই তত্ত্ব স্বীকার করাতে কি আলোচ্য আপত্তির বলবত্তা স্বীকার করা হল ? আমরা কি স্বীকার করেছি যে এমন তথ্য আছে বা থাকতে পারে যা কালাধীন নয় ? আমরা বলতে বাধ্য যে আমরা স্বীকার করি না যে এরকম কোনো তথ্য আছে। সব সময়েই প্রত্যেক তথ্য বা ঘটনার তাৎপর্য হল সেই তথ্য বা ঘটনার বহির্ভূত বা অতিরিক্ত কিছু ; কিন্তু তাই বলে কোনো তথ্য শুধুমাত্র উল্লেখ বা তাৎপর্য হতে পারে না। উল্লেখটা যেন তথ্যের একটা প্রেক্ষা বা দিক মাত্র। এই প্রেক্ষাকে কার্যকরী ও সত্য হতে হলে কোনো একটা বিশিষ্ট ঘটনার মধ্যে, একটা বিশিষ্ট স্থানে ও বিশিষ্ট কালের ধারায় প্রতীয়মান হতে হবে। তার মানে উল্লেখহীন বা তাৎপর্যহীন ঘটনা হয়তো আছে কিন্তু ঘটনাহীন উল্লেখ বা প্রেক্ষা অসম্ভব।

প্রত্যেক তথ্যের যে এই দুটো রূপ আছে আপত্তিকারী সেটা লক্ষ্য করেন নি। সেইজন্য তাঁর অজ্ঞাতসারেই তিনি বিশ্রী উভয়সংকটে পড়েছেন। আমাদের জীবনে ঘটনার অতিরিক্ত সর্বদাই কিছু না কিছু আছে। এই ব্যাপার থেকে তিনি এক দুঃসাহসিক অনুমান করেছেন যে এই অতিরিক্ত কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই কোনো প্রকার চিন্ময় তথ্য। কিন্তু এই অতিরিক্ত কিছু যদি চিন্ময় তথ্য হয় সেই তথ্য অনুভূত হতে বাধ্য। অননুভূত চিন্ময়

তথ্যের কোনো অর্থ নেই। তা ছাড়া, এইরকম তথ্য যদি থাকে, কোন্ অদ্ভুত ভাবে তাকে আমরা জানতে পারি, তাও আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের কাছে চৈতন্যের ধারার মধ্যে উদিত না হয়ে অনুভূত হওয়ার কিংবা অন্যান্য ঘটনার স্রোতের মধ্যে এক ঘটনারূপে বিন্যস্ত না হয়ে অনুভূত হওয়ার কথা সম্পূর্ণ অর্থশূন্য। আমরা যা কিছু অনুভব করি তাকে অনুভবের বিষয় বলতে পারি। এক দৃষ্টিতে, বিষয়টা তৎকালিক অনুভবের অবস্থা-বিশেষ মাত্র ; অন্য দৃষ্টিতে, এই বিষয়টা একটা ভাব ; এবং মনে হয় যেন ভাবরূপী বিষয়টা অনুভবের সামনে প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু এই ভাবরূপী বিষয়টা একটা তথ্য নয় ; ভাবরূপী বিষয়টা চিত্তবৃত্তিরূপী তথ্য থেকে পৃথক ; ভাবরূপী বিষয়কে তথ্যরূপে গ্রহণ করলে সেটা হয় অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটা বিশেষ ঘটনা।

কোনো জড় বা চেতনার ধারা বা শৃঙ্খলা বা প্রণালীর ঐক্যকে কখনো ঘটনা বা তথ্যরূপে আমরা পাই না। সেজন্য প্রশ্ন ওঠে এইরকম শৃঙ্খলার ঐক্যকে আমাদের অভিজ্ঞতার তথ্য বলতে পারি কি না। শৃঙ্খলার ঐক্যকে আমরা যথার্থত তথ্য বলতে পারি না। কারণ সবরকম ঐক্যই হল ভাবগত তত্ত্ব। শৃঙ্খলাকে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে সংযুক্তরূপে কিংবা অন্যান্য তথ্যের থেকে বিমুক্তরূপে কোনো রূপেই প্রত্যক্ষ অনুভবের মধ্যে পাওয়া যায় না। অথচ শৃঙ্খলা একটা বিশেষণ সুতরাং শৃঙ্খলার ধর্মই হচ্ছে কোনো কিছুকে বিশেষিত করা। ফলে শৃঙ্খলার কোনো পৃথক বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। শৃঙ্খলা সেইজন্য ঘটনারূপে উদিত হয় ; তা না হলে মনে করতে হয় যে বিশেষণটা শুধু আকাশে ঝোলে। কোনো ঘটনা ঘটতে হলে তা আত্মার বা আমার চৈতন্যের মধ্যেই ঘটবে। নতুবা আর কোথায় ঘটবে ? এবং চিন্ময় ঘটনারূপে ঘটলেই চেতনার দশারূপে তার একটা স্থান এবং স্থিতি দরকার। তা না হলে বিষয়টা আমার অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু তবুও স্বরূপত ঐক্য হল বিভিন্ন ঘটনার সম্পর্কিত একটা ভাব এবং তার সত্তা হল একান্ত ভাবগত।

আপনি বলবেন, "না, তা হতেই পারে না। আত্মার একত্ব ও অনবচ্ছিন্নতা নিশ্চয়ই শুধু একটা ভাবগত বা প্রত্যয়মূলক তত্ত্ব নয়। আমাদের কাছে উপাত্তরূপে যা আসে তা অবচ্ছিন্ন, সুতরাং উপাত্তরূপে আত্মার সাক্ষাৎকার

অসম্ভব। আবার আত্মার অস্তিত্ব যদি কেবল ভাবগত হয়, তা হলে আত্মার বস্তুত্ব থাকে না। সুতরাং চিন্ময় ঘটনার ধারার মধ্যে একক ঘটনারূপে আত্মার সাক্ষাৎকার হয় না ; অন্যান্য প্রতীয়মান সত্তার সঙ্গে আমরা আত্মাকে নিশ্চয়ই ভিন্নরূপে জানি ; এই ধারণাই সংগত।" কিন্তু এই যুক্তি অসংগতি-পূর্ণ। কারণ যা-কিছু এক্ষণে বা সর্বক্ষণের জন্য অন্যান্য অনুভবের সঙ্গে অনুভূত হয়, তাই চিন্ময় ঘটনার স্রোতের অন্তর্বর্তী এক বা ততোধিক ঘটনামাত্র এবং অনুভূত হওয়ার অর্থই হল চেতনার দশাবর্তী হওয়া। অপর পক্ষে যা আমার চৈতন্যের ধারার অন্তর্গত নয়, তাকে আমার অভিজ্ঞতার বিষয় বলতে পারি না। আমার অনুভবের অংশীভূত না হয়ে কোনো কিছুর পক্ষে প্রতীয়মান হওয়া সম্ভব কিরকম করে আমি বুঝতে পারি না। এবং যা আমার অভিজ্ঞতার অংশ নয় তা বস্তুত শূন্যমাত্র। একটা মনগড়া ধারণাকে সমর্থন করবার উদ্দেশ্য ছাড়া আর অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কেউ এরকম অদ্ভুত মতের অবতারণা করে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কালের মধ্যে প্রতীয়মান সত্তা বা তথ্যগুলো পরমসত্য নয় সুতরাং কালের অধিক ও অতীত কিছু আছে। আমরা ভুল করে মনে করি যে যা-কিছুর বস্তুত্ব আছে, তাই যেন একটা দ্রব্যবিশেষ। সেইজন্য আমাদের মনে হয় কালাতীত সত্তাটাও কালের পাশে দণ্ডায়মান এক সত্তা-বিশেষ। নিত্যলোক বলুন বা পারমার্থিক অহং বলুন বা তুরীয় আত্মা বলুন, এগুলোর কোনোটাই আমাদের অনুভবের মধ্যে ধরা পড়ে না। সেইজন্য স্বীকার করতে হয় যে এই নিত্যবস্তুগুলোর শক্তি ও অস্তিত্ব আমরা অন্য কোনো রূপে জানি। একটা ভ্রান্ত ধারণার জন্য এইরকম স্বীকার করতে হয়। আমরা কালকে অতিক্রম করতে চাই আবার সঙ্গে সঙ্গে যা কালের মধ্যে প্রকাশিত নয় তাকে বাস্তব বলতে চাই না। সেইজন্য আমাদের নিত্যলোক তুরীয় আত্মা বা অহংকে আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই কতগুলো সসীম পদার্থে পরিণত করি। অদৃশ্য ও অলৌকিক সত্তাগুলোর স্বীকারের ফলে দুই শ্রেণীর অবভাসকে স্বীকার করতে হয়। একটা দৃশ্য জগতের স্থলে দুটো আপাতদৃশ্য জগতের উদ্ভব হয়। তার ফলে আমাদের হাতের সমস্যাগুলোর সমাধান তো হয়ই না বরঞ্চ আরো কতগুলো অতিরিক্ত সমস্যা এসে জোটে। এই সত্তাগুলো স্বীকারের ফলে আমাদের ওপর নূতন দায়িত্ব

এসে পড়ে। আমরা আগে যে সত্তাগুলোর বিষয় বিচার করছিলাম সেগুলোর চেয়ে এই সত্তাগুলো প্রকৃষ্টতর একথা বলা চলে না। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর সত্তাগুলোর মধ্যে কি সম্বন্ধ তার নিরূপণ দরকার হয়। সম্বন্ধ নিরূপণ করতে গিয়ে আমরা হয় স্পষ্ট আত্ম-অসংগতি নয় মূর্খ জটিলতার আবর্তে পতিত হই। মুক্তির একমাত্র পথ হল কুসংস্কার ত্যাগ করে বস্তুসত্তা ও আপাত-স্বীকৃত সত্তার প্রভেদ মেনে নেওয়া। আনন্তর্য, একত্ব, অপরলোক ও অহং এগুলোর কোনোটারই দৃশ্য সত্তা নেই। সেগুলোর অস্তিত্ব ভাবগত বা প্রত্যয়াত্মক এবং সেগুলোকে তথ্য বলা চলে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেগুলোর বস্তুসত্তা আছে এবং কালাধীন ঘটনাগুলোর সত্তা থেকে সেগুলোর বস্তুসত্তা কোনো অংশে নিকৃষ্টতর নয়। অবশ্য বস্তুসত্তার পূর্ণ অর্থে, ভাবগত বা প্রত্যয়গত সত্তা এবং তথ্যগত বা অনুভবগত সত্তা এ দুটোর মধ্যে কোনো সত্তাটাই বাস্তব নয়। কিন্তু এই দুটো সত্তার একটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে অন্যটাকে একান্ত স্বীকার করা চলে না। কারণ, পক্ষদুটো পরস্পরবিরোধী নয় এবং এই দুটো পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ যে মিথ্যা তা নয়। এই ভ্রান্তির জন্যই যত অসংগতি ও বিরোধ উপস্থিত হয়।

ক্লান্তিকর হলেও অহং সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা দরকার। অনবচ্ছিন্নতা ও একত্ব যে ভাবগত পদার্থ এটা না বোঝবার ফলেই অহংকে একটা তথ্যরূপে পাওয়ার চেষ্টা হয়। অহংকে এক দিকে তথ্যরূপে পাওয়া চাই, অন্য দিকে অসংখ্য প্রতীয়মান ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনা মাত্র হলে তার অস্তিত্ব দিয়ে কোনো কাজ হয় না। কিন্তু এইরকম অহংকে পাওয়ার চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। কারণ এটা নিশ্চিত, আমরা যে আত্মাকে পাই তার স্বরূপ সব সময়ই সগুণ বা উপাধিযুক্ত। আপ্ত বা উপলব্ধ আত্মা সর্বদা কোনো না কোনো বিশেষ গুণ বা ধর্ম দ্বারা আক্রান্ত। আত্মা ও অনাত্মাকে আমরা কখনো নির্গুণ বা নিরুপাধি আত্মা বা অনাত্মারূপে উপলব্ধি বা অনুভব করতে পারি না। এবং অনুভবের ধারার মধ্যে একটা বিশেষ মানসিক বা চিন্ময় ঘটনারূপে ছাড়া অন্য কোনোরূপে বিশেষ উপাধিযুক্ত সত্তা প্রতিভাত হতে পারে না। এই ব্যপদেশে আমি একটা উভয়সংকটাত্মক যুক্তির অবতারণা করতে পারি। আপনার অহং বা আত্মার যদি কোনো গুণ বা উপাধি না থাকে তা হলে এই কল্পিত আত্মা হল শূন্য মাত্র এবং তৎসম্পর্কিত কোনো

অনুভব বা উপলব্ধি সম্ভবপর নয়; অপর পক্ষে এই আত্মা যদি কিছু হয়, কালের ধারার মধ্যে তাকে প্রতিভাত হতেই হবে। কিন্তু উত্তরে হয়তো বলা যেতে পারে, "মোটেই নয়, অহং কালের ধারার বাইরে থেকেও সেই ধারাকে হয়তো প্রভাবিত করতে পারে।" এই যুক্তি দ্বারা খুব লাভবান হওয়া যায় না। কারণ অহং যদি নির্গুণ হয় তা হলে কালের ধারার মধ্যেই হোক কিংবা কালের বাইরেই হোক, কোনো ক্ষেত্রেই তাকে শূন্যপদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু কল্পনা করা চলে না এবং সেইজন্য এই শূন্য পদার্থের সঙ্গে কালের সংসর্গ ও কালের ওপর তার প্রভাব বা ক্রিয়ার কথা নিরর্থক হয়ে পড়ে। অপর পক্ষে অহং যদি সগুণ হয়, তা হলে শুধু তর্কের খাতিরে আপনি বলতে পারেন যে সময়ের বাইরে তার অস্তিত্ব আছে; কিন্তু সময়ের বাইরে থাকবার জন্য এই অহং-পদার্থের অনুভব কখনো সম্ভবপর নয়। পুনরায় হয়তো আপত্তি উঠতে পারে, "ঠিকই, অহং নিজে অনুভবের মধ্যে ধরা দেয় না; কিন্তু কালের সঙ্গে অহং বা আত্মার সম্বন্ধ ও কালের ওপর অহং বা আত্মার ক্রিয়া কোনো এক ভাবে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে বা জানতে পারি।" এই যুক্তিতে নূতনত্ব কিছুই নেই এবং এই যুক্তি স্বীকার করলেও উভয় সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। কোনো সম্বন্ধের জ্ঞান উপলব্ধি বা অনুভবের জন্য সম্বদ্ধ বস্তু বা বিষয়দুটোর অনুভবও সমানভাবে প্রয়োজন। একটু স্থির হয়ে ভাবলেই দেখা যাবে আমাদের এই মন্তব্যের সত্যতা হল নিঃসন্দিগ্ধ। সেইজন্য সম্বন্ধ স্বীকার করার পরিণতি হচ্ছে দুটো। হয় কালের ধারায় প্রতিভাত বা অবভাসিত ঘটনার সঙ্গে কালের অতিরিক্ত কোনো কিছুর সম্বন্ধ মিথ্যা; নতুবা সংবেদন স্রোতের অসংখ্য উপাদানের মধ্যে অহং বা আত্মা হল আর একটা সম্বদ্ধ উপাদান মাত্র।

যে দৃষ্টিভঙ্গির গোড়ায় গলদ তার অন্যান্য শাখাপ্রশাখার আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা স্বীকার করি যে মানসিক ঘটনার অধিক বস্তুর অস্তিত্ব বা সত্তা আছে এবং সেইজন্যই সেইরূপ বস্তুর পক্ষে সময়ের প্রবাহে প্রতিভাত হতে হয়। কিন্তু এই বস্তুসত্তার কালাতীত দিক বা অংশটা হল ভাবগত তত্ত্ব, প্রকৃত তথ্য নয়। কালের অন্তর্গত তথ্যের সঙ্গে কালাতীত তত্ত্ব কোনো এক রহস্যময়রূপে অবস্থান করে এরকম কল্পনা করলে কালাতীত তত্ত্বকে সসীম, বিশেষ ও বহুর গণ্ডীর মধ্যে নামিয়ে আনা হয়। আমাদের

সমস্ত প্রাণপাত চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা কিছুতেই নিছক ঘটনার জগতের উর্ধ্বে উঠতে পারি না এবং ঘুরে ফিরে বারবার ঘটনার আবর্তের মধ্যে ফিরে আসি। আমাদের পক্ষে কালের ধারার অন্তর্নিহিত যাবতীয় ঘটনাকে যদি এক নিরবচ্ছিন্ন, যুগপৎ ও অখণ্ড অনুভবের মধ্যে ধরা সম্ভবপর হত তা হলে আমরা বলতে পারতাম যে কালাতীত তত্ত্বকে আমরা তথ্যরূপে অনুভব করছি। কিন্তু এইরকম উন্নততর অনুভবের মধ্যে ভাব ও অনুভবের ভিন্নতার অবসান হয় এবং একমাত্র উন্নততর সত্তার পক্ষেই এইপ্রকার অনুভব সম্ভবপর।

এ পর্যন্ত আমরা যতগুলি আপত্তির আলোচনা করেছি সেগুলোর প্রত্যেকটাই অত্যন্ত দুর্বল। অনুভূত বা উপলব্ধ এমন কিছু নেই যা ঘটনা নয়। তবে ঘটনার মধ্যে ঘটনাকে অতিক্রম-করা সত্তা আছে। সমস্ত প্রকার অনবচ্ছিন্নতা বা আনন্তর্যই হল ভাবগত এবং চেতনার প্রবাহের ঐক্যের বিরুদ্ধে যে আপত্তি আনা হয় তাও টেকে না। এবং আমরা আত্মাকে প্রতীয়মান বা আপাতগ্রাহ্য আবভাসিক সত্তারূপে গ্রহণ করলেও তাকে জীবদেহের বিকারমাত্র বা বিশেষণমাত্র বলি নি। দেহ ও আত্মা দুটোই হল সত্তার অবভাস এবং সে দুটোর মধ্যে সম্বন্ধটাও হল প্রতীয়মান বা আপাত-সত্য জগতের সম্বন্ধ। সম্বন্ধটার বিশেষ রূপ কি সেই বিষয়ে এর পর আমরা আলোচনা করব।

সূচনাতেই এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করি যেটা আমি গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। অনেক সময় দেহ ও আত্মাকে একই বস্তুর দুই দিক বা অংশরূপে দেখা হয়। কোন্ যুক্তির বলে এরকম ধারণা সম্ভবপর আমার সেই বিষয়ে কিছু বলার ইচ্ছা নেই এবং কোনো বিরুদ্ধ যুক্তি আছে কি না আমার সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছাও নেই। কেন আমি এক বস্তুত্ব স্বীকার করি না তাই সংক্ষেপে বলব। ১. কেবল দৃশ্যমান জগতের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলেও আত্মাবিশেষ ও তার দেহকে সমগ্র বিশ্বের থেকে পৃথক পৃথক ও বিযুক্ত কতগুলো সত্তা বলে ভাববার সপক্ষে কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। ২. তা ছাড়া এই মতের বিরুদ্ধে আরো একটা মারাত্মক আপত্তি আছে। কারণ, আত্মাবিশেষ ও তার দেহ মিলে যদি একই বস্তুসত্তা হয় তা হলে পরমতত্ত্বের মধ্যে বহু সসীম নিত্যবস্তুর অবস্থান স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এইরকম অনুমান একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়।

৩. পরমতত্ত্বের মধ্যে দেহ ও আত্মার নিজ বৈশিষ্ট্য কেন রক্ষিত হবে আমি একেবারেই ধারণা করতে পারি না। সর্ববিধ আপাতদৃশ্য ও অবভাসিত সত্তা পরমার্থের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয় বলা এক কথা এবং পরমার্থের মধ্যে প্রত্যেক আপাতস্বীকৃত ও প্রতীয়মান সত্তা নিজরূপ নিয়ে অবস্থান করে বলা আর-এক কথা। দেহ আত্মা প্রভৃতি সত্তাগুলোর ধর্মই হল এই যে সেগুলো রূপান্তরিত হয়ে উচ্চতর সত্তায় লীন হয় এবং রূপান্তরের ফলে সেগুলোর আপাতদৃশ্য বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে পারে না।

এইখানে এসে আমরা একটা সুপরিচিত ও বহু-তর্কিত প্রশ্নের সম্মুখীন হই। প্রশ্নটা হল এই : দেহরূপী ও আত্মারূপী দুই ধারার মধ্যে কি নিমিত্তের সম্বন্ধ আছে ? আমরা বলতে পারি কি যে একটা ধারা অন্য ধারার ওপর ক্রিয়াশীল ? প্রথমে যে মত সাধারণ মানুষের চোখে আপাতসত্য বলে মনে হয় আমি তার বিবরণ দেব। তার পর কতগুলো ভ্রান্ত মতের পর্যালোচনা করব। এবং সর্বশেষে কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য তাই বলবার চেষ্টা করব। যে কোনো পক্ষপাতিত্বশূন্য দর্শকই বিশ্বাস করে যে দেহ ও আত্মা হল উভয়ে উভয়ের ওপর ক্রিয়াশীল। শুদ্ধ দেহ ও শুদ্ধ আত্মা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে এই ধারণা অনেক পরে আসে ; কারণ বহু চিন্তা ও দীর্ঘ বিচারের পর শুদ্ধ দেহ ও শুদ্ধ আত্মার ধারণা লাভ করা যায়। কোনো মতের দিকে না চেয়ে কেবল তথ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে এই দুটো ধারার যে কোনো এক ধারার মধ্যে যদি পরিবর্তন আসে তা হলে অন্য ধারাটার মধ্যেও পরিবর্তন আসে। কায়িক ধারা ও মানসিক ধারা দুটোই সমান ভাবে একটা অন্যটাকে প্রভাবিত করে। স্পষ্ট দেখা যায় যে জীবদেহের মধ্যে কোনো উত্তেজনার উদ্ভব হলে আত্মার বা মনের মধ্যে তার ফলে পরিবর্তন হয় এবং আত্মার বা মনের মধ্যে পরিবর্তন এলে জীবদেহে তার ফলে নূতন কম্পন উদ্ভূত হয়। মনে হয়, কেউই নিজের প্রিয় মত সমর্থন করবার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অস্বীকার করবেন না যে যে ইচ্ছার দ্বারা মন বা আত্মা জড়জগতের ওপর দাগ কেটে থাকে। সুখ ও দুঃখের অনুভব জীবদেহকে আরো প্রত্যক্ষভাবে উদ্বেলিত করে। বর্তমানের সুখ ও দুঃখ আমাদের বিচলিত করে না, তারা শুধু কতগুলো নিষ্ক্রিয় অনুভূতির আবেশ মাত্র এবং আমাদের জীবনে সেগুলোর

কোনো প্রভাব বা প্রতিপত্তি নেই, এরকম মতকে সংস্কারমুক্ত সাধারণ মানুষ সত্যের অপলাপ বলে মনে করে। মধ্যে মধ্যে আমার সন্দেহ হয় যাঁরা এই মতের সমর্থক তাঁরা তাঁদের মতের পূর্ণ তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন কি না।

দেহ ও মন বা আত্মা পরস্পরকে প্রভাবিত করে এই লৌকিক মতকে কোনোরকম যুক্তি দিয়েই খণ্ডন করা যায় না। কতগুলো বিরোধী মতের আলোচনা এইবার করব। দেহ ও আত্মার অন্যোন্যক্রিয়া যিনি অস্বীকার করেন অবশিষ্ট কয়েকটা সম্ভাবনার মধ্যে তাঁকে একটা বেছে নিতে হয়। ধারা দুটোর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করে তিনি ধারণা করতে পারেন যে সে-দুটো ধারা পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলে কিংবা দুই ধারার মধ্যে একটাকে প্রধান বা মুখ্য বিবেচনা করে তিনি কল্পনা করতে পারেন যে অন্য ধারাটাকে প্রথম ধারার বিকার বা ফল মাত্র। আমি প্রথমে সমান্তরাল প্রবাহ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করব এবং এই বিষয়ে আমার মন্তব্য প্রকাশ করবার সময় মতটার ঐতিহাসিক রূপকে উপেক্ষা করে চলব।

এই বলে আরম্ভ করা উচিত যে কার্যকারণসম্বন্ধের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য কেউ যদি সম্পূর্ণ সংশয়হীন প্রতিপত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁকে নিরাশ হতে হবে। এইরকম ব্যাপারে আমরা শুধু দেখাতে পারি যে জ্ঞাত সবরকম তথ্যই একটা বিশেষ অনুমানকে সমর্থন করে এবং এই অনুমানকে মিথ্যা মনে করবার কোনো পক্ষে বিশেষ হেতু নেই এবং এটুকু করতে পারলেই আমরা মনে করব যে আমাদের সিদ্ধান্তটা প্রমাণ করতে পেরেছি। সত্য, এইরকম প্রমাণের পরও মনের সংশয় একেবারে শেষ হয় না। অন্য সব সম্ভাবনাগুলোকে নিরাকৃত করতে না পারা পর্যন্ত অসংশয় প্রতিপত্তি পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে দেহ ও আত্মার পারস্পরিক ক্রিয়াটা হয়তো একপ্রকার কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু সম্ভবপর বলেই যে কাকতালীয় সম্বন্ধটা সত্য সেরকম কল্পনা করাও অসংগত।

দৃশ্যমান জগতের ঘটনাগুলোকে অনুধাবন করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে কায়িক ঘটনাপ্রবাহ ও চিন্ময় ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে একটা কার্যকারণসম্বন্ধ আছে। কিন্তু এমন হতে পারে যে এইরকম প্রতীতি হবার কতগুলো

সবিশেষ কারণ আছে এবং সম্বন্ধটা হল স্বরূপত মায়ামাত্র। এমন হতে পারে দুটো ধারার মধ্যেই কতগুলো অজ্ঞাত উপলক্ষ আছে এবং সেগুলোর জন্যই দুই ধারার অন্তর্গত পরিবর্তনগুলো ঘটে। এমনও কল্পনা করতে বাধা নেই যে প্রত্যেক ধারার অন্তর্গত নিজ ঘটনাগুলোর মধ্যেও কোনো কার্যকারণসূত্র নেই এবং শুধু কতগুলো অবিদিত উপলক্ষ বা উপাধির ক্রিয়ার ফলে প্রত্যেকটা ধারার অন্তর্গত ঘটনাগুলোকে একটা ধারা বলে মনে হয়। এই কল্পনা যদি সত্য হয় তা হলে প্রতি ধারার অন্তর্গত ঘটনাগুলো যেমন একটার পর একটা আসছে, তেমনই আসবে কেবল সেগুলোর মধ্যে কার্যকারণের বন্ধন থাকবে না। এরকম হওয়া অসম্ভব বলতে পারি না; কিন্তু সম্ভবপর বলেই যে এরকমই হয় তাও আমরা স্বীকার করতে পারি না। দেহ ও আত্মার অন্যোন্যসম্বন্ধ হল একটা কাকতালীয় ব্যাপার এই উক্তি আমার মতে ভিত্তিহীন। সুতরাং এই বিষয়ে আর আলোচনা করা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

আমি মনে করি যে দেহ ও মনের মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। প্রশ্ন ওঠে এই সম্বন্ধের স্বরূপ কি? এই দুটো ধারার মধ্যে একটা ধারাই কি সবসময় কারণস্থানীয় ও অন্য ধারাটা কি সবসময় কার্য-স্থানীয়? আত্মা বা মন কি শারীরক্রিয়ার একটা পরিণতি মাত্র? শরীর কি আত্মা বা মনের ক্রিয়ার একটা আনুষঙ্গিক ফল মাত্র? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে জোরের সঙ্গে আমাদের 'না' বলতে হয়। একতরফা কার্যকারণসম্বন্ধ অসম্ভব ও অসংগতিপূর্ণ। সবসময়ই মানসিক ক্রিয়ার ফলে কায়িক পরি-বর্তন ঘটে কিন্তু দেহ মনকে কখনো প্রভাবিত করে না; এরকম ধারণা অগ্রাহ্য। সুতরাং একদেশদশা বিপরীত মতটার আলোচনা করা যাক।

এই মত অনুযায়ী দেহের ক্রিয়ার ফলেই মানসিক পরিবর্তন ঘটে কিন্তু মন বা আত্মার দেহের ওপর কোনো প্রভাব বা ক্রিয়া নেই; মন হচ্ছে দেহের বিকার বা বিশেষণ মাত্র এবং মনের পরিবর্তনের জন্য দেহের মধ্যে কোনো বিকার জন্মে না। এই দৃষ্টিতে মানসিক ঘটনাগুলো নিমিত্তসম্বন্ধের বাইরে নয়। কারণ, মানসিক ঘটনাগুলো দৈহিক পরিবর্তন দ্বারা উৎপন্ন; কিন্তু কার্য-কারণসম্বন্ধটা একমুখী। এই বিচারে মানসিক ঘটনাগুলো কিছু উৎপাদন করে না, সেগুলো শুধু উৎপন্ন হয়। যাঁরা এই মত সমর্থন করেন তাঁদের

বলবার উদ্দেশ্য শুধু এই নয় যে কতগুলো বিশেষ অভিপ্রায়-সাধনের জন্য মনে করতে হয় যে অপ্রধান গুণগুলোর প্রধান গুণগুলোর ওপর কোনো ক্রিয়া নেই এবং অপ্রধান গুণগুলো হচ্ছে প্রধান গুণগুলোর নিষ্প্রয়োজন কতগুলো বিভূষণ মাত্র। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে দৈহিক ঘটনা দ্বারা যাবতীয় চিন্ময় বা মানসিক ঘটনা সৃষ্ট হয়। কিন্তু এই প্রতীয়মান জগতের অন্য কোনো ঘটনার ওপর সৃষ্ট মানসিক ঘটনাগুলোর কোনো ক্রিয়া বা কার্য নেই। আমার ভাষায় মতটাকে আমি প্রকাশ করেছি। তার কারণ যাঁরা এই মতের সমর্থক তাঁরা কেউই যথার্থভাবে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন না। কতগুলো উপমা ও অসম্পূর্ণ তুলনা দিয়েই তাঁরা তাদের কাজ শেষ করেন। তাঁদের ব্যাখ্যা আলোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁদের মতটা কতগুলো বিশৃঙ্খল চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এই মতের দোষ দুই দিক থেকে দেখানো যায়। মতটা দুইভাবে আমাদের অভিজ্ঞতার বিরোধী। ১. বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্য কোনো ভাবে পরিবর্তিত হয় না এইটা হল প্রথম বিরোধ এবং ২. কালের অন্তর্গত এক কার্যরূপী ঘটনার কোনো কারণরূপ নেই এটা হল দ্বিতীয় বিরোধ। সংক্ষেপ করবার জন্য আমি মাত্র দ্বিতীয় বিরোধটার আলোচনা করব। জড়বাদী মতের একটা আপাতগ্রাহ্য রূপ আমি আমার মতো করে প্রথমে দিতে চেষ্টা করব; পরে দেখাতে চেষ্টা করব যে এই মতের অন্তর্নিহিত অসংগতি দূর করা অসম্ভব।

চিন্ময় বা মানসিক ঘটনাবলীকে অপ্রধান গুণাবলীর পর্যায়ে ফেলতে আমরা যদি রাজি হই, তা হলে এই মত-অনুযায়ী দেহ ও মনের সংসর্গেরও রীতিটা হবে এইরকম :

ক——খ——গ
↓ ↓ ↓
ক (১) খ (১) গ (১)
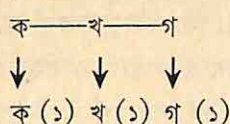
এখানে "ক," "খ" এবং "গ" এই তিনটে হল প্রধান গুণ; এগুলো আনুপূর্বিক ও কার্যকারণসম্বন্ধযুক্ত এক ধারার মধ্যে অবস্থিত। "ক (১)", "খ (১)" ও "গ (১)" এই তিনটে হল অপ্রধান গুণ; এগুলো "ক," "খ" ও "গ" দ্বারা উৎপন্ন এবং এগুলোর মধ্যে কোনো কার্যকারণসূত্র নেই, এবং "ক" থেকে "খ"এর পরিণতির ব্যাপার কিংবা "খ" থেকে" "গ"এর পরি-

ণতির ব্যাপারে কোনো অপ্রধানগুণেরই কিছুমাত্র প্রভাব নেই। "ক (১)" "খ (১)" এবং "গ (১)" ঘটনা তিনটে হল শুদ্ধ কতগুলো কার্য, সেগুলোর কোনো কারণরূপ নেই এবং সেজন্য সেগুলো সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। "ক (১)" এবং "খ (১)" এবং "গ (১)" তিনটে গুণের উদয়ের আনুপূর্বিকতা প্রকৃতপক্ষে কার্যকারণসম্বন্ধোপেত নয়। তবে নিয়মিতভাবে সেগুলো উদিত হয়, সেইজন্য সেইগুলোকে কার্যকারণসম্বন্ধযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

"ক (১)", "খ (১)" এবং "গ (১)" তিনটে গুণ যে নিয়মিতভাবে উদ্ভূত হয় তার কারণ সেগুলোর উৎপত্তি "ক" "খ" ও "গ"এর উপর নির্ভরশীল এবং "ক" "খ" ও "গ" তিনটে গুণ কার্যকারণধারার বন্ধনে আবদ্ধ। এই মতাবলম্বীরা মনে করেন যে তাঁদের মত গ্রহণের ফলে বিশ্বের সংগতি কোনো রূপেই ব্যাহত হয় না। এবং সম কারণের জন্য বিষম কার্যের উৎপত্তি হচ্ছে এরকম অপসিদ্ধান্ত তাঁদের মতবিরুদ্ধ। যেমন "খ" এবং "খ খ(১)" দুই ঘটনার কারণ "ক" হচ্ছে না; কারণ "ক"এর সঙ্গে "ক(১)" অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত এবং অন্যান্য ফল প্রসব না করে "ক থেকে খ"এর পরিণতি সম্ভবপর হচ্ছে না; যেহেতু "ক"এর সঙ্গে "ক(১)" এবং "খ"এর সঙ্গে "খ(১)"এর সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। এখন দেখা যাক এই মত স্বীকার করবার চূড়ান্ত ফল কি দাঁড়াচ্ছে; ফল হচ্ছে এই : "ক-খ-গ" গুণগুলোর ধারাই হল প্রকৃত কার্য-কারণের ধারা এবং "ক(১), খ(১) ও গ(১)" কতগুলো নিষ্ক্রিয় গুণ মাত্র ও "ক(১), খ(১) ও গ(১)" গুণগুলোর কোনো সৃজনক্ষমতা নেই, সেগুলো কেবল সৃজনক্ষম বলে মনে হয় এইমাত্র।

আমার জড়বাদী মক্কেলদের মামলা যেভাবে সাজালে সবচেয়ে জোরালো হয় আমি তাই করেছি। শুধু একটা ব্যাপারে তাঁদের কথা শুনি নি। তাঁরা অনেকেই বলেন যে "ক-খ-গ" গুণগুলোর ধারার কার্যকারিতা ঐ ধারার মধ্যেই নিবদ্ধ। তাঁদের স্বার্থেই তাঁদের এই পরামর্শ আমি গ্রাহ্য করি নি। কারণ তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী বিবরণ তৈরি করলে তাঁদের মামলা দুর্বল হয়ে পড়ত। এইবার মামলাটার দোষগুণ বিচার করা যাক।

অভেদ বা সমত্বের সূত্র বা নিয়মকে যখন আনুপূর্বিক তথ্যের বেলায় প্রয়োগ করা হয় তখন কার্যকারণসম্বন্ধের উদ্ভব হয়। আনুপূর্বিক ঘটনার সম্বন্ধে কোনো বাক্য যদি এখন সত্য হয় তা হলে সেই বাক্য চিরকাল সত্য।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় "যে "ক"এর পর "খ" উদ্ভূত হয়" এই বাক্য যদি সর্বক্ষেত্রে ও সর্বকালে সত্য হয় তা হলেই এই পারম্পর্যের ধারাকে কার্য-কারণধারা বলা যেতে পারে। অপরপক্ষে "খ"এর অনুগমন যদি সার্বিক-ভাবে সত্য না হয় তা হলে ধারা-সম্বন্ধীয় বাক্যটাকে সত্য বলাই চলে না। কারণ বর্তমান ক্ষেত্রে তা হলে মনে করতে হয় যে "ক"এর বেশি বা কম কোনো তথ্যকে "খ" অনুগমন করে এবং সেইজন্য "ক-খ" সম্বন্ধীয় অবধারণ বা বাক্যটা ভ্রান্ত বা মিথ্যা হয়ে পড়ে। এই দৃষ্টিতে কোনো ঘটনাবলীর আনুপূর্বিকতাকে যে পর্যন্ত কার্যকারণসম্বন্ধের দ্বারা নির্দিষ্ট না করা যায়, সে পর্যন্ত সেই আনুপূর্বিকতাসম্বন্ধীয় কোনো বাক্যই সত্য নয়। এবং নিমিত্তরূপী সমস্ত তথ্য সার্বিকভাবে সত্য। কেবল সেই সম্বন্ধই চিরকাল সত্য বা চিরকাল মিথ্যা হতে পারে যা ভাবের বিষয়, অনুভবের নয়। এবং সেইজন্য যখনই আমরা বলতে সমর্থ যে "খ" শুদ্ধ "ক"এর অনুগমন করে তখন এই ধারা-সম্বন্ধীয় প্রবচন একটা শাশ্বত সত্য। এতদ্ব্যতীত সত্যের রূপ পরিবর্তিত হতে পারে না। যাকে সত্য বলে স্বীকার করা যায় তা সঙ্গে সঙ্গে সত্যের অতিরিক্ত আরো ভিন্ন কিছু হতে পারে না। সেইজন্য একবার "ক-খ" অবধারণ স্বীকার করে নিলে "ক-খখ (১)" অবধারণ স্বীকার করা যায় না, যদি দুই ক্ষেত্রেই আমরা একই "ক"এর বিষয়ে চিন্তা করি; কারণ, যদি "খ (১)" ও অন্য কোনো উপলক্ষ বিনা শুদ্ধ "ক"এর অনুগমন করে, তা হলে "খ" এবং "খ খ(১)" দুটোকেই "ক"এর বিধেয়রূপে অভিহিত করতে হয়। কিন্তু এই দুই বিধেয় পরস্পরবিরুদ্ধ। এই ভাবে দেখানো যায় যে যদি "ক ক(১)"এর ফল হয় শুদ্ধ "খ" তা হলে শুদ্ধ "ক"এর ঐ একই ফল প্রসব করা সম্ভব নয়। অন্যরূপ যদি প্রতীয়মান হয় তা হলে অনুমান করতে হবে, "ক" শুদ্ধ "ক" নয় কিংবা "ক(১)" হল এক অবান্তর তথ্য। যে কোনো অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে "খ" সম্পর্কে দুটো পরস্পরবিরোধী প্রবচন ব্যবহার করতে হয়।

সুতরাং যে মত-অনুযায়ী আত্মাকে দেহের অপ্রয়োজন বিভূতি কল্পনা করা হয় সেই মত সম্বন্ধে আমাদের প্রথম সিদ্ধান্তে আসা যাক। যদি এই মতে বলা হয় যে মানসিক ঘটনার সংঘটন এবং অসংঘটন কোনোটারই হেতু নেই এবং যদি বলা হয় যে মানসিক ঘটনা ঘটুক আর নাই ঘটুক শারীর ঘটনার

ধারা একই রকম থাকে তা হলে এ মত স্বতোবিরুদ্ধ হতে বাধ্য। কারণ এইরকম স্বীকার করার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় যে এমন ক্রিয়া আছে যার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু বিশেষিত বা প্রভাবিত করে না এইরকম বিশেষণ অসম্ভব। তা ছাড়া বিভূতি কখনো দেহের ঘটনার সঙ্গে আসে এবং কখনো আসে না এইরকম বিশ্বাসের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে মানসিক ঘটনা ঘটবার কোনো হেতু নেই। এখানে এইটুকু বলেই আমি আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হতে চাই।

জড়বাদীদের মামলার যে বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি তার দিকে আবার মনোনিবেশ করা যাক। ধারাটা এইরকম :

ক — খ — গ
↓ ↓ ↓
ক(১) খ(১) গ(১)

এক্ষেত্রে অপ্রধান গুণগুলো প্রধান গুণগুলোর থেকে অবিচ্ছেদ্য। এবং "ক-খ-গ" গুণগুলো অন্যান্য ঘটনার জন্ম না দিয়ে পৃথক ও স্বতন্ত্র রূপে আসে না। তবুও "ক-খ-গ" গুণগুলোর ধারাটাই কার্যকারণের ধারা। এইভাবে বিবরণ দিলে আমাদের গলদটা শুধু ঢেকে রাখা হয়। "ক-খ-গ" গুণগুলোর ধারায় যা আছে বলা হচ্ছে তার অধিক কিছু না থাকলে অথবা "ক(১) খ(১) গ(১)" গুণগুলো বাহ্য কোনো কিছুর বন্ধনে আবদ্ধ এইরকম কল্পনা না করলে অসংগতির নিরসন হয় না। যদি "ক-খ-গ" গুণগুলোর ধারা সত্য হয় তা হলে সমগ্র পরিবর্তনের ধারা বোঝানো যায় না। অপর পক্ষে সমগ্র পরিবর্তনের ধারাটাই যদি অন্যরকম হয় তা হলে "ক-খ-গ" গুণগুলোর সত্য হওয়া সম্ভবপর নয়। আমরা ধরে নিয়েছি "ক (১)" গুণ হচ্ছে "ক" গুণের একটা অপরিত্যাজ্য বিশেষণ এবং "ক"এর ওপর "ক(১)"এর কোনো ক্রিয়াই নেই ; "ক (১) " সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। কিন্তু এই বিচার সত্য হলে স্বীকার করতে হয় "ক"এর দুটো বিধেয় আছে এবং বিধেয় দুটো পরস্পরবিরোধী। আমাদের বলতে হয় যে "ক" হচ্ছে "খ"এর উৎপাদক এবং "ক" হচ্ছে "খ খ(১)" এরও উৎপাদক; কিন্তু দুটো অবধারণের মধ্যে একটা মিথ্যা। কারণ, "ক" যদি শুদ্ধ "খ" এর জনক হয় তা হলে "ক"এর পক্ষে "খ খ(১)"এর জনক হওয়ার কথা মিথ্যা। সুতরাং "খ(১)"এর আগমন হয় কারণহীন নতুবা

"ক (১)" প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে "খ"এর মধ্যে "খ (১)"-রূপী পরিবর্তনের উৎপাদক। কিন্তু তা হলে "ক (১)" নিষ্ক্রিয় নয়, "ক (১)" হচ্ছে "খ" এর আংশিক উৎপাদক। সেইজন্য শুদ্ধ "ক" থেকে "খ"এর আগমনের কথা মিথ্যা। আমাদের মামলার বিবরণ শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হল।

আপনি বলবেন যে প্রত্যেকটা অপ্রধান গুণই যে একটা পৃথক প্রধান গুণের সৃষ্টি তা নয়, প্রধান গুণগুলোর অন্তর্বর্তী সম্বন্ধের একটা সমূহ প্রভাবে অপ্রধান গুণসমুদয়ের জন্ম। কিন্তু উৎপন্ন গুণনিচয়ের এই সম্বন্ধের ওপর কোনো কার্যকারিত্ব নেই। এই বিচারেও অসংগতি অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। "ক থেকে ঙ" সম্বন্ধ যদি "খ থেকে চ" সম্বন্ধের উৎপাদক হয়, তা হলে "ক থেকে ঙ" নামক সম্বন্ধের পক্ষে "খ থেকে চ" নামক নগ্ন সম্বন্ধ এবং "খ" (১) নামক ভূষণের উৎপাদক হওয়া অসম্ভব। এই ছুটো বাক্যের একটা মিথ্যা। সার কথা, দশার ভেদ হলে সেটা কার্যও বটে কারণও বটে।

ভ্রান্তধারণাগুলো সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা এখন শেষ হল। আমরা জেনেছি যে দেহ ও আত্মার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া অস্বীকার করা হয় বিপজ্জনক না হয় অসম্ভব। আত্মা হচ্ছে দেহজাত এক নিষ্ক্রিয় বিকার মাত্র, এইরকম ধারণা পোষণ করতে হলে অসংগতিকে উপেক্ষা করতে হয়। এবং দেহ ও আত্মার সমাপতিত ও সমান্তরাল প্রবাহে বিশ্বাস করতে হলে প্রতীয়মান তথ্যগুলোর সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করতে হয়। সুতরাং লৌকিক মতকেই মূলত প্রামাণ্য বলে আমাদের গ্রহণ করতে হয়।

এইবার দেহ ও আত্মার অন্যোন্যক্রিয়ার প্রকৃতরূপ কি সেই বিষয়ে আলোচনা করি। দেহ ও আত্মা পরস্পরকে প্রভাবিত করে; কিন্তু এই বাক্যে দেহের অর্থ শুদ্ধ দেহ এবং আত্মার অর্থ শুদ্ধ আত্মা নয়। শুদ্ধ দেহ এবং শুদ্ধ আত্মার অন্যোন্যক্রিয়া সম্ভবপর কি না পরে দেখব; কিন্তু সেইরকম ক্রিয়া যে প্রকৃত নয় সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ। শুনতে পাই যে সচরাচর প্রত্যেক ঘটনার ছুটো দিক আছে এবং এই ছুটো দিক হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত। এবং ছুটো দিক মিলিতরূপে পরবর্তী আর একটা ঘটনা ঘটায়। কার্যটা কি? কার্যটা হচ্ছে একটা মানসিক অবস্থা এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত আর-একটা কায়িক অবস্থা কিংবা একটা চেতনার দশা এবং জীবদেহের যে বিশেষ অংশ

মনের সঙ্গে সাক্ষাৎরূপে সংযুক্ত তার একটা দশা। এবং কারণটা কি আমরা বলব ? কারণটাও হচ্ছে এরকম একটা দ্বৈত ঘটনা; তার দুটো দিক অবিচ্ছেদ্য-রূপে সংযুক্ত থেকে যুগপৎ কার্য করে। মন বা আত্মার মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা শুধু মন বা শুধু শরীরের অবস্থার উপর নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে শরীর ও মন উভয়ের যুগপৎ ক্রিয়ার ওপর। সেইরকম দেহের মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তাও মন ও দেহ উভয়ের সমকালীন ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হয়। কেবল দেহ বা কেবল আত্মার একক ক্রিয়া কখনো এই পরি-বর্তনগুলোর কারণ নয়। সেইজন্য যে-কোনো এক দিকের পরিবর্তনে অন্য দিকেও পরিবর্তন উপস্থিত হয় এবং সেইজন্যই যে-কোনো এক দিকের পরি-বর্তনে পরবর্তী ঘটনার দুই দিকেই পরিবর্তন সাধিত হয়। পরে মতটা আর একটু বদলাতে হবে। কিন্তু ঘটনার দ্বিমুখিত্ব যে একটা তথ্যতা আমাদের স্বীকার করতেই হয়।

শারীরবৃত্ত ও মনোবিজ্ঞানে কাজের সুবিধার জন্য আমরা এই জটিলতাকে উপেক্ষা করি ; এবং কতগুলো সুস্পষ্ট বা মুখ্য উপলক্ষ বা নিমিত্তকে কারণ এবং কতগুলো সুস্পষ্ট বা মুখ্য ফলকে কার্য নামে অভিহিত করি। প্রতীয়মান তথ্যের এরকম অঙ্গচ্ছেদ বিজ্ঞানের সাধনার জন্য দরকার হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আমরা মনে করি যে কোনো চিন্তন-ব্যাপারে হেতুস্থানীয় যুক্তির মানসিক ঘটনাটা আগে আসে এবং সিদ্ধান্তস্থানীয় মানসিক ঘটনাটা তার ফল। আমরা এমনভাবে কথা বলি যে মনে হয় যেন পূর্ববর্তী ঘটনাটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ও যথার্থ কারণ এবং কারণের মাত্র এক অংশ নয়। যতক্ষণ দুই দিকের ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কোনো ব্যভিচার ধরা পড়ে না ততক্ষণ এই দুটো পরম্পরাকে আমরা স্বতন্ত্র বলে মনে করি। যখন পারম্পর্যের মধ্যে ব্যভিচার ধরা পড়ে তখন আমরা দেহ ও আত্মা এই দুটো সত্তার সংঘাতের সম্বন্ধে সচেতন হই। কিন্তু, দুটো সত্তার স্বাতন্ত্র্য যে শুধু সৌকর্যের জন্য এই সত্য আমাদের মনে থাকে না এবং আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে এক কষ্টের সম্মুখীন হই ; আমরা জিজ্ঞাসা করি যে যে-ধারা স্বতন্ত্র ও পৃথক ছিল সেই-ধারা অন্য আর একটা ধারার ওপর প্রভাব বিস্তার করে কি করে এবং অন্য ধারাটার দ্বারা প্রভাবিতই বা হয় কি করে। তার পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা এক মিথ্যা ও সর্বনাশা ভ্রমের পথে অগ্রসর হই।

প্রকৃত পক্ষে কেবল মানসিক ঘটনার ধারা নামক কোনো তথ্য নেই। প্রত্যেক মানসিক ঘটনার সঙ্গেই একটা কায়িক ঘটনা সংযুক্ত আছে এবং কায়িক ঘটনাগুলো কার্যকারণপরম্পরার অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। পৃথকরূপে দেহ ও মনের বিকারগুলো কার্য ও কারণের মাত্র এক অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যখন আমরা এক বিশেষ দিককে মুখ্য বিবেচনা করি তখন সেই বিশেষ দিকে মনোসংযোগ করি; এবং অপর দিকের ধারাটা যতক্ষণ সমানভাবে ও অব্যভিচারীভাবে চলে অপর দিকের ধারাটাকে অগ্রাহ্য করি। কিন্তু বস্তুত প্রত্যেক ঘটনারই কারণ হল শরীর ও মন উভয়ে। এইজন্য আমরা বলি যে মানুষের ভাব ও ভাবনা, সুখ ও দুঃখ তার দেহকে প্রভাবিত করে। এবং মনের ব্যাপারগুলো সত্য সত্যই দেহকে প্রভাবিত করে; কারণ, সেগুলো দেহের মধ্যে পরিবর্তন আনে; এবং শরীরের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো আসে সেগুলোর কারণ অন্য কতগুলো অগ্রগামী ও দৈহিক উত্তেজনা নয়। কিন্তু সুখ ও দুঃখ, ইচ্ছা ও ভাবনা এইসব চিত্তবৃত্তির অস্তিত্ব বা ক্রিয়া দেহ থেকে বিযুক্ত অবস্থায় অসম্ভব। দেহের অন্তর্বর্তী অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সব সময়েই দায়ী হল কতগুলো পূর্ববর্তী চিন্ময় এবং কায়িক উপলক্ষের একত্র সমাবেশ। আবার মনের দশার পরিবর্তনের জন্যও দায়ী হল কতগুলো অগ্রগামী কায়িক ও চিন্ময় উপলক্ষের সংযুক্ত সমাবেশ। অনেক সময় বাহ্য সংবেদনকে দেহজাত মনে করা হয়; কিন্তু এই মত ভ্রমাত্মক ও একদেশদর্শী। এই মতে প্রধান উপলক্ষকে গ্রহণ করে অবশিষ্ট উপলক্ষগুলোকে পরিত্যাগ করা হয়। কোনো সংবেদনের উৎপাদনে পূর্ববর্তী মানসিক ক্রিয়ার প্রভাবকে যদি একেবারে অস্বীকার করা হয় তা হলে স্বৈরিতার সীমা লঙ্ঘন করা হয় এবং ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

দেহ ও দেহী (জীব) উভয়েই হচ্ছে প্রতীয়মান বা আপাতগ্রাহ্য সত্তা মাত্র। সাধারণভাবে বলা যায় যে উভয়ে উভয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গীরূপে সংযুক্ত। এ দুটোর স্বাতন্ত্র্য হল একটা কাল্পনিক ব্যাপার এবং চিকীর্ষা বা ইচ্ছাবৃত্তির সাহায্যে সেতু নির্মাণ করবার চেষ্টা একটা অপচেষ্টা মাত্র; সেটা যেন অনেকটা মতিভ্রমকে মায়া দিয়ে নিরসন করবার মতো। প্রত্যেক চিন্ময় বা মানসিক ঘটনারই দুটো দিক আছে; তবে কার্যত আমরা একদিককে অগ্রাহ্য করি। সেইজন্য মনে রাখা ভালো যে ভাব-অনুষঙ্গের ব্যাপারের

সঙ্গেও নিশ্চয়ই কিছুটা দৈহিক ক্রিয়া আছে। এবং অনুষঙ্গের ব্যাপক নিয়মের দ্বারাই মানসিক ও শারীরিক ঘটনাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের ব্যাখ্যা করতে আমরা বাধ্য। সেগুলোর যে-কোনো একটা ঘটনার পুনরভ্যুদয়ে সংযুক্ত অপর ঘটনার পুনরভ্যুদয় হয়। এইজন্য কোনো মানসিক ঘটনার উদয়ে, সাধারণত সেই মানসিক ঘটনার সঙ্গে অতীতে যে ঘটনাটা অনুষক্ত ছিল সেই দৈহিক ঘটনাটারও অভ্যুত্থান হয় এবং মানসিক ঘটনাটাকে দৈহিক পরিবর্তনের কারণ বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যথার্থত মানসিক ঘটনাটা সমগ্র কারণ নয়, কারণের এক মুখ্য ও কার্যসাধক অংশ। এবং দৈহিক পরিবর্তনটা কেবল আর একটা পূর্বগামী দৈহিক অবস্থার সৃষ্টি নয়। যদি এই পূর্বগামী দৈহিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ভাব বা অনুভবের ক্রিয়া না থাকত তা হলে পরবর্তী দৈহিক পরিবর্তন আসত না।

আমাদের এই বর্ণনাকে ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য যে শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। এই বিষয়ে অনেক রকম প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন আত্মার অবস্থান কোথায় এবং চিন্ময় ও কায়িক ঘটনাগুলোর অন্তর্বর্তী পারমার্থিক সম্বন্ধ কিরূপ এই-সব প্রশ্ন সংগত ও প্রয়োজনীয়। আমরা এইসব প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে অক্ষম ; তবে এগুলোর সম্বন্ধে মোটামুটি একটা উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ হল মূলত দুর্বোধ্য এবং কেন এই দুই সত্তা পরস্পরসংযুক্ত সেই সম্বন্ধে আলোচনা সম্পূর্ণ বৃথা। কারণ দেহ ও আত্মা পরমার্থ নয় ; দেহ ও আত্মা প্রতীয়মান, আপাতস্বীকৃত ও আবভাসিক সত্তা। স্বতন্ত্রভাবে দেহ ও আত্মা হচ্ছে অখণ্ড সত্তার বিভিন্ন, বিযুক্ত ও কৃত্রিম অংশবিশেষ এবং উভয় সত্তার ধারণাই হল স্বতোবিরোধদুষ্ট। দেহ ও আত্মার খণ্ডিত সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। কারণ, খণ্ডিতরূপে দেহ ও আত্মার ধারণা সত্য নয়। এবং এই কারণেই দেহ ও আত্মার অন্যোন্যসম্বন্ধের বাস্তব স্বরূপ হল বুদ্ধির অগোচর।

নিমিত্তের ধারণাটা বিশ্লেষণ করলেও ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সাধারণত দেহ ও আত্মার ধারার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য ; একটার থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্নরূপে অন্যটাকে দেখবার স্বৈরিতা আমরা কেবল কাজের সুবিধার জন্য স্বীকার করে নিই। কিন্তু দুই দিকের

অন্যোন্যসম্বন্ধ স্বীকার করেও যথার্থ কারণসূত্রকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সমগ্র বিশ্বের খানিকটা অংশ খণ্ডিত করে আমরা দেহ ও আত্মার সত্তা দুটোকে লাভ করি। যথার্থ কারণ হচ্ছে সমগ্র কারণ ; এবং সমগ্র কারণ বলতে সেই কারণকেই বোঝা যায় যার মধ্যে সমগ্র পরিবেশ ও পশ্চাতের সব অনির্দিষ্ট উপলক্ষগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। সমগ্র কারণ না জেনেও ধারার অব্যভিচারিত্ব বোঝা যায় কিন্তু একমাত্র সমগ্র কারণ বুঝতে পারলে কোনো এক বিশেষ ধারার উদ্ভবের সম্যক হেতু বা আবশ্যকতা আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু পশ্চাদ্বর্তী সব উপলক্ষগুলোকে জেনে শেষ করা যায় না ; সেগুলো সীমাহীন ; সুতরাং উপপত্তিরূপে আমরা মানতে বাধ্য যে কার্য ও কারণের সম্যক ও পূর্ণজ্ঞান অসম্ভব। আমরা যে-সব ঘটনা বা যে-সব ব্যাপার বা যে-সব অবস্থাকে কার্য ও কারণ বলে মনে করি সেগুলো কখনো প্রকৃত ও পূর্ণ কার্যকারণ নয়। সেগুলোকে দয়া করে এবং খানিকটা বিকৃত করে কার্য ও কারণ বলবার রীতি আমাদের মধ্যে অনুমোদিত এইমাত্র। আমরা যখন দৃশ্যমান কোনো ঘটনারাশির ব্যাখ্যা দিই তখন বিভিন্ন ঘটনার অভ্যুত্থান বা আগমনের নিয়ম লক্ষ্য করে যে-সব ঘটনাকে কার্যত অবান্তর বলে মনে করি সেইসব ঘটনাকে অগ্রাহ্য করে, কতগুলো নির্দিষ্ট ঘটনাকে কারণস্থানীয় এবং অন্য কতগুলো নির্দিষ্ট ঘটনাকে কার্যস্থানীয় বিবেচনা করি। ব্যবহারিক সত্তার ব্যাখ্যার জন্য এর অধিক কিছু করা সম্ভবপর নয়। এবং দেহ ও মনের অন্যোন্যক্রিয়ার ব্যাখ্যাতেও এর বেশি আশা করলে ব্যর্থমনোরথ হতে আমরা বাধ্য।

অগ্রসর হওয়ার আগে কতগুলো বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। মনের কোনো বিশেষ দশা যে পূর্বগামী দশার দ্বারা উৎপন্ন কিংবা অংশত উৎপন্ন এরকম সবসময় আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় না। মনে হয় মানসিক জীবনের উৎপত্তি কতগুলো দেহজাত ঘটনার উপলক্ষের সমাবেশের ওপর নির্ভরশীল। অচৈতন্য অবস্থা বা চেতনার বিচ্ছেদের পর আত্মা যখন আবার জেগে ওঠে তখন দেহই যেন এই জাগরণের কারণ এই রকম প্রতীয়মান হয়। প্রথমে এবার আত্মা বা চৈতন্যের উৎপত্তির বিষয়টা আলোচনা করি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা উচিত যে শুদ্ধদেহ হল একটা কৃত্রিম ও বিশ্লিষ্ট ভাবমাত্র এবং দেহ ও মন হল সমগ্রের মধ্যে লয়প্রাপ্ত এক বস্তু ; তবে আত্মা বা

কোনো অচেতন জড়সংস্থান বাস্তব কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। (দ্বাবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই কথাগুলো যদি স্মরণ রাখা হয় তা হলে জড়সংস্থানের দ্বারা চৈতন্যের উৎপত্তি সম্ভবপর এই মত স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই। এমন হয়তো সম্ভবপর যে জড়সংস্থান একক্ষণে চৈতন্যহীন থাকে এবং অন্যক্ষণে চৈতন্যময় হয়ে ওঠে। সম্ভাবনার দিক থেকে এই মত অস্বীকার করা যায় না। এই মতের মধ্যে কোনো বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে ১. পুনরুত্থিত চৈতন্য বা আত্মা জড় ঘটনাসংস্থান থেকে সহসা উদ্ভূত হয় এবং ২. চৈতন্য যদি শুদ্ধ কতগুলো জড় তথ্যের দ্বারা উৎপন্ন হয়ও সেগুলোর ওপর চৈতন্যের প্রতিক্রিয়া আসতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রেও শুদ্ধ দেহ শুদ্ধ মনের ওপর ক্রিয়াশীল এরকম ভাবা যায় না। ঘটনাটা প্রথমে মনে হয় যেন একমুখী কিন্তু সেটা হল দ্বিমুখী এবং দ্বিমুখী ঘটনার প্রভাবে দুই দিক পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে। আমরা তা হলে দেখতে পাই যে, শুদ্ধ আত্মা বা চৈতন্য কখনো থাকে না এবং চৈতন্যের উদ্ভবের পর শুদ্ধ দেহ বলেও কিছু থাকে না। এই তত্ত্বটা স্বীকার করলে চৈতন্যকে জড়সম্ভব বলা নির্দোষ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখা চাই যে জড়সংস্থানকে চৈতন্যের বা আত্মার সম্পূর্ণ বা সমগ্র কারণ বলা চলে না। কারণ, জড়প্রকৃতি সমগ্র সত্তার হল একটা বিশ্লিষ্ট ও ভাবগত অংশ মাত্র; জড়প্রকৃতি কখনো পরমার্থ নয়। কোনো বিশেষ জড়সংস্থান কর্তৃক অন্য কোনো ঘটনা উৎপন্ন হওয়ার জন্য সেই সংস্থানের পশ্চাদ্বর্তী ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সব ঘটনাকে যুগপৎ কার্যকরী হতে হয়। শুদ্ধ জড় বা ভৌতিক কারণের কোনো বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। এইরকম কারণ হল একট কৃত্রিম দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র।

চৈতন্যের অবিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে বিচার করলেও এই একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। জীবদেহে চেতনার ন্যূনাধিক অপসৃতির পর পুনরায় যখন চৈতন্যের উদয় হয় তখন প্রশ্ন ওঠে এই চৈতন্যের পুনরুদয়ের কারণ শুদ্ধ দেহ কি না। তথ্য ও সম্ভাব্যতা দুই দিক থেকে প্রশ্নটার বিচার হতে পারে, এই কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত আমরা বলতে পারি যে চৈতন্য যে একেবারে নিবে যায় বা অদৃশ্য হয় এই বাক্য প্রমাণ করা অসম্ভব। পরিচিত লক্ষণের অবর্তমানে চৈতন্যের সম্পূর্ণ অপসৃতি প্রমাণ করা চলে না। হয়তো অচৈতন্য

অবস্থায় চৈতন্য ভিন্ন মাত্রায় বা ভিন্ন প্রকারে অবস্থান করে। এবং কোনো জীবদেহে কখনো সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থা আছে কি না এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া হয় যে সম্পূর্ণ চৈতন্যহীন অবস্থা আছে, তা হলেও নূতন কোনো কষ্টের উৎপত্তি হয় না। এখানেও আমরা বলতে পারি যে মানসিক ঘটনাকে উপলক্ষ করেই চেতনার পরের দশাটির উদ্ভব হয়। এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন এবং ব্যবধানের মুহূর্তে বা সময় আত্মা বা চৈতন্যের অবস্থান কিভাবে বর্ণনা করতে হবে তা আমরা আগেই বলেছি।

মানসিক অনুষঙ্গ যেখানে শারীর অনুষঙ্গে পরিণত হয় সেখানেও চৈতন্য স্খলন হয় আমরা ধরে নিতে পারি। মনোবিজ্ঞানে প্রায়শই দেখা যায় যে কতগুলো আচরণ বা বৃত্তি এক সময় চৈতন্যসহিত ছিল এবং পরে সেগুলো পূর্ণত বা অংশত, সব সময় বা কখনো কখনো চৈতন্যরহিত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তত্ত্ববিচারে এইসব ঘটনার কোনো তাৎপর্য নেই। কারণ প্রথমত আমরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি না যে আত্মার অচৈতন্য অবস্থা নেই। দ্বিতীয়ত যে দেহ পড়ে থাকে সেই দেহকেও একমাত্র খুব সংকীর্ণ অর্থে শুদ্ধ বা কেবল দেহ বলা চলে। চৈতন্যস্খলনের অবস্থায় দেহের মধ্যে আত্মা না থেকেও কোনো একপ্রকারে থাকে স্বীকার করতে হয়। কারণ প্রকৃতির এমন কোনো অংশ থাকা সম্ভবপর নয় যা এক বা একাধিক আত্মার চৈতন্যের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। (দ্বাবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং শুদ্ধ জড় হল একটা কল্পনা মাত্র, এও আমরা দেখেছি। পরমার্থের সমগ্র অনুভবের ওপর জড়ের অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

আমার মতের বিরুদ্ধে আপত্তি আসতে পারে যে আমি জড় ও চৈতন্য জগতের নিয়মগুলোর বশ্যতা স্বীকার করছি না এবং এইরকম অস্বীকার সমর্থন করা যায় না। আমি বলব এই আপত্তিটা এক ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক নিয়মই শাশ্বত সত্য; সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে প্রত্যেক নিয়মই প্রধানত একটা নির্বাচন বা বিশ্লেষণ মাত্র। এবং এইজন্যই প্রত্যেক নিয়মই দৃশ্যমান জগতের ঘটনাগুলোর থেকে বিশ্লিষ্টভাবে ভাবগতরূপে সত্য। যদি কোনো নূতন উপলক্ষের আমদানি করা হয় কিংবা নিয়মের বন্ধনকে মূর্ত জগতে নামিয়ে আনতে হয় তা হলে আমরা নিয়মের বাইরে চলে যাই।

নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না ; নিয়ম থাকেই শুধু বর্তমান স্থলে নিয়মটা প্রযোজ্য হয় না। প্রত্যেক নিয়মের উপযোগী কতিপয় বিশেষ অবস্থা আছে। সেইসব অবস্থা যেখানে নেই মনে হয় সেখানে ঐ নিয়ম প্রয়োগ করা চলে না। কিন্তু এই অপ্রয়োগকে নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যায় না।

দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ সম্পর্কিত আরো অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে এ পর্যন্ত কোনো আলোচনা হয় নি। এইবার সেইগুলোর নিষ্পত্তি করা দরকার। শুদ্ধ আত্মা দেহের ওপর ক্রিয়াশীল এ বাক্য কি বলা চলে? এবং দেহ ব্যতিরেকে আত্মার অস্তিত্ব কি সম্ভবপর এবং যদি সম্ভবপর হয়, কি অর্থে? এ প্রশ্নগুলোর আলোচনা করা দরকার। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় শুদ্ধ আত্মা নামক কোনো পদার্থের সন্ধান কখনো পাই না। আমাদের অভিজ্ঞতায় আত্মার অস্তিত্ব ও ক্রিয়াশীলতা হল জড়পদার্থের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। কিন্তু সম্ভাবনার দিক থেকে প্রশ্নটার বিচার করা যাক। শুদ্ধ আত্মা যদি থাকেও তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। আমরা দেখেছি যে দেহের নানাত্ব অসম্ভব নয়। (দ্বাবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কোনো এক জীবদেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রূপে ও বিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করতে পারে। এবং একই জীবদেহ একাধিক আত্মার বাসস্থান হতে পারে। তা ছাড়া দেহের ক্রিয়া ও কর্মক্ষমতার সম্ভাবনার কোনো সীমা নেই। এমন অবস্থায় শুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব কেমন করে সম্ভবপর বুঝতে পারি না। এই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত হল এই: বিদেহ আত্মার অস্তিত্ব বা ক্রিয়া সম্ভবপর ; কিন্তু এইরকম আত্মার প্রকৃত অস্তিত্বের সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

বিদেহ আত্মা বলতে আমরা কি মনে করি? বিস্তারহীন বা আয়তনহীন আত্মা শূন্য পদার্থ নাও হতে পারে। এরকম আত্মার মধ্যে অপ্রধান গুণরাশির সন্নিপাত সম্ভবপর। এবং এই গুণগুলোই দেহের কাজ করতে পারে। এইরকম ধারণা পোষণ করবার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই ; তবে এই ধারণাকে অসম্ভব বলা চলে না। শুদ্ধ আত্মার ধারণাও অসম্ভব নয়, তবে গ্রহণযোগ্যও নয়। এইরকম আত্মাকে শুদ্ধ চৈতন্যের ধারা হতে হবে। এরকম চৈতন্যের সঙ্গে সেইসব গুণের একটাও থাকতে পারবে না যেগুলোর ভিত্তিতে জীবদেহের উৎপত্তি। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন যে শুদ্ধ আত্মা অজড় অথচ এক বিশেষ স্থানে অবস্থিত তাঁর ধারণাতে

অসংগতি দোষ জন্মাবে। সম্ভাবনার দিক থেকে অজড়, অনংশ, বিস্তারহীন ও দেশে অনবস্থিত চেতনার প্রবাহ স্বীকার করতে কোনো কষ্ট নেই। এবং এরকম শুদ্ধ আত্মার পক্ষে দেহের ওপর অধিকাংশ সময় বা কখনো কখনো প্রভাব বিস্তার করাও খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়। এমন কি এরকম আত্মার পক্ষে জড়পদার্থ সৃষ্টি করাও সম্ভবপর হতে পারে। এইসব সম্ভাবনাগুলোকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। কারণ সেগুলোকে অলীক বলে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু সম্ভাব্যতার দিক থেকে সেগুলোকে গ্রহণ করা চলে না। সেগুলোকে কেবল কল্পনার বিলাস বলা চলে। যে বস্তু বা ব্যাপার এইরকম সম্ভাবনামাত্র তাকে কার্যত শূন্য বলতে কোনো বাধা হওয়া উচিত নয়।

আমাদের আলোচনার ফল দাঁড়াচ্ছে যে দেহ ও আত্মা কোনোটাকেই বস্তু বলা চলে না। সে দুটো উভয়েই আমাদের অভিজ্ঞতার দুই ভিন্ন ধারারূপে সমুৎপন্ন এবং এই দুই ধারার অন্তর্গত ঘটনাগুলো কার্যকারণসূত্রে সম্বদ্ধ। এক দিকের ধারার মধ্যে পরিবর্তন অন্য দিকের ধারার মধ্যে পরিবর্তন আনে এবং সেই অন্য দিকের ধারার পরিবর্তনের দ্বারা আবার প্রভাবিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় দেহ ও আত্মার পারস্পরিক সম্বন্ধের রূপ এইরকম। তার পর লক্ষ্য করা যায় যে দেহ ও আত্মার ধারার স্বরূপে কিছু তারতম্য আছে। শুদ্ধ আত্মা হল শুদ্ধ সম্ভাবনা মাত্র। এর বেশি বিশ্বাস করা অসম্ভব। যদি শুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব একটা তথ্যও হয় সেই তথ্য জানবার ও প্রমাণ করবার কোনো পন্থা নেই। অপর পক্ষে দেহের শুদ্ধ অস্তিত্বকে শুদ্ধ সম্ভাবনা বলা যায় না; শুদ্ধ দেহ থেকে আত্মার উদ্ভব ও চৈতন্যের আংশিক ও সাময়িক স্খলন বা অপসৃতিকে একটা সম্ভাবনামাত্র বলা চলে না। যদিও শুদ্ধ দেহকে তথ্যরূপে স্বীকার করবার কোনো প্রমাণ নেই, শুদ্ধ দেহের অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা অনেক বেশি। তবে আত্মার ওপর শুদ্ধ দেহের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। দেহ ও আত্মার পারস্পরিক সম্বন্ধের পূর্ণ ও নির্দোষ ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। তত্ত্ববিদ্যার দিক থেকে এবিষয়ে বিশদ জ্ঞানের প্রয়োজনও নেই। কারণ, দুই অবভাসিত ও আপাতসত্য ও সমুৎপন্ন ধারাই পরমতত্ত্বে যখন লীন হয় তখন সে দুটোর স্বকীয় ধর্ম নষ্ট হয়ে যায় সুতরাং দেহ ও আত্মা স্বতন্ত্ররূপে অসত্য। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে দেহ ও আত্মাকে পৃথক কল্পনা করা চলতে পারে। কিন্তু পারমার্থিক বিচারে এই স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত।

এবার বিভিন্ন আত্মার মধ্যে সম্বন্ধের বিষয় কিছু বলা দরকার। বিভিন্ন আত্মার মধ্যে সংযোগের স্বরূপ কি এবং আত্মার ভিন্নতা ও অভিন্নতার অর্থ কি? এই বিষয়ে যাতে আমরা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করি সেই দিকে সতর্কতা অবলম্বন করবার কারণ আছে। প্রত্যেক আত্মার অনুভব বা অভিজ্ঞতা পৃথক বা ভিন্ন; বিষয়গত ঐক্য থাকা সত্ত্বেও, অনুভব বা অভিজ্ঞতার সমুৎপত্তি হয় ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রকে আশ্রয় করে। সেজন্য প্রত্যেক আত্মার অনুভবের অনন্য স্বকীয়তা আছে। এক আত্মার পক্ষে অন্য আত্মার অনুভবকে প্রত্যক্ষরূপে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। এক দিক থেকে প্রত্যেক আত্মা স্বতন্ত্র ও অসঙ্গ। কিন্তু অন্য দিক থেকে এক আত্মা অন্য আত্মার ওপর ক্রিয়াবিস্তার করতে পারে। কিভাবে এই ক্রিয়াবিস্তার সম্ভবপর আমি অনুসন্ধান করব।

এক আত্মা অন্য আত্মার ওপর অপরোক্ষরূপে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এরকম ধারণাকে নেহাৎ আজগুবি বলা যায় না। তবে এপ্রকার প্রভাব-বিস্তার একটা সম্ভাবনা মাত্র। যা বিক্রিয়মান ও বিকৃত তা তো সব সময়ই মনে হয় আমাদের দেহের কোনো বাহ্য অংশ। অলৌকিক প্রত্যক্ষ বা অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারাও আত্মার সাক্ষাৎ ক্রিয়া বা প্রভাবের অনুমান প্রমাণিত হয় না। কারণ আমরা ধরে নিতে পারি যে এই প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ বা প্রভাব কোনো না কোনো সূক্ষ্ম জড়পদার্থের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়। সুতরাং অলৌকিক সংসর্গ ও লৌকিক সংসর্গের মধ্যে প্রকারভেদ করা চলে না। আবার আমরা ভাবতে পারি যে এক জীবদেহের অন্তরিন্দ্রিয় অন্য জীবের অন্তরিন্দ্রিয়ের ওপর প্রত্যক্ষ ক্রিয়া বিস্তার করে। কিন্তু এটা যদি শুধু সম্ভাবনামাত্র হয় তা হলে এই নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নাই। এবং তত্ত্ববিদ্যায় এইসব আলোচনা হল আপ্রাসঙ্গিক। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে ও বাহ্য জগতের ওপর দিয়ে মূর্ত হওয়ার জন্য আত্মা বা অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রভাব কিছু কম কার্যসাধক নয় এবং প্রত্যক্ষরূপে মূর্ত হলেই যে সে প্রভাবের পারমার্থিক মূল্য বাড়ে একথাও বলা যায় না। এইটুকু বলেই এই কুসংস্কারপূর্ণ ধারণাকে আমরা বর্জন করতে পারি। বিভিন্ন আত্মার মধ্যে সাক্ষাৎ সংযোগ অসম্ভব নয়, তবে এরকম সংযোগ কোনো তথ্য নয়। এতদ্ব্যতীত এই সম্ভাবনার কোনো তত্ত্বগত মূল্যও নেই।

আমরা তা হলে সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বিভিন্ন আত্মার মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব একমাত্র জীবদেহের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এবং সেইজন্য তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদানও এই জীবদেহের সাহায্যেই হয়। যে-সব সমুৎপন্ন বা প্রতীয়মান তথ্যকে আমরা দেহ বলি সেগুলোর মধ্যে পরিবর্তনের জন্য ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন জন্মায় এবং এই পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে অন্যান্য জীবদেহের মধ্যে পরিবর্তন আসে ; তার ফলে সংশ্লিষ্ট জীবচেতনার মধ্যেও অনুভবের ইতরবিশেষ হয়। এই রীতিতে আমি ভাবের আদানপ্রদান করি অন্য জীবের সঙ্গে এবং অপর জীবেও এই রীতিতেই আদানপ্রদান করে। এই বিশ্ব এমন যে, তার সম্বন্ধে আমাদের সকলের পক্ষে একই প্রকার ভাব রচনা করা সম্ভবপর। আমরা চিন্তার দ্বারা এমন এক শৃঙ্খলা নির্মাণ করতে পারি যার মধ্যে প্রত্যেকেরই স্থান আছে ; এমন এক সুসমঞ্জস ও স্থায়ী বিশ্ব আমরা সৃষ্টি করতে পারি যার মধ্যে প্রত্যেকেরই উপলব্ধ সম্বন্ধ অপরের উপলব্ধ সম্বন্ধের সঙ্গে মিলে যায়। কেন ও কিভাবে এই ব্যাপার সম্ভবপর বোঝা যায় না। কিন্তু প্রকৃতির এই সুষমা বা সমতাই হল সমস্ত পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদানের ভিত্তি। তবে এমন কিছু অসম্ভব নয় যে সচেতন জীবের নানারকম ক্রম বা শ্রেণী আছে এবং এক শ্রেণীর জীবের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর জীবের কোনো সংযোগ নেই। (দ্বাবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

এখন আরো এক বিষয়ে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমরা দেখছি যে দেহ ব্যতীত আমাদের ভাব ও ভাবনা প্রকাশ করা যায় না। প্রশ্ন ওঠে, এই অবস্থায় আমরা যে নিজেদের যথার্থরূপে প্রকাশ করতে পারি সে বিষযে নিঃসংশয় হওয়া যায় কি করে ? আমাদের নিজ নিজ অনুভবের বৈচিত্র্য থাকতে পারে। এই বৈচিত্র্য দেহের ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা কি সম্ভবপর ? এই আপত্তি প্রাসঙ্গিক ও এই আপত্তিকে সম্পূর্ণ খণ্ডন করা যায় না। আমাদের প্রত্যেকেরই ইন্দ্রিয়জ অনুভব যে একরকম এ বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া যায় না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের গঠনের আপাতদৃষ্ট সমত্ব থেকে আমাদের অনুভবের সমত্ব অনুমিত হয়। এই অনুমানের যাথার্থ্য প্রমাণ করা অসম্ভব। তবে এই অনুমান সত্য হওয়ারই সম্ভাবনা খুব বেশি।

যখন সম্বন্ধের পরিবর্তন হচ্ছে না তখন গুণের পরিবর্তন হচ্ছে এইরকম ব্যাপার অসম্ভব বললেই চলে। তবে সরবে ঘোষণা করা চলে না যে এই ব্যাপার অসম্ভব। আমরা বিশ্বাস করি যে পরস্পরকে আমরা বুঝতে পারি। তবে উপপত্তিরূপে বলা চলে যে অন্যান্য দেহের সঙ্গে কোনো আত্মা বা চৈতন্য হয়তো নেই। কিংবা এও কল্পনা করা চলে যে অন্যদেহস্থিত আত্মার ব্যবহার থেকে সে বুঝতে পারছে মনে হলেও প্রত্যেক আত্মা নিজের নিজের গুহার মধ্যে চিরবন্দী। শুধু সংশয়ের কথা বাদ দিলে সব প্রশ্নটা তা হলে দাঁড়ায় এই : পারস্পরিক সংযোগ বা ভাবের আদান-প্রদান স্বীকার করে নেওয়ার তাৎপর্য কি? ন্যূনতম কি পরিমাণ সমত্ব ভাবের আদান-প্রদানের জন্য দরকার।

আমরা সাধারণত যেভাবে আচরণ করি তার থেকে মনে হয় যেন আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের সকলের অন্তর্জগৎ এক ও অভিন্ন। কিন্তু এই বিশ্বাসের তাৎপর্য হল এই যে আমাদের একের অন্তর্জগতের সঙ্গে অন্যসকলের অন্তর্জগতে মিল বা সংগতি আছে। বিভিন্ন জীব নিজ নিজ অন্তর্জগৎকে বিশ্বাস করে যদি সকলে একই ফল পায় তা হলে মনে করতে হবে যে প্রত্যেকের জগৎ স্বরূপত অপরের জগতের সঙ্গে সমগুণসম্পন্ন বা অভিন্ন। এখানে কতখানি বৈচিত্র্য থাকলেও বিভিন্ন অন্তর্জগতের মধ্যে এই সংগতি বা সমাপতন অব্যাহত থাকে সেই প্রশ্ন ওঠে। আমরা এ বিষয়ে যতদূর জানি বলতে পারি যে খুঁটিনাটি ব্যাপারের পার্থক্য থাকলে বিশেষ আসে যায় না, যতক্ষণ প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলোতে মিল থাকে। যদি বিভিন্ন জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা অভিন্ন হয় তা হলে একটা জায়গায় এসে খুঁটিনাটির বৈচিত্র্য অবহেলা করেও স্বীকার করতে হয় যে এই বিভিন্ন জগৎ বস্তুত এক। ইন্দ্রিয় অনুভবলব্ধ তথ্যের ওপরে প্রশস্ত নিয়মের দিকে যত আমরা আরোহণ করি ততই এই ঐক্যের কাছে এগিয়ে যাই। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির ক্ষেত্রেই যত বৈচিত্র্য, কিন্তু ভাবের উপলব্ধির ক্ষেত্রে সমত্ব নিঃসন্দিগ্ধ এবং দুই সীমার মধ্যস্থিত ক্ষেত্রে অনুভবের চেয়ে ভাবের বা নিয়মের বা সার্বিক প্রত্যয়ের মধ্যেই বিভিন্ন জীবের অন্তর্জগতের মিল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং এই সংগতি বা মিল হয় মুখ্যত সমত্বের জন্য। আমাদের পরস্পরের রুচি ও ঘ্রাণ এক হওয়ার চেয়ে আমাদের সকলের

সাধারণ নৈতিক মান একই রকম হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তা ছাড়া তত্ত্ববিদ্যায় এই বিষয়ে আলোচনার খুব সার্থকতা নেই। কারণ প্রাথমিক নিয়মগুলোর মধ্যে অনুভবের বৈচিত্র্যের স্বকীয়তা নেই এবং যত কিছু বৈচিত্র্য এই বিশ্বে আছে সবই তো পরমার্থে রূপান্তরিত হয়ে এক হয়ে আছে।

কিন্তু এই বিষয়ে একটা ভুল করা খুব স্বাভাবিক। আপনি বলতে পারেন যে আমাদের অন্তর্জগতগুলোর মধ্যে কোনো মিল নেই; অন্তর্জগতে আমরা নিঃসঙ্গ ও একক। বাহ্যজগতই সর্বসাধারণের এবং সেই জগৎই হল আমাদের মিলনস্থল; সর্বসাধারণ বাহ্যজগতের ভিত্তিতেই ভাবের আদান-প্রদান সম্ভবপর। এইরকম বলা কিন্তু ভুল হবে। আমার বাহ্য সংবেদনগুলো আমার চিন্তা ভাব ও সুখদুঃখবোধের মতো অতিতর ব্যক্তিগত ব্যাপার। দুই ক্ষেত্রেই আমার অভিজ্ঞতা হল আমার স্বকীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ; এবং এই গণ্ডী ও বাহ্যজগতের মাঝখানে আছে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। প্রত্যেক জীবই তার সুখদুঃখ, ভাব, ভাবনা সংবেদন প্রভৃতি সর্ববিধ মানসিক উপলব্ধি নিয়ে এক অস্বচ্ছ কাচের ঘরে বাস করে; তার ফলে সেই ঘরের বাইরের জীবের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ অসম্ভব। ভাবের আদান-প্রদান-ব্যাপারে অন্যান্য মানসিক ঘটনা এবং সংবেদনের মধ্যে কোনো প্রকারগতভেদ নেই, কেবল পরিমাণগত ভেদ আছে। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে প্রত্যক্ষরূপে ভাবের আদান-প্রদান বা সংযোগ অসম্ভব। তবে কতগুলো মানসিক অবস্থা প্রকাশ করার রীতি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সংক্ষিপ্ত; আবার কতগুলো মানসিক ব্যাপার আদান-প্রদানের জন্য যেসব আয়োজনের দরকার সেগুলো হল অনেকটা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির বাহ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে যে একতা বা সাদৃশ্য আছে, সেই একতা বা সাদৃশ্য বিভিন্ন আন্তর অভিজ্ঞতার মধ্যেও নেই, একতা অসত্য। এবং কার্যত অন্তরের ভাব ইত্যাদি প্রকাশ করার চেয়ে বাহ্য অনুভব প্রকাশ করা সহজতর এমনও নয়। মানসিক অনুভূতিরূপে সমগ্র বিশ্ব আমাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই অভিজ্ঞতা অনন্য ও অসাধারণ। বিভিন্ন জীবের মধ্যে যোগস্থাপনের জন্য ভাব বা প্রত্যয়ের একত্বের ওপর নির্ভর করে ব্যক্তিগত ও অনন্য অনুভবের প্রাকার অতিক্রম

করতে হয়। এই বিচার স্বীকারের পর আন্তর ও বাহ্য অভিজ্ঞতার প্রভেদ স্বীকার করা চলে না। যে কোনো অনুভবের কথাই ভাবা যাক না কেন বিভিন্ন জীবের সেই প্রকার অনুভবের মধ্যে যে সমত্ব বা একত্ব আছে তার জ্ঞান পরোক্ষ ও আনুমানিক। কতগুলো দৈহিক-ক্রিয়ারূপী ভাষা ব্যবহার করে এই জ্ঞান লাভ করা যায়। বিবিধ জীবাত্মার মধ্যে সংযোগস্থাপনও একমাত্র দৈহিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। ভাবের সমত্ব বাহ্য প্রকাশ ব্যতীত কার্যকরী হয় না।

এইবার বিভিন্ন আত্মার একত্বের প্রশ্ন ওঠে। আমাদের নিজ নিজ প্রত্যক্ষ অনুভব সম্পূর্ণ পৃথক একথা হয় তো কেউই অস্বীকার করবেন না। অনেকে আছেন যাঁরা দুটো আত্মা যে প্রকৃতপক্ষে সম বা সদৃশ হতে পারে এই বিচার একেবারেই মানেন না। এই বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত।

অবশ্য কেউ যদি তর্ক করেন যে দুই আত্মা দুই নয়, এক এবং তাদের নিজ নিজ পার্থক্য ভিন্ন নয়, অভিন্ন, তা হলে বলব তিনি স্বেচ্ছায় অসংগত ও অর্থহীন কথা বলেছেন। কিন্তু অভেদ যা ঐক্যও তাই, এই নীতির অর্থ হল অন্যরকম। এই নীতি-অনুযায়ী বৈষম্য সত্ত্বেও সমত্ব সম্ভবপর এবং যে বিষয়ে সমত্ব আছে সেই বিষয়ের সমত্ব অন্য বিষয়ের পার্থক্য দ্বারা বিসংবাদিত হয় না। এই নীতি অস্বীকার করলে কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধিতা করতে হয়। এবং 'সমত্ব' শব্দের ব্যবহার অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। প্রত্যেক ভাবানুষঙ্গক্রিয়া এবং বুদ্ধির প্রত্যেক ক্রিয়া বৈষম্যের ভেতর সমত্ব এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন প্রসঙ্গের মধ্যে ঐক্য সম্ভবপর এই নীতি স্বীকার না করলে আমরা বিশ্বকে জানবার পথে এক পাও এগোতে পারি না। এই নীতির অস্বীকারে পরিবর্তন, সন্ততি ও গতিকে অস্বীকার করতে হয়; কোনো দ্রব্য বা আত্মার অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না; এক কথায় বুদ্ধি-গ্রাহ্য কোনো তথ্যই থাকতে পারে না। একমুহূর্তের মূক অনুভবের মধ্যে যদি বন্দী না হয়ে থাকতে চান তা হলে এই নীতিকে স্বীকার করতেই হবে। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য বা সমতা এই প্রধান নীতির ওপর আমাদের সমগ্র ভাবজগৎ নির্মিত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আপনি সমত্বের পরিবর্তে সাদৃশ্য স্বীকার করে সমত্বকে পরিহার করতে

পারেন না। কারণ দিনের আলোতে পরীক্ষা করলে সাদৃশ্য যে অনির্দিষ্ট সমত্ব ছাড়া অন্য কিছু নয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। একমাত্র একত্বের দ্বারা বিপন্ন হবার ভয় ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কেউই সাদৃশ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে না। এবং একত্বের ভয় ভিত্তিহীন।

একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে সমত্ব স্বীকারের পর বৈষম্য স্বীকার করা চলে না। বৈষম্য একটা সুস্পষ্ট তথ্য। সমত্ব এক অর্থে বৈষম্যের বিরোধী; কিন্তু আর এক অর্থে বৈষম্য ব্যতিরেকে সমত্ব অসম্ভব। এবং সমত্বের এই দুই দিক তৎসম্বন্ধীয় ধারণাতেও অবিভাজ্য। ভিন্নতার মধ্যে বা সত্ত্বেও অভিন্নতা ছাড়া সমত্বের অন্য কোনো অর্থ হতে পারে না। এক ভাব পার্থক্য বা বৈষম্য, সমত্বের বিরোধিতা করে; আবার অন্যভাবে সমত্ব ব্যতীত পার্থক্যও অসম্ভব। কারণ পার্থক্য সম্বন্ধের ওপর নির্ভর করে এবং সমত্বের ভিত্তিতেই সম্বন্ধ সম্ভব। সমত্ব ও ভিন্নতা পরস্পরবিরোধী ধারণা করা কাণ্ডজ্ঞানের পরিপন্থী। বিভিন্ন স্থান ও ক্ষণের মধ্যে একই বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব এই যুক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রচলিত বিজ্ঞানে কেউ গতির তথ্যতা অস্বীকার করেন না। একাধিক জিনিসের সমত্ব যে সেগুলোর ভিন্নতার জন্যই সম্ভবপর এবং একাধিক জিনিসের ভিন্নতা যে সেগুলোর সমত্বের জন্যই সম্ভবপর, এই তত্ত্বের মধ্যে স্বতোবিরোধ নেই। এই তত্ত্বটা স্বতোবিরুদ্ধ তখনই মনে হয়, যখন সমত্ব ও বৈষম্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এইরকম ভুল ধারণা থাকে। ঐক্য বা সমত্বের বিরোধিতার আর একটা কারণ হচ্ছে একপ্রকার একদেশদশা ও স্থূল তত্ত্ববিদ্যা।

সমত্ব ও বৈষম্যের ভ্রান্ত বৈরিতা হল একটা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু এই সত্যকে মিথ্যায় বিকৃত করার ফলেই যত ভ্রান্তি। নিত্যবস্তু স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ; নিত্যবস্তুর সত্তা আপেক্ষিক নয় এবং তার মধ্যে বিশেষ্য ও বিশেষণের বিভেদ নেই। এক কথায়, আপেক্ষিকতা বা আত্ম-অতিক্রমপ্রবণতা বা ভাবপ্রবণতা পরমার্থের ধর্ম নয়। এই বিষয়ে সাম্যবিরোধীদের সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু এই অবধারণ থেকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেই সিদ্ধান্ত নিয়েই তাদের সঙ্গে আমাদের অনৈক্য। আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই রকম: সসীম সত্তা শেষ পর্যন্ত পারমার্থিক নয়; প্রতীয়মান সত্তা পরমার্থে অন্যরূপে অবস্থান করে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের থেকে দৃশ্যমান জগতে ঐক্য

নেই, এইরকম অনুমান করার কোনো হেতু নেই। আমাদের বিরোধীরা নিত্যবস্তুর স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ স্বরূপ স্বীকার করে বহু পৃথক ও সসীম নিত্যপদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত একেবারেই গ্রাহ্য নয়। কারণ বহুত্ব ও পৃথকত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধের ওপর নির্ভরশীল। (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অপর সত্তা থেকে পৃথক হতে হলেও নিজ সত্তার সীমা অতিক্রম করতে হয় এবং সর্ববিধ সসীম সত্তাই আপেক্ষিক ও ভাবপ্রধান। প্রত্যেক সসীম সত্তার গুণই তার বিশেষ অস্তিত্বের বাইরে অন্য সত্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সসীমের সমত্ব বা ভিন্নতা কোনোটাই অপরাপর সসীমের সমাজ ব্যতীত সম্ভব-পর নয়। বিভিন্ন সসীমকে যা দিয়ে বাঁধা যায় তাই সেগুলোকে ভাগ করে এবং যা দিয়ে ভাগ করা যায়, তাই সেগুলোকে বাঁধে। সসীমের সংযোগ ও বিয়োগ, মিলন ও বিচ্ছেদ, দুইই ভাবগত। এই তত্ত্ব স্বীকার করলে সমত্বের তথ্যতা অস্বীকার করা চলে না। সমত্ব শেষ পর্যন্ত পারমার্থিক নয়; তবে কোনো তথ্যই পারমার্থিক নয় এবং তথ্যের কথা একমাত্র আবভাসিক বা দৃশ্যমান বা আপাতসত্য জগতের সম্বন্ধেই ওঠে। তা ছাড়া পার্থক্যও একপ্রকার অবভাস এবং পার্থক্যেরও পারমার্থিক মূল্য নেই। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এইভাবে প্রকাশ করতে চাই: আমাদের এমন এক তথ্যের দেশ দেখান যেখানে না আছে সমত্ব না আছে বৈষম্য: আমাদের দেখান সম্বন্ধহীন গুণ কিংবা শুদ্ধ সত্তা কিভাবে বৈশিষ্ট্য দান করতে পারে; আমাদের দেখান সমত্বকে নির্বাসন দিলে ভিন্নতার কি অর্থ থাকে; আমাদের বলুন সমত্ব ও ভিন্নতা যদি ভাবগত না হয় তা হলে সেগুলো আর কি হতে পারে; বুঝিয়ে দিন যে সমত্ব যদি তথ্য না হয়, তা হলে অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বের কোনো এক অংশকে আমরা ধারণা করি কি করে; চেষ্টা করে দেখুন নতুবা স্বীকার করুন যে সমত্ব বা অভিন্নতা হচ্ছে এক ভাবগত তথ্য এবং আপনার সমত্ব-বিরোধ হচ্ছে একটা কুসংস্কার মাত্র কিংবা একটা বুদ্ধিবিভ্রম।

কিন্তু সমত্বের জন্য পার্থক্য দরকার এই সূত্রের কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। দুই আত্মার মধ্যে সমত্ব আছে বলাতে দুই আত্মা এক এই কথা স্বীকার করা হয় না। কারণ সমত্বের সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্যই এই দুই আত্মাকে দুই রেখে দেয়। সুতরাং দুই আত্মার একত্ব বা সমতা অস্বীকার করা যায় না। পার্থক্যের মধ্যেই সমত্বের অস্তিত্ব। তাই বলে পার্থক্য যে সমত্বকে প্রভাবিত

করে না এ কথাও সত্য নয়। এও বলা যায় না যে সবসময়ই সমত্ব একটা সংযোগসাধিকা শক্তি।

আমরা বলতে পারি যে যা একবার সত্য তা চিরকালই সত্য থাকে কিংবা যা এক পরিবেশ বা প্রসঙ্গে সমান তা অন্য প্রসঙ্গেও সমান। কিন্তু এই নীতি সমর্থন করার ফলে আমরা যেন একটা মারাত্মক ভুল করে না বসি। অবস্থার ভিন্নতায়, সমত্বের মধ্যেও ভেদ উপস্থিত হতে পারে। এবং প্রসঙ্গ ও পরিবেশ দ্বারা সমত্বের তারতম্য হতে পারে, এই কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। সমত্ব হল মূলত একটা অবস্তুক ও বিশ্লিষ্ট ভাব বা প্রত্যয় এবং যখন আমরা সমত্বের কথা বলি তখন সমগ্রসত্তার অন্যান্য অংশের থেকে দৃষ্টি প্রত্যাহার করি। সমত্বের দিক অন্যান্য দিকের মধ্যে এক দিক মাত্র এবং বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সমত্ব অক্ষতভাবে বিরাজ করে এই আমরা বিশ্বাস করি। ধরুন একটা নিয়ম আছে; সেই নিয়মের সঙ্গে কোনো একটা তথ্য মিলছে না, সেই ব্যতিক্রমটাকে যদি অন্য কতগুলো উপলক্ষে বা অবস্থার প্রভাবে ঘটেছে বলে বোঝা যায়, তা হলে নিয়মটা একই আছে এবং সমানভাবেই কাজ করছে, আমরা বিশ্বাস করি। সেইরকম ধরুন দুই ব্যক্তির একটা দিক বা অংশ অভিন্ন; এমত অবস্থায় যতক্ষণ এই অভিন্নতা বজায় থাকে ততক্ষণ আমরা এই দুই ব্যক্তির সমত্বে বিশ্বাস করি। অন্য যতরকম পার্থক্যই থাকুক এই দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের যে দিকটা অভিন্ন সেটা যে এক একথা স্বীকার করতে আমাদের কোনো বাধা থাকে না। আমাদের এই নীতি সম্পূর্ণ নির্দোষ; এবং প্রহেলিকা হওয়া তো দূরের কথা আমাদের কাছে মনে হয় নীতিটা কেমন যেন তুচ্ছ। কি অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হয় তার ওপর এই নীতির মূল্য নির্ভর করে। নীতিটা হল সার্বিক বা সাধারণ। সেইজন্য কেবল তার থেকেই কোনো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

এই সার্বিক বা সামান্য নীতিতে সমত্বের সংযোগসাধিকা শক্তির বিষয় কিছু বলা হয় না। দুটো জিনিসের মধ্যে অভিন্ন অংশটা জিনিস দুটোকে অন্য কোনো রূপে প্রভাবিত করে কি না এই প্রশ্নের উত্তর এই সূত্র থেকে পাওয়া যেতে পারে না। কারণ একটা জিনিস কিভাবে কাজ করবে, তা তার বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধের ওপর নির্ভর করবে এবং আমাদের সূত্রটা কেবল একটা সার্বিক বা সাধারণ সূত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে যখন দুই

জীব এক সঙ্গে বাস করে তখন তাদের মধ্যে সমত্বের প্রভাবে একটা বৃহত্তর ঐক্য গঠিত হয়তো হয় কিন্তু এই দুই জীব যদি দুই বিভিন্ন যুগে বা কালে বাস করে তাদের সমত্ব একই থাকবে, কিন্তু ঐ সমত্বের ফল এক হবে না। সমত্বের পরিমাণ, প্রকার ও সমত্বের ক্রিয়া সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর এই সাধারণ মত থেকে পাওয়ার কথা নয়। সুতরাং কেউ যদি এই কারণে আমাদের নীতির বিরোধিতা করেন তাঁর বিরুদ্ধতা যুক্তিহীন।

এই পর্যন্ত আলোচনার ফল দাঁড়াচ্ছে যে বিভিন্ন জীবাত্মার মধ্যে ঐক্য বা সমত্ব একটা তথ্য। তাদের ভিন্ন অস্তিত্ব যতখানি বাস্তব তাদের ভাব ও প্রত্যয়ের অভিন্নতাও ততখানি বাস্তব। কিন্তু এই চিত্তৈক্যের অন্য কোনো প্রকার সাক্ষাৎ ক্রিয়া নেই বলেই মনে হয়। দেহের মধ্যে দিয়ে পরোক্ষ ভাবে এক জীব অন্য জীবকে প্রভাবিত করে।

ঐক্যের কার্যকারী শক্তির সম্বন্ধে আমাদের উল্লিখিত মতের খানিকটা পরিবর্তন করতে হয় যখন কোনো জীবের স্বকীয় জীবনের মধ্যে ঐক্যের প্রভাবের বিষয় বিবেচনা করা যায়। প্রত্যেক জীবের অন্তর্জীবনে মানসিক অবস্থার সমত্ব বা একত্বের একটা কার্যকারী প্রভাব আছে। প্রকৃতির পরিবর্তনের বেলায় যে যান্ত্রিক বা বলমূলক ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা যায় চৈতন্য-স্থিত ঘটনার বেলায় সেই ব্যাখ্যা একেবারে পরিত্যাগ করতে হয়।

এখানে প্রকৃতি বলতে চৈতন্যজগৎ থেকে অবিচ্ছিন্ন জড়জগতকে আমি মনে করছি। জড়জগতে সমত্ব ও বৈচিত্র্য দুইই আছে কিন্তু জড়-জগতের সমত্ব বা বৈচিত্র্যের কোনো স্বয়ংক্রিয়তা নেই। অন্তত জড়-বিজ্ঞানের আদর্শ প্রকৃতি এইরকমই, যদিও জড়বিজ্ঞানী কার্যত এই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। এই নীতি-অনুসারে কোনো জিনিসই তার সমত্ব বা ভিন্নতার জন্য অন্য আর-এক জিনিসের কাছে কিছু নয়। কারণ, সমত্ব বা ভিন্নতা তো জিনিসের ভিতরের নিজ ধর্ম ; কিন্তু প্রকৃতির জগতে একমাত্র বাহ্যসম্বন্ধই কার্যকরী ও ফলোৎপাদক। কিন্তু তাই যদি সত্য হয় তা হলে প্রভেদ ও অভেদের কোনো অর্থ নেই। এগুলোকে প্রকৃতির অঙ্গে নিষ্প্রয়োজন অলংকার বলে মনে করতে হয় এবং আরো মনে করতে হয় যে বিজ্ঞানে অলংকারগুলোর কোনো মূল্য নেই। কিন্তু এইরকম সিদ্ধান্ত সময়োচিত হবে না। কারণ সমত্ব ও বৈচিত্র্যের বর্জনে বিজ্ঞানের

অবসান হতে বাধ্য। এদের অবর্তমানে "কেন" প্রশ্ন করা অসম্ভব হয়ে উঠবে, "যেহেতু" বলা বন্ধ হয়ে যাবে। সমত্ব ও বৈচিত্র্যের কার্য সুস্পষ্ট। নিয়মের দ্বারা যেসব বাহ্য-সম্বন্ধ সক্রিয় সেগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয় এবং পৃথক পৃথক উপাদানগুলোর সঙ্গে এই সার্বিক নিয়মের সংযোগ স্থাপন সম্ভবপর হয় সেগুলোর সমত্ব বা বৈচিত্র্য দিয়ে। এই দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় সমত্ব ও ভিন্নতা নিষ্ক্রিয় হলেও পরোক্ষভাবে কার্যকরী ও অপরিহার্য। আমার মতে যান্ত্রিক সৃষ্টিবাদের মর্মকথা এই। কিন্তু যান্ত্রিক সৃষ্টিবাদ প্রকৃতির সর্বাংশে প্রয়োগ করা কার্যত সম্ভবপর হয়েছে কি না আমি বলতে পারি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি যে শূন্যের মধ্য দিয়ে কোনো দ্রব্যের গতির ব্যাপারে সমত্বের আপাতপ্রভাবের যথার্থ ব্যাখ্যা কিভাবে সম্ভবপর আমি বলতে পারি না। সাধারণভাবে বলা যায় যে যান্ত্রিক সৃষ্টিবাদ সম্পূর্ণ অর্থশূন্য। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর স্বরূপ দুর্বোধ্য ও অসঙ্গতিতে ভরা। প্রত্যেক বিশেষ বিজ্ঞানই এই দোষে দুষ্ট। তবে জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দোষ চরমে পৌঁছয়। জড় উপাদানগুলোর ঐক্য বা সমত্ব যেন তাদের সত্তার বাইরে কতগুলো নিয়মের মধ্যে অবস্থিত এইরকম ধারণা করতে হয়। নিয়মগুলো আর যাই হোক জড় নয়। অথচ জড়প্রকৃতির সারাংশ হল প্রাকৃতিক নিয়মাবলী। সুতরাং এর ফলে জড়প্রকৃতি অজড় হয়ে পড়ে। যাই হোক জড়জগতে বাহ্যবলপ্রভাবেই সব-কিছু সমুৎপন্ন হয় এবং বলাৎকারের বিধিই একমাত্র কার্যবিধি। অন্তত আদর্শের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রাখতে হলে বলতে হয় প্রাকৃতিক জগতে ঐক্য বা পার্থক্যের কোনো প্রভাব নেই।

কিন্তু চৈতন্যের রাজ্যে প্রবেশ করলে অন্য রকম দেখা যায়। সেখানে যান্ত্রিক সৃষ্টি যে একেবারেই নেই তা নয়, এবং মনোরাজ্যের যে যে অংশে যান্ত্রিক সৃষ্টি অচল সেই সেই অংশেই যে ভাবিক সৃষ্টি সত্য, তাও নয়। যেমন সুখদুঃখ বোধের কার্যরীতি যান্ত্রিকও নয় ভাবিকও নয়। কিন্তু মনোবিদ্যায় কার্যত একত্বের শক্তি বা কার্যকারিতা ন্যূনাধিক মেনে নিতে হয়। কোনো কোনো মনোবিদ্ এই শক্তিকে অনিচ্ছার সঙ্গে ব্যবহার করেন এবং কেউ কেউ এই শক্তি যে ব্যবহার করছেন তা অস্বীকার করেন। কিন্তু এই শক্তিকে না মেনে মনোজগতের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা যায় না।

সান্নিধ্যজনিত অনুষঙ্গের ব্যাপারের বিষয় চিন্তা করা যাক। এই ব্যাপারে এখন যা মনের মধ্যে ঘটছে তা আর একটা ঘটনা যা পূর্বে ঘটেছিল তারই জন্য, এবং বর্তমান ঘটনা ঘটছে যেহেতু একটা ঐক্য বা সমত্ব অতীত ঘটনার সঙ্গে বর্তমান ঘটনাকে সংযুক্ত করে রেখেছে। অর্থাৎ চৈতন্যের মধ্যে অবস্থিত অতীতের অনুষঙ্গটা একটা নিয়ামক শক্তিরূপে পরিণত হয়েছে। অতীত ঘটনার সঙ্গে কোনো এক দিকে বা স্থলে ঐক্যের জন্যই বর্তমানের ঘটনা ঘটেছে। এইভাবেই নানারকম অভ্যাস মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। দেহের অভ্যাস একটা সন্দেহজনক উপমা মাত্র। যেখানে অতীত ও বর্তমানের ক্রিয়া কোনো এক আভ্যন্তরীণ ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেখানে অভ্যাস শব্দের কোনো অর্থ থাকে না। এই কারণেই আমরা বলতে পারি যে আত্মা মুখ্যত নিজেই নিজের নিয়ম এবং আত্মার নিজত্ব অতীত ও বর্তমানের ঐক্য দ্বারা গঠিত। প্রকৃতির মূলতত্ত্ব যেমন প্রকৃতির বাইরে অবস্থিত, আত্মার মূলতত্ত্ব তেমন আত্মার মধ্যে নিহিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি যতই ভ্রান্ত হোক প্রত্যেক মনোবিদ্‌কে কার্যত এই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতে হয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বীকার করি যে উপর্যুক্ত মতে প্রচুর দোষ আছে। কোনো জিনিস অতীতে ছিল, সেইজন্য এখন আছে এই মত শেষ পর্যন্ত সমর্থন করা অসম্ভব। এবং আত্মার বেলায় এই আপত্তি দুই দিক থেকে তোলা যেতে পারে। প্রথমত ১. মনে করুন আমার পুরাতন দেহের পরিবর্তে আমার এ দেহের মতো একটা নব দেহ নির্মিত হয়েছে। এই নবদেহের সঙ্গে সঙ্গে আমি যা-কিছুকে আমার আত্মা বলে জানি সবই চলে যাবে। কারণ আমি মেনে নিয়েছি যে আত্মা দেহের নিষ্প্রয়োজন আভরণ মাত্র নয়। এই স্থলে স্মৃতি ও অনুষঙ্গের সমত্ব সত্ত্বেও একথা বলা যাবে না যে আত্মা ছিল বলে এখন আছে। বরঞ্চ আমাদের বলতে হবে যে আত্মা আছে বলেই এক অর্থে ছিল। এই কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রকারান্তরে স্বভাব বলতে কি বোঝা যায় সেই প্রশ্নটা আবার উত্থাপন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমরা দেখছি যে দেহ ও আত্মা নামক দুই পৃথক ও কৃত্রিম সত্তাকে স্বীকার করে স্বভাবের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। দেহ ও আত্মার ভিন্নত্ব অতিক্রম না করতে পারলে স্বভাবের স্বরূপ বোঝা যায় না।

দ্বিতীয়ত ভিতর থেকে দেখলেও বোঝা যায় যে আত্মার ঐক্যের মনোবিজ্ঞাবিষয়ক ধারণাও একটা আপসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্মরণশীলতার দুই দিক বিবেচনা করলেই এই ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়। এক দিকে অতীত ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটেছে বলেই স্মরণের উদ্ভব অপর দিকে আমার স্মৃতি বর্তমানে আমার জীবনে যা ঘটছে তার থেকে সৃষ্টি। কারণ আমি বর্তমানে যা তার উপর আমার স্মৃতি হল সর্বাংশে নির্ভরশীল। এই সৃষ্টিক্রিয়া আবার স্মৃতিকে অতিক্রম করে ভাবজগৎ গড়ে চলেছে। দুটো ঘটনা কোনো অতীতে এক সঙ্গে আমার জীবনে ঘটেছিল, সেইজন্য সেই ঘটনাদ্বয়ের সংযোগকে সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না। চিন্তা দ্বারা অবান্তরকে বর্জন করে আমরা সেই আদর্শ ভাবলোকের দিকে অগ্রসর হই যেখানে একাংশ অন্য অংশের সঙ্গে ও সমগ্রের সঙ্গে একতাবদ্ধ। এই আদর্শ আমরা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবে পরিণত করতে পারি না। তবে এই আদর্শই সত্যনির্ণয়ের মানদণ্ডরূপে ব্যবহৃত হয়। (পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই মাপকাঠিতে বিচার করলে মনোবিজ্ঞাবিষয়ক ঐক্যের ধারণাও গর্হিত বলে পরিত্যাগ করতে হয়।

সমগ্র কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ দৃশ্যমান জগৎ, দেহ ও আত্মা সবই হল কতগুলো অসম্পূর্ণ ভাব বা ধারণা। এইসব ধারণা দিয়ে পরমার্থকে বিচার করা চলে না। এইসব ধারণার কোনোটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ব্যবহারিক জগতের পক্ষে ধারণাগুলো উপযোগী বটে ; কিন্তু পারমার্থিক বিচারে এইসব ধারণার মধ্যে অসংখ্য অসংগতি। আমরা দেখেছি যে দেহের ঐক্য নেই এবং দেহ দুর্বোধ্য, আত্মার অন্তর্নিহিত ঐক্য একটা আপস মাত্র। দেহ ও আত্মা দুটোই হচ্ছে অবভাস এবং দুটোই পারমার্থিক বিচারে অসত্য। তবে অসত্যের মাত্রা বা তারতম্য আছে। জড়জগতের তুলনায় আত্মা কম অসত্য। কারণ পরমার্থের স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধর্ম দেহের চেয়ে আত্মায় বেশি প্রকাশিত।

আমাদের বিচারের ফল এইবার সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক। দেহ ও আত্মা দুটোই ব্যবহারিক বা আপাতস্বীকৃত ও অবভাসিত সত্তা। ঔপপত্তিক বিচারের সুবিধার্থে হল দেহ ও আত্মার পৃথক সত্তারূপে ধারণা; কিন্তু বিশ্লিষ্টরূপে দেহ ও আত্মার ধারণার মধ্যে প্রচুর অসংগতি আছে। আত্মার চেয়ে দেহের সত্তা উচ্চতর, এইরকম ধারণা ভ্রান্ত। দেহ ও আত্মার মধ্যে সমবায়-

সম্বন্ধ সত্য নয় ; দেহের একপক্ষীয় ক্রিয়াও মিথ্যা ; নিষ্ক্রিয় আত্মার ধারণা অর্থশূন্য। বিভিন্ন আত্মার মধ্যে সংযোগস্থাপন হচ্ছে দেহের সাহায্যেই সম্ভবপর ; কিন্তু বিভিন্ন আত্মার মধ্যে ভাবগত ঐক্য বা সমত্ব আছে। জীবের মানসিক জীবনের অভ্যন্তরে ঐক্যের ক্রিয়া বা প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। সর্বশেষে আমরা দেখেছি যে আমাদের সমস্যাগুলোর পূর্ণ সমাধানের জন্য দেহ ও আত্মা নামক সত্তার বিনাশ বা দ্রবীকরণ অবশ্যম্ভাবী। যতক্ষণ এই দুই সত্তার পৃথক ও প্রতীয়মান সত্তার রাজ্যে আমরা থাকি ততক্ষণ সমস্যাগুলোও আমাদের কামড়িয়ে ধরে থাকে, ছাড়ে না।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সত্য ও সত্তার মাত্রা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সত্য ও সত্তার মাত্রার প্রশ্নের সঙ্গে আমাদের একটু পরিচয় হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে এই বিষয়ে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করব। সম্পূর্ণরূপে ও বিশদরূপে এই বিষয় আলোচনা করতে গেলে আমাদের অনেকদূর যেতে হবে। কিভাবে জড় ও আধ্যাত্মিক জগৎ পরমার্থের প্রকাশের বিভিন্ন অবস্থা বা মাত্রা তাই দেখতে গেলে একটা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বশাস্ত্র রচনা করতে হবে। এরকম তত্ত্বশাস্ত্র সৃষ্টি করবার অভিলাষ আমার নেই। আমি নিত্যবস্তু সম্বন্ধে একটা নির্দোষ ও সাধারণ ধারণা দিতে চাই এবং এই ধারণার প্রতিপক্ষে যেসব আপত্তি ও অসুবিধা আছে সেগুলোর নিরসন করতে চেষ্টা করব। নিত্যবস্তুর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করবার জন্য উচ্চতর ও নিম্নতর প্রকাশের ভাবকে সমর্থন করতে হয় ও এই প্রকাশের অর্থ ব্যাখ্যা করতে হয়। এই ব্যপদেশে আলোচনা করবার সময় চিন্তনের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাকে আর-একবার আলোচনা করতে হবে। (পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

পরমার্থ পরমার্থরূপে অর্থাৎ স্বরূপত হল মাত্রাহীন। পূর্ণতার কোনো মাত্রা বা তারতম্য হতে পারে না। (বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কিন্তু প্রতীয়মান ও ব্যবহারিক জগতে তারতম্যের অর্থ ও প্রয়োগ আছে। কেউ

হয়তো আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইবেন যে কালেরও পরমার্থের পূর্ণতার মতন মাত্রাহীন চরমত্ব আছে। কোনো জিনিস হয় কালের প্রবাহের মধ্যে আছে কি বা নেই। অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের কোনো তারতম্য নেই। এই দৃষ্টিতে, আমরা মনে করি যেন কালের ধারার মধ্যে অস্তিত্বই হল পারমার্থিক বা বাস্তব অস্তিত্ব। ব্যবহারিক জগতেও বিশেষ কয়েকটা উদ্দেশ্যে এইরকম ধারণা মার্জনা করা যায়। কিন্তু এই ধারণা অসত্য ও অগ্রাহ্য। একটা জিনিসের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের তারতম্য হয়তো নেই, কিন্তু জিনিসটার কতখানি অস্তিত্ব আছে তার তারতম্য আছে। একটা জিনিস তার সাক্ষাৎ উপস্থিতির জোরে অস্তিত্ববান হতে পারে ; আবার তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও আপেক্ষিক গুরুত্বের বলে অস্তিত্ববান হতে পারে। এইজন্য শেষ পর্যন্ত 'অস্তিত্ব থাকার' অর্থ কি আমরা সহজে বোঝাতে পারি না। সব জিনিসেরই সমান অস্তিত্ব আছে এই বাক্যে কেমন যেন একটা অসত্যাভাস আছে।

আমরা অনেক আগেই লক্ষ্য করেছি যে তত্ত্ববিচারে চরম দৃষ্টিভঙ্গির একদেশদর্শিতা টেকে না। কালিক তথ্যগুলোকে প্রধানত ভাবের সৃষ্টি বলেই আমরা দেখতে পেয়েছি। কালের পর্যায়ের সত্তা আপেক্ষিক ও আবভাসিক। কারণ কাল নিত্য বা পারমার্থিক পদার্থ নয়। প্রত্যেক অবভাসিত সত্তার মতন কালের সত্তারও তারতম্য আছে। সত্যকেও অবভাস বলতে হয়। কারণ সত্য আর বস্তু এক নয়। সত্য একটা বর্ণনা মাত্র। সত্যেরও ন্যূনাধিক্য বা তারতম্য আছে। সুতরাং কালিক তথ্যের সগর্ব হুঙ্কারকে উপেক্ষা করে আমরা আমাদের বিচারে অগ্রসর হতে পারি।

চিন্তন-প্রণালীর মৌলিক রূপ আমরা পূর্বেই উদ্ঘাটন করেছি। মুখ্যত "কিম্" কে "তৎ" থেকে বিশ্লেষ করার ব্যাপারটার নাম চিন্তন বা ভাবনা। চিন্তন-ক্রিয়ার মূল তত্ত্বই এই দ্বিধাবিভক্তি বা পৃথককার। চিন্তন-ক্রিয়ার কাজ হচ্ছে তথ্য গড়া নয়, তার কাজ ভাব গড়া। চিন্তনের মূল ব্যাধিই দ্বিধাকরণ এবং এই ব্যাধির প্রশমকল্পে দ্বিধাকরণকেই ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়, দ্বিধাকরণকে অন্তিম পর্যন্ত ঠেলে দেওয়া হয়। চিন্তনের আদর্শ, ভাবসমূহের এমন এক বিন্যাস বা শৃঙ্খলা যার মধ্যে সমস্ত ভাব সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য লাভ করে এবং চিন্তন দ্বারা এমন ভাবশৃঙ্খলাকে অবশেষে আমরা পরমার্থের

প্রতি প্রয়োগ করতে চাই যার সঙ্গে পরমার্থের কোনো বিরোধ না হয়। এই আদর্শকে কার্যে পরিণত করতে সক্ষম হতে হলে চিন্তনকে আত্মহত্যা করতে হয় তা আমরা পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে দেখেছি। সত্যের পক্ষে লক্ষ্য ও অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা অসম্ভব, যদি সত্যে আমরা ব্যাপনা বা লক্ষ্যকে দ্যোতনা বা অর্থের সামিল ও দ্যোতনা বা অর্থকে ব্যাপনা বা লক্ষ্যের সামিল করতে চাই। শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য ও বিধেয়, বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে একটা অবচ্ছেদ থেকেই যায়; এই অবচ্ছেদ চিন্তনের ব্যর্থতা প্রমাণ করে। কিন্তু এই অবচ্ছেদের হানিতে চিন্তনের নিজ বৈশিষ্ট্যেরও লোপ পায়।

এই কথা অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা বলতে পারি যে প্রত্যেক নিরুপাধিক ও নিশ্চয়াত্মক অবধারণই অসত্য। শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য বা বিশেষ্য এবং বিধেয় বা বিশেষণের কোনোটারই পক্ষে অপরটার সমান হওয়া অসম্ভব। চিন্তনের আদর্শ এই নিরুপাধিক নির্ণয় বা অবধারণ; কিন্তু নিরুপাধিক অবধারণে তর্কপদসমূহ ও সেগুলোর অন্তর্নিহিত সম্বন্ধের লুপ্তি ঘটে। সেই-জন্য প্রত্যেক সত্য অবধারণই সোপাধিক; এই অবধারণের অন্তর্গত বিধেয়ের যথার্থতা কতগুলো বিশেষ অবস্থা বা উপাধির ওপর নির্ভরশীল এবং সমস্ত বিশেষ অবস্থা বা উপাধিকে অন্য আর একটা বিধেয়ের দ্বারা বর্ণনা করাও সম্ভবপর নয়।

সেইজন্য প্রত্যেক অবধারণ বা নিরূপণই সোপাধিক; সোপাধিক এই অর্থে যে যা প্রকাশ করা হয় এই অবধারণে তা অসম্পূর্ণ। প্রত্যেক অবধারণের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপাধি-সমষ্টির জ্ঞান অসম্ভব। সংশ্লিষ্ট সমস্ত উপাধির সম্বন্ধে যখন আমাদের জ্ঞান নেই তখন চরম সত্য প্রকাশ করবার জন্য আমাদের অবধারণকে কতদূর পরিবর্তন করতে হবে তা আমরা বলতে পারি না। তবে সংশ্লিষ্ট উপাধির ওপর নির্ভরশীলতার জন্য আমাদের বিধেয়ের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু এই পরিবর্তনের স্বরূপ ধারণা করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। এমন পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে যার ফলে বিধেয়ের নিজ বৈশিষ্ট্যই চলে যেতে পারে, বিধেয়ের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটতে পারে অন্যান্য অবস্থার সান্নিধ্যে এবং সহযোগে। এই দিক থেকে দেখলে বিধেয়টাকে অপরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের অংশত মিথ্যা বলে গ্রহণ করতে হয়। আমরা যা কিছু বলি বা নিরূপণ করি সবই একটা বিরাট অজ্ঞতার পটভূমিকার

মধ্যে। সুতরাং আমাদের সমস্ত বিচার ও নির্ণয় সোপাধিক, আমাদের সমস্ত "অস্তি" বস্তুত "স্যাৎ" মাত্র।

উপযুক্ত সিদ্ধান্তে এসে আমরা এই বুঝতে পারি যে সত্য ও অসত্য সবসময় মিলে ও মিশে থাকে। এমন কোনো সত্য নেই যার মধ্যে মিথ্যার ছায়া নেই এবং এমন কোনো মিথ্যা নেই যার মধ্যে সত্যের স্পর্শ একটুকুও নেই। সত্য ও মিথ্যা দুটোই পরিমাণগত ব্যাপার; এদুটোর তারতম্যের প্রশ্নই হচ্ছে প্রধান প্রশ্ন। কতগুলো অর্থে বা উদ্দেশ্যে আমাদের চিন্তনকে সম্যক মিথ্যা বলে ধরে নেওয়া যায়, আবার অন্য কতগুলো উদ্দেশ্যে তাকে সম্পূর্ণ ভ্রমহীন বলে মেনে নেওয়া যায়; কিন্তু পরমার্থের মানদণ্ডে বিচার করলে আমাদের সত্য ও মিথ্যার তারতম্য আছে, আমাদের অবধারণ বা নির্ণয় কখনো পরমসত্য হতে পারে না, আমরা কেবল বলতে পারি আমাদের বিচার ন্যায্য বা প্রামাণিক কি না; বিচারে ন্যায্যতার বা প্রামাণ্যের কমবেশি নিয়েই আমাদের তৃপ্ত থাকতে হয়। অবশ্য ন্যায্যতাকে আমি শুধু অর্থক্রিয়াকারিত্বের সাথে সামিল করি না; পরমসত্য ও পরমসত্তার ধর্ম কতখানি আছে আমাদের অবধারণ বা বিচারে তার দ্বারা ঐ অবধারণের প্রামাণিকতা বা ন্যায্যতা নির্দিষ্ট হয়। আমাদের অবধারণে যে পরিমাণ পরমসত্তার ধর্ম থাকে তার ওপর নির্ভর করে ঐ অবধারণ আমাদের জীবনে কি মাত্রায় বা পরিমাণে পরমসত্তার স্থান অধিকার করবে। দুটো অবধারণের মধ্যে যেটাকে কম সংশোধন করা প্রয়োজন সেটা হল নিত্যবস্তুর প্রকৃষ্টতর প্রকাশ। পরমসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য যে অবধারণের যত অধিক সেই অবধারণ তত বলবান। প্রকারান্তরে এই তত্ত্বটাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি: একটা অবধারণকে পরমার্থে পরিণত করতে হলে তার যে পরিমাণ পরিবর্তন দরকার তার দ্বারা সেই অবধারণের সত্যের পরিমাপ করা যায়। যেখানে পরিবর্তন কম দরকার সেইখানে সত্য বেশি, এবং যেখানে পরিবর্তন বেশি দরকার সেখানে সত্য কম।

আমরা এখন বুঝতে পারছি যে, সব সত্য আপেক্ষিক ও অসম্পূর্ণ। এইবার আমাদের এখন দেখতে হবে কি ভাবে সব অসম্পূর্ণ সত্যই অংশত সত্য। এক দিকে যেমন পরমসত্যের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলে আমাদের

STATE INSTITUTE OF EDUCATION Govt. of West Bengal

সত্যে সব সময়ই ঘাটতি দেখতে পাই, অন্য দিকে এও ঠিক যে প্রত্যেক সত্যেই আমরা পরমসত্যের মান রক্ষা করতে চেষ্টা করি। সর্বপ্রথমে সেইজন্য সত্যের মান কি সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাক।

সত্য ও সত্তার পূর্ণতার মান বা আদর্শ একই। এদুটোর পূর্ণতা হল এদের সদর্থক ও স্বাবলম্বী অদ্বিতীয়তায়। অদ্বিতীয়তা বা ব্যক্তিতার অর্থ আমি বিংশ অধ্যায়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। দুই ভাবে ব্যক্তিতার প্রকাশ। আভ্যন্তরিক সমন্বয় ও সর্বগ্রাহিতা হল অদ্বিতীয়তা বা ব্যক্তিতার দুটো দিক ; এবং এই দুই দিকই সত্যে আছে। এবং সমন্বয় ও সর্বগ্রাহিতা হচ্ছে একই তত্ত্বের দুই বিভিন্ন অংশ। কোনো তথ্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ হচ্ছে সেই তথ্যের অন্তর্নিহিত ঐক্য। এই ঐক্যের জন্য বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়। এই ক্ষেত্রে সমন্বয় লাভের জন্য বৃহত্তর শৃঙ্খলার মধ্যে সংঘর্ষশীল তথ্যগুলোর পুনর্বিন্যাস দরকার হয়। সমন্বয় ও সংকীর্ণতা পরস্পরবিরোধী। যে তত্ত্ব বা তথ্য সর্বগ্রাহী নয় তার অভ্যন্তরে অসংগতি থাকতে বাধ্য। এবং এইরকম হওয়ার কারণ খুব স্পষ্ট। যা কিছু এই তথ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না তাই সমগ্রতার আহ্বানে বাহ্য সম্বন্ধ দ্বারা বদ্ধ হয়। এই বাহ্য সম্বন্ধগুলো এক দিক থেকে তথ্যের বাইরে থেকে যায়; অন্য দিক থেকে সেগুলো বাইরে থাকতে পারে না। কারণ, সম্বন্ধের ধর্মই হচ্ছে সম্বন্ধ-পদদ্বয়কে প্রভাবিত করা এবং প্রভাবিত করে সে-দুটোর সত্তার মধ্যে প্রবেশ করা। যে সম্বন্ধের দ্বারা সসীমের অস্তিত্ব গঠিত হয় সেই সম্বন্ধ সসীম সত্তা থেকে ভিন্ন এবং সসীম সত্তার সঙ্গে অভিন্ন দুইই। সসীমের স্বভাব সেইজন্যই হল দুরারোগ্যভাবে পরাবলম্বী। সসীমের ধর্মই হচ্ছে নিয়ত তার সীমার বাইরে গিয়ে বিদেশ থেকে একরাশ সম্বন্ধ নিজের ভিতরে নিয়ে আসা। বাইরে থেকে সান্ত হওয়ার মানেই হল ভিতর থেকে অশান্ত হওয়া। এবং সসীম বস্তু যত ক্ষুদ্রতর হবে ততই তার অন্তর্নিহিত সত্তার ত্রাস ঘটবে ; শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থায় পৌঁছনো যাবে যখন বাহ্য সম্বন্ধগুলোকে আর কোনো অর্থে আভ্যন্তরীণ অংশ বলে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। আবার অন্য দিক থেকে সসীম বস্তু যত বৃহত্তর হবে তত তার অন্তর্নিহিত সমন্বয় অধিকতর হবে ও বাহ্য সম্বন্ধগুলো তত তার অন্তর্নিহিত সত্তার অংশ হয়ে উঠবে। এইভাবে ছোটোর সত্তা নষ্ট হয়, বড়োর সত্তা

পুষ্ট হয়। ব্যাপকতর সত্তার পক্ষে আরো অধিকতর সংগতিপূর্ণ ব্যক্তিতালাভ করা সহজ ; এইরকম সত্তার নিজের মধ্যেই তার স্বভাব গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন অসংগতিগুলো এইরকম সত্তার মধ্যে একটা বৃহত্তর শৃঙ্খলার অন্তর্বর্তী হয়ে উচ্চতর ঐক্য সৃষ্টি করে। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাপকতা ও সমন্বয় এই দুটো হল একই তত্ত্ব ; ব্যাপকতা হচ্ছে সমন্বয়ের অনুকূল এবং সমন্বয় হচ্ছে ব্যাপকতার অনুকূল। অবশ্য কার্যত আমরা এই তত্ত্ব দুটোকে পৃথক করে দেখি ও রাখি।

সর্বগ্রাহিতা ও পূর্ণ আত্ম-সংগতির থেকে দূরে থাকারই দরুন সত্তা ও সত্যের হ্রাস হয়। দুটো আপাতস্বীকৃত ও অবভাসিত সত্তার মধ্যে যেটা ব্যাপকতর ও অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ সেইটাই অধিকতর বাস্তব। কারণ এই সত্তা সর্বগামী ব্যক্তিতার নিকটতর এবং এইরকম সত্তার পূর্ণতার জন্য অপেক্ষা-কৃত অল্পসংখ্যক সংশোধন দরকার। যে সত্য ও তথ্যকে পরমসত্য ও পরম-তথ্যে পরিণত করতে অল্পতর সংশোধন ও সংযোজন করবার সেই সত্য ও তথ্য অধিকতর সত্য ও বাস্তব। সত্য ও সত্তার মাত্রা নির্ধারণ করবার এই হচ্ছে একমাত্র মান। নিত্যবস্তুর ধর্ম অধিকতর পরিমাণে থাকার অর্থও যা, বস্তুসত্তার অধিকতর পরিমাণ থাকার অর্থও তাই।

ভ্রমাত্মক জ্ঞান নামক অধ্যায়ে মিথ্যা অবভাস কিভাবে সত্যে পরিণত হতে পারে তা আমরা দেখিয়েছি। সংযোজন বা পরিপূরণ ও পুনর্বিন্যাস এই দুই প্রণালী অবলম্বন করে মিথ্যা অবভাসকে সত্যে উন্নীত করা হয়। বস্তুর প্রতি আরোপিত যে ধর্ম পুনর্বিন্যস্ত হওয়ার পরও বস্তু কর্তৃক আত্তীকৃত হয় না সেই ধর্মকে সম্পূর্ণ ভ্রম বলা চলতে পারে। এবং এইরকম চরম ভ্রম থাকার সম্ভাবনা নেই। যাকে আমরা ভ্রমাত্মক জ্ঞান বলি, সেটা যখন সত্যে পরিণতি লাভ করে তখন তার নিজরূপ অন্তর্হিত হয় ও তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়, একমাত্র এই অর্থেই সম্পূর্ণ ভ্রম সম্ভবপর। কিন্তু এইরকম ব্যাপারও একমাত্র নিকৃষ্টতর সত্যের বেলায় ঘটে। তা হলেই এসে যাচ্ছে যে তত্ত্ব-বিদ্যায় সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কোনো চরম ও নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। প্রত্যেক নির্ণয়ের সম্বন্ধেই এই প্রশ্ন করতে হয় যে পরমসত্যরূপে পরিণতি লাভ করতে হলে এই নির্ণয়ের কি পরিমাণ পরিবর্তন প্রয়োজন ও পরিবর্তনের পর এই নির্ণয়ের কতটুকু টিকে থাকে। অর্থাৎ এই নির্ণয়ে বা অবধারণে যে

বিশেষণ প্রয়োগ করা হচ্ছে তার কতখানি শেষ পর্যন্ত টিকবে। যেটুকু অবশিষ্ট থাকে কিংবা শেষ পর্যন্ত টেকে তার ওপরই প্রত্যেক স্থলে সত্য ও সত্তার মাত্রা নির্ভর করে।

আপত্তি উঠবে যে এমন অবধারণ আছে যার সত্যিকারের কোনো অর্থ নেই এবং এমন ভাব বা চিন্তন আছে যেগুলো স্বপ্নেও আমরা বিশ্বের প্রতি প্রয়োগ করতে চাই না। সুতরাং এইসব অবধারণ বা ভাবের সত্যমাত্রা হচ্ছে শূন্য। এই ভাবগুলো যেন বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একপ্রকার বিকৃতি মাত্র; সেগুলো বিশ্বব্যপদেশে কোনো নিরূপণ বা অবধারণ নয়। এই আপত্তিটা একটা ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১. সদর্থক বা ভাবাত্মক ও অসদর্থক বা অভাবাত্মক যেরূপ অবধারণই হোক না কেন এবং অবধারণটা প্রথমদৃষ্টিতে যত চপল ও নিরর্থকই মনে হোক না কেন, প্রত্যেক অবধারণেই বিশ্বের কোনো না কোনো অংশ সম্পর্কে কিছু না কিছু বলবার অভীপ্সা থাকে, এবং যে ভাবকে আমরা আরোপ করি তা একেবারেই ভ্রান্ত হতে পারে না। তবে যে অর্থে একটা ভাবকে আরোপ করা হয়েছে সেই অর্থে চরমসত্য না হয়ে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত অর্থে ভাবটা চরমসত্য হতে পারে। ২. প্রত্যেক চিন্তনই স্বরূপত একটা নির্ণয় বা অবধারণ। কারণ প্রত্যেক চিন্তনেই আমরা বস্তুসত্তার কোনো না কোনো দিকের গুণ নির্ধারণ করি। প্রশ্ন করা, সংশয় পোষণ করা, প্রস্তাব করা, কিংবা কেবল ভাব পোষণ করার ব্যাপার ও স্পষ্টত অবধারণ করার ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য আছে, নিশ্চয়ই। কিন্তু এই ব্যাপারগুলোর স্বরূপ বিচার করলে অন্যরকম সিদ্ধান্তে আসতে হয়। যখনই আমরা কোনো ভাবের দ্বারা বস্তুসত্তার উল্লেখ করি তা সে জ্ঞানতই হোক, কিংবা অজ্ঞানতই হোক, নির্দিষ্টরূপেই হোক কিংবা অনির্দিষ্ট রূপেই হোক, তখনই আমরা অবধারণে প্রবৃত্ত হই। এই দিক থেকে বিচার করলে সর্ববিধ চিন্তনক্রিয়াই হচ্ছে অবধারণক্রিয়া। চিন্তনক্রিয়া যেই আরম্ভ হয় অমনি ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ সংবেদনের ঐক্য ভেঙে টুটুকরো হয়ে যায়; এর ফলে ধর্মী অংশত ভাবগত বস্তু হয়ে ওঠে ও তার ধর্মের মধ্যেও পরিবর্তনের প্রয়োজন লক্ষিত হয়। তৎসত্ত্বেও চিন্তনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যটা পরিবর্তিত হয় না। তবে অনেক সময় চিন্তনে বাস্তব জগতের প্রতি উল্লেখটা থাকে নির্বিশেষরূপে ও অনির্দিষ্টরূপে। ধর্মীর সঙ্গে সামঞ্জস্য

আনবার জন্য ধর্মরূপী ভাবটার যে পরিবর্তন বা রূপান্তর প্রয়োজন এই কথা সব সময়ই আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় এবং কখনো কখনো এই কথা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। বাস্তবজগতের প্রতি উল্লেখহীন ভাব বা চিন্তন হচ্ছে এক নিরালম্ব ও বায়বীয় শূন্যতা মাত্র। প্রত্যেক চিন্তনেই আমরা বিশ্বের বা নিত্যবস্তুর কোনো না কোনো এক দিক বা অংশের সঙ্গে সংযুক্ত।

আমার আগেকার সিদ্ধান্তটা কেমন যেন লোকমতবিরুদ্ধ। যেসব বিষয় কেবল কাল্পনিক সেগুলোকে বাস্তবজগৎ বা বিশ্বসত্তার অংশ বলে আমরা কখনো স্বীকার করি না। আমরা এরকম ভাবগুলোকে বস্তুজগৎ থেকে ভিন্ন করে রাখি। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে আমাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তটা সত্য। কাল্পনিক ভাবগুলোও এক অর্থে বাস্তবজগতের অংশ। কিন্তু এইরকম ভাবগুলোকে বাস্তবজগতের অংশরূপে বিবেচনা করবার সময় ক. বাস্তব জগতের কোন্ প্রদেশে সেগুলোর অবস্থান এ সম্বন্ধে আমরা অল্পবিস্তর অবহিত থাকি এবং খ. এই ভাবগুলোকে চরমসত্যে পরিণত হতে কি পরিমাণ সংশোধন দরকার তারও একরূপ ধারণা আমাদের থাকে। এইবার এই দুটো ধারণার তাৎপর্য কি আমরা আলোচনা করে দেখব।

ক. প্রথম ধারণাটার সম্বন্ধে বিচার করবার সময় আমরা স্মরণ করব যে যদিও অনুভবে বিশ্ব আমাদের কাছে এক তথাপি যেভাবে বিশ্ব আমাদের কাছে সচরাচর প্রতীয়মান হয় তার মধ্যে নানা অংশ, নানা দিক, নানা খণ্ড, নানা লোক বা ক্ষেত্র আছে এবং এই বিভিন্ন অংশ বা ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো দৃশ্যমান সংযোগসূত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ তো সর্বজনবিদিত সত্য যে শিল্পে, ধর্মে, চরিত্রনীতিতে, বাণিজ্যে, রাষ্ট্রচিন্তায় বা জ্ঞানসাধনায় আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ক্ষেত্র বা জগৎ থাকতে পারে, এমন-কি পরস্পর সংযোগহীন একাধিক ক্ষেত্র বা জগৎও আমাদের থাকতে পারে। আমরা লক্ষ্য করি না যে, এইসব বিভিন্ন জগতের মধ্যে প্রায়শ বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনো ঐক্যবন্ধন নেই। কোনো ব্যক্তির জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পূর্ণ ন্যায়সম্মত ঐক্য থাকা অসম্ভব এবং এও অসম্ভব যে তার সমগ্র জগৎ সব সময়ই শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সমুত্থিত হবে। এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তা হলে কোনো মানুষই একটা বিশেষ ভাব স্বীকার বা অস্বীকার করবার সময়, ঠিক

কি অর্থে তাকে স্বীকার বা অস্বীকার করছে তা সব সময় জানতে পারে না। এক এক সময় বাস্তবজগৎ বলতে বিশ্বের এক এক বিশেষ অংশকে সে বোঝে এবং এই বিভিন্ন অংশগুলো পৃথক করে দেখবার অভ্যাস তার নেই। তাকে এই জগৎগুলোকে পৃথক করে দেখাতে বললে তার মাথা হয়তো গুলিয়ে যাবে।

আমাদের সৃষ্ট দৈশিক শৃঙ্খলাকে হয়তো বাস্তবজগৎ বলা যেতে পারে। কিন্তু জড়জগৎকে বাস্তব ও তথ বলে স্বীকার করলে এই জগতের অতিরিক্ত অন্য সবকিছু কেবল কল্পনা বা ভাবমাত্রে পরিণত হয়, অর্থাৎ সেগুলো অতথ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অতথ্য বলে অভিহিত করলেও আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবতীয় নির্বাসিত ও পরিত্যক্ত ভাব ভাবনা কল্পনাদির জন্য পৃথক পৃথক জগৎ বা লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। আমরা না চাইলেও সেগুলোকে বিশ্বের মধ্যে স্থান দিতে হয়। তা ছাড়া এই ভিন্ন জগৎ-বিষয়ক কোনো ভাব পোষণ করবার সময় তাকে যত অপরিস্ফুট ভাবেই হোক না কেন, তৎসম্পর্কিত জগতে অবস্থাপন বা আরোপ না করে আমরা পারি না। যে বিষয়টা কাল্পনিক তার অবস্থানের জন্যও কল্পনার এক পৃথক লোক বা উপলোক আমরা মেনে নি। যত অস্বীকারই করি না কেন, শেষ পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করি যে এইসব বিভিন্ন জগৎ বা লোকও এক নিত্যবস্তুর বা পরমার্থের প্রকাশ বা অবভাস।

ঈপ্সা ও আদেশের চরম দৃষ্টান্তগুলো বিবেচনা করলেও আমাদের পূর্ব-গামী সিদ্ধান্ত অবিকৃত থাকে। ঈপ্সাকে অবধারণ বলা চলে না, তবে এক অর্থে ঈপ্সার মধ্যে অবধারণ অন্তর্নিহিত আছে। প্রথমে মনে হয় আদিষ্ট ও ঈপ্সিত বিষয়টা যেন স্বরূপত বাস্তবজগতের বহির্ভূত। কিন্তু এই প্রথম ধারণাটা ভুল। আমাদের এই স্থলে স্মরণ করতে হবে যে প্রত্যেক অভাবাত্মক অবধারণই হচ্ছে আপেক্ষিক। যে ভাব এইরকম অবধারণে বস্তুসত্তা বা বাস্তব কর্তৃক অস্বীকৃত হয়, সেই ভাবই আবার ধর্মীর পরিবর্তনে প্রযুক্ত ও স্বীকৃত হয়ে ওঠে কিংবা সেই ভাবই আবার স্বকীয় পরিবর্তনের পর বস্তুসত্তা বা বাস্তব কর্তৃক স্বীকৃত হয়। এক অর্থে আমাদের ঈপ্সিত বিষয়টার নিশ্চয়ই কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই; বাস্তবজগতে ঈপ্সিত বিষয়টা নেই বলেই সেটা ঈপ্সিত। কিন্তু এখানে বাস্তব অস্তিত্বের অর্থ খুব সংকীর্ণ। সেইজন্য

অন্য অর্থে, তথ্যের দেশের বাইরে বাস্তবের অন্য কোনো অংশে ঈপ্সিত বিষয়টা আছে, আমাদের এইরকম বিশ্বাস করতে হয়। সুতরাং এই দিক থেকে ঈপ্সিত বিষয়টার মধ্যেও বস্তুসত্তার বা বাস্তবের উল্লেখ প্রচ্ছন্ন আছে। এই সত্তার উল্লেখের জন্যই বাসনার বেদনা এত তীব্র আকারে উপস্থিত হয়। আমার আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের যে অস্তিত্ব আছে সচেতনভাবে তা আমি বিশ্বাস করি না, তবে আমি কেমন যেন অনুভব করি যে আকাঙ্ক্ষার বিষয়টা কোনো এক রহস্যময় দেশে বিচিত্রভাবে অবস্থান করছে। এবং রহস্যময়ভাবে আছে অথচ আমার কাছে আবির্ভূত হচ্ছে না এইজন্যই যত যন্ত্রণা ও যত উত্তেজনা। এইভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে যাওয়ার মানে হচ্ছে সেই বিষয় যে বাস্তব এই ধারণা ও অবধারণা করা।

খ. এইবার দ্বিতীয় ধারণাটার বিষয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার। আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রত্যেক ধারণা বা ভাবের মধ্যেই, তা সে যতই কাল্পনিক হক না কেন, বাস্তবের প্রতি একটা উল্লেখ আছে। আমরা আরো দেখতে পেয়েছি যে প্রকৃত ধর্মীর বিভিন্ন অর্থ সম্বন্ধে ও তার উদয়ের বিভিন্ন স্তর বা ধারা বা লোক সম্বন্ধে আমরা কেউই বিশেষ সচেতন নই। ধর্ম বা বিধেয়ের প্রয়োগ ব্যাপারেও সচেতনতার এই অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক ভাবই বাস্তবের প্রতি প্রযোজ্য, তবে আমরা দেখেছি যে প্রয়োগের জন্য প্রত্যেক ভাবের সংস্কার দরকার হয় ; কম আর বেশি প্রত্যেক ভাবেরই পরিপূরণ ও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই পরিপূরণ ও পূর্ণরচনার আবশ্যকতা ও তার পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অনবগত থাকতে পারি। সচরাচর যেসব ভাব আমরা ব্যবহার করি সেগুলো আপেক্ষিক ও সেইজন্য সোজাসুজি বস্তুসত্তা বা বাস্তবের প্রতি অপ্রযোজ্য ; কিন্তু এই সম্বন্ধে আমাদের কোনো প্রকট প্রত্যয় থাকে না। আমাদের বচনের অন্তর্নিহিত কল্পিত অবস্থাগুলোর বিষয়ে আমরা সাধারণত অন্ধ এবং এই কল্পিত শর্তগুলোর সম্বন্ধে স্পষ্টবোধ আমাদের প্রায়ই থাকে না। এই বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন হয় যে আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রতিভাত না হলেও চিন্তন ও অবধারণ হচ্ছে একই ক্রিয়ার দুই নাম। আমরা এও দেখেছি যে প্রত্যেক অবধারণেই অল্পবিস্তর সত্য আছে এবং প্রত্যেক অবধারণে বিভিন্ন মাত্রায় সত্যের মান

বা আদর্শ রক্ষিত ও পরিত্যক্ত হয়। এইবার আমরা মূল বিষয়ের আলোচনায় ফিরে যাই।

এর পূর্বে আমরা দেখেছি যে আমাদের মান বা আদর্শের বিভিন্ন রূপ আছে। এখন দৃষ্টান্ত দিয়ে আদর্শের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচয় করবার চেষ্টা করব। ক. কোনো কাল-অন্তর্গত আপাতস্বীকৃত সত্তার বাস্তবতার বা বস্তুসত্তার পরিমাপ করতে হলে আমাদের ১. প্রথমে অবভাসিত তথ্যালীর সমন্বয়ের দিকে বিবেচনা করতে হয়। অর্থাৎ আমাদের অনুসন্ধান করতে হয় যে আপাতদৃশ্য ও অবভাসিত বিষয়গুলোকে বাস্তবের প্রতি প্রয়োগ করবার জন্য কতখানি পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে; কতখানি সুসমঞ্জস ও আত্মসংগতিপূর্ণ এই তথ্যালী, তার ওপর পুনর্বিন্যাসের পরিমাণ নির্ভর করে। ২. তারপর আমাদের বিচার করতে হয় কতখানি কাল বা দেশ জুড়ে এই অবভাসিত সত্তার বিস্তার বা ব্যাপ্তি। অন্য সব দিক সমান থাকলে, দুটো সত্তার মধ্যে যেটার আয়তন বেশি কিংবা স্থায়িত্ব বেশি সেইটাই অধিকতর বাস্তব। খ. ঘটনা বা তথ্য ছাড়া নিয়মের ব্যাপারেও আমাদের মানের ক্রিয়া লক্ষ্য করতে পারি। নিয়ম দুই শ্রেণীর :—১. কতগুলো নিয়ম নির্বস্তুক এবং ২. কতগুলো নিয়ম সবস্তুক ; নিয়মের শ্রেণীভেদ অনুযায়ী সত্যের মানপ্রয়োগবিধিও ভিন্ন। গণিতের অবস্তুক বা অমূর্ত নিয়ম এবং জীববিদ্যা ও মনোবিদ্যার সবস্তুক ও মূর্ত নিয়মের মধ্যে কোন্‌টা অধিকতর সত্য? প্রথম শ্রেণীর নিয়মাবলী তথ্য থেকে অনেক দূরে, সেগুলো শূন্যমাত্র ও সেগুলোর স্বয়ংসত্তা নেই ; সুতরাং সেগুলোকে কম সত্য বলতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মাবলী হচ্ছে সংকীর্ণতর এবং বাস্তবের বা বস্তুসত্তার ক্ষুদ্রতর অংশে সেগুলো প্রযোজ্য ; সুতরাং সেগুলো বেশি মিথ্যা। অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে অবস্তুক নিয়মাবলীর আত্ম-অসংগতির সম্ভাবনা বেশি, যেহেতু বাস্তবজগতের বৃহত্তর অংশকে বর্জন করে এই নিয়মাবলীর সৃষ্টি ; আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মাবলী সংস্পর্শজ অনুভবের জগতের খুব কাছাকাছি হওয়ার দরুণ সেগুলোর মধ্যে অনেক অবান্তর তথ্য থাকার সম্ভাবনা এবং সেইজন্যই সেগুলোর ভিতরে প্রচুর আত্ম-অসংগতি আছে। কালাধীন তথ্য এবং কালাতীত তত্ত্ব উভয়ের বেলাতেই ব্যক্তিতা ও শৃঙ্খলার আদর্শ হচ্ছে এক। এবং এই আদর্শকে প্রয়োগ করবার সময় গ্রহণক্ষমতা ও সমন্বয় এই দুই দিক থেকে

বিচার করতে হয়। এই দুই দিকের যে কোনো এক দিকের ব্যর্থতা, উভয় দিকের ব্যর্থতা নির্দেশ করে, এবং যে কোনো এক দিকের ব্যর্থতায় পূর্ণতা আশঙ্কিত হয়।

বিশ্বের উচ্চতর প্রকাশ বা অবভাসের সম্পর্কেও আমাদের এই বিচার সমানভাবে খাটে। আমাদের জগৎ যদি শুধু কতগুলো সমুৎপন্ন ঘটনা ও সেগুলোর উপরে কয়েকটা নিয়মের সমষ্টি মাত্র হত, তা হলে এই জগৎ এক তুচ্ছ পদার্থ হত। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই তথ্য ও তত্ত্বের অসুস্থ বিচ্ছেদ সত্য নয়। গ. কোনো ঘটনার গুরুত্ব সেই ঘটনার কার্যকারিতা দ্বারা আমরা নিরূপণ করি ; যে-ঘটনা তার নিজ অস্তিত্বের সীমা অতিক্রম করে যত প্রভাব বিস্তার করে সেই-ঘটনা তত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থলে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও আত্ম-অতিক্রমপ্রবণতা এই দুই দিকের মধ্যে সংঘর্ষ লক্ষ্য করা যায়। এই সংঘর্ষের উপরে এমন উচ্চতর অবস্থা আছে যেখানে সত্তার মধ্যে নিয়ম দেহধারণ করে ও যেখানে তথ্যের অন্তর্নিহিত নিয়ামক শক্তিরূপে তত্ত্ব অবস্থান করে। তবে সার্বিক নিয়মের কোনো উদাহরণের মধ্যে আমরা তথ্য ও তত্ত্বের যে মিলন দেখতে পাই তা স্পষ্টত দোষযুক্ত এবং সেখানে তথ্য ও তত্ত্ব হল পরস্পর পরস্পরের বাইরে অবস্থিত। সত্যের আদর্শ আমাদের এমন এক ব্যক্তিতাসম্পন্ন ভাবের দিকে নিয়ে যায় যার নিয়ম হচ্ছে তার অন্তরের জিনিস এবং এমন নিয়মাবলীর দিকে নিয়ে যায় যেগুলো হচ্ছে কোনো এক বস্তুসত্তার আভ্যন্তরীণ ধর্ম। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে জীবাত্মার স্বভাব বলতে যা আমরা মনে করি তা এইরকম তত্ত্বের একটা অপূর্ণ অবভাস বা প্রকাশ। কোনো আদর্শের রূপায়ণজনিত সৌন্দর্যের মধ্যেও তথ্য ও তত্ত্বের মিশ্রণের আর এক প্রকার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। চৈতন্যের রাজ্যে এই আদর্শের নব নব প্রয়োগ ও পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। ব্যক্তি বা সমাজের ইচ্ছাকে যখনই বাহ্য ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তখনই এই আদর্শের দাবি মেনে নিতে হয়। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের বিচার্য বিষয় হয় : ১. তত্ত্বের সামঞ্জস্য ও ব্যাপ্তি ও ২. তথ্যের ভিতর তত্ত্বের রূপায়ণের পরিমাণ। ইচ্ছার নিম্নতর বিকাশের মধ্যে পূর্ণতা না পেয়ে সত্তার উচ্চতর বিকাশের দিকে আমরা আকৃষ্ট হই ; জ্ঞান ও কর্মের যেসব উচ্চতর আদর্শের জন্য মানুষ পরিশ্রম করে ও প্রাণপাত

করে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি যায়। কিন্তু এইসব আদর্শের স্বরূপ এমন যে কোনো সসীম জীবের পক্ষে সেগুলোকে পূর্ণতা দান করা অসম্ভব। তাই সব উচ্চতর ভাবের বা অবভাসের মূল্য নিরূপণের জন্যও আমাদের সত্যের আদর্শকে প্রয়োগ করতে হয়। এবং প্রত্যেক স্থলে অসংগতি ও সংকীর্ণতার পরিমাণের দ্বারা অবভাসের পারমার্থিক পরিমাপ করা হয়।

জীবনের এইসব বিভিন্ন বিভাগ বা ক্ষেত্র সম্বন্ধে পরে আমার কিছু বলবার আছে। বর্তমানে কতগুলো বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। প্রথমত বলতে চাই যে বিশ্বের অনেকগুলো অংশ বা স্তর আছে এবং সেইসব স্তরকে সত্য ও সত্তার আপেক্ষিক মাত্রা-অনুযায়ী হয়তো পর পর সাজানো যায়; কিন্তু এই সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলবার আমি চেষ্টা করব না। আমি জানি যে কোনো যুক্তিসম্মত তত্ত্বশাস্ত্র রচনা করতে হলে এই কাজে হাত দিতে হয়। কিন্তু এই পুস্তকে বিশ্বের কয়েকটা প্রধান বৈশিষ্ট্যের বিষয় আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত একটা প্রশ্নের দিকে আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রশ্নটা এই : যে-মত-অনুযায়ী বাস্তবতা ও কালের অন্তর্গত অস্তিত্ব একার্থক, যে-মত-অনুযায়ী সত্য হচ্ছে কাল-প্রবাহের এক পাংশু প্রতিচ্ছবি মাত্র, যে-মত-অনুযায়ী কোনো এক দ্রব্য কেবল আছে কিংবা কেবল নেই, যে-মত-অনুসারে কোনো এক ভাব হয় কেবল সত্য নয় কেবল মিথ্যা, সেই-মতের দ্বারা আপাতগ্রাহ্য অবভাসের শ্রেণীভেদ ও স্তরভেদের যৌক্তিকতা স্বীকার করা সম্ভবপর কি করে? এই মত স্বীকার করলে, আত্মসংগতি রক্ষার জন্য মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনার প্রধান প্রধান বিষয়গুলোকে অবিশিষ্ট দুর্গতির এক অলীক গহ্বরে ঠেলে ফেলে দিতে হয়। কিন্তু গৃহীত মত-অনুযায়ী যা ন্যায্য তাকে অস্বীকার করলে বিচারের পথে আমরা এগোই কি করে? তাই আমাদের সামনে দুটো পথ উপস্থিত হয়। হয় আমাদের স্বীকার করতে হয় যে বিভিন্ন জিনিসের তুলনামূলক মূল্যনির্ণয় অসম্ভব, আমাদের জীবনে শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজ ও চরিত্রের মর্যাদা কতখানি এবং তারা কতদূর সত্য ও বাস্তব এ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং বিশ্বসংস্থানে সেগুলোর কোনো মূল্য ও সার্থকতা আছে কি না এও আমরা বলতে অপারগ, হয় এই স্বীকার করতে হয়। নতুবা আমাদের একদেশী মতের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে

হয়। আমি যতদূর বুঝতে পারছি তাতে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য দুটো পথের মধ্যে একটা পথ বেছে নিতে হয়। সত্য ও বাস্তবতা সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি হয় সেই মতকে স্বীকার করে নিতে হয়, এইটাই হল প্রথম পথ। নতুবা সব কিছুই অনুভূতির মানদণ্ড দিয়ে বিচার্য, সাহস করে এই মত স্বীকার করতে হয়; এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় পথ। তবে অনুভূতির মানদণ্ডকে পূর্ববর্ণিত সত্যের অসম্পূর্ণ আদর্শের পাশে সার্থকতা পরিমাপের পৃথক আদর্শরূপে গ্রহণ করলে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ, এই উপায় অবলম্বন করলে সত্য ও সত্তার তারতম্যের কোনো স্পষ্ট অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না এবং দুই আদর্শের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, অথচ কোনো এক উচ্চতর আদর্শের অভাবে এই দুই আদর্শের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করা যায় না। যেমন ধরুন, কোনো বিশেষ ধর্মবিশ্বাস বা রসানুভূতির সম্বন্ধে হয়তো করতালি দিয়ে বলে উঠলাম, "সম্পূর্ণ অলীক, তাতে কি? এর স্থান সত্যের চেয়েও উপরে এবং আমাদের জীবনে বাস্তবের চেয়ে এর মূল্য অনেক বেশি," কিংবা কোনো প্রামাণিক ও প্রশস্ত নিয়ম সম্বন্ধে বলে বসলাম, "কি অভ্রান্ত সত্য কিন্তু কি জঘন্য?" কিংবা কোনো জড়তথ্যের সম্বন্ধে হয়তো মন্তব্য করলাম, "মানুষের বিবেচনার অযোগ্য।" সত্য ও বাস্তবতাকে সার্থকতার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। তাই এই দুয়ের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমরা যুক্তিহীন ও বিচারহীন আপসের শরণ নিতে বাধ্য হই, কিংবা নিরন্তর দোলাচলচিত্ততায় ভুগতে থাকি। ব্যবহারিক জীবনে চল-চিত্ততা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু যে-মত স্বীকার করে এই পরিণতি হয় সেই-মত অগ্রাহ্য। সুতরাং অনুভূতির মানদণ্ডকে শুধু সার্থকতার জন্য অতিরিক্ত একটা মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা যায় না। আমি বলতে চাই যে এক বিশেষ অনুভূতিকে সত্য, বাস্তবতা ও সার্থকতার চরম মানদণ্ডরূপে স্বীকার করলেও হয়তো বিশ্বের অর্থ ও সার্থকতাকে বাঁচানো যেতে পারে। এইরকম মানের সম্ভাবনা কম, কিন্তু এইরকম মানের বশ্যতা স্বীকার করলে বিশ্বের অসামঞ্জস্য ও বিরোধ অনেক কমিয়ে আনা যায়। ধরুন, সুখবোধকে সত্য, বস্তুসত্তা ও সার্থকতার পরিমাপ বা আদর্শরূপে গ্রহণ করা হল। এই মান প্রয়োগ করে আমরা সুস্পষ্ট তথ্যকেও অস্বীকার

করে শূন্যমাত্র বলতে পারি, যদি তা দুঃখদায়ক হয়; কিংবা কোনো সত্য যদি আমাদের মতে সুখবৃদ্ধির প্রতিকূল হয় তাকে অবিমিশ্র ভ্রম ও মিথ্যা বলে অভিহিত করতে পারি। এইরকম মত শেষ পর্যন্ত কতদূর যুক্তিসহ সে অন্য কথা, তবে এইরকম মত দ্বারাও বিশ্বের ঐক্য ও অর্থ খানিকটা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুভূতিমাত্রকে অদ্বিতীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব এবং দ্বিবিধ আদর্শের বশ্যতা স্বীকার করার ফল হচ্ছে এক অসহ্য বিশৃঙ্খলা। এই অবস্থায় আমাদের পূর্ববর্তী সংকীর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ আদর্শের দিকে ফিরে যেতে হয়, কিন্তু তাও অসম্ভব। সুতরাং সাহসের উপর ভর করে প্রথম পথে বিপ্লবসাধন করতে হয়। আমাদের অবগত বাস্তব বিশ্ব হচ্ছে কেবল কতিপয় বাহ্য ও আন্তর ঘটনার ধারার সমষ্টি, এই মত সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হয়। প্রত্যেক অবভাস বা প্রতীয়মান সত্তার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ বাস্তবতা বা বস্তুসত্তা আছে, যদি সত্য নাও থাকে, একথা আমাদের স্বীকার করতে হয়। এবং কতখানি বস্তুসত্তা আছে তা নির্ণয় করবার জন্য আমাদের বর্ণিত সত্য ও সত্তার মান প্রয়োগ করতে হয়। এখানে অবশ্য সাধারণভাবে এই মান প্রয়োগের ফল কি দাঁড়ায় তা বলবার চেষ্টা করব না এবং আমি স্বীকার করি যে কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে এই আদর্শের দ্বারা তুলনা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের অসামর্থ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে মান বা আদর্শটা অসত্য। আমাদের অজ্ঞতা ও বুদ্ধির দৌর্বল্যের জন্যই অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই আদর্শকে প্রয়োগ করতে পারি না। পুনরুক্তি হলেও আমি এই বিষয়ে আবার সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

স্বগতসত্তারূপী সত্তাই হল বস্তুসত্তার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এক অদ্বিতীয় এবং পূর্ণ শৃঙ্খলার মধ্যেই বহুত্ব ও সম্বন্ধের পক্ষে এই স্বয়ংসত্তা লাভ করা সম্ভবপর। কোনো পূর্ণ শৃঙ্খলাই সসীম হতে পারে না। এ আমরা প্রতিপন্ন করেছি। কারণ যখনই কোনো সত্তাকে বাহ্য সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন করা যায় তখনই তার ভিতরকার বস্তুত্ব এই বাহ্য সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীলতার জন্য দোষাক্রান্ত হয়। এবং এই কারণেই সংগতি ও ব্যাপ্তি হল পূর্ণতার দুটো লক্ষণ। সমন্বয়ের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে অন্যান্য অবস্থা একই রকম থাকাকালীন, যে সত্তা বাইরে থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্র অধিকার করে থাকে তার

অন্তরে অসংগতির ক্ষেত্র ক্ষুদ্রতর। এবং ব্যাপ্তির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে অন্যান্য অবস্থা যদি একই রকম থাকে, তা হলে যে সত্তার আভ্যন্তরীণ সংগতি অধিকতর তার বাহ্যবিস্তারও বৃহত্তর হওয়ার সম্ভাবনা। চিন্তার বিষয়ীভূত বিশ্লিষ্ট কোনো সত্তা বা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত নির্বাচিত কোনো সত্তার ক্ষেত্রে যদি এই সত্য আমরা ভুলেও যাই সেই খণ্ডসত্তাগুলোর বস্তুত্ব নিরূপণ করতে গেলেই এই সত্যের কথা আবার আমাদের স্মরণ করতে হয়। এই বিষয়গুলোর চরমসত্যতা নির্ণয় করবার সময় সেগুলো কতখানি অসংগতিপূর্ণ ও সেগুলোর কতখানি পরিপূরণ দরকার এই দুই বিষয়ে আমরা দৃষ্টি দিতে বাধ্য হই। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাপকতা ও সংগতি দিয়েই বস্তুতা ও সত্যের মাত্রার মাপ করা হয়। এই একই তত্ত্বকে অন্যভাবে প্রকাশ করতে গেলে বলা যায় যে কোনো তথ্যের হীনতার পরিমাণ দিয়ে তার বস্তুত্ব বা যাথার্থ্যের নিরূপণ করা যায়। কোনো জিনিসের বস্তুত্ব বিচার করবার সময় সেই জিনিসের অবস্থাসাপেক্ষতাদোষ দূর করবার জন্য কি পরিমাণ সংশোধন প্রয়োজন তারই পরিমাপ করতে হয়। যে অবভাসিত বা দৃশ্যমান তথ্যকে সংশোধন করতে গিয়ে যত বেশি রূপান্তর বা ক্ষয় দরকার হয়ে পড়ে সেই তথ্যের মধ্যে তত অল্প বস্তুত্ব নিহিত আছে মনে করতে হবে ; কিংবা অন্যরূপে বলতে গেলে বলতে হয় সেই তথ্য নিত্যবস্তুকে তত কম প্রকাশ করে। এই নীতির সাহায্যেই প্রামাণিকতা নামক ধোঁয়াটে শব্দটার একটা পরিষ্কার অর্থ আমরা খুঁজে পাই।

সর্ববিধ বিষয়েই অন্তত নীতিগতভাবে এই মানের প্রযোজ্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। কারণ প্রত্যেক জিনিসেরই হয় প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে নিত্যবস্তুর মধ্যে স্থান আছে এবং সেখানে তার আপেক্ষিক স্থান অন্যান্য জিনিসের তুলনায় কি হবে তা তার আভ্যন্তরীণ অখণ্ডতা কি পরিমাণ রক্ষিত হচ্ছে তার তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুখ ও দুঃখবোধের তীক্ষ্ণতার মাত্রার কথা মনে করুন। চেতনা অধিকার করা ছাড়াও এই তীক্ষ্ণতার একটা বাহ্য প্রকাশ আছে। এবং তীক্ষ্ণতার প্রভাবে যেসব বাহ্য পরিবর্তন সাধিত হয় সেগুলোও এক স্থূল অর্থে সুখ ও দুঃখবোধের সত্তার অঙ্গ বা অংশ হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত

তথ্যগুলোকে তুলনা করবার সময় সেগুলোর মধ্যে কোনটা কতখানি স্থান ও কাল অধিকার করে আছে তাই দেখতে হয়। আবার এমন কোনো বিমূর্ত সত্য যদি থাকে যার কোনো কালিক অস্তিত্ব নেই তাকে তুলনা করবার সময় তার কার্যকরী প্রভাব কতদূর বিস্তৃত সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। এই সব নিয়ম সম্বন্ধে যদি আমাদের কোনো সন্দেহ উপস্থিত হয় তা হলে এগুলো নেই কল্পনা করলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সেবিষয়ে অবহিত হলেই সন্দেহের উপশম হয়। সমাজ-জীবনে সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই গোষ্ঠীর বৃহত্তর অভিপ্রায় সম্বন্ধে ব্যক্তিগতরূপে সচেতন ও সেই অভিপ্রায়-সাধনে তৎপর। এই তথ্যটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে একটা শৃঙ্খলার অদ্বিতীয়ত্ব বাহ্য তথ্যরূপে প্রকটিত না হয়েও বাহ্য তথ্যকে প্রভাবিত করে। এই ভাবেই আভ্যন্তরিক ঐক্য মূর্তিমান হয় ও উচ্চতর ঐক্যকে প্রকাশ করে। ধর্ম, কলা ও চিন্তার ক্ষেত্রে কালের প্রবাহের অন্তর্গত ঘটনার চাইতে এইরকম উচ্চতর ঐক্য তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব হল অনেক বেশি। এইসব ক্ষেত্রে আভ্যন্তরিক তত্ত্বটার অনেক বেশি ব্যাপক ও তার ঐক্যটার অনেক বেশি গভীর হওয়ারই সম্ভাবনা; কিন্তু বাহ্য ও কালিক তথ্যের মধ্যে তার পূর্ণ প্রকাশ কখনো সম্ভবপর নয়। তত্ত্বটা যত উচ্চতর হবে, যত তার সবরকম জিনিসের উপর আধিপত্য করবার সামর্থ্য অধিকতর হবে, ততই বিস্তৃততর হবে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঘটনাবলীর ক্ষেত্র। এবং এই কারণেই এইরকম তত্ত্বকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, এইরকম তত্ত্ব বাহ্য ও আন্তর অনুভবের বাইরে। শুধু নিকৃষ্টতর তত্ত্বগুলোই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যরূপে প্রকাশিত ও পরীক্ষিত হতে পারে।

একমাত্র আমাদের মতো এইরকম একটা মান অবলম্বন করলেই তবে ইন্দ্রিয়প্রতীতির যথাযোগ্য স্থান নির্ধারণ করা যায়। একমাত্র এই পরিমাপ স্বীকার করেই আমরা দুটো স্থূল ও বিপরীতধর্মী ও ভ্রমাত্মক মত থেকে রক্ষা পেতে পারি। এই দুটোর মধ্যে এক-মত-অনুযায়ী ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত তথ্যকেই একমাত্র অবগত বাস্তব বলে স্বীকার করা হয় কিংবা করবার প্রবণতা দেখা যায়। অন্য-মত-অনুযায়ী কালের অন্তর্গত প্রতীতি বা অবভাসকে অকিঞ্চিৎকর কিছু বলে কল্পনা করা হয়; এইমতাবলম্বীরা বাস্তবকে ভাবময় জগতে অন্বেষণ করেন। দুটো মতই শেষ পর্যন্ত আমাদের মিথ্যার দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং দুটো মতেরই শিকড় একটা ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে

নিহিত। শেষ পর্যন্ত এ দুটো মতের যে কোনো একটা গ্রহণেই আমাদের এক খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ অংশকে পরিপূর্ণ বস্তুসত্তা বলে স্বীকার করতে হয়; তার ফলে যাকে আমরা বস্তুরূপে গ্রহণ করি তার মধ্যে অসংগতি থেকে যায়। এ দুটো মতের প্রত্যেকটাই বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আগেই দেখেছি যে বাস্তবকে ভাব ও অস্তিত্ব এই দুই অংশে ভাগ করা একমাত্র আপাতস্বীকৃত অবভাসের জগতেই উপযোগী। পূর্ণসত্তায় এই বিভাগ লয় পায় ও মুছে যায়। কিন্তু আমরা এই কথার উপর জোর দিয়েছি যে মুছে যাওয়ার সঙ্গে প্রত্যেক অংশের সত্তার দাবি সম্পূর্ণভাবে সম্মানিত হয়। সেইজন্য আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে ঠিক কিভাবে এই দুই বিপরীত অংশ পূর্ণের মধ্যে সম্মিলিত হয় তার বিশদ বর্ণনা আমরা দিতে অক্ষম হলেও আমরা মানতে বাধ্য যে সেগুলো পরমতত্ত্বের মধ্যে সমৃদ্ধরূপে সমাবিষ্ট হয়ে থাকে। পরমসত্তায় ভাব ও অস্তিত্ব উভয়ে উভয়ের পরিপূরক বস্তুকে পায়। সুতরাং অবভাসের দুই দিকের এক দিক মাত্র বাস্তব বা বস্তুসত্তা, এই মতকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে আমরা বর্জন করেছি।

এই একই শাখা থেকে যে দুটো বিভ্রমের প্রশাখা বেরিয়েছে সে বিষয়ে আরো অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করা যাক। প্রথম বিভ্রমের বশবর্তী হয়ে আমরা এই বলি যে বাস্তবের ঘটনারূপে উদ্ভাসিত হওয়া প্রয়োজন; অতএব বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অনুভবে যা প্রত্যক্ষরূপে আসে একমাত্র তাই বাস্তব। কিংবা এই চূড়ান্ত মত গ্রহণ না করে আমরা বলি যে যা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা অনুভব্য একমাত্র তাই বাস্তব। এই মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাস্তবের কালিক উদ্ভাস বা অবভাস প্রয়োজন এই সত্য যুক্তির বলে অজ্ঞাতসারে একটা মিথ্যা ও দোষযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ এই ধরে নেওয়া হয় যে বাস্তবের উপস্থিতিকে যেন সব সময়েই সশরীর উপস্থিতি হতে হবে। এবং একটা ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে সশরীরে যে বাস্তব উপস্থিত না হয় তাকে বাস্তব বলে স্বীকার করা যায় না, এই ধরা হয়। কিন্তু এই ধারণা একান্ত ভুল। আমরা লক্ষ্য করেছি যে কোনো অনুভবের মধ্যস্থিত ধর্মেরই স্বয়ংসম্পূর্ণতা নেই, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ অনুভব বা জ্ঞানের মধ্যেই প্রত্যয়মূলক বা ভাবমূলক অংশ আছে; এর জন্য ইন্দ্রিয়-অনুভবে প্রাপ্ত প্রত্যেক তথ্যের মধ্যেই স্ব-বিরোধ উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেক তথ্যের মধ্যেই

অন্য তথ্যের প্রতি উল্লেখ থাকে। অন্য দিকে যে ধর্মের স্বরূপত প্রকাশিত হবার সামর্থ্য যত কম, তাকে দেশ ও কালের আকারে তত কম উদ্ভাসিত হতে হয় এবং সেইজন্যই তার আভ্যন্তরীণ সংগতি ও আভ্যন্তরিক ঐক্যও তত বেশি। এবং আমরা জেনেছি যে ব্যাপকতা ও সমন্বয় এই দুটোই হচ্ছে বাস্তব বা বস্তুসত্তার প্রকৃত লক্ষণ।

দ্বিতীয় বিভ্রমটাও প্রথমটার মতো। এখানেও ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে অবভাসিত বা উদ্ভাসিত হওয়াকেই ভুল করে একমাত্র অবভাস বলে মনে করা হয়, অর্থাৎ সংবেদন ও অবভাস হচ্ছে এক জিনিস এরকম মনে করা হয়। এবং এই ভুল যুক্তির দ্বারা আর একটা ভুল সিদ্ধান্তে আসা হয়। কিন্তু এখানে ভুলটা করা হয় বিপরীত দিকে। চরমতত্ত্বগুলো ও পরমনীতিগুলো ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, সেইজন্য এই মীমাংসা করা হয় যে সেগুলো এক ভাবময় জগতে অবস্থিত, সেগুলো যেন এক শুদ্ধ চিন্তালোকের বস্তু। এবং একমাত্র এই ভাবজগতকেই বাস্তব বলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ভাবময় জগতকে কালের প্রবাহের জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে এই ভাবলোক বাইরে থেকে সীমিত ও ভিতরে বিবাদ-কণ্টকিত হয়ে ওঠে। এবং যখন এই শুদ্ধ অমূর্ত ভাবরাশিকে দিয়ে বিশ্বকে বুঝতে চেষ্টা করি এবং অনুভবলব্ধ বাস্তবের সঙ্গে সেগুলোর সামঞ্জস্য বিধান করতে প্রয়াসী হই তখন আমাদের বুদ্ধিভ্রম স্পষ্ট ধরা পড়ে। ইন্দ্রিয়জ অনুভবকে অভ্যাগত ও অসত্য বলে বর্জন করার ফলে এই অনুভব স্বাধীন ও স্বপ্রধান হয়ে ওঠে। এবং এমন অবস্থায় বাস্তবের প্রতি যে-কোনো শুদ্ধ ভাবকে বিধেয়রূপে প্রয়োগ করা হয়, তাই প্রত্যক্ষ তথ্যের দ্বারা ক্লিষ্ট ও কলুষিত হয়ে পড়ে। প্রত্যেক প্রত্যক্ষ অনুভবের ব্যাপারে সংবেদনের সঙ্গে ভাবনার সংযোগ আছে এবং প্রত্যেক অবভাসের মধ্যেই তথ্যের সঙ্গে ভাবের সংগম আছে। এ ভিত্তির উপর সত্য দাঁড়িয়ে আছে। এই সঙ্গে আমাদের এই রক্ষাকারী তত্ত্বটা স্বীকার করে নিতে হয় যে থাকা এবং অস্তিত্ব থাকা দুটো এক জিনিস নয় এবং কালের মাঝখানে বাস্তব হওয়া এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়াও এক ব্যাপার নয়। এই তত্ত্বগুলো স্বীকার করলে নিকৃষ্ট ভ্রমসমূহকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি। এবং এই থেকেই আমরা সত্য ও সত্তার তারতম্যের পরিমাপক-তত্ত্বে আবার ফিরে আসি, আমাদের জীবন ও জগতে যদৃচ্ছচারিতার

স্থলে আবার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং জীবন ও জগৎ হচ্ছে তথ্য ও কল্পনা দুই অসংলগ্ন লোকের কৃত্রিম সহযোগ মাত্র এই ধারণা আর থাকে না। এই মাত্রানির্ণয়ের মান স্বীকার করলে নিত্যবস্তুর প্রকাশের পরিমাপ সম্ভব হয়; আর মনে করতে হয় না যে পরমসত্তার প্রকাশ খামখেয়ালি, অর্থহীন ও বিশৃঙ্খল; আমরা উচ্চতর নিম্নতর এই দুটো বিশেষণের একটা অর্থ আবার খুঁজে পাই। আমরা বুঝতে পারি যে অবাস্তব হওয়ার অর্থ হল অপ্রকাশিত হওয়া এবং প্রকাশের পূর্ণতার তারতম্যের উপর বাস্তবতার পূর্ণতার তারতম্য নির্ভরশীল, কিন্তু এইটুকু বললে মাননির্ণয়ের তত্ত্বের অর্ধেকটুকু মাত্র প্রকাশ করা হল। এই তত্ত্বের বাকি অর্ধেকটুকু এই: কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবের পৃথক পৃথক তথ্যরূপে প্রকাশ হচ্ছে খুব নিম্নশ্রেণীর প্রকাশ, একমাত্র নিকৃষ্ট সত্তাই সর্বত্র এইরকম প্রত্যক্ষ তথ্যরূপে প্রকাশিত হয়।

এই বিষয়টা একটু স্থূলভাবে বিচার করে আমরা কালাধীন অস্তিত্বের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করতে পারি। যদিও কালাধীন সত্তা ও বাস্তবতা সমার্থক নয়, তবুও কাল হচ্ছে আমাদের অনুভব বা চেতনার একটা অপরিহার্য অংশ বা অঙ্গ। এবং তথ্য ব্যতীত শুদ্ধ ভাব যে বাস্তব বা সত্য নির্ণয়ের পথ হতে পারে এইরকম ধারণা উদ্ভট। ঘটনার প্রবাহ বিনা কোনো জ্ঞান অসম্ভব; কারণ এই প্রত্যক্ষ অনুভব বা অভিজ্ঞতা থেকে সমস্ত ভাবলোকের উৎপত্তি। আমরা মোটামুটি ভাবে এই কথা নিঃসংকোচে বলতে পারি যে চিন্তার রাজ্যে বস্তু বা সম্বন্ধ এ দুটোর আকারে এমন কিছুই নেই যা ইন্দ্রিয়জ অনুভবের থেকে উৎপন্ন নয়। এবং একমাত্র অনুভবে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই আমরা দেশ ও কালের আকারে শৃঙ্খলিত এক জগৎ নির্মাণ করি। আমরা অষ্টাদশ অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি যে এইরকম কল্পিত ঐক্য হল আংশিক অসম্পূর্ণ ও আপেক্ষিক মাত্র। সে যাই হোক সংস্পর্শজ সংবেদনগুলোর সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ যতক্ষণ না কল্পিত বা নির্মিত হচ্ছে ততক্ষণ জ্ঞানলাভ করার ভিত্তিস্থাপনই হয় নি। কিন্তু এই বলে সব কিছুই বা সমস্ত কালিক ঘটনাই যে আমাদের বাস্তব দেশ ও কালের এক সংস্থানের মধ্যে উদ্ভাসিত হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে প্রত্যেক অবগত তথ্যই প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে বাস্তব ঘটনাস্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে

এবং কোনো না কোনো অর্থে এই স্রোতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। আমরা যদি বলি যে গৃহীত তথ্য দ্বারাই সত্যনির্ণয় করা সম্ভব তা হলে খুব অন্যায় বলা হবে না।

এখানে একটা সাংঘাতিক ভুল যেন আমরা করে না বসি। আমরা দেখেছি যে অস্তিত্ব ব্যতীত চিন্তন বা ভাব সম্পূর্ণ নয়। এই বাক্যের এমন অর্থ নয় যে শুদ্ধভাব হল নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং অস্তিত্ব যেন বাইরে থেকে আনা এক প্রয়োজনীয় সংযোজন মাত্র। আমরা এই তত্ত্বটা লক্ষ্য করেছি যে বাহ্য উপাদানের সংযোগে কোনো পূর্ণ বস্তুর পূর্ণতার বৃদ্ধি বা উৎকর্ষ সাধিত হয় না এবং বিশেষ করে চিন্তন-ক্রিয়াতে যে আমরা বাস্তব তথ্যের পেছনে দৌড়ই তার একমাত্র এই উদ্দেশ্য যে আমরা চিন্তন-ব্যাপারের অন্তর্গত ভাবময় জগৎটাকে ব্যাপকতর ও আরো সংগতিপূর্ণ করতে চাই। তথ্য দ্বারা কিভাবে সংগতি ও ব্যাপ্তিলাভে সাহায্য হয় তাও একটা দৃষ্টান্ত দিলে সহজে বোধগম্য হবে। যে টাকা শুধু কল্পনা বা শুধু চিন্তার বিষয় তা একান্ত নির্গুণ। (লেখক এখানে ডলারের তুলনা দিয়েছেন।) কিন্তু যে টাকার অস্তিত্ব বাহ্যজগতে প্রমাণিত, বস্তুবিন্যাসের মধ্যে তার একটা বিশেষ স্থান আছে এবং সেই টাকা অসংখ্যগুণসম্পন্ন। টাকার শুদ্ধ ভাব বা কল্পনাটা তা হলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষসম্বন্ধাবলীর পরিবেশের মধ্যে নব নব গুণের অধিকারী হয় এবং এই কথা একেবারেই বলা চলে না যে এই নূতন নূতন বিশেষণগুলো হচ্ছে চিন্তনক্রিয়ার পক্ষে অতি তুচ্ছ জিনিস।

শুদ্ধ কল্পনা বা ভাব বলতে আমরা এমন ভাবগত বিষয়কে উল্লেখ করি অস্তিত্বের সঙ্গে যার কোনো সংযোগ নেই বলে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু আমরা আগেই দেখতে পেয়েছি যে শুদ্ধ ভাব পোষণ করতে হলেও বাস্তবের উল্লেখ তাতে কোনো না কোনোরূপে থেকেই যায়। সুতরাং এই দিক থেকে দেখলে আমাদের তথাকথিত শুদ্ধভাবও প্রতীয়মান কালের অন্তর্গত ঘটনা শৃঙ্খলার সঙ্গে একপ্রকারসম্বন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে। তবে কালিক শৃঙ্খলার সঙ্গে কোনো আভ্যন্তরিক সংযোগ না থাকার ফলে এই শুদ্ধ ভাবটার বাস্তবের সহিত সংযোগ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে বাহ্য এবং এই ভাবের অন্তর্নিহিত অর্থ বা বিষয়টার অস্তিত্ব হচ্ছে একেবারেই অনিশ্চিত ও আকস্মিক। শুদ্ধ ভাবটাকে এইরূপে বিবেচনা করলে তাকে তথাকথিত আকস্মিক ইন্দ্রিয়জ

তথ্যেরও নীচে স্থান দিতে হয়। তার কারণ আকস্মিক ইন্দ্রিয়জ তথ্যের মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে অন্তত খানিকটা আন্তরিক সংযোগ আছে এবং সেইজন্য তার মধ্যে একপ্রকার অপরিচ্ছন্ন সার্বিক সম্বন্ধও আছে।

যা কিছু বাস্তব, ঘটনার জগতের মধ্যে তার প্রকাশ অবশ্যম্ভব। এবং সেই-সত্তার বাস্তবতা তত বেশি যে-সত্তার সঙ্গে ঘটনার জগতের দ্বন্দ্ব যত কম। সেইজন্য অন্যান্য অবস্থা একই প্রকার থাকলে, যে-সত্তার কালাধীন জগতের সঙ্গে সংযোগ আছে এবং সেই জগতে একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে, সে-সত্তার বাস্তবতার পরিমাণ বেশি। অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার জন্য এই সম্বন্ধগুলো এই সত্তার ভিতর থেকে কার্যকরী। যা কাল্পনিক তা হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য ও অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ধ্বংসাত্মক ও বাহ্য। "অন্যান্য অবস্থা একই প্রকার থাকলে" এই সর্তের ওপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই। কারণ, এই উপাধিটার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এমন কল্পনাও আছে যা বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-অনুভবজাত তথ্য থেকে হচ্ছে উচ্চতর, সত্যতর ও নিঃসংশয়ে বাস্তবতর। এই জিনিস বুঝতে পারলে আবার আমরা পূর্বেকার পার্থক্যবিচারে ফিরে আসি। প্রত্যেক সত্যকেই প্রকাশলাভ করতে হয় এবং অস্তিত্বের উপর কর্তৃত্ব করতে হয়, কিন্তু প্রকাশের অর্থ এ নয় যে ইন্দ্রিয় অনুভূতির চতুঃসীমার মধ্যে তাকে যথার্থভাবে আবির্ভূত হতে হবে। বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলোর বেলায় এই তত্ত্বটা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। ধর্ম ও শিল্পের প্রধান নীতিগুলোর প্রকাশও যে এই একই রকম তাও নিঃসন্দিগ্ধ। শাশ্বত সত্যগুলো কোনো ক্ষেত্রেই দেশ ও কালের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় সেগুলোর প্রবেশ যেন প্রবেশের ভাণমাত্র ও সেগুলোর প্রকাশ নানাভাবে বিকৃত। কোনো দ্রব্যসংস্থানের কেন্দ্রের যত কাছে থাকা যায়, তত তার পরিধির ওপর অধিকতর আধিপত্য আসে; কিন্তু পরিধির মধ্যে ইঙ্গিতরূপে থাকা ব্যতীত পরিধির ওপর প্রভুত্ব সম্ভবপর নয়। এবং এই প্রকার অভিব্যক্তি হচ্ছে খুবই অসম্পূর্ণ, ক্ষণিক ও আভাসরূপী মাত্র। কালের প্রবাহের মধ্যে কোনো জিনিসের স্বধর্মের অভিব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তব নয়; কোনো জিনিসের নিজ মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পক্ষে কালের মধ্যে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। এমন-কি ন্যায্য পথ অনুসরণ করবার প্রবল ও অকম্প

ইচ্ছাকেও কালের মধ্যে যথার্থ ও সম্পূর্ণ প্রকাশদান করা অসম্ভব। তবে পূর্ণসত্তার মধ্যে ভাব ও অস্তিত্বের মধ্যেকার এই ব্যবধান বিলুপ্ত হয়। এবং আমাদের জগতে যে-সত্তার অদ্বিতীয় ব্যক্তিতা যত বেশি সেই-সত্তা হল তত বেশি বাস্তব ও সত্য। কারণ তার মধ্যে পরমতত্ত্বের স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধর্ম অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে আছে এবং অদ্বৈত তত্ত্ব ও সেই সত্তার মাঝখানে ফাঁক হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম। প্রকারান্তরে বলা যায় যে এইরকম উচ্চতর সত্তার পরমতত্ত্বে প্রবেশ করবার জন্য অপেক্ষাকৃত কম সংস্কার ও শোধন দরকার।

এইবার এই সাধারণ সূত্র থেকে এগিয়ে কতগুলো জরুরি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যাক। এখনো অনুভূত প্রকৃতির স্বরূপ ও জীবাত্মার প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় নি; এবং অব্যক্ত অস্তিত্বের অর্থ কি তা আমাদের নিরূপণ করা বাকি আছে। আলোচনা আরম্ভ করবার আগে একটা ভুলের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়। আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে যে-ভাব হচ্ছে নিত্যবস্তুর যত সন্নিকটে, সেই-ভাব হচ্ছে তত অধিক সত্য এবং যে-ভাবের আভ্যন্তরিক সংগতি যত অধিক, সেই-ভাব নিত্যবস্তুর তত নিকটে। এই সিদ্ধান্ত থেকে আমরা যেন ধারণা করে না বসি যে শুদ্ধভাবসমূহই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর বাস্তব হয়ে ওঠে। কারণ এই অনুসিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য। আমরা লক্ষ্য করেছি কেবল ভাবের পক্ষে সম্পূর্ণতালাভ করা অসম্ভব ও ভাবকে সম্পূর্ণতা লাভ করতে হলে ভাবের অধিক হতে হয়। যেহেতু পূর্ণতা লাভের এইসব অবস্থা ভাবের অন্তর্নিহিত নয়, সেইজন্য বিনা-সাহায্যে ভাব পূর্ণ হতে পারে, এই ধারণা সংগত নয় এবং একই কারণে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে পূর্ণতা প্রাপ্তির পর ভাব আর কেবল ভাব থাকে না।

এইবার বিভিন্ন প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাহ্য প্রকৃতি বা জড়জগতের খানিক অংশ কেবল চিন্তার বিষয়রূপে অবস্থান করতে পারে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এও উপলব্ধি করেছি যে পরমসত্তায় সমস্ত সসীম জীবের চেতনার বিষয়গুলো গলে একাকার হয়ে যায় এবং সেইজন্য সেখানে ভাবের সঙ্গে অনুভব বা বেদনার সংমিশ্রণ হচ্ছে অবশ্যম্ভব। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে আমাদের প্রকৃতির স্বরূপ বিচার করতে গিয়েও এই একই সিদ্ধান্তে আমরা এসেছি। আমাদের

প্রকৃতি বা স্বভাবও হচ্ছে একটা বুদ্ধিগত বিষয় মাত্র ; কারণ তার অস্তিত্ব সোপাধিক, এবং সোপাধিক অস্তিত্বকে ব্যক্ত অস্তিত্ব বলা চলে না। এখানেও কিভাবে আছে বিশদরূপে না জানলেও আমাদের বিশ্বাস করতে হয় যে ভাবগত তথ্যের পরিপূরক অনুভব সমগ্রসত্তার মধ্যে নিশ্চয়ই থাকতে বাধ্য। এই অপর অংশের সঙ্গে সংযোজনের পর ভাব পূর্ণসত্তার অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে।

বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা দ্বারা হয়তো এইসব বিষয়ে আমাদের ধারণা অনেকটা স্পষ্টতর হয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি যে ভাবগত অবস্থাগুলোর পক্ষে পূর্ণতা লাভ করে বাস্তবরূপ ধারণ করতে গেলে কেবল ভাবগত থাকা আর চলে না ; কেবল বুদ্ধির জগৎকে অতিক্রম করে যেতে হয়। এবং আমরা এও বুঝতে পেরেছি যে প্রত্যেক প্রত্যয় বা ভাবেই কিছু কিছু সত্য ও বাস্তবতা আছে। ভাবগত বিষয় বা অর্থকে অস্তিত্বের দেশে আবির্ভূত হতে হয় ; কিন্তু তাই বলে অস্তিত্বের দেশে যথার্থরূপে প্রকাশিত হতে না পারার জন্য তাকে অবাস্তব বলা অন্যায়। এইবার এই তত্ত্বটা দিয়ে বাহ্যপ্রকৃতির অদৃষ্ট অংশের ও জীবস্বভাবের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করা যাক। কালাধীন তথ্যরূপে জীব স্বভাব থাকতে পারে না এবং যতদূর আমরা আগে দেখেছি প্রকৃতির অদৃষ্ট অংশ কালাধীন তথ্যরূপে না থাকলেও কিছু যায় আসে না। সুতরাং এই দুটো তথ্যকেই আমরা অনবভাস্য বা অপ্রকাশ্য তথ্য বলে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করলেও সেগুলোকে অ-বাস্তব বলবার কোনো হেতু নেই। এবং বিশ্বে সেগুলোর কি প্রভাব, প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা আছে তার দ্বারা আমাদের নির্ণীত মান অনুসারে সেগুলোর বাস্তবতা বিচার করা যায়।

উপর্যুক্ত দুটো তথ্য বা সত্তাকেই অব্যক্ত সত্তা বলে পরিগণিত করতে হয়। সুতরাং আমরা এখন "অব্যক্ত সত্তা" এই বাক্যাংশের অর্থ নিরূপণ করবার চেষ্টা করব। "অব্যক্ত", "সুপ্ত", "গুপ্ত", "জায়মান", "ফলতঃ" ও "প্রবণতা" এই শব্দগুলোর বড়ো বেশি ব্যবহার করা হয়। এই শব্দগুলোর ব্যবহার দ্বারা আমরা যে জিনিস নেই বলে জানি বা জানা উচিত সেই জিনিস আছে এই ভাবটা প্রকাশ করতে চাই। একশ্রেণীর দার্শনিকদের কাছে এই শব্দগুলোর দাম অত্যন্ত বেশি। সেই সম্বন্ধে এখানে কিছু বলতে চাই না। কোনো

প্রকার অস্তিত্বের উদ্ভবের উপযোগী উপাধিসমষ্টির কতগুলো যখন অনুভবে বর্তমান এবং কতগুলো ভাবরূপে বর্তমান তখনকার অস্তিত্বকে আমরা অব্যক্ত বা অনভিব্যক্ত অস্তিত্ব বলি। তবে সাধারণত কি কি উপাধির ওপর এই অস্তিত্ব নির্ভরশীল সেই বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা না থাকা সত্ত্বেও আমরা এই শব্দগুলোর প্রয়োগ করি এবং যেখানে উপাধিসমষ্টির একাংশ আবির্ভূত হচ্ছে সেইখানেই যেন সমগ্র সত্তাটা আছে এইরকম একটা ধারণা আমরা করি। এই পরবর্তী ধারণাটা সমর্থনের অযোগ্য।

"অব্যক্ত সত্তা" এই শব্দগুলোর ব্যবহার কি প্রসঙ্গে ন্যায্য মনে করা যেতে পারে তা পরে বিচার করছি। যখন কোনো সত্তা সম্পূর্ণ বা যথার্থরূপে আবির্ভূত না হয়ে কোনো ভাবে কালের এক অংশের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে তখন সেই সত্তা অব্যক্তরূপে আছে, ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু কি অবস্থায় এই ব্যবহার সংগত এবং কি অবস্থায় অসংগত তার ধারণা করা দরকার। কোন্ সময় এই শব্দগুলোর ব্যবহার অসংগত আমি সেই বিষয়ে আগে বলব। আমরা সেইক্ষেত্রে অব্যক্ত অস্তিত্বের কথা বলতে পারি না, যেক্ষেত্রে সত্তাটার অভিব্যক্তিতে তার অবসান হয়। এখন কারণরূপে যে উপাধিসমুচয়ের উদয় হয়েছে, সেগুলোর অবশিষ্ট উপাধিগুলোকে উৎপন্ন করতে পারা উচিত। এবং এই ব্যাপার সম্ভবপর করবার জন্য অন্য বাহ্য উপাদানের সহকারিতা দরকার। কিন্তু বাহ্য উপাদানগুলো যদি এত বেশি হয় যে প্রথম আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্যটাই সেগুলোর জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বা অবান্তর হয়ে পড়ে, তা হলে আর অব্যক্ত সত্তার কথা বলা চলে না। ধরুন, একজন লোকের তেঁতুলের বীজ খেয়ে মৃত্যু ঘটেছে। (লেখক এখানে চেরিফলের বীজের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।) এমত অবস্থায় প্রত্যেক তেঁতুলের বীজের মধ্যেই মৃত্যু অব্যক্তরূপে বিদ্যমান আছে, এইরকম বিশ্বাস করা অত্যন্ত অদ্ভুত হবে। কারণ, তেঁতুলের বীজ খেয়ে মৃত্যু ঘটবার জন্য আরো বহু বাহ্য তথ্যের বা নিমিত্তের প্রয়োজন এবং সেই জন্য তেঁতুলের বীজ খাওয়ারূপী নিমিত্তটার সঙ্গে মানুষের মৃত্যুরূপী ঘটনার বা কার্যের সম্বন্ধ নিছক আকস্মিক এইরকমই বিচার করতে হয়। আরো একটা উদ্ভট উদাহরণ দিলে তত্ত্বটা সুপরিস্ফুট হবে। কবির কাব্যসৃষ্টির জন্য কয়েকগ্রাস কামিনীতণ্ডুলের ওদন ভক্ষণ নিমিত্ত হতে পারে; কিন্তু তাই বলে

প্রত্যেক কামিনী তণ্ডুলকণার মধ্যেই অব্যক্তরূপে কাব্যরাশি বর্তমান আছে এরকম ধারণা কি করা যায়? (লেখক এখানে একটুকরো পাঁউরুটির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।)

এইসব অসম্ভব পরিণতির থেকে আমরা বুঝতে পারি যে একমাত্র কতগুলো বিশেষ অবস্থায় উপর্যুক্ত শব্দগুলোর ব্যবহার যথার্থ ও উপযোগী! যেখানে উপস্থিত নিমিত্তরূপী তথ্যটা কার্যরূপী তথ্যের উৎপাদনে সক্ষম, সেখানে "অব্যক্ত অস্তিত্বে"র কথা প্রাসঙ্গিক; তবে কার্য উৎপাদনের সময় নিমিত্তের বৈশিষ্ট্যটা সম্পূর্ণ প্রণষ্ট হলে চলবে না, অর্থাৎ কারণ থেকে কার্যে পরিণতির সময় ১. নিমিত্তের স্বরূপের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন ঐক্য থাকতে হবে এবং ২. অন্ত্য ফলকে মুখ্যত আদ্যতথ্যজনিত হতে হবে। এছুটো হচ্ছে একই তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ। কারণ এক নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক বাহ্য কারণের যদি আগমন দরকার হয় তা হলে আদ্য ও অন্ত্য অবস্থার তাদাত্ম্য আর কল্পনা করা যায় না; সেইরকম ক্ষেত্রে অন্তিম পরিণতি আদ্য অবস্থার মধ্যে পূর্ব থেকেই নিহিত আছে এরকম বিশ্বাস করা কঠিন হয়। বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবস্থিতি অব্যক্ত সত্তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। (লেখক এখানে ডিম থেকে মোরগের উৎপত্তির উদাহরণ দিয়েছেন।) কিন্তু প্রত্যেক মানুষকে নির্বিচারে একজন প্রচ্ছন্ন বসন্তরোগী কল্পনা করা হচ্ছে এরকম দুষ্ট কল্পনা। (লেখক এখানে স্কারলেট্ ফিভারের উদাহরণ দিয়েছেন।) আমি আমার নাশের পর যা হব এখন আমি তাই আছি একথা একেবারে দুর্বোধ্য। একমাত্র প্রকৃত ক্রমবিকাশ বা পরিণতির ক্ষেত্রেই অব্যক্ত অস্তিত্বের কল্পনা হচ্ছে যথাযোগ্য। তবে তথা-কথিত এক নব্য দর্শনশাখায় যে বিকৃত অর্থে ক্রমবিকাশকে নেওয়া হয়েছে সেই অর্থে একে গ্রহণ করলে চলবে না।

আমাদের সিদ্ধান্ত তা হলে এই যে কতগুলো অবস্থায় অব্যক্ত অস্তিত্বের ভাব বা কল্পনা সংগত। তবে একই সঙ্গে এও মনে রাখা দরকার যে কোনো স্থলেই এই ভাবটা সম্পূর্ণ সত্য ও ভ্রমহীন হতে পারে না। কারণ কোনো তথ্য বা অবস্থা বা জিনিসকে পরিণত হতে হলে বাহ্য উপাধির সাহচর্য প্রয়োজন হয়। তবে শেষ পর্যন্ত কতখানি বাহ্য উপাধি বা উপাদান বা সহকারী কারণ সহ্য করা যেতে পারে তা সঠিক বলা যায় না। একমাত্র সমগ্র কারণকেই প্রকৃত কারণ বলে অভিহিত করা চলে। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে

শুধুমাত্র সমগ্র বিশ্বটাই সমগ্র কারণ হতে পারে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের বর্ণনা করা অসম্ভব। এই আপত্তিটাকে সূক্ষ্মচিন্তার বিলাস মাত্র মনে করে উপহাস করা যায় না। কারণ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ নির্ণয় করবার সময় আমরা এই আপত্তিটার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পেয়েছি। একটা জিনিস এখন-যা, তার জন্যই পরে যা-হবে-তাই এইরকম বিচার তথ্যত কখনো সত্য হতে পারে না এবং যে ক্ষেত্রে এই বিচার অশুদ্ধ সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে অব্যক্ত সত্তার কথা আমরা বলতে পারি না। সুতরাং সর্বদাই অব্যক্ত অস্তিত্বের ভাব ব্যবহারের মধ্যে কিছু চিন্তাশৈথিল্য ও অস্পষ্টতা থাকতে বাধ্য। ফলত আমরা যেন দুই বিপদের মাঝখানে এসে পড়ি : ১. যদি কোনো সসীম সত্তার সম্বন্ধাবলীকে বিধেয়রূপে প্রয়োগ করতে অসম্মত হই— যেসব সম্বন্ধের অনেকগুলোই বাহ্য ও পরিবর্তনশীল— তা হলে ঐ সত্তা-সম্বন্ধীয় বর্ণনা অসম্পূর্ণ ও শূন্য হয়ে পড়ে। ২. আর যদি বিধেয়রূপে প্রয়োগ করতে সম্মত হই তা হলে জিনিসটার কি হওয়া সম্ভবপর একমাত্র তাই বলতে পারি।

উপর্যুক্ত পথে চলতে বাধ্য হয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত এক অচিন দেশে উপনীত হই। যে-ধর্মীর উদ্দেশ্যে বিধেয়গুলো আরোপ করা হয় সেই-ধর্মীকে উত্তরোত্তর পরিবর্ধন করে যেতে বাধ্য হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা আসে যখন ধর্মী আর থাকে না। অব্যক্ত অস্তিত্বের ভাব ব্যবহার করবার সময় মনে হয় আমরা যেন এক অবনত-তটের উপর দাঁড়িয়ে আছি। চলতে যেই আরম্ভ করি অমনি নীচের দিকে গড়িয়ে যেতে বাধ্য হই। আমরা আমাদের যাত্রা সর্বপ্রথমে এই বলে আরম্ভ করি, 'ক' এমন এক সত্তা যে কতগুলো উপাধির উদ্ভবে এটা 'খ'এ পরিণত হবে, সুতরাং এই কারণেই আমি বলতে সাহস করি যে 'ক যেন খ' ; আমাদের যাত্রা যখন শেষ করি তখন আমরা বলি, 'ক' এর 'গ' হওয়াও সম্ভবপর সুতরাং এই কারণে 'গ' বিধেয়কেও 'ক'এর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা চলে ; খুব অল্প কয়েক স্থলে 'ক' হচ্ছে 'গ'এর উৎপাদক এবং পরিণতির কালে 'ক'এর সম্পূর্ণ তিরোধান হয়েছে, তাতে কি ; তবুও বিধেয়প্রয়োগ আমাদের মেনে নিতে হবে।

সুতরাং আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে অনভিব্যক্ত অস্তিত্বের ভাব হচ্ছে কতগুলো বিভিন্ন ও বিরোধী মতের মধ্যে একটা স্থূল নিষ্পত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত। কোনো সুনির্দিষ্ট নীতির দ্বারা এই ভাবের প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। তবুও পদটার তাৎপর্য ও অর্থ মনে রেখে ব্যবহারিক জগতে তার প্রয়োগ করাতে কোনো বাধা কিংবা অসুবিধা নেই। কিন্তু সব সময়েই এই পদটা নানারকম বিপদ ও বিভ্রান্তির জনক। এই শব্দটির ব্যবহার করবার প্রবৃত্তি যত সংযত করা যায় ততই শুভ।

সম্ভাবনা ও আকস্মিকতার সাধারণ স্বরূপ নির্ণয় করতে পারলে অনেক দুর্গম সমস্যার ওপর আলোকপাত করা যাবে। এই বিষয়ে আমরা আগে একবার কিছু বলেছি, যখন পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবতার সমান বলা যায় কি না এই প্রশ্নের আলোচনা আমরা করছিলাম। এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব : সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠা ভাব ও তথ্যের বা অস্তিত্বের বিশ্লেষের উপর, কিন্তু প্রত্যয় ও অস্তিত্ব মূলত হচ্ছে এক ; সেইজন্য পৃথকরূপে প্রত্যেকটারই অভ্যন্তরে মল বা আময় আছে ; তবে যা সাম্ভবিক তাকে যদি পূর্ণতা দেওয়া যেতে পারত তা হলে তা বাস্তবিক হয়ে উঠত, এবং এই পূর্ণতালাভের সঙ্গে শুদ্ধ সম্ভাবনা বা কেবল ভাব আর সম্ভাবনা বা ভাব থাকত না।

সবসময়েই বস্তু ও ভাব বা প্রত্যয়ের আংশিক ব্যবকলনের উপরই হচ্ছে সাম্ভবিকের ভিত্তি। কোনো এক অগ্রগামী উপাধিনিচয়ের ভাব থেকে তার যে পরবর্তী পরিণতি চিন্তা দ্বারা কল্পনা করা হয় যথার্থত তারই নাম হল সম্ভাবনা। কতগুলো উপাধির বা অবস্থার সাকল্য থেকে, স্বয়ংসম্পূর্ণতা নেই এমন একটা শৃঙ্খলা থেকে, তার যে পরিণতি আমরা ধারণা করি তাকেই সম্ভাবনা বলে বিশ্বাস করি এবং এই শৃঙ্খলার মাত্র একাংশ ব্যতীত বাকি সমস্তটাই হল প্রত্যয়গত বিষয়, বাস্তবিক নয়। শেষের উক্তিটি দিয়ে আমাদের বক্তব্যকে বিশিষ্ট করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করি। যা সাম্ভবিক তাকে বাস্তবিক বলা চলে না। অথচ এর স্বরূপ এমন যে তাকে শুধুমাত্র কাল্পনিক বা ভাবগত বললেও দোষ হয়। যা বাস্তবিকত সম্ভবপর একমাত্র তাকেই সাম্ভবিক বা সম্ভাব্য বলা যেতে পারে। বাস্তবের মাটির মধ্যে হচ্ছে সম্ভবপরের শিকড়। নিরুপাধিক ও নিরপেক্ষ সম্ভাবনা নামক কোনো জিনিস নেই। সাম্ভবিক চিরকালই হল আপেক্ষিক। সম্ভবপর যদি স্বাধীন হতে চায় তা হলে সম্ভবপরই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে যদি উনবিংশ

অধ্যায়ে আপেক্ষিক বা অবস্থাসাপেক্ষ আকস্মিকতার সম্বন্ধে আমাদের আলোচনাগুলো স্মরণ করা যায়। কোনো জ্ঞানিক শৃঙ্খলার বা সামগ্রের বাইরে যে উপাত্ত তথ্য থাকে, তাকে আপতিক বা আকস্মিক তথ্য বলা হয়। একটা সমগ্র শৃঙ্খলার মধ্যে যে উপাদানকেই গ্রহণ করা যাক তাই সর্বময় শৃঙ্খলার তুলনায় একটা তথ্যমাত্র এবং তথ্যমাত্ররূপে তার আকস্মিকতা হচ্ছে আপেক্ষিক। সংক্ষেপত, যাকে আমরা আপতিক বা আকস্মিক বলি তা হচ্ছে আকস্মিকের বাড়া কিছু সেইজন্যই তা আকস্মিক। আপতিক তথ্যকে কোনো একটা সার্বিক ভাবের থেকে ব্যতিরিক্ত করে দেখতে হয়। কিন্তু তথ্যটার মধ্যে ভাবগত উপাদান আগের থেকে না থাকলে এই ব্যতিরেক-সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব। আপেক্ষিক সম্ভাবনার মধ্যেও অনুরূপ লক্ষণ পরিস্ফুট। যাকে আমরা সম্ভাব্য বা সাম্ভবিক বলি তা হচ্ছে সাম্ভবিকের বাড়া কিছু এবং অংশত বাস্তবিক সেইজন্যই তা সাম্ভবিক। যে-সত্তাকে সাম্ভবিক বলা হয় তার উৎপত্তির কারণের খানিকটা অংশ হচ্ছে বাস্তব। তবে সাম্ভবিকের এই বাস্তবভিত্তির কথা সব সময়ে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয় না, এবং বাস্তব অংশটাও সদা পরিবর্তনশীল এইজন্য সম্ভাবনার তারতম্য আছে। সম্ভাবনার প্রকাশের রীতি এবং তার বাস্তব-ভিত্তি, এই দুটোরই নানাত্ব সম্ভবপর। এইজন্য কোনো জিনিসের সম্ভাবনাও সম্বন্ধের এই বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে নানারকমের হতে পারে। সম্ভাবনা ও আকস্মিকতা কিংবা সাম্ভবিক ও আপতিকের পরস্পরসম্বন্ধ আমরা এইভাবে বর্ণনা করতে পারি : কোনো এক বিশেষ তথ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে তার মধ্যে পরিপূরক যে ভাবসমূহের উল্লেখ প্রচ্ছন্ন থাকে সেগুলোর সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকি। সেইজন্য সেইসময় কোনো এক শৃঙ্খলার সঙ্গে তুলনা করলে এই তথ্যটাকে আপেক্ষিক আকস্মিকতা বলে মনে হয়। অপর পক্ষে কোনো এক তথ্যের পরিপূরক ভাবরাশিকে যখন স্পষ্টত পৃথক্‌কৃত করা হয় এবং অস্পষ্টরূপে সেই ভাবসমূহের বাস্তব পরিণতি কল্পনা করা হয়, তখন এই কল্পিত পরিণতিকে সম্ভাবনা বলা যায়। যে-সব কারণের উদ্ভবের দ্বারা পরিণতি বাস্তব হতে পারে, সেগুলোর ন্যূনাধিক্যের উপর সম্ভাবনার ন্যূনাধিক্য নির্ভর করে। তবে সব সময়েই সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এই-সব কারণের কিছুটা বাস্তব-রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে।

নিকৃষ্ট ধরণের সম্ভাবনার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে, আমরা আমাদের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার সমীচীনতা বুঝতে পারব। আমি নিরর্থক নয় এরকম একটা ভাবের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এই ভাবটার মধ্যে যদি আত্ম-বিরোধ না দেখতে পাই এবং বাস্তবের সঙ্গে তার যদি কোনো সংঘর্ষ না দেখতে পাই তা হলে সেই অবস্থায় ভাবটাকে সম্ভবপর বলা যায়। এখানে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আমরা যেন পরতন্ত্র সম্ভাবনার স্থলে অতন্ত্র সম্ভাবনাকে পাচ্ছি। কিন্তু এই ধারণা ভুল। এখানেও সম্ভাবনা কতগুলো উপাধি থেকে একটা অনুমান-বিশেষ। এখানেও উপাধিনিচয়ের মধ্যে কতগুলো বাস্তব। কারণ, যদিও কি কি বিশেষ কারণ বা উপাধির সাহায্যে ভাবটা বাস্তব হতে পারে তা আমরা সম্পূর্ণভাবে জানি না, তবুও একথা বলা চলে না যে আমরা একেবারে কিছুই জানি না। আমরা ধরে নিয়েছি আমাদের উদাহৃত ভাবটার মধ্যে বাস্তবতার সাধারণ ধর্ম আছে এবং অন্তত এই বাস্তবধর্মী তথ্যটা হচ্ছে সম্ভাবনার প্রকৃত ভিত্তি। যদি এইটুকু আমরা স্বীকার না করি, তা হলে আমাদের ভাবের বিষয়টার সম্ভাব্যতাও অলীক হয়ে পড়ে।

কেউ যদি এমন সম্ভাবনা বা আকস্মিকতার কথা বলেন যা আপেক্ষিক নয়, একেবারে নিরুপাধিক ও অতন্ত্র, তার সম্বন্ধে এই বলতে হয় যে সেরকম সম্ভাবনা বা আকস্মিকতা নেই। সেরকম সম্ভাবনা বা আকস্মিকতা একটা ভ্রমাত্মক ধারণার দুই বিভিন্ন দিক। এই ধারণায় একই প্রধান স্ব-বিরোধ-দোষ দু ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করলে জিনিসটা পরিষ্কার হবে। শুদ্ধ বা কেবল বা নিরুপাধিক সম্ভাবনার বেলায় একটা বিশেষ ভাবের সঙ্গে বাস্তবের সম্পূর্ণ সংযোগহীনতার ভিত্তির উপর সদর্থক বা অস্ত্যর্থক বিধেয় প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়। শুদ্ধ বা কেবল বা নিরুপাধিক আকস্মিকতার বেলায় একটা ঘটনা বা তথ্যের সঙ্গে বাস্তবের সংযোগহীনতার উপর আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলি। আমার বক্তব্যটার ব্যাখ্যা আমি এখন করব।

ধরুন আমার মনে একটা ভাব আছে। আমি আমার মতে এই ভাবের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। সেইজন্য আমি বলছি যে এই ভাবের বিষয়টা সম্ভবপর। আমরা আগে দেখেছি যে যদি কোনো ভাবের একটা অর্থ থাকে এবং

তার মধ্যে স্ব-বিরোধ অবর্তমান থাকে তা হলেই ভাবটার একটা অন্ত্যর্থকরূপ থাকতে বাধ্য। এবং এই কারণে ভাবটাকে বাস্তব কল্পনা করবার একটা জ্ঞাত কারণ পাওয়া যায়। এইরকম সম্ভাবনাকে আপেক্ষিক সম্ভাবনাই বলতে হয়; কারণ, এই সম্ভাবনা হচ্ছে একটা বাস্তবধর্মী তথ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। শুদ্ধ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সাম্ভবিক ও বাস্তবের মধ্যে কোনো সম্বন্ধের জ্ঞান থাকে না, এই আমাদের ধারণা। এই ক্ষেত্রে, ভাবের সঙ্গে বাস্তবের একমাত্র কোনো সম্বন্ধ দেখতে না পারার দরুন আমি বলছি ভাবটার বাস্তব হওয়ার যোগ্যতা আছে। কিন্তু এই উক্তিটা অসংগতিপূর্ণ। কারণ, ভাবটার বাস্তব হওয়ার যোগ্যতা আছে বলতে গেলেই আমাদের জানতে হয় ভাবটা অংশত সত্য, তার মানেই জানতে হয় বাস্তবের সঙ্গে ভাবটার একপ্রকার আভ্যন্তরিক সংযোগ আছে। বাস্তবের সঙ্গে ভাবের সংযুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে বাস্তবের এক বা অধিক ধর্ম এই উপাদানটার আছে। যদি উপাদানটা বাস্তব হওয়ার উপযোগী, তবে কমবেশি পরিবর্তনের পর সেটা টিকে যাবে। কিন্তু শুদ্ধ সম্ভাবনার বেলায় যোগ্যতা শব্দের একটা বিকৃত অর্থ আমরা করি। সেখানে অযোগ্যতার অভাব দর্শনে, অর্থাৎ কোনো এক প্রকার অনুভবের অভাবে আমার ভাবটাকে বাস্তব হওয়ার যোগ্য বিচার করি। ফলত সেই স্থলে নিছক অজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে ভাবটা কমবেশি সংস্কারের পর টিকে যাবে— এইরূপ বলতে চাই। কিন্তু এইরকম প্রচেষ্টাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায় না।

যেটা শুদ্ধ বা নিরপেক্ষরূপে সাম্ভবিক তাকে আমরা বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে পৃথক করে দেখি এবং তাকে বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধ দ্বারা যেন অপ্রভাবিত এরকম কল্পনা করে থাকি। কোনো সম্বন্ধ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলে ধরে নিই যে পৃথক ও অনবগত ও অপর কোনো সম্বন্ধ ভাবটাকে প্রভাবিত করে তার ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠবে না। এবং যখন ভাবটাকে বিধেয়রূপে বাস্তবের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করি তখনও এই ধারণাটাকে পোষণ করি। কিন্তু ভাবকে বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ধারণা করতে গেলে সেটা বাস্তবের অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং নিজের ভিতর থেকে কোনো সম্বন্ধ না থাকলে বাইরে থেকে এই সমস্ত সম্বন্ধের কাজ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত শুদ্ধ বা চরম সম্ভাবনাও হল ন্যূনতম সম্বদ্ধতার একটা দৃষ্টান্ত, এই সিদ্ধান্ত,

আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই। এই জিনিসটা আরো বুঝিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় শুদ্ধ সাম্ভবিকের অন্তর্গত ভাবটা অন্তত তথ্যগতরূপে বাস্তব ; এবং সেইজন্য বাস্তবের সঙ্গে সংযুক্ত; কারণ ভাবটা একটা ঘটনারূপে আমার মনের মধ্যে বিদ্যমান। এই সম্বন্ধটাকে বাহ্য বলে গ্রহণ করলে, মনে করতে হয় যে সম্বন্ধটা হচ্ছে একটা অনিবার্য বাহ্য প্রভাবের ফল। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাহ্য তথ্যের সঙ্গে অনিবার্য সম্বন্ধের প্রকোপে কোনো উপাদানই ভিতরে অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। সেই উপাদানের ভিতরেও ভাঙন ধরে। এই আলোচনা অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে শুদ্ধ সম্ভাবনা বলে যদি কিছু থাকে আমরা যতদূর জানি তা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। এক দিক থেকে এরকম সম্ভাবনাকে এমন এক ভাব হতে হয় যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সদর্থক সম্বন্ধ নেই, অন্য দিকে এই-রকম ভাব হল সম্পূর্ণ স্ব-বিরোধী। আমাদের সিদ্ধান্ত তা হলে এই যে বাস্তবের সঙ্গে অন্ত্যর্থক সংযোগ বিনা এবং বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠাহীন অবস্থায় কোনো সম্ভাবনারই সম্ভাবনা নেই।

শুদ্ধ আকস্মিকতার মধ্যেও এইরকম স্ব-বিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। সেই তথ্যকে আমরা চরম বা শুদ্ধ আকস্মিক তথ্য বলি যার নিজ পরিবেশের সঙ্গে কোনোরকম আভ্যন্তরিক সংযোগ নেই। এইরকম তথ্যের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই ; যেন সমস্ত সম্বন্ধই তার বাইরে আমরা এরকম কল্পনা করি। কিন্তু সম্বন্ধ থেকেও তার কোনো প্রভাব অনুভূত হচ্ছে না, এরকম হতে পারে না; সেইজন্য চরম আকস্মিক তথ্যটা বাইরের অনিবার্য প্রভাবকে এড়াতে পারে না। এবং বাহ্য প্রভাবের দ্বারা তথ্যটার ভিতরে পরিবর্তন উৎপন্ন হয়। এই বিচার অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে চরম আকস্মিকতার যে-স্বরূপ আমরা স্বীকার করে নিয়েছি তা বাধিত হচ্ছে। কোনো আকস্মিক তথ্যকে আকস্মিক হতে হলে শুদ্ধ আকস্মিক হলে চলে না ; আপেক্ষিকরূপে যা আকস্মিক একমাত্র তাকেই প্রকৃত আকস্মিক বলা যায়। প্রকৃত আকস্মিক তথ্যটা প্রচ্ছন্নরূপে একটা বৃহত্তর তথ্যের অংশ ; তবে এই বৃহত্তর তথ্যটা ভাবগতরূপে বর্তমান এবং এই আভ্যন্তরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতেই হচ্ছে তথ্যটার অন্য তথ্যের সঙ্গে বাহ্য সম্বন্ধ। কিন্তু শুদ্ধ আকস্মিকতার ক্ষেত্রে এক দিকে কল্পনা করতে হয় যে সমস্ত সম্বন্ধ

যেন আকস্মিক তথ্যটার বাইরে, অপর দিকে তথ্যটার বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সুতরাং এই অবস্থায় স্ব-বিরোধ দোষ এসে পড়ে।

এই স্ব-বিরুদ্ধতা দোষটা অন্যভাবেও আমরা প্রকটিত করতে পারি। ধরুন, একটা উপাত্ত উপাদানের ক্ষেত্রে, সেটা যে কোনো এক শৃঙ্খলার সঙ্গে সংযুক্ত এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না। প্রত্যেক উপাদানের ধর্মই হচ্ছে এই যে সেই উপাদানটির সঙ্গে বহিস্থ অন্য বিবিধ তথ্যের এক অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ আছে। এবং এই আভ্যন্তরিক সম্বন্ধগুলো ভাবগত হওয়ার জন্য সেগুলো শাশ্বত ও অবশ্যম্ভিক। এখন উদাহৃত উপাদানটার এই আভ্যন্তরিক সম্বন্ধগুলো ধরতে না পারার জন্য যদি আমি সিদ্ধান্ত করি যে তার ভিতরে এরকম কোনো সম্বন্ধ নেই তা হলে উপাদানটা শুদ্ধ আকস্মিক তথ্যের পর্যায়ে পড়বে ; কিন্তু তথ্যটার মধ্যে কোনো আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ না থাকার দরুন সেটা একেবারে সম্বন্ধহীন হয়ে পড়ে এবং যে তথ্যের কোনো সম্বন্ধ নেই, সেই তথ্যকে বিশিষ্ট ও পৃথক তথ্যও অভিহিত করা যায় না। সুতরাং এই চরম আকস্মিক তথ্য অলীক বলে প্রমাণিত হয়।

একই জটিল অবস্থার এক দিক হচ্ছে সম্ভাব্যতা, অন্য দিক হচ্ছে আকস্মিকতা। প্রকৃত বা আপেক্ষিক আকস্মিক বলতে আমরা এমন এক তথ্যকে বুঝি যার অস্তিত্ব আছে কিন্তু যাকে অংশত আমরা বুঝতে পারছি না ও অন্যান্য তথ্যের সাথে সংযুক্ত করতে পারছি না। সুতরাং প্রকৃত আকস্মিক তথ্য এমন একটা তথ্য যা আছে কিন্তু সেটা কিভাবে আছে আমরা সম্পূর্ণ জানি না। প্রকৃত বা আপেক্ষিক বাস্তব বলতে আমরা এমন এক তথ্যকে বুঝি যাকে আমরা অসম্পূর্ণভাবে জেনেছি কিন্তু তবুও সেটা কোনো এক-রকমে বাস্তব বলে বিশ্বাস করি। সম্ভবপর ও আকস্মিক এ দুটোই হচ্ছে বাস্তবের দুই অসম্পূর্ণ প্রকাশ মাত্র। আমরা ইচ্ছা করলে আকস্মিকতা ও সম্ভাব্যতার পার্থক্যটা আর এক ভাবে দেখাতে পারি। বিশুদ্ধ আকস্মিকতার বেলায় আমরা কল্পনা করি যেন আকস্মিক তথ্যটার নিজ কোনো সম্বন্ধ বা ধর্ম নেই, এটা যেন কতগুলো বাহ্য সম্বন্ধের দ্বারা সংযুক্ত। শুদ্ধ সম্ভাবনার বেলায় আমরা কল্পনা করি যেন সাম্ভবিক তথ্যটার বাস্তবের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, এটার যেন শুধু কতগুলো নিজ ধর্ম বা সম্বন্ধ আছে। শুদ্ধ

আকস্মিকতার ক্ষেত্রে আমরা আভ্যন্তরিক ও ভাবগত সংযোগের কথা ভুলে যাই এবং শুদ্ধ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে বাহ্য ও তথ্যগত সম্বন্ধের কথা মনে থাকে না। আকস্মিকতা যেন অস্তিত্বের দেশের জিনিস এবং সম্ভাবনা যেন ভাবজগতের জিনিস। কিন্তু দুটোরই দোষ একবিধ; এবং নিরপেক্ষরূপে গ্রহণ করলে দুটোই বাহ্য নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। যেটা সাম্ভবিক সেটা যদি তথ্য হয়ে উঠতে পারত সেটাকে আকস্মিকতা কিংবা নিয়তি বলে মনে হত। আবার যেটা আকস্মিক সেটার সম্পর্কে কোনো প্রত্যয়মূলক ধারণা যদি করতে পারি তা হলে সেটা একটা শুদ্ধ সম্ভাবনা হয়ে দাঁড়ায়; কারণ আপতিক কখনো সম্পূর্ণ বাস্তব হতে পারে না।

উপরের সিদ্ধান্তগুলো বিবেচনা করবার পর প্রশ্ন ওঠে যে সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার মাত্রা আছে কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব যে এ দুটোর তারতম্য আছে। কম আর বেশি সাম্ভবিক এবং কম আর বেশি সত্য হওয়া এবং বেশি আর কম আকস্মিক হওয়া মূলত একই জিনিস। এইখানে আমাদের বর্ণিত দ্বিবিধ মান প্রযুক্ত হচ্ছে কি না তার পরীক্ষা করা চলতে পারে। যে উপাদানটা অধিকতর সংগতিপূর্ণ ও অধিকতর ব্যাপক তাকেই আমরা অধিকতর সম্ভবপর বলি। যে বিষয়বস্তু-সমষ্টির সম্পূর্ণ উদ্ভবে উপাদানটা বাস্তবে পরিণত হবে তার অধিকতর নিকটে হল এই অধিকতর সম্ভবপর উপাদানটা। অপর পক্ষে যে উপাদানটা অধিকতর সম্ভবপর বা সাম্ভবিক, তার বাস্তবের সঙ্গে আংশিক সংযোগ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বেশি। এই কারণে অধিকতর সম্ভবপর উপাদানের ক্ষেত্রে যে-সব বাহ্য অবস্থার উদ্ভব উপাদানটার বাস্তবরূপ ধারণ করবার জন্য দরকার, সেগুলোর পরিমাণও হচ্ছে ন্যূনতর। ফলত উপাদানটা এইরকম ক্ষেত্রে পূর্ণতর, সত্যতর ও বাস্তবতর এই বলতে হয় এবং বাস্তবের সঙ্গে উপাদানটার সংযোগ অধিকতর হওয়ার জন্য তার আভ্যন্তরিক সংগতিও অধিকতর। এইভাবে আকস্মিকতার আধিক্যে, মিথ্যাত্বও বাড়ে। যে উপাদানটার ওপর বাহ্যশক্তির প্রভাব যত বেশি, যে উপাদানটার শৃঙ্খলা বা নিয়ম বা ভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ যত কম, সেটা তত কম বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং তার মধ্যে সংগতি তত কম এবং সেটা তত কম সত্য। আমি মনে করি আমাদের বর্ণিত মানদ্বয়ের সত্যতা হয়তো প্রমাণিত হয়েছে।

এই সম্পর্কে সত্তার প্রত্যয়মূলক প্রমাণের বিষয় কিছু বলে আমার বিচার শেষ করব। চতুর্দশ অধ্যায়ে এই প্রমাণটার সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। বর্তমান অধ্যায়ে এই প্রমাণের মূল্য বিচার করব। যুক্তি-রূপে দেখলে এই প্রমাণটা কোনো এক ভাব বা প্রত্যয় থেকে সেই ভাবের অন্তর্নিহিত অর্থ বা বিষয়ের অস্তিত্বের অনুমান মাত্র। যে কেউ এক নজরেই দেখতে পারে যে এই প্রমাণ কত তুচ্ছ। বাস্তব বলতে যদি দেশ ও কালের অন্তর্গত তথ্যকে বোঝা যায় তা হলে ভাবটা যে আমার মাথার ভিতরকার একটা জিনিস হতে পারে এ কথা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু যদি ভ্রমের সাধারণ রূপ কি, এই বিষয়ে আলোচনা করতে বসি তা হলে যে-ব্যাপারটা এত স্পষ্ট মনে হচ্ছে সেই-ব্যাপারটাই অস্পষ্ট ও জটিল হয়ে উঠবে। যেটা আমার মাথার মধ্যে আছে সেটা অন্তত বিশ্বের কোথাও না কোথাও আছে। এবং ভাবটাকে যখন বিশ্বের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করছি তখন বাস্তবের বাইরে এর স্থান কোথায়, এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হলে বাস্তব ও সসীম সত্তার মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করতে হয় এবং এই ভিত্তিতে সত্তার প্রত্যয়মূলক প্রমাণটাকে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধহীন কেবল একটা ভাব কিংবা আমার মস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত একটা ভাবমাত্রের কল্পনা একপ্রকার ভ্রান্ত বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা লক্ষ্য করেছি কোনো এক ভাব পোষণ করবার সময় সেই ভাবটার মধ্যে বাস্তবের প্রতি কোনো এক প্রকার উল্লেখ থাকতে বাধ্য। সেইজন্য এমন কোনো ভাব থাকতে পারে না যার মধ্যে বাস্তবের প্রতি কোনো উল্লেখ নেই। সেইরকম ভাব হচ্ছে স্ব-বিরোধী। এই দিক থেকে প্রত্যয়মূলক প্রমাণটার বিচার করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দুটো জিনিসের ওপর এই প্রমাণটা দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম জিনিসটা হচ্ছে বস্তুসত্তা বা বাস্তবের উদ্দেশ্যে একটা চিন্তন বা প্রত্যয় এবং দ্বিতীয় জিনিসটা হচ্ছে চিন্তনের বিষয়রূপী এবং চিন্তনক্রিয়াদ্বারা বিশিষ্ট বস্তুসত্তার উপস্থিতি। সত্তার প্রত্যয়মূলক যুক্তিটার ভিতরের কথা এই : প্রথম জিনিসটার ওপর দাঁড়ালে দ্বিতীয় জিনিসটার দিকে আমাদের বাধ্য হয়ে এগিয়ে যেতে হয় ; কেবল প্রত্যয় বা চিন্তনের মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে ; সেইজন্য ভাবপোষণ করলেই ভাবের মধ্যে যে বস্তুসত্তার উল্লেখ প্রচ্ছন্ন আছে সেই দিকেও দৃষ্টি

যায় ; কারণ, এই বস্তুসত্তাই কালের মধ্যে উদ্ভাসিত। বিশ্বরচনাবিন্যাসমূলক প্রমাণে আমরা দ্বিতীয় জিনিসটা থেকে প্রথমটার দিকে যেতে বাধ্য হই। এই প্রমাণ দ্বারা আমরা বস্তুসত্তার স্বরূপ নির্ণয় করতে চাই। বিশ্বরচনাবিন্যাস-মূলক যুক্তির মর্মকথা এই : বস্তুসত্তাকে চিন্তা বা প্রত্যয় দিয়ে বর্ণনা বা বিধেয়প্রযুক্ত করা যায়; সুতরাং চিন্তনের ধর্ম ও বস্তুসত্তা বা বাস্তবের ধর্ম হচ্ছে এক। এই দুটো প্রমাণেরই মূলকথা এক। সমগ্রের যে কোনো এক দিক থেকে তার অন্য দিকে আমরা যেতে পারি। এবং এই মূলনীতিটা হল সম্পূর্ণ অভ্রান্ত।

সত্তার প্রত্যয়মূলক প্রমাণের দোষ অন্যত্র। এই প্রমাণে শুধু যে ভাব বা প্রত্যয়টা কোনোরূপে বাস্তব এইটুকু বলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই না। আমরা বলতে চাই যে ভাবটাকে আমরা যেরূপে পাচ্ছি সেইরূপে এটা বাস্তব। এইখানেই সত্তার প্রত্যয়মূলক যুক্তির ভ্রান্তি। একটা সাধারণ নিয়ম হিসেবে আমরা বলতেই পারি না যে প্রত্যেক ভাবই নিজরূপে বাস্তব। বরঞ্চ আমরা জানতে পেরেছি যে সত্য ও বাস্তবতার তারতম্য আছে। কোনো বিধেয় নিজরূপে বাস্তবিকত সত্য হতে পারে না। সত্য হতে হলে প্রত্যেক ভাবেরই পরিবর্তন, পুনর্বিন্যাস ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন। কোনো বিধেয়কে বাস্তবরূপে গ্রহণ করবার কালে তার নিজরূপ কতখানি অপরিবর্তিত রাখতে পারা যায়, তার দ্বারাই সেই বিধেয়ের সত্যতার মাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়। পূর্ণতার ভাবের ক্ষেত্রে প্রত্যয়মূলক যুক্তিটা কেন টেকে না, তা অংশত চতুর্দশ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। বর্তমান আলোচনা দ্বারা আমরা এই বিষয়ে পূর্ণতর জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হব। আমার মস্তিষ্কের ভিতরকার প্রত্যেক ভাবই পরমসত্তাকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু আমার "ভাবটা" আমার নিজ ব্যক্তিগত চিন্তন দ্বারা কলুষিত। ভাবটার যথার্থতা হয়তো নিজরূপে নয়; অন্যরূপে পুনর্বিন্যস্ত করলে ভাবটা হয়তো সত্য হয়ে ওঠে। এইটা হওয়াই স্বাভাবিক। পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে ভাবটার নিজরূপ রক্ষা নাও করা যেতে পারে ; এই তত্ত্বটার গৌরব প্রমাণ করাই প্রত্যয়মূলক যুক্তির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রত্যেক ভাবই নিজরূপে বাস্তব কিংবা অস্তিত্ববান হতে পারে না। একটা ভাব বা প্রত্যয় যত অধিক পূর্ণতা লাভ করবে, তত অধিক হবে

তার সান্তবিকতা এবং তার আভ্যন্তরিক বাধ্যতা এবং তত অধিক হবে সেই ভাবের বাস্তবিকতা। এবং যত অধিক বাস্তবতা থাকবে একটা ভাবের, তত অধিক সেটা প্রকাশিত হবে।

সত্তার এই প্রত্যয়মূলক প্রমাণ কোনো সসীম পদার্থের বেলায় প্রয়োগ করা যায় না, একথা সত্য। একমাত্র পরমার্থের সম্পর্কে এই যুক্তিটার ব্যবহার চলে এবং সেইজন্য হয়তো বলা যেতে পারে যে, পরমার্থের উদ্দেশ্যে এই যুক্তিটা প্রয়োগ করলে এই যুক্তিটা ন্যায্য হয়। আমরা স্বীকার করি এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট বস্তু আছে। পরমার্থের ভাবটা শুদ্ধ ভাবরূপে হচ্ছে স্ব-বিরোধী; সেইজন্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য অস্তিত্বের দরকার। কিন্তু এখানে বলে রাখা ভালো যে কোনো ভাব কখনো নিজরূপে বাস্তব হতে পারে না। বস্তু ও সত্যের প্রভেদ যায় না। শ্রেষ্ঠ সত্যও হচ্ছে খানিকটা নির্বস্তুক, কিন্তু বস্তু হচ্ছে বস্তুই। এই একই জিনিস আমরা অন্যরূপেও প্রকাশ করতে পারি। আমরা বলতে পারি যে, যে-যুক্তির বলে ভাব ও অস্তিত্বের অপ্রভেদমূলক সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছই সেই-যুক্তির মধ্যেই ভাব ও অস্তিত্বের প্রভেদ স্বীকৃত হচ্ছে, সুতরাং সেই যুক্তিটাই ভ্রমাত্মক। এই আপত্তিটা ন্যায়সংগত এবং এই আপত্তি প্রত্যেক যুক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু অন্তর্নিহিত পদ্ধতিটার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে আপত্তিটা আর টেকে না। এইরকম যুক্তির দ্বারা সমগ্র বা পূর্ণসত্তা বিভিন্ন অংশের বিচ্ছেদের ওপর তার ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। সত্তার দিক থেকেই হোক কিংবা ভাবের দিক থেকেই হোক যে দিক থেকেই যুক্তিটা আরম্ভ করা যাক ফল একই দাঁড়ায়। উদ্দেশ্য ও বিধেয় ও সে দুটোর অন্তর্নিহিত তাদাত্ম্যের প্রভাবে এইরকম চরম পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। তবে পূর্ণতার বা চরম পরিণতির মধ্যে প্রভেদ আর থাকে না। সুতরাং উদ্দেশ্য বা বিধেয় কোনোটাই নিজরূপে পরমতত্ত্বে নেই। সে-দুটো রূপান্তরিত হয়ে পরমতত্ত্বে থাকে।

উপসংহারে আরো একটা বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া ভালো হবে। বাস্তব বলতে যদি আমরা প্রত্যক্ষ অস্তিত্বকে বুঝি তা হলে বাস্তবতা খুব নিম্নশ্রেণীর সত্তা হয়ে পড়ে। কারণ, এইরকম সত্তার পক্ষে বাস্তবতা ও সত্যের মানের খুব ওপরে উঠবার দরকার হয় না। সত্তার প্রত্যয়মূলক যুক্তির একটা বিকৃত

ব্যবহার দিয়ে আমি আমার বক্তব্য পরিষ্কার করব। প্রত্যেক ভাবেরই একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিক আছে। ভাব হচ্ছে একটা অর্থ বা বিষয়; এ ছাড়া ভাব একটি মানসিক ঘটনাও বটে। ভাবগুলোর অস্তিত্বকে মানসিক ঘটনার অস্তিত্বরূপে বর্ণনা করা তত্ত্ববিদ্যার কাজ সাধারণত নয়। তবে এই প্রভেদটার একটা মূল্য আছে। ভাবের অর্থ এবং অস্তিত্বের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণের অসামঞ্জস্য বা বিরোধ থাকতে পারে। সেইজন্য সব সময় অর্থরূপী বা বিষয়-রূপী ভাবকে ঘটনারূপী ভাবের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলে না। যেমন অতীত-বিষয়ক (অর্থরূপী ভাব) ঘটনারূপে মনের একটা বর্তমান বৃত্তি বা অবস্থা হতে পারে, সৎকর্ম-বিষয়ক ভাব যে মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করে আছে, সেটা অসৎ হতে পারে। যে অশ্বের বিষয় চিন্তা করছি সেটি অশ্ব-সম্বন্ধীয় স্মৃতিচ্ছবির সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। অপর পক্ষে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্রোধবিষয়ক চিন্তা কিছু না কিছু ক্রোধের অনুভবের উদ্রেক করেই। তেমনি অধিকাংশ স্থলে সুখ-বিষয়ক ও দুঃখ-বিষয়ক ভাবগুলোও ঘটনারূপে তথ্যত হচ্ছে সুখ ও দুঃখ। যেখানেই একটা ভাব কোনো এক বিশেষ সংবেদনের একদিক মাত্র সেখানেই ভাবের বিষয়টা ঘটনারূপে আছে এই যেন বলা যায়। এইসব ক্ষেত্রে প্রত্যয়মূলক যুক্তির আকারে এক যুক্তির অবতারণা করে বলা যেতে পারে যে, ভাবটার উপস্থিতির জন্য তথ্যটার অস্তিত্বের প্রয়োজন, সেইজন্য ভাবের উপস্থিতি দ্বারা তথ্যের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "ইদং (এই)" ও "মম (আমার)" ভাবের কথা ধরা যেতে পারে। একমাত্র বাস্তবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অনুভব থেকে এই সাক্ষাৎ অনুভব-সম্পর্কিত ভাবটার উদয় হয়। সেইজন্য এতৎসম্পর্কিত ভাবটার উপস্থিতি মানেই তদনুযায়ী সাক্ষাৎ অনুভবরূপী তথ্যটারও উপস্থিতি, এইরকম আমরা বলতে পারি।

কিন্তু এই দৃষ্টান্তটার স্বরূপ আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, উপর্যুক্ত যুক্তিটা হল একটা ছদ্ম যুক্তিমাত্র। এই যুক্তির দুটো দোষ আছে। ১. প্রথম দোষ এই : প্রদত্ত ভাবটার বিষয়ের মধ্যে অস্তিত্ববান হওয়ার কোনো বাধ্যতা নেই। এই ক্ষেত্রে ভাব ও অস্তিত্বের মধ্যে কোনো আভ্যন্তরিক ও অনিবার্য সম্বন্ধ নেই। সে দুটো হল একত্রসংযুক্ত এইমাত্র। সেইজন্য এই ক্ষেত্রে যুক্তিটা প্রামাণিক হতে হলে ভাব ও অস্তিত্বের বাইরে

এক তৃতীয় সহ-অবস্থানকারী উপাদানের মধ্যস্থতা প্রয়োজন। এমত অবস্থায় প্রত্যয়মূলক প্রমাণের আসল যুক্তিটার ভিত্তি আর থাকে না। ২. দ্বিতীয় দোষ এই : যে-ভাবটাকে বাস্তবের উদ্দেশ্যে বিধেয়রূপে প্রয়োগ করা হচ্ছে তার মধ্যে সত্যের ও বাস্তবতার পরিমাণ অতি অল্প, সে-ভাবটা অতি নিম্নশ্রেণীর ভাব। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাচ্ছি না যে ভাবটা হল তার নিজ অস্তিত্বের তুলনায় একটা বিশ্লেষণমাত্র এবং সেই কারণে সেটা মিথ্যা ; আমি আরো বলতে চাই যে এই ক্ষেত্রে ভাব দ্বারা হয়তো অস্তিত্বের প্রমাণ করা যায়, কিন্তু বাস্তবতার কিংবা সত্যতার প্রমাণ করা যায় না। বরঞ্চ যে-অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় তার মধ্যে বাস্তবতা কিংবা সত্যতা নেই। আমরা উদ্দেশ্য কিংবা বিধেয়কে যেরূপে কল্পনা করি সেইরূপে সেগুলো সত্য নয়। এই ক্ষেত্রে আমরা কল্পনা করি যে উদ্দেশ্যটা একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা এবং বিধেয়টা যেন সেই তথ্যের একটা দিক মাত্র। কিন্তু এই দুটো কল্পনাই ভ্রান্ত। কারণ, সত্য ধর্মী বা বিশেষ্য হচ্ছে পরমার্থ বা পরমসত্তা, এবং আপাতদৃশ্য উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অন্তর্নিহিত সমস্ত ধর্মই হচ্ছে এই পরমসত্তার বিশেষণ। একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যঘটনাকে উদ্দেশ্য করে আছে এই ভাবটা ; এই ভাবটা আবার পরমতত্ত্বের উদ্দেশ্যে হচ্ছে একটা বিধেয়। কিন্তু এরকম বিধেয় একটা তুচ্ছ বিশ্লেষণমাত্র ; তার বাইরে অবস্থিত অস্তিত্বের দ্বারা তার স্বরূপ হচ্ছে গঠিত এবং সেইজন্য এই ভাবের মধ্যে আছে প্রচুর স্ব-বিরোধ ; এবং সত্য বিশেষ্যের সঙ্গেও তার সামঞ্জস্য নেই। ছদ্মপ্রত্যয়মূলক যুক্তিটা আলোচনা করে আমরা আবার আমাদের পুরাতন সিদ্ধান্তে ফিরে আসি যে অস্তিত্ব ও বাস্তবতা এক জিনিস নয়।

অস্তিত্বকে বাস্তবতা বা বস্তুসত্তা বলা চলে না। তবে বাস্তব বা বস্তুসত্তার অস্তিত্ব থাকবেই। সমগ্রকে বুঝতে গেলে এই দুটো সত্যকে মনে রাখতে হয়। অস্তিত্বকে বাস্তবের একপ্রকার প্রকাশ বা অবভাস বলতে হয়। এক বা একাধিক ঘটনারূপে প্রকাশিত হওয়াকে এক নিম্নপর্যায়ের বাস্তবতা বলা যেতে পারে। আবার কালের ধারার মধ্যে একেবারেই কোনো অর্থে প্রকাশিত না হওয়ার অপর নাম মিথ্যা বা অবাস্তব। অধিকতর সত্য ও অধিকতর বাস্তব হওয়ার অর্থই হচ্ছে বাহ্যত কোনো না কোনোরূপে

অধিকতর প্রকাশমান হওয়া। কারণ, যেটা যত অধিকতর সত্য, সেটা তত ব্যাপকতর। যে সত্যকে কার্যকরী নয় বলে প্রমাণ করা যায়, সেই সত্যকে একরকম মিথ্যা বলেই ধরে নেওয়া যায়। এইটুকু বলেই আমরা সত্তার প্রত্যয়মূলক প্রমাণের আলোচনা বন্ধ করতে চাই। এই প্রমাণটার আলোচনা করে বর্তমান অধ্যায়ের মূলসূত্রের সমর্থন পাওয়া গেছে। 'উচ্চতর' ও 'নিম্নতর' এ দুটো শব্দের যথার্থ তাৎপর্য ও স্থান নির্ধারণ করবার জন্য সত্য ও বাস্তবতার পরিমাণগত ভেদ আছে স্বীকার করতেই হয়। এবং একমাত্র এইরকম একটা মাত্রাগত পরিমাপ দিয়েই ভাব ও অস্তিত্বের দুই দিকের প্রতি সমান সুবিচার করা যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শুভ বা কল্যাণ বা হিত বা শ্রেয়ঃ

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আমি সংক্ষেপে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে অশুভ বা অনিষ্টের অস্তিত্বের জন্যে আমাদের বর্ণিত পরমসত্তা অসিদ্ধ হয় না। শুভ এবং অশুভকে অলীক বলা যায় না; কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সেগুলোর সত্তা আপাতসত্য ও আবভাসিকমাত্র। শুভ ও অশুভ উভয়েই হচ্ছে সমগ্রতত্ত্বের এক অংশ মাত্র; দুটোরই পারমার্থিক রূপ সে-দুটোর আপাতদৃশ্য ও নিজরূপ থেকে অন্যরকম। চতুর্বিংশ অধ্যায়ের আলোচনার পর শুভ ও অশুভের ধারণার মূল্য কি এবং আমাদের জীবনে শুভ ও অশুভের স্থান কি এই বিষয়গুলো আরো ভালোভাবে বুঝতে পারা উচিত। সত্য ও মিথ্যার যেমন তারতম্য আছে কল্যাণ ও অকল্যাণেরও তেমনি তারতম্য আছে। কারণ সর্বত্রই পূর্ণের কিছু না কিছু অংশ কোনো না কোনো রূপে প্রকাশিত হচ্ছেই হচ্ছে এবং আমরা সেইজন্যই বলতে বাধ্য যে প্রকাশের মাত্রাভেদ আছে। পূর্ণসত্তার ধারণার সাহায্যে আমরা উচ্চতর ও নিম্নতর প্রকাশের মধ্যে মাত্রাভেদ করি। যে হিত বা কল্যাণকে পরমহিত বা পরম কল্যাণে পরিণত করতে যত অধিক রূপান্তর দরকার সেই হিত বা কল্যাণ হল তত নীচ। যেমন উচ্চতর সত্যের দৃষ্টিতে

নিম্নতর সত্যকে মিথ্যাও বলা চলে, তেমনি উচ্চতর হিতের সঙ্গে তুলনা করে নিম্নতর হিতকে অহিতও বলা যায়। ১. পরম ও পূর্ণসত্তা হচ্ছে সর্বাংশে সত্য ও শিব ; ২. কিন্তু বাস্তব, সত্য ও কল্যাণের উচ্চ ও নীচ শ্রেণীভেদ হচ্ছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সর্বক্ষেত্রেই পূর্ণতার প্রতি একটা গূঢ় এষণা বা আকর্ষণ দেখা যায় এবং এই আকর্ষণ ক্রিয়াশীল বলেই কল্যাণের মাত্রাগত প্রভেদ স্বীকার করতে হয়।

যাবতীয় আপাতস্বীকৃত অবভাসমালার মূল্য এবং সত্যতা পূর্ববর্ণিত দুই নিয়ম দ্বারা নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি একটা মোটামুটি ধারণা দেবার চেষ্টা করব মাত্র। সেইজন্য এখানে কল্যাণসম্পর্কিত সর্ববিধ প্রশ্নের আলোচনা করবার আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই। ধর্ম ও নৈতিকতার একটা চরম সত্যতা আছে। সাধারণত এরকম একটা ধারণা খুব প্রচলিত। এই ধারণাটা আসলে হল একটা কুসংস্কার মাত্র ; সেইটুকু দেখবার জন্যই বর্তমান অধ্যায়ে আমি কল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি ; আমি মুখ্যত সেইসব মতের আলোচনা করব যেগুলো আমার সিদ্ধান্তের বিরোধী।

যার দ্বারা ইচ্ছার পূর্তি হয় আমরা তাকেই সাধারণত ইষ্ট বলে থাকি। যে-বিষয়কে আমরা প্রশংসা বা অনুমোদন করি, যেটা পেলে আমরা শান্ত ও সন্তুষ্ট হই সেই-বিষয়কে হিত বা শুভ বা কল্যাণ বা শ্রেয়ঃ বলি। এই একই বিষয়কে আমরা পুরুষার্থ বা মূল্য বলি। সত্যের মধ্যে যে-সব উপাদান আছে শুভ বা ইষ্টের মধ্যেও সেইসব উপাদান আছে। ভাবও অস্তিত্বের মিল হচ্ছে সত্য। তেমনি ভাব বা প্রত্যয় ও অস্তিত্বের তাদাত্ম্য হচ্ছে শ্রেয়ঃ বা কল্যাণ। সত্য অনুসন্ধানের সময় অস্তিত্বকে পূর্ণের প্রকাশরূপে গ্রহণ করে বাস্তবিকত সেই অস্তিত্বের স্বরূপ কি তা আমরা ধারণা করবার চেষ্টা করি। অপর পক্ষে কল্যাণ বা শ্রেয়ঃ অনুসন্ধানের সময়, পূর্ণতা বা চরমোৎকর্ষের ভাবকে স্বীকার করে সেই ভাবকে আমরা রূপ দিতে চেষ্টা করি কিংবা কোনো বিশেষ অস্তিত্বের মধ্যে সেই ভাবকেই আমরা খুঁজে বার করি। তবে কল্যাণের ক্ষেত্রে পূর্ণতার ভাব হচ্ছে আমাদের কাছে কাম্য। সুতরাং কল্যাণ-লাভ বা শ্রেয়ো-লাভের ব্যাপারে আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত ও ভাবগত বিষয়কে বাস্তবরূপ দিই এবং তথ্যবিশেষকে একটা আকাঙ্ক্ষিত

ভাবের সঙ্গে তুলনা বা মাপ করি। এইরূপে সত্য ও শিব দুইএরই ভিত্তি হচ্ছে ভাব ও অস্তিত্বের প্রভেদের উপর এবং দুটোকেই কালের ধারার মধ্যে পেতে হয়। সুতরাং দুটোই হল পরমবস্তুর মাত্র আংশিকরূপ এবং দুটোকেই আপাতসত্য ও ব্যবহারিক জগতের জিনিস বলতে হয়।

আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে যে শ্রেয়ঃ বা হিতের জন্য সব সময় ভাব ও প্রত্যয়ের প্রয়োজন নেই। যেমন সুখকর বিষয়মাত্রকেই আমরা হিতকর বা ইষ্ট বলি। আমি বলব এই আপত্তি ভ্রান্ত। একমাত্র বাসনার বা ইচ্ছার তৃপ্তির ক্ষেত্রেই হিত বা ইষ্ট শব্দের প্রয়োগ হচ্ছে যথার্থ। যদি কোনো লাভকে কাম্য ভাবের ফলরূপে মনে না হয় তা হলে সেটাকে কল্যাণ বা শ্রেয়ের নিম্নবর্তী অন্য কিছু বিবেচনা করা উচিত। সেরকম লাভের অভিজ্ঞতা বা অনুভব হয়তো আমাদের আছে। কিন্তু সে অনুভবকে সত্য বা শ্রেয়ঃ নামে অভিহিত করা চলে না। তবে আমাদের মনের গড়ন যেরকম, তাতে মনে হয় এমন খুব কম ক্ষেত্রই আছে যেখানে বিনা ইচ্ছা বা বাসনায় আমরা তৃপ্তির অনুভব পাই। তবে এমন কোনো তৃপ্তির অনুভূতি যদি আমাদের থাকে যার সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা বা প্রত্যয় হয় না এবং যার সম্বন্ধে অস্পষ্টভাবেও একথা মনে হয় না যে অনুভূতিটা ইষ্ট বা কাম্য সেইরকম অনুভূতিকে কল্যাণ বা শ্রেয়ঃ নাম দেওয়া অসংগত হবে। আবার এক মুহূর্তের জন্যও যদি কাম্যবোধ জাগে তা হলেও অনুভূতিটা হিত বা শ্রেয়ঃ বলে মনে হবে। কারণ, সেই অবস্থায় বলা চলবে যে আমার কি পাওয়া দরকার সেই সম্বন্ধে আমার একটা ভাব বা প্রত্যয় আছে ও সেই প্রত্যয়-অনুযায়ী একটা তথ্যও আমার সম্মুখে আছে। যে-ক্ষেত্রে ভাব নেই সেই-ক্ষেত্রে সত্য ও শিবের প্রকৃত অস্তিত্বও নেই; সেই-ক্ষেত্রে আমরা বড়ো জোর বলতে পারি যে সত্য ও শিব অব্যক্তরূপে আছে।

হিত বা শ্রেয়ের অস্তিত্বের জন্য ভাবের অস্তিত্বের দরকার। এ সিদ্ধান্ত অনেকটা স্পষ্ট। তবে কামনার অস্তিত্বের দরকার কিনা সেই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। আপত্তিকারক বলবেন যে অনেক সময় আকাঙ্ক্ষা বা কামনা না করেও যদি কোনো একটা সুখদায়ক ভাবের পরিপূর্তি হয় সেই পরিপূর্তিকেও আমরা ইষ্ট বলে স্বীকার করি। কারণ অনেক সময় ভাব-অনুযায়ী তথ্য এমনি এসে পড়ে, সেইজন্য কামনার উত্তেজনার কোনো

প্রয়োজন হয় না। এই উক্তির বিরোধিতা করা সম্ভবপর ; কিন্তু উক্তিটার সত্যতা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। এবং এও মেনে নিচ্ছি যে হিতের বোধের জন্য সব সময় কামনার অস্তিত্বের দরকার নেই। কিন্তু ক্রমশ কামনার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। কামনা ব্যতীত কোনো লাভ বা প্রাপ্তিকে আমরা হিত বা মঙ্গল বলে স্বীকার করে নিই এরকম অবস্থা খুব বিরল ও অস্থায়ী। যেই কোনো প্রকার বিরোধ কিংবা অনিশ্চিতির উদ্ভব হয়, অমনি কামনার উদ্ভবের উপযোগী উত্তেজনা জন্মায়। এইজন্য আমি বলব যে যদিও কখনো কখনো প্রারম্ভে কামনা বিনাই হিত বা শ্রেয়ের বোধ সম্ভবপর কিছু সময়ের মধ্যেই কামনা জন্মায় ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মঙ্গলবোধের জন্য কামনা বা আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তবে এই বিষয়টার খুব গুরুত্ব নেই। কোনো-কিছুকে হিতরূপে গ্রহণ করবার জন্য ভাবের অস্তিত্ব প্রয়োজন, এই তত্ত্বটা সার-স্থানীয়।

উপর্যুক্ত কারণে সুখকর বা সুখদায়ককে মঙ্গল বা হিত বলে আমাদের স্বীকার করা অসম্ভব। হিত কিংবা ইষ্ট সুখকর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ; যা অধিকতর মঙ্গল তা সেই অনুপাতে অধিকতর সুখকর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই। এবং সুখকরকে সাধারণত হিত বলেও অভিহিত করা চলতে পারে। তবে সুখকর কেবলমাত্র সুখকর বলেই মঙ্গল, এই সিদ্ধান্ত ভুল। সুখকরকে মানুষ স্বভাবত কামনা করে ; সেইজন্য সেটা হিত বা ইষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু সমস্ত সুখানুভূতিই বাসনার তৃপ্তিজাত নয় এবং কামনাহীন সুখানুভূতিও হয়তো আছে এবং অননুমোদিত বা অন্যায্য সুখানুভূতিও সম্ভবপর। এই তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় অনেক সুখকর অনুভূতির সঙ্গে ন্যায্যতার ভাব বা প্রত্যয় থাকে না ; সেইসব অনুভূতিকে হিত বা কল্যাণ বলে অভিহিত করা যায় না।

শুদ্ধ সুখ নিজরূপে কখনো হিত বা মঙ্গল বলে পরিগণিত হতে পারে না। এইরকম মত যাঁদের তাঁরা সুখকে অন্যান্য সব কিছু থেকে পৃথক করে তার পরে বলতে চান বিশ্বে সুখ ব্যতীত অন্য কোনো অভীষ্ট নেই। কিন্তু তারা যদি বলতেন যে যে-জিনিস যত অধিক উত্তম সেই-জিনিস তত অধিক সুখকর তা হলে সেই মত স্বীকার করতে কোনো বাধা হত না। কারণ সংঘর্ষহীনতা, সমন্বয় ও পূর্ণতার তারতম্যের ওপর সুখের তারতম্য নির্ভরশীল।

এবং সুখ যে পূর্ণতার এক অপরিহার্য অঙ্গ এই সিদ্ধান্তে আমরা বিংশ অধ্যায়ে আগেই এসেছি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি না যে, বিশ্বে একমাত্র সুখ ব্যতীত আর কিছুই কাম্য বা ইষ্ট নেই ; কিংবা বিশ্বে অন্যান্য সবকিছু সুখনামক একমাত্র অভীষ্টের লাভের উপায়মাত্র। যেখানে সব জিনিসই একটা সমগ্রের মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে আছে সেখানে যে-কোনো একটা উপাদানকে পৃথক করে দেখা যেতে পারে এবং নিজের খুশিমতো প্রমাণ করা যেতে পারে যে এই একটা উপাদানের অভাবে অন্যান্য সব উপাদান অসম্পূর্ণ ও মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং এই একটা উপাদানের সংযোগে অন্যান্য সবকিছুই আবার বাস্তব ও সার্থক হয়। এবং এই যুক্তি অনুসরণ করে যে-কোনো একটা জিনিসকে উদ্দেশ্য এবং অবশিষ্ট জিনিসকে সেই উদ্দেশ্যলাভের উপায়রূপে কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে পরিস্থিতি এরকম সেখানে নির্দ্বিধায় কোনো একটা অংশকে একমাত্র শ্রেয়ঃ বা কাম্য বিবেচনা করা বিচারসম্মত নয়। এইরকম সিদ্ধান্ত সাধারণ সূত্ররূপে ন্যায্য ; কিন্তু কোনো-এক বিশেষ অংশ বা দিককে চরমপ্রাধান্য দিতে গেলে এই সিদ্ধান্তের মধ্যে একদেশদর্শিতা দোষ এসে পড়ে। সুখমাত্রবাদের গোড়ার কথা হচ্ছে যে সুখই একমাত্র কাম্য বা ইষ্ট ; সেই জন্য এইমত দৃঢ়তার সঙ্গে বর্জনীয়।

কোনো-এক জিনিস সুখকর বলেই আমরা কামনা করি, না আমরা কামনা করি বলেই সেটা সুখকর ? আবার প্রশ্ন ওঠে কোনো-এক জিনিস ইষ্ট বা হিত বলেই আমরা কামনা করি, না আমরা কামনা করি বলেই সেটা হিত বা মঙ্গল ? আমরা আরো প্রশ্ন করতে পারি কোনো-একটা জিনিস সত্য বলেই আমরা তার বিষয়ে চিন্তা বা ভাবনা করি, না আমরা চিন্তা বা ভাবনা করি বলেই সেটা সত্য ? আবার প্রশ্ন করতে পারি কোনো-একটা জিনিস আমার করা উচিত বলেই কর্তব্য বা বিহিত, না বিহিত বা কর্তব্য বলেই সেটা আমার করা উচিত ? সৌন্দর্যের বেলাতেও এইরকম প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। কোনো-একটা জিনিস আমাকে মুগ্ধ করে বলেই সুন্দর, না সুন্দর বলেই আমাকে মুগ্ধ করে ? এইসব প্রশ্নের প্রত্যেকটা অসমীচীন। যেখানে পার্থক্য নেই সেখানে নিদারুণ একটা পার্থক্য কল্পনা করে এইসব ক্ষেত্রে আমরা সর্বনাশী দ্বন্দ্বের কাছে অসহায়রূপে আত্মসমর্পণ করি।

আমাদের দোষ হচ্ছে এই যে, এইসব ক্ষেত্রে এক অংশকে অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেও একটা বাস্তব তথ্যরূপে কল্পনা করছি অথচ সেরকম কল্পনা অসংগত। কামনার তৃপ্তিকে যদি ইষ্ট বলা হয়, তা হলে ইষ্টের একটা কারণ কামনা। অপর পক্ষে কামনা দ্বারা যদি কোনো প্রকার তৃপ্তি লাভ না করে থাকি তা হলে আমরা কামনাই করব না। কামনা না করে এবং কাম্য বিবেচনা না করেও কিছু নিম্নশ্রেণীর সুখ কিছুক্ষণের জন্য আমরা লাভ করতে পারি। কিন্তু তাই বলে হিত বা কল্যাণ হল সুখমাত্র বা সুখের ফলমাত্র এরকম সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য।

সংগতি রক্ষা করে যদি সুখমাত্রবাদীরা কথা বলেন তা হলে তাঁদের বলতে হয় যে আমাদের সব কামনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ। কোনো-একটা জিনিসকে, সেটা সুখকর, শুধু এই কারণের জন্য আমরা চাই এবং এই বললেই সব-কিছু তাঁদের মতে বলা হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু সুখও এমনি এসে পড়ে না। সুখের উৎপত্তিরও একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা দেখতে পাই যে পূর্ণতা বা স্বকীয়তার সঙ্গে সুখ থাকতে বাধ্য। এমত অবস্থায় কামনার উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণতা, এরকম বলা চলে; আবার কামনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ, তাও বলা চলে। পূর্ণতাকে কামনা না করেই আমরা সুখ কামনা করি যদি এই কথা বলবার অধিকার আমাদের থাকে, তা হলে সুখকে কামনা না করে পূর্ণতা আমরা কামনা করি এই কথা বলতেও কোনো বাধা থাকতে পারে না। পূর্ণতা ও সুখের মধ্যে সংযোগকে যদি আকস্মিক বলে গ্রহণ করা হয় তা হলে সুখ ও কামনার মধ্যে সংযোগটাও আকস্মিক হবে না কেন? কিন্তু পূর্ণতা ও সুখের মধ্যে ইতরেতর সম্বন্ধ যদি সত্য হয়, তা হলে পূর্ণতার নিমিত্ত সুখের প্রয়োজন এবং সুখের নিমিত্ত পূর্ণতার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্ত আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। এবং এই সিদ্ধান্ত সুখমাত্রবাদের মূলসূত্রকে নিরসন করে। সুখই আমাদের বিশ্বের একমাত্র কামনার বিষয় নয়। সুখ কিংবা বিশ্বের কোনো-একটা উপাদানমাত্র আমাদের কাম্য বা অভীষ্ট এই ধারণা সমর্থনের অযোগ্য। (ষড়্‌বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আমি আরো বলব যে, যদি সুখমাত্রবাদ সত্যও হয় তার সত্যতা প্রমাণ করবার কোনো উপায় নেই।

এবার আর-একটা মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। একরকম

চিন্তাধারা-অনুযায়ী ইষ্টকে সংকল্পের সফলতার সঙ্গে একার্থক করবার চেষ্টা দেখা যায়। এই মতটা যে-কল্পিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা ভ্রান্ত। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ইচ্ছা কখনো স্বতঃই পূর্ণ হয় এবং কখনো প্রযত্ন দ্বারা আমরা ইচ্ছা পূর্ণ করি। এবং যেসব অনুভূতির মধ্যে কামনাতৃপ্তিজাত সুখ আছে সেগুলোকে হিত বা ইষ্ট না বলে উপায় নেই। তা ছাড়া ইচ্ছার তৃপ্তি ও সুখ এক জিনিস এ কথাও অসংগত। কারণ ইচ্ছা ব্যতিরেকেও সুখের অস্তিত্ব সম্ভবপর।

আমাদের সাধারণ মত এইবার প্রকাশ করি। আমাদের মতে যা-কিছু প্রশস্য তাই হচ্ছে হিত বা শ্রেয়ঃ বা ইষ্ট। প্রশংসা বা অনুমোদন শব্দকে প্রশস্ত অর্থে নিতে হবে। মনে করুন একটা ভাব বাস্তবে পরিণত হচ্ছে কিংবা তার বাস্তব পরিণতি কল্পনা করা হচ্ছে; এইরকম ভাবকে যখন তৃপ্তিদায়ক বলে বিবেচনা করা হয় তখন সেই বিবেচনা-ব্যাপারের অপর নাম অনুমোদন বা প্রশংসা। ভাবটা কল্পনায় কিংবা বাস্তবে যখন সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে অসমর্থ হয়, তখন ঔচিত্যবোধ জন্মে, তখন ভাবটাই 'উচিত' রূপে উদ্ভাসিত হয়। এই সাধুবাদ বা অনুমোদন-ব্যাপার যে একমাত্র নৈতিক জগতেই সীমাবদ্ধ তা নয়, শিল্প ও চিন্তার জগতেও এই সাধুবাদের প্রয়োগ আছে। যেখানেই একটা সুখদায়ক ভাবের সঙ্গে বাহ্য বা আন্তর কোনো ফলকে তুলনা করে দেখা যায় যে উভয়ের মধ্যে মিল হয়েছে সেইখানেই আমরা সাধুবাদ দিই কিংবা অনুমোদন করি। এবং যেখানেই একটা ফলকে বা ব্যাপারকে প্রশংসা করি বা সাধুবাদ দিই সেইখানেই তাকে উত্তম বা শুভ বলে বিবেচনা করি।

সাধারণত ইষ্ট ও বাঞ্ছনীয় দুটো শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই ব্যবহারের দ্বারা কিছু বিভ্রান্তি উৎপন্ন হতে পারে। বাঞ্ছনীয় শব্দের অর্থ যা কামনার যোগ্য অর্থাৎ যা কামনা করা উচিত। এবং ইষ্টকে বাঞ্ছনীয় বললে এরকম হয়তো মনে হতে পারে যে ইষ্ট যেন কখনো প্রকৃত কামনার বিষয় হতে পারে না, কারণ ইষ্ট হচ্ছে তাই যা কামনা করা উচিত এবং আমরা যা প্রকৃতপক্ষে কামনা করি তা যেন ইষ্ট নয়। শুভ বা ইষ্ট শব্দকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করলে এই উক্তিটির সত্যতা সন্দেহজনক। যেখানে উৎকৃষ্টতর বা নিকৃষ্টতর শব্দের ব্যবহার ন্যায্য, একমাত্র সেইখানেই

'বাঞ্ছনীয়' শব্দের প্রয়োগ যথার্থ। যখন কোনো একটা জিনিস কামনা করাই উৎকৃষ্টতর মনে হয় তখন সেই জিনিসটাকে বাঞ্ছনীয় বলা যায়। যে-স্থলে কোনো একটা জিনিসকে আকাঙ্ক্ষা করা শুধু উত্তম বলে মনে হয় সে-স্থলে জিনিসটাকে বাঞ্ছনীয় বলা চলে না।

তবে শুভ বা ইষ্টকে এই অর্থে বাঞ্ছনীয় বলা চলে যে ইষ্ট মূলত কামনার বিষয়। কারণ, কামনা ইষ্টের বাইরে কোনো বাহ্য উপায় মাত্র নয়; কামনা ইষ্টের মধ্যে অন্তর্নিহিত এবং ইষ্টের অস্তিত্বের জন্য কামনার একান্ত প্রয়োজন। আমরা হয়তো বলতে চাইব যে অনাকাঙ্ক্ষিত ইষ্টকে ইষ্ট বলা চলে না, সুতরাং এই অর্থে ইষ্ট বাঞ্ছনীয়। এইভাবে 'বাঞ্ছনীয়' শব্দের প্রয়োগের কিছু সার্থকতা আছে; তবে উপর্যুক্ত কারণের জন্য এই প্রয়োগ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। 'বাঞ্ছনীয়' শব্দের ব্যবহারের দ্বারা অন্তত যে-সময় শব্দটা ব্যবহার করা হয় সেই-সময়ের জন্য কামনা ও ইষ্ট পৃথক হয়ে পড়ে।

আমরা এতক্ষণ ইষ্ট শব্দের অর্থ নির্ধারণ করবার চেষ্টা করছিলাম। এবার শুভ বা ইষ্টের অন্তর্নিহিত বিরোধটিকে প্রকটিত করতে চেষ্টা করব। হিত বা কল্যাণকে পূর্ণ বলা যায় না। কল্যাণ পূর্ণতার মাত্র এক অংশের প্রকাশ। কল্যাণকে সম্পূর্ণতা দিতে গেলে তাকে অতিক্রমণ করে তার ঊর্ধ্বে যেতে হয়। কল্যাণের অন্তর্নিহিত অসম্পূর্ণতা উদ্ঘাটন করবার জন্য দুটো দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। প্রথমত আমরা আলোচনা করব কল্যাণ কাকে বলে এবং দ্বিতীয়ত আমরা দেখাতে চেষ্টা করব যে কল্যাণের ভাবের মধ্যে স্ব-বিরোধ আছে।

কল্যাণ কি বা কাকে বলে এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে আমরা সর্বপ্রথমে লক্ষ্য করি কল্যাণ এমনসব জিনিসের বিশেষণ যেগুলো কল্যাণ বা শুভ নয়। যেমন সৌন্দর্য, সত্য, সুখ এবং সংবেদনকে আমরা কল্যাণ বা ইষ্ট বা হিত বলি। আমরা এগুলোর সবকটাকেই কামনা করি, এবং এগুলোর প্রত্যেকটাকে আমাদের শ্রদ্ধা বা প্রশস্তিক্রিয়ার আদর্শ-রূপে গ্রহণ করতে পারি। এবং সেইজন্য এগুলোর প্রত্যেকটাকেই আমরা শ্রেয়ঃ বা ইষ্ট বলতে পারি। কিন্তু এইসব জিনিসের সমষ্টিকে কি ইষ্ট বা কল্যাণের চরমরূপ বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের 'না' বলতে

হয়। কারণ সত্য, সুন্দর, সুখ প্রভৃতির প্রত্যেকটার নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। এবং ইষ্ট বলে বিবেচিত হতে হলে বিশ্বের প্রত্যেক দিকেরই নিজ বৈশিষ্ট্যটা থাকা দরকার। সুতরাং বোঝা যায় যে, বিশ্বের যাবতীয় জিনিসের সাফল্যকে হিত বা ইষ্ট বলে অভিহিত করা চলে না। শ্রেয়ের স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলেও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হই। কল্যাণের সত্তাও হচ্ছে আপাত-স্বীকৃত বা ব্যবহারিক। ভাব ও অস্তিত্বের প্রভেদের উপর কল্যাণের সত্তা নির্ভর করে এবং কালের ধারার মধ্যে প্রভেদের এই ক্ষত অনবরত সারে আবার হয়।

কল্যাণের অন্তরতম সত্তার মধ্যে প্রত্যয় বা ভাব ও অস্তিত্বের এই বিরোধ হল সতত-ক্রিয়াশীল। তৃপ্ত কামনার মধ্যে একটা স্ব-বিরোধ আছে। কামনা তৃপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার কামনারূপ আর থাকে না। এবং যতক্ষণ কামনা, কামনারূপে সজীব থাকে ততক্ষণ তার মধ্যে আংশিক অতৃপ্তি থাকতে বাধ্য। যে ক্ষেত্রে আমরা মাত্র পাওয়া জিনিসটাকে চাই এবং যে ক্ষেত্রে পাওয়া জিনিসটার প্রশস্তি বা অনুমোদনের জন্য কোনো রকম বাসনা নিষ্প্রয়োজন সেই-ক্ষেত্রে আমরা যে গুণের সংস্পর্শে আসি সেটাকে পরিবর্তন-বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এইটুকুই এই ব্যাপারের-সব নয়। এ ছাড়া সব ক্ষেত্রেই এমন-একটা ভাবের ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত আমরা পাই যেটা তথ্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়েও ভিন্ন। মঙ্গলের অস্তিত্বের জন্য এই পরস্পরবিরোধী দুই দিকের দরকার। ভাব ও অস্তিত্বের মধ্যে প্রভেদের প্রণাশ দ্বারাই মঙ্গল লাভ করা সম্ভবপর; অথচ এই প্রভেদ কখনো একেবারে যায় না; এবং যদি প্রভেদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় তা হলেও মঙ্গলের স্বরূপ নষ্ট হয়। অতএব হিত বা কল্যাণের মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই। মঙ্গল বা শ্রেয়ঃ মঙ্গলের অতীত এক উচ্চতর ও অপর গুণের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যায় এবং সম্পূর্ণতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেয়ঃ ইষ্টানিষ্টের অতীত সেই গুণের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়।

সমগ্রকে, উপর্যুক্ত কারণের জন্য, মঙ্গলময় বা শিব বলা সংগত নয়। হিত কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা সমগ্রতা দান করতে পারে না। পারমার্থিক বিচারে ইষ্ট বা অনিষ্ট কিংবা শ্রেয়ঃ বা হেয়তর বলে কিছুই নেই। কারণ, পরমার্থ ও তার অবভাস দুটো এক জিনিস নয়। অপর পক্ষে এইরকম বর্ণনা

একেবারে সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমরা দেখেছি যে পরমার্থ তার অবভাসের মধ্যেই প্রকাশিত; আপাতস্বীকৃত অবভাসসমূহের বাইরে কোথাও পরম-সত্তা বাস্তব হতে পারে না। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, কোনো এক বিশেষ অবভাসের মধ্যে পরমসত্তার বাস্তবতা নিহিত থাকে না। কারণ সমস্ত অবভাস হচ্ছে ঐক্যবদ্ধরূপে পরমার্থের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পরমার্থকে শিব বা মঙ্গলময় বলতে বাধা নেই এবং এও বলা চলে যে বিভিন্ন মাত্রার হিত ও অহিতের মধ্যে দিয়ে পরমার্থের প্রকাশ হয়। কল্যাণের পূর্ণতা হচ্ছে সমগ্র পরমসত্তার মধ্যে এবং পূর্ণতালাভের সঙ্গে কল্যাণের বিশিষ্টরূপ নাশপ্রাপ্ত হয়। কল্যাণের চরম পরিণতিলাভ-দ্বারা সূচিত হয় যে, ভাব ও অস্তিত্বের পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সুতরাং পূর্ণতা-লাভের সঙ্গে প্রত্যয় বা ভাব ও অস্তিত্ব নষ্ট হয় না; সমগ্র পরমার্থে সে-দুটোর মিল হয় এইমাত্র। অতএব এই দৃষ্টিতে পরমার্থ হল কল্যাণময় বা কল্যাণ-স্বরূপ। আবার সসীম জীবের বিভিন্ন প্রকারের সফলতাকে ও তৃপ্তিকে পূর্ণ কল্যাণের মানদণ্ডে বিচার করে উচ্চতর ও নিম্নতর বলে অভিহিত করা যায়। সুতরাং সসীম জীবের সর্ববিধ ইষ্টের মধ্যে পরমার্থ নানা মাত্রায় প্রকাশিত হয়, এইরকম ধারণা অন্যায় নয়। এইবার এই শেষের উক্তিটার বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা সত্য ও বাস্তবতার মাত্রাভেদের প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। যার চরমোৎকর্ষের থেকে ব্যবধান যত কম সেটা হচ্ছে তত প্রকৃষ্টতর। এবং কোনো এক বিশেষ প্রতীয়মান ও আপাত-দৃষ্ট সত্তার পরম বাস্তবে পরিণতির জন্য যে-পরিমাণ পুনর্বিন্যাস ও সংযোজন দরকার তার দ্বারা এই ব্যবধানের মাত্রা পরিমাপ করা হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই পরিমাপক নিয়মের দুটো দিক আছে। সেই দুই দিক দিয়ে আপাতস্বীকৃত ও আবভাসিক সত্তার দুরকম দোষ বিচার করা হয়। প্রথম দিক দিয়ে অবভাসিত সত্তার সংকীর্ণতার পরিমাণ নিরূপিত করা হয় ও দ্বিতীয় দিক দিয়ে তার অসংগতির পরিমাণ নিরূপিত করা হয়। এই দুইরকম দোষ কেন ও কিরূপে মূলত হচ্ছে একই দোষ তাও আমরা বুঝেছি। এই নিয়মটা কল্যাণের বিচারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; প্রারম্ভে স্থূলভাবে এই মন্তব্যটা আমরা এখানে করব। যে তৃপ্তি যত বাস্তব ও সত্য সেই তৃপ্তি তত কল্যাণপ্রদ।

ব্যাপকতা ও সংগতির দিক থেকে বিচার এখানেও দরকার। একমাত্র যা সুসমঞ্জস ও সম্পূর্ণ তাই আমাদের বাসনার সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে। সুতরাং যে-তৃপ্তিতে স্ব-সংগতি বেশি কিংবা যে-তৃপ্তির ব্যাপকতা বেশি সেই-তৃপ্তির মূল্যও বেশি। এই দুই দিকের মধ্যে প্রভেদটি হচ্ছে আপাতদৃশ্য মাত্র। কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির একদেশদর্শিতার জন্য পার্থক্যটার উৎপত্তি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে যে-তৃপ্তি বাহ্যবস্তুর ওপর নির্ভরশীল তার মধ্যে আত্মসংগতি অসম্ভব, অপর পক্ষে যে-তৃপ্তি সম্পূর্ণ আত্মগত বা আত্ম-নির্ভরশীল তা সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। প্রয়োগ করবার সময় নিয়মের দুই দিককে দুটো মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু মূলত দুটো দিক হচ্ছে এক এবং সর্বত্রই পরমতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা দ্বারা কল্যাণের মাত্রা বিচার করা হয়।

সুতরাং এইরকম উক্তিতে দোষ নেই যে পরমসত্তা প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ-স্বরূপ এবং বিভিন্ন প্রকার হিত বা ইষ্ট এই পরমকল্যাণের প্রকাশের মাত্রা-ভেদমাত্র। প্রত্যেক চিন্তা, অনুভূতি ও সত্তাই যখন পরমসত্তায় ঐক্যলাভ করে, আমরা এও বলতে পারি যে বিশ্বের প্রত্যেক অংশেরই পরম অর্থ বা মূল্য আছে।

এ পর্যন্ত কল্যাণ বা হিতের সাধারণ অর্থ এবং তাৎপর্য নির্ণয় করলাম। এবার কল্যাণ শব্দের সংকীর্ণ অর্থটি বিবেচনা করা যাক। হিতের মধ্যে প্রত্যয় বা ভাব ও অস্তিত্বের দুটো দিক বর্তমান। এ পর্যন্ত আমরা এক বিশেষ রকমের কল্যাণের আলোচনা করেছি; সেই কল্যাণের অন্তর্নিহিত ভাবের অংশের সঙ্গে অস্তিত্বের অংশের মিল হচ্ছে অনায়াসলব্ধ; সেই মিল আনবার জন্য কোনো চেষ্টা বা যত্ন দরকার হয় নি। যে ইষ্টলাভের জন্য যত্ন বা প্রয়াসের প্রয়োজন সেই ইষ্টকে, সংকীর্ণ অর্থে, ইষ্ট বলা হয়। এই অর্থে, যখন ইচ্ছার প্রয়োগ দ্বারা কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তখন আমরা সেই সিদ্ধিকে ইষ্ট বলি। এই প্রকার ইষ্টের অন্তর্নিহিত ভাব ও অস্তিত্বের সামঞ্জস্যটা হল ইচ্ছা বা যত্ন দ্বারা সৃষ্ট। এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ভাব বাস্তবরূপ ধারণ করে কিংবা বাস্তবে পরিণত হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে কল্যাণ বা শ্রেয়কে কর্মজগতের জিনিস বলতে হয়। নৈতিক দৃষ্টিতে যাকে শ্রেয়ঃ বা কর্তব্য বলা যায়, এটা সেই শ্রেয়ঃ বা কল্যাণ। অর্থাৎ শুভ বা প্রশস্তের সংকীর্ণ অর্থ হচ্ছে নৈতিক বিচারে যা সৎ বা বিহিত। একমাত্র সসীম জীবের

ক্ষেত্রেই আত্মবিকাশের অর্থ থাকতে পারে। প্রত্যেক জীবই সসীম; তবে সসীম জীবমাত্রই মানুষ নাও হতে পারে। ইচ্ছা পূর্ণ করতে হলে আমাদের কর্ম করতে হয় এবং সিদ্ধিলাভের ব্যাপারটা হল সময়সাপেক্ষ। পরমসত্তাকে এই ভাবে ইচ্ছা করতে হয় না। অপর পক্ষে ভৌতিক দ্রব্যাদির মধ্যেও উদ্দেশ্যসাধনের ইচ্ছা বলে কিছু দেখা যায় না। পরবর্তী অধ্যায়ে প্রকৃতির মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে কি না এই প্রশ্নের আলোচনা করব। বর্তমান অধ্যায়ে সুবিধার জন্য এই দিকটা আমরা উপেক্ষা করে অগ্রসর হব। ফলত আমরা এই ধরে নেব যে আত্মবিকাশের মানেই হচ্ছে জীবের আত্মবিকাশ।

সুতরাং যে-শ্রেয়ের ভাবকে কোনো সসীম জীব তার ইচ্ছার দ্বারা বাস্তবরূপ দেয় বর্তমান প্রসঙ্গে তাকেই শ্রেয়ঃ বলব। এই শ্রেয়ঃ শুধুমাত্র লব্ধ কোনো জিনিস নয়। এই শ্রেয়ঃ হল জীবের ইচ্ছার সৃষ্টি। আমরা আগে দেখেছি যে নৈতিক বিচার এবং অনুমোদন বা প্রশংসা এক জিনিস নয় ও প্রশংসার ক্ষেত্র হচ্ছে নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রের চেয়ে ব্যাপকতর। এই সত্যটা এখানে উপেক্ষা করব। তা ছাড়া নৈতিকতার আরো সংকীর্ণ অর্থ হতে পারে; যেমন নৈতিকতা কোনো বাহ্য জিনিস নয়; সেটা হল একটা আভ্যন্তরিক ব্যাপার। এই কথাটাও এখানে মনে রাখার প্রয়োজন নেই। বর্তমান প্রসঙ্গে শুভের পরিভাষা হল এই: উৎকর্ষের কোনো ভাব বা ধারণাকে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টার দ্বারা বাস্তবে পরিণত করবার সাফল্যই হচ্ছে শুভ বা শ্রেয়ঃ। আমার বিচারে এই অর্থেও শুভ অসংগতিপূর্ণ। আমি এখন অসংগতিটা দেখাবার চেষ্টা করব।

প্রথম প্রশ্ন ওঠে যে উপর্যুক্ত অর্থে শ্রেয়ঃ বা ইষ্টের বিশেষ বিষয়বস্তু কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে বাধ্য যে একথা সত্য নয় যে মাত্র কতকগুলো বিশেষ বিষয়বস্তুই আমাদের কাম্য হতে পারে। সুখমাত্রকে ইষ্টের সারবস্তু বলা চলে না, এ আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। তা ছাড়া বিশ্বের এমন-কিছু নেই যা ইষ্টরূপে বাঞ্ছিত না হতে পারে। সৌন্দর্য, সত্য, অনুভূতি, সংবেদনা যা-কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি, সবই হচ্ছে উৎকর্ষের অঙ্গ বা অংশবিশেষ। কারণ উৎকর্ষ হল শেষ পর্যন্ত একটা অদ্বিতীয় ও পূর্ণ শৃঙ্খলা। সেটা সমস্ত জিনিসের সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ রূপ। কিন্তু জীববিশেষ যখন সংকল্পশক্তি দ্বারা

কোনো উৎকর্ষের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করতে সমর্থ হয় তখনকার বাস্তবরূপপ্রাপ্ত আদর্শকে আমরা ইষ্ট বলে এখানে অভিহিত করছি। ইষ্টের এই অর্থ স্বীকার করলে পূর্ণ শৃঙ্খলার আকারকে শুভ বলা চলে না। এবং সমগ্র বিশ্ব থেকে বিশ্লিষ্টরূপে বিশ্বের কোনো বিশেষ বিষয়বস্তুকেও মঙ্গল বা হিত কল্পনা করা যায় না।

পূর্ণতার অসামান্যতার দুটো দিক আছে যেমন : ১. সমন্বয়ের দিক এবং ২. ব্যাপকতার দিক। সত্য ও বাস্তবতার মাত্রার বিচার এই দুই দিক থেকে করা হয়। কল্যাণের মাত্রাবিচারও এই দুই দিক থেকে করতে হয়। চতুর্বিংশ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে এই দুই দিক শেষ পর্যন্ত অভিন্ন। তবে কার্যত এই দুই দিকের বিচার পৃথক করতে হয়। উৎকর্ষের আদর্শ বিশ্বে বিভিন্নরূপে কিভাবে বাস্তব হয়েছে সে বিষয়ে আমি কিছু বলব না। ইষ্টের অন্তর্নিহিত দোষ কি তা উদ্ঘাটন করবার জন্য সমন্বয় ও ব্যাপকতার প্রয়োগের ভিন্নতার ওপর আমি জোর দিতে চাই। সমন্বয় ও ব্যাপকতা দুটোরই পরিণতি হচ্ছে এক ; তবে চরম পরিণতি লাভের পর ইষ্ট বা শ্রেয়ের নিজস্ব রূপ আর থাকে না।

এবার আমি আত্মত্যাগের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কোনো ব্যক্তি তার উৎকর্ষের আদর্শ যখন বাস্তবে পরিণত করতে সমর্থ হয় কেবল তখনই সে ইষ্টলাভ করে এই আমাদের বিশ্বাস। এবং প্রত্যেক উৎকর্ষের দুই দিক আছে ১. সমন্বয়ের দিক এবং ২. ব্যাপ্তির দিক। প্রথম থেকেই অবশ্য এই দুই দিকের মধ্যে মিল দেখতে পাওয়া যায় না। শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে একটা সত্য মত হচ্ছে এই যে ব্যক্তিগত জীবনের যা-কিছু আছে সবকে একটা সমন্বয়ের মধ্যে গ্রথিত করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ। অপর পক্ষে ব্যক্তিগত জীবনকে বৃহত্তম উদ্দেশ্যের জন্য বলিদান দেওয়াও একটা সত্য নৈতিক আদর্শ। সুতরাং আত্মবিকাশ ও আত্মত্যাগ দুটোই মানুষের জীবনের নৈতিক আদর্শ হতে পারে। যে আত্মবিকাশের পথে যায় সে নিজের জীবনে শৃঙ্খলার স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে এবং যে আত্মত্যাগের পথ বেছে নেয়, সে ব্যাপক কল্যাণের জন্য সর্ববিধ স্বার্থের সাধনা পরিত্যাগ করে। এই দুইরকম নৈতিক আদর্শের মধ্যে এক প্রকার বিরোধ সুস্পষ্ট। এবং কেবল তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে বিচার করলে আত্মপ্রতিষ্ঠা

ও আত্মত্যাগ এ দুটো আদর্শের মধ্যে কোন্‌টা উন্নততর তা বলা একেবারে অসম্ভব।

আমার বলবার উদ্দেশ্য এই নয় যে, নৈতিক জীবনযাপন করবার জন্য সব সময়েই এই দুটো আদর্শের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। তা যদি হত তা হলে আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ত। ব্যক্তিগত উন্নতির কথা না ভেবে পরার্থে জীবনযাপন করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণও সাধিত হয়। স্থূলভাবে আমরা এও বলতে পারি যে আত্মত্যাগ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই এবং এই দুই আদর্শের কোনোটারই যথার্থ অর্থে নৈতিক জীবনের জন্য প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটা স্থূল ঐক্য সত্ত্বেও এই দুটো আদর্শের মধ্যে যে আংশিক প্রভেদ আছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। এবং অনেক মানুষের জীবনে এই দুই আদর্শের মধ্যে অনেক সময় একরকম বৈরিতা উপস্থিত হয় তাও স্বীকার্য।

ফলত দুটো বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের অস্তিত্বকেই আমাদের মেনে নিতে হয়। কেউ তার পূর্ণতার নিজ ধারণার অনুযায়ী আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ বেছে নেয়, কেউ তার পূর্ণতার নিজ ধারণা বিকাশের জন্য আত্মত্যাগের পথ বেছে নেয়। নৈতিক উৎকর্ষের জন্য সেইজন্য দুটো পথ খোলা আছে। আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ, এই দুই নৈতিক আদর্শের অর্থ কি সে সম্বন্ধে আমা-দের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। আত্মত্যাগকে সাধারণত অপরের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করার অর্থে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠাকে স্বার্থান্বেষণের অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই ব্যবহার অসংগত। এই মত-অনুযায়ী এক-মাত্র যা প্রত্যক্ষরূপে বা পরোক্ষরূপে, স্পষ্টত বা প্রচ্ছন্নত সমাজের পক্ষে হিত-কারক তাকেই নৈতিক দৃষ্টিতে সংগত বলা হয়। ব্যক্তির উন্নতি, যদি সমাজের হিতবুদ্ধির সহায়ক না হয় তা হলে তাকে আর নীতিসম্মত বিবেচনা করা হয় না। এই মতের মধ্যে সত্য আছে, কিন্তু এর মধ্যে যথেষ্ট অতিরঞ্জনও আছে এবং যথার্থ বিচারে এই মত অগ্রাহ্য। জ্ঞানের অনুশীলন ও অন্যান্য অনেকরকম সাধনা বা কুশলতা আছে; সেগুলোকে নৈতিক উৎকর্ষ না বলে উপায় নেই; কিন্তু এইসব সাধনার দ্বারা সব সময়েই যে সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়, এরকম উক্তি করা যায় না। এবং সেগুলোকে সমাজদেহের অলংকারও বলা চলে না। এইভাবে বিচার

করলে আমরা বুঝতে পারি যে সর্ববিধ বিহিতকর্ম বা সুকৃতিই যে মুখ্যত বা মূলত সমাজের হিতসাধক এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। অপর পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে সমাজের উপকার বা হিতকে উপেক্ষা করে অন্যবিধ অর্থ বা সিদ্ধির জন্য জীবন উৎসর্গ করা নৈতিক বিচারে শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা কেন, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তও হতে পারে। আমরা এও বলতে পারি যে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য-সাধন না করে শুধু পরের হিতের জন্য জীবন অতিবাহিত করা একরকম স্বার্থ-পরতা কিংবা অনৈতিকতাও হতে পারে।

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মধ্যে পার্থক্য এইজন্য নয় যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ হল ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আত্মত্যাগের আদর্শ হচ্ছে ব্যক্তিকে অতিক্রম করে। এইরকম কথার কোনো সুস্পষ্ট অর্থ হয় না। 'ব্যক্তি' শব্দকে যদি সংকীর্ণতম অর্থে গ্রহণ করা যায় তা হলে যে-কোনো শাশ্বত আদর্শ ব্যক্তিকে অতিক্রম করে বিদ্যমান। তা ছাড়া যে-বিষয়ে ব্যক্তি তার উৎকর্ষের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করে সেই-বিষয়টাও শুধু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কোনো ব্যক্তির উৎকর্ষই বিশ্বের থেকে পৃথক একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। এই উৎকর্ষ লাভ করবার জন্য তাকে বিশ্বের সর্বসাধারণ সারবস্তুকে আয়ত্ত করতে হয় এবং এই সার-ভূত সত্তা তার কাছে এক এক বিশেষ শৃঙ্খলার রূপ ধারণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই হচ্ছে সামাজিক জীব। সেইজন্য ব্যক্তিগত কল্যাণসাধন করতে গেলেও খানিকটা পরের হিতসাধন করতে হয়। তা ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই মধ্যে আছে একটা ভাবুক অংশ; যে-সব উপাদান দ্বারা এই অংশ গঠিত সেগুলো শুধু কেবল তার নিজের নয়। যে-সব উপাদান দ্বারা মানুষ সত্য, সুন্দর ও শিবের অনুসন্ধান ও সাধনা করে সেগুলো সর্বসাধারণের। এইজন্যই আত্ম-বিকাশের বেলাতেও শুধু নিজের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা যায় না; স্বকীয় সত্তাকে অতিক্রম করতে হয়। বস্তুত আত্মপ্রতিষ্ঠা কিংবা আত্মত্যাগের বিষয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এদুটোর মধ্যে পার্থক্য নির্ভর করে কিরূপে দুটোর অন্তর্গত বিষয়কে কাজে লাগানো হয় তার উপর। এখন আমি আমার এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা করব।

নৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের যে-কোনো উপাদানকে গ্রহণ করা যায়। তবে এইসব উপাদানের এমন হওয়া উচিত যে সেগুলো দ্বারা ক্ষুদ্র

ব্যক্তিগত স্বার্থের অধিক কোনো বৃহত্তর পুরুষার্থ সাধন সম্ভবপর ও অবশ্যম্ভব। আত্মপ্রতিষ্ঠার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এইসব উপাদানগুলোকে আমার জীবনে বৃহত্তম শৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার কাজে আমি ব্যবহার করি। আমার ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের মানদণ্ড দিয়ে যখন এইসব উপাদানের নির্বাচন ও পরিমিতি করি তখন আমার আচরণ হচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক। অপর পক্ষে আমি যদি এমন কোনো বৃহৎ অর্থ বা উদ্দেশ্য বেছে নিই যার সাধনের জন্য আমার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা হলে আমার আচরণকে আত্মত্যাগ বলা যেতে পারে। কারণ এই লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য আমার ব্যক্তিগত স্বার্থকে আমি উপেক্ষা করি, সংকুচিত করি এবং দরকার হলে পরিহার করি। সমাজের হিতসাধনকল্পে আমি নিজের কল্যাণকে অপরের কল্যাণের জন্য অবহেলা করতে পারি, কিংবা আমি নিজেকে এমন এক নৈর্ব্যক্তিক সাধনায় উৎসর্গ করতে পারি যার জন্য আমার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং সংগতিও নষ্ট হতে পারে। নির্বাচিত নৈতিক আদর্শের জন্য ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ বিবেচনা করাই হচ্ছে আত্মত্যাগ। পরের হিতের জন্য এই ত্যাগ কিনা সে প্রশ্নটা নিতান্তই অবান্তর। কিন্তু আত্মত্যাগকেও শেষ পর্যন্ত একপ্রকার আত্মবিকাশ বলা চলে। কারণ যে বৃহত্তর উদ্দেশ্য বা আদর্শের জন্য আমি আত্মত্যাগ করি তাকে পেয়ে আমি আমার বাঞ্ছিত কল্যাণকেই পাই।

সসীম জীবরূপে আমার মধ্যে একই সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি ও আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি দুটো প্রবৃত্তিই ক্রিয়াশীল। সেইজন্য আত্মপ্রতিষ্ঠার বিষয়ই হোক কিংবা আত্মত্যাগের বিষয়ই হোক দুটো বিষয়কেই আমি স্বকীয় বলে স্বীকার করতে বাধ্য। দেহ ও তার ইন্দ্রিয়ের উপমা দিয়ে এই দুই ভাবের মধ্যে প্রভেদটা বোঝানো যেতে পারে। যদি কোনো ইন্দ্রিয়বিশেষ অন্য অন্য সব অঙ্গের সাধারণ জীবনীশক্তি থেকে শুধু নিজ উৎকর্ষ বিধানের জন্য উপাদান আহরণ করতে থাকে ইন্দ্রিয়টা তা হলে হয়ে ওঠে আত্মপ্রতিষ্ঠাপরায়ণ; অপর পক্ষে ইন্দ্রিয়বিশেষটা নিজের জীবন বিপন্ন করেও যদি দেহের বৃহত্তর জীবনের উদ্দেশ্যে কাজ করে চলে তা হলে সেটাকে বলা চলে আত্মত্যাগী। প্রথম দৃষ্টান্তে ইন্দ্রিয়টা স্বকীয়, সম্পূর্ণ ও অখণ্ড উৎকর্ষের আদর্শ গ্রহণ করেছে। পরবর্তী দৃষ্টান্তে যে আদর্শ গৃহীত হয়েছে তার প্রভাবে ইন্দ্রিয়-

টার খণ্ডিত, বিশ্লিষ্ট, সংকীর্ণ, বঞ্চিত ও নিহত হতেও কোনো দ্বিধা নেই। আত্মত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করবার জন্য ক্ষতি স্বীকার করতে হয়; কিন্তু এই ক্ষতির দ্বারা যে বৃহত্তর উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় তার ফলে চিত্তের প্রসার হয় এবং এই চিত্তপ্রসার-জনিত আনন্দই ক্ষতিকে পূরণ করে। এটা সুনিশ্চিত যে পূর্ব-বর্ণিত দুটো আদর্শের ফল হচ্ছে মোটামুটি একই রকম। প্রত্যেক অংশের নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার দ্বারা সমগ্রের স্বার্থ রক্ষিত হয়; কারণ সমগ্র হচ্ছে অংশগুলোর মধ্যেই বাস্তব। আবার সমগ্রের জন্য কাজ করে অংশেরও উন্নতি হয়; কারণ এইরূপে অংশের মধ্যে সমগ্রের শক্তি সঞ্চার হয়। এইভাবে বিচার করলে দেখা যায় দুটো আদর্শের মধ্যে একটা স্থূল সাদৃশ্য আছে। কিন্তু দুটো আদর্শের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যও আছে এবং অনেক স্থলে আদর্শ দুটোর মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট।

উপর্যুক্ত দুটো আদর্শের সাহায্যেই আত্মবিকাশ করা যায়। দুটোর সাহায্যেই বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। দুটোই হচ্ছে নীতিসম্মত এবং ধর্মসংগত। ব্যক্তির নিজ আত্মার প্রতি কর্তব্য যদি না থাকে তা হলে কার প্রতি কর্তব্য থাকতে পারে? স্বকীয় উৎকর্ষ-বিধান দ্বারা সমগ্রের উৎকর্ষও সাধিত হয়। এমন হতে পারে না কারো উৎকর্ষ শুধু তার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং বিশ্বের তাতে কোনো লাভ নেই। কারণ ব্যক্তি ও বিশ্বের বা পরমার্থের মধ্যে এই প্রভেদ অর্থশূন্য। অপর পক্ষে এই কথা কি বলা যায় যে নিজেকে বলিদান দেওয়া বিবেক-বিরুদ্ধ? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে সসীম জীবের স্বরূপই হচ্ছে স্ব-বিরোধপূর্ণ। অন্যের সঙ্গে নানা সম্বন্ধের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে সসীম জীবের প্রকৃতি হয় গঠিত। এই দিক থেকে দেখলে প্রত্যেক সসীম জীবই তার আত্মার বাইরে বাস করে। এমন অবস্থায় সসীম জীব যে আত্মবিকাশের জন্য নিজের সীমা অতিক্রম করে সেটা খুব স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগত। কেউ যদি বিশ্বাস করেন যে সসীম জীবের মধ্যে আত্মবিরোধ নেই সে হচ্ছে অন্য কথা; তবে যিনি এরকম বিশ্বাস করেন তিনি তাঁর মত আগে প্রমাণ করুন। অন্যথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে নৈতিক উন্নতির এই দ্বিবিধ আদর্শ হল স্বাভাবিক ও আবশ্যক। এবং সাধারণভাবে ও নির্বিশেষ বিচারে দুটোকেই শ্রেয়ঃ বা কল্যাণ মনে করা চলে। কোনো এক বিশেষ ক্ষেত্রে এ দুটোর মধ্যে

কোন্ আদর্শটা গ্রহণীয় তা অবশ্য অবস্থাবিশেষের দ্বারা নির্ধারণ করতে হয়।

তবে অন্তিমে যে দুই আদর্শের প্রভেদ আর থাকে না সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ পরমার্থের বাইরে কিছু নেই এবং পরমার্থের মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে না। যে কাম অসিদ্ধ বা অনাপ্ত তার মধ্যে এক প্রকার অপূর্ণতা আছে; অসিদ্ধ কামের মধ্যে ভাব ও অস্তিত্বের অসামঞ্জস্য আছে। পরমার্থে প্রত্যেক সসীম তার ঈপ্সিত পূর্ণতা লাভ করে। তবে ঠিক সে যেইভাবে চায় সেইভাবে তার বাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে না। কারণ আমরা দেখেছি যে সসীম পদার্থ পরমসত্তায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়; সেইজন্য পূর্ণতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্ববর্তী স্বরূপ বিনষ্ট হয়। সমস্ত সসীমের ক্ষেত্রে যা ঘটতে বাধ্য হিত বা কল্যাণের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। আত্মপ্রতিষ্ঠা কিংবা আত্মত্যাগ এই দুটোর মধ্যে কোনো একটা আদর্শকেই পূর্ণতা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কোনো সসীম ব্যক্তিই তার জীবনে পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধন করতে পারে না; এবং যত বৃহৎ আদর্শের জন্যই সে নিজকে উৎসর্গীকৃত করুক না কেন এবং যত নিষ্ঠার সঙ্গে এই আদর্শকে পালন করুক না কেন পূর্ণ আত্মবিলোপ দ্বারা আত্মবিকাশরূপ পরিণতি সে কিছুতেই লাভ করতে পারে না। আমরা যদি ধরেও নিই যে তার আদর্শে কোনো ত্রুটি বা অভাব নেই এবং সেই আদর্শ বাস্তবে পরিণত হয়েছে, তবুও অন্তত তার নিজ ব্যক্তিত্বটা এই পরিণতির বাইরে থেকে যায়। একটা গভীর বিশ্বাস দিয়ে এই অন্তিম পার্থক্যটাকে ঢেকে রাখা যায়; কিন্তু এই বিশ্বাসটাই প্রমাণ করে যে পূর্ণ পরিণতি অনেক দূরে। এবং শেষ পর্যন্ত যদি তার ব্যক্তিত্বও চলে যায় তা হলে সে নিজেও আর থাকে না এবং যে-ইষ্টের সাধন সে করে তারও রূপ বদলায়। এই কথা বলেই আমরা এই অধ্যায় আরম্ভ করেছিলাম। ইষ্টের বা কল্যাণের সত্তাও হচ্ছে ব্যবহারিক এবং সেইজন্য তার মধ্যে আত্ম-অসংগতি আছে। এবং এই কারণেই সত্য ও বাস্তবতার তারতম্যের ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখেছি হিতের ক্ষেত্রেও তেমনি দেখি যে সমন্বয়ের দিক ও প্রসারের দিকের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল নেই। শেষে যেখানে সমস্ত বিরোধের অবসান হতে বাধ্য সেখানে সমস্ত ভাবই বস্তুসত্তা লাভ করে; এবং সেখানে কিছুই হারায় না বা নষ্ট হয় না;

কিন্তু সব কিছুই সেখানে সংযোজন ও পুনর্বিন্যাসের ফলে অন্য রূপ লাভ করে। আমাদের সিদ্ধান্ত তা হলে এই যে আত্মত্যাগ, আত্ম-প্রতিষ্ঠা, ইষ্ট বা নৈতিকতা কোনোটাই পারমার্থিক বিচারে সত্য নয়। হিত বা কল্যাণ হল বিশ্বকে দেখবার একটা অপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সম্পূর্ণ সংগতিলাভ করা যায় না।

এইটুকু বলেই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছু পাঠকের সুবিধার জন্য আমি কল্যাণের আপেক্ষিক রূপের বিষয় আরো খানিকটা আলোচনা করতে চাই। বহু ইংরেজ নীতিবেত্তা বিশ্বাস করেন যে কল্যাণের একটা চরম ও পরম মূল্য আছে। তাঁরা তত্ত্ববিদ্যা বোঝেন না এবং তাঁরা যে-ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করেন তাতে নৈতিকতার স্থান নিম্নে। এইসব সত্ত্বেও হিতবোধকে আপেক্ষিক মনে করতে তাঁরা সংকুচিত হন। সমস্ত সসীম তথ্যেরই সত্যতা ও বাস্তবতার তারতম্য আছে এবং কোনো সসীম তথ্যই পরম সত্য নয়। এই মত তাঁদের বোধগম্য নয়। প্রতীয়মান ও ব্যবহারিক জগতে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও সমগ্র পরমতত্ত্বের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় থাকতে পারে এরকম মত তাঁদের ধারণাতীত। প্রত্যেক তথ্য দৃশ্যমান জগতে যেরূপে উদ্ভাসিত হচ্ছে তাঁরা তাকে সেইরূপে পরম সত্য বলে বিবেচনা করেন। অথচ তথ্যের দৃশ্যমান রূপ পরমসত্য নয়। যে-সব খণ্ডিত ও একদেশী রূপ-সমূহ পরিবর্তনের পর পরমতত্ত্বে স্থান পায় সেগুলোকে তাঁরা নিত্য ও পরমবাস্তব বলে গ্রহণ করেন। কল্যাণের স্বরূপ বিচার করবার সময় দেখা যায় যে আত্মত্যাগ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের মধ্যে মিল নেই; এমন-কি দুটো আদর্শের মধ্যেই আত্মসংগতি নেই। এগুলোকে আংশিকরূপে সত্য বলা চলতে পারে; পরম সত্যতা এইসব আদর্শের নেই। অথচ লৌকিক নীতি-নিপুণেরা এই আদর্শগুলোকে নিত্য ও পরম বাস্তব বলে ঘোষণা করে থাকেন। এর ফলে বিভ্রান্তির গোলক-ধাঁধায় পথ হারাতে হয় ও ভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পড়তে হয়। এই অসুখকর পরিণতির পূর্ণ বর্ণনা দিতে আমার অভিরুচি নেই। তবে এই বিষয়ে আরো একটু বিস্তৃত আলোচনা করলে হয়তো অন্যের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হতে পারে।

একটা স্পষ্ট কথা প্রায়শই আমাদের মনে থাকে না। কল্যাণ কিংবা ইষ্ট সুসমঞ্জস ও পরম বাস্তব কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা দরকার। কিন্তু

কেবলমাত্র স্বার্থপরতা ও সাধুতার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। আমরা না হয় ধরেই নিলাম যে অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে আমরা স্বার্থপরতা ও সচ্চরিত্রতার মধ্যে প্রভেদ করে থাকি। বস্তুত দুটোর মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তা হলে আমাদের মূল সমস্যার কোনো সমাধান হয় না। নিজের কল্যাণবৃদ্ধি করবার জন্য আমাকে আমার প্রতিবেশীর কল্যাণসাধন করতে হয়। কারণ পরোপকার বা আত্মত্যাগ হচ্ছে স্বার্থ-সিদ্ধির একমাত্র উপায়। কিন্তু যত প্রশস্ত উপায়েই আমি আমার সুবিধা বা স্বার্থলাভ করি না কেন সেই লাভ দ্বারাই আমার কামনার পূর্ণ শান্তি হয় না। তার কারণ অতি সাধারণ। মানুষের কামনার শেষ বা সীমা নেই। ফলত কল্যাণের আহ্বান মানে পরিপূর্ণতার আহ্বান। সসীম জীবের ধর্মই হচ্ছে অসীমকে কামনা করা। সেইজন্য স্বার্থ-সিদ্ধি দ্বারা বা উপভোগ দ্বারা কল্যাণ বা শ্রেয়কে পাওয়া যায় না। সাধুতাকে স্বার্থপরতার যত কেন না সূক্ষ্মরূপ বলে অভিহিত করা হোক কল্যাণ-সাধনার অন্তর্গত বিরোধ তাতে যায় না এবং কল্যাণকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ কল্যাণকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করতে গেলে কল্যাণের উর্ধ্বে যেতে হয়।

এ ছাড়া আরো কতকগুলো সহজ সত্যের দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কোনো সমাজব্যবস্থাতেই ব্যক্তি তার পূর্ণ কল্যাণ লাভ করতে পারে না। এই ত্রুটি সমাজব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রমাণ করে। তাত্ত্বিক বিচারে আত্মত্যাগের বা আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হচ্ছে এক প্রকার ব্যর্থতার নিদর্শন মাত্র। স্পেন্সার মহোদয়ের নূতন জেরুজালেম নামক কাল্পনিক সমাজে কোনো অশুভ নেই। কিন্তু একমাত্র নির্বোধের পক্ষেই এইরকম কাহিনীতে বিশ্বাস করা সম্ভবপর। কারণ সসীম জীবমাত্রেই ভৌতিক দুর্ঘটনার দাস এবং সসীম জীবের এই বৈশিষ্ট্য চলে যাবে একথা অবিশ্বাস্য। তার ওপর আরো দেখা যায় যে যে-কোনো সমাজব্যবস্থার অধীনে মানুষ থাকুক না-কেন ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ বা স্ফূর্তি কখনো সম্ভবপর নয়। সমষ্টির হিতের জন্য ব্যষ্টিকে কিছু-না-কিছু আত্মনিগ্রহ করতেই হবে। কারণ এক-একজনের এক-একটা বিশিষ্ট কর্ম করবার অধিকার থাকে এবং এই কর্মভেদের জন্য ব্যক্তির বিকাশ সংকীর্ণ, সংকুচিত ও একমুখী হতে বাধ্য। এই নিগ্রহ বা সংকোচের ফলে ব্যক্তি কখনো পরিপূর্ণ সমন্বয় লাভ করতে পারে

না। আরো একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কোনো বিশেষ শিল্পচর্চা বা জ্ঞান-সাধনা, যদি কোনো ব্যক্তির জীবনের কাম্য হয় তা হলে তাকেও সর্বমুখী ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। অপর পক্ষে এই কাল্পনিক নূতন জেরুজালেমেও যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থ-সাধনা করবে তার ভাগ্যে ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতা হচ্ছে সুনিশ্চিত। এর কারণ, দোষযুক্ত ও পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক ভিত্তির ওপর সমন্বয়পূর্ণ শৃঙ্খলা গড়া যায় না। তা ছাড়া নৈরাশ্যের আরো একটা কারণ আছে। এই ব্যক্তিটা শুধু সসীমের বন্ধনের মধ্যেই একটা পরিপূর্ণ সমন্বয় রচনা করতে চায় না। যে-সব উপকরণ দিয়ে এই স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তিটি সমন্বয় রচনা করতে চায় সেগুলোর কোনো স্বাভাবিক সীমা নেই। সেগুলোর সম্বন্ধ হচ্ছে আরো অসংখ্য জিনিসের সঙ্গে। সুতরাং আমাদের অতিপরিচিত সিদ্ধান্তে আবার আসতে হয়। মানুষ কখনো পরিপূর্ণতালাভ করতে পারে না। তাই যদি হয় তা হলে কল্যাণের দ্বারা যে পরিপূর্ণতা অন্বেষণ করা হয় সেই পরিপূর্ণতা অলভ্য। এই দৃষ্টিতে কল্যাণ অবাস্তব অর্থাৎ কল্যাণের সত্তা হচ্ছে আপেক্ষিক; তার সত্তা পারমার্থিক নয়। কল্যাণ হচ্ছে পরমতত্ত্বের একবিধ আপাতস্বীকৃত অবভাসমাত্র।

দৃশ্যমান জগতের তথ্যগুলো যে আপেক্ষিকরূপে সত্য হতে পারে এই সম্বন্ধে লৌকিক দর্শন সম্পূর্ণ অন্ধ। লৌকিক দর্শনের বিচারে কোনো একটা জিনিস হয় তথ্য নতুবা মতিভ্রম। যদি তথ্য হয় তা হলে সেটা বাস্তব এবং যদি মতিভ্রম হয় সেটা শূন্যমাত্র। যেসব সত্তা আপেক্ষিকরূপে বা আংশিকরূপে অবাস্তব কেবল সেইসব সত্তার শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়েই পরমার্থের প্রকাশ; শৃঙ্খলাকে বাদ দিলে এইসব প্রতীয়মান সত্তা পরস্পর-বিরোধী ও স্ব-বিরোধী; অথচ সংঘর্ষশীল এইসব উপাদানের বাইরে কিছু নেই কিংবা কিছু থাকতে পারে না; অবভাসিত ও আপাতদৃষ্ট তথ্যগুলো যদি দুরপনেয়রূপে আত্মবিরোধী না হত সেগুলো পরমসত্তার প্রকাশ হতে পারত না। এই তত্ত্বটা লৌকিক দর্শনের কাছে দুর্বোধ্য ও অর্থশূন্য। তথ্য যে অ-বাস্তব হতে পারে লৌকিক মত তা বিশ্বাস করতে অপারগ। অপর পক্ষে সংযত সমালোচনার নামে যেসব প্রশ্ন সে উত্থাপন করে সেগুলো হচ্ছে কতগুলো স্থূল কুসংস্কারের প্রকাশমাত্র। এই অপরিচ্ছন্ন চিন্তার একটা খুব ভালো দৃষ্টান্ত লৌকিক নীতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। কল্যাণের ভাবের

অন্তর্নিহিত বিরোধটা যে কল্যাণের অ-পারমার্থিক সত্যতার জন্য, এই সিদ্ধান্ত লৌকিক দার্শনিকেরা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। এই বিরোধের নিরসন যে অন্য কোনোরূপে সম্ভবপর নয় সেই বিষয়ে লৌকিক মত সম্পূর্ণ অচেতন। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের আভ্যন্তরীণ অসংগতি প্রমাণ করে যে কোনোটাকেই যুক্তিসম্মত বলা যায় না। এইরকম সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত মত তার ধার কাছে ঘেঁষে না। এই দুটো আদর্শের মধ্যে কোনো বিরোধ বা অসংগতি নেই। অতএব দুটোর মধ্যে একটা সত্য এবং অপরটা হচ্ছে মিথ্যা; কিংবা এই দুটো আদর্শই পরম ও প্রামাণ্য; সুতরাং কল্যাণ হয় এই দুটো আদর্শের মিশ্রণ কিংবা এ দুটো আদর্শের মিলন। লৌকিক নীতিশাস্ত্রে এইরকম কতগুলো মত প্রচলিত আছে। এই মতগুলোর বিষয় আমি কিছু আলোচনা করব।

১. একমতে আত্মবিলোপ হচ্ছে কল্যাণ। এই মত-অনুসারে আত্ম-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে পাপ বা অন্যায়। কিন্তু আত্মবিলোপরূপী কল্যাণের অভ্যন্তরে বিরোধ বর্তমান। কারণ আত্মত্যাগও হচ্ছে একপ্রকার আত্মবিকাশ বা আত্ম-পরিণতি এবং সেইজন্য আত্মত্যাগের মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠার উপাদান বেশ খানিকটা আছে। সুতরাং শুদ্ধ আত্মত্যাগকে কল্যাণ বলা সম্পূর্ণ অর্থশূন্য। কারণ, শেষ পর্যন্ত সসীম জীবের চেতনার মধ্যেই অবশ্য কল্যাণকে বাস্তবরূপ ধারণ করতে হবে; এবং শ্রেয়ঃ বললে সব সময়েই অপরের হিতকে বুঝতে হবে, এই উক্তি অসংগতিপূর্ণ। এইরকম মত স্বীকার করার ফল দুরকম হতে পারে। হয় আমাদের স্বীকার করতে হয় যে কল্যাণ শূন্যমাত্র। নয় আমাদের বলতে হয় যে কর্ম বা ভোগ করবার সময় আমরা যা করি বা ভোগ করি সেটা যে শুভ বা প্রশস্ত এই বোধ আমাদের থাকে না। কল্যাণটা যেন বাইরে থেকে আসা অন্য কোনো জিনিস। অর্থাৎ এই স্থলে কল্যাণকে শুভ বলা চলে না এবং পূর্বোক্ত স্থলে কল্যাণকে অস্তিত্বশীল বলা চলে না। সর্বসাধারণের হিত বা প্রকর্ষের জন্য কর্ম করতে গেলেই নিজের হিতও সাধিত হয়। কারণ ব্যষ্টি হচ্ছে সমষ্টির অংশমাত্র। সুতরাং পরার্থে কৃতকর্মকে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ বলা যায় না। এবং যদি এই কথা বলা হয় যে ব্যক্তি বৃহত্তর সমাজের অংশ, সুতরাং সমাজের হিতসাধন করাই একমাত্র নৈতিক আদর্শ, কারণ সেইভাবে কর্ম করেই ব্যক্তির হিতসাধন সম্ভবপর, তা হলে সেই প্রকার আচরণকে

বিশুদ্ধ আত্মত্যাগমূলক অভিহিত করা যায় না। সুতরাং কল্যাণের আত্ম-বিলোপমূলক পরিভাষা হচ্ছে অসংগতিপূর্ণ ও অযৌক্তিক।

২. দ্বিতীয় লৌকিক মত এই : আত্মাকে অতিক্রম করে বাইরে যাওয়া যায় না। সুতরাং আত্মপ্রতিষ্ঠা কিংবা আত্মহিতসাধনই হচ্ছে যথার্থ নৈতিক আদর্শ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ হিত কামনা করার জন্য সকলের হিত সাধিত হয়। কিন্তু অন্যের হিত হচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণের একটা আক-স্মিক ফলমাত্র। পরের হিতকে স্বার্থের সমান মূল্যবান মনে করতে গেলে আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। আমরা শুদ্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠার বিষয় এখানে আলোচনা করব। কারণ আমাদের এই মত-অনুসারে শুদ্ধ আত্মহিতসাধনই হচ্ছে চরমোৎকর্ষ বা কল্যাণ। এইরকম কল্যাণ লাভ করা অসম্ভব। এর কারণ আমরা জেনেছি। কোনো সসীম জীবই কল্যাণকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করতে পারে না। শুধু ভৌতিক ভিত্তিটাই যে পরিবর্তনশীল এমন নয়। যে-সব উপাদানকে নিয়ে সমন্বয় সৃষ্টি করতে হবে সেগুলোর অবস্থান আত্মার বাইরে। সেইজন্য সেগুলোকে একটা সম্পূর্ণ সমন্বয়ের শৃঙ্খলা দান করা যায় না। অন্যরূপে এই অলভ্যকে পাওয়ার চেষ্টা করলেও অকৃতকার্য হতে হয়। ব্যবহৃত উপাদানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপেক্ষা করে শুধু তার এক অংশে সমন্বয় আনবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু সেই চেষ্টাও বিফল হয়। কারণ সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য অংশকে স্বীকার করতে হয় এবং আমাদের প্রয়াস যে অসংগতিপূর্ণ তাই প্রমাণিত হয়। এই কারণে আমরা বলতে বাধ্য যে কখনো কেউ কেবল ও শুদ্ধ স্বার্থ-অন্বেষণ করতে পারে, এমন কথাই অযৌক্তিক। কেবল স্বার্থ নামক কোনো কিছু নেই। সাধারণত লৌকিক মতে প্রত্যেক মানুষের নিজ ব্যক্তিত্ব হচ্ছে সমাজ থেকে একটা পৃথক জিনিস এবং এই পৃথক ব্যক্তিত্বের বিকাশেই হচ্ছে প্রত্যেকের নৈতিক কল্যাণ। কিন্তু এই মত গ্রহণ করা যায় না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যে সমাজের অভাবে একই রূপ থাকে এমন বলা চলে না। স্বার্থান্বেষণ করতে গেলেও ব্যষ্টিকে কেবল নিজ বা ব্যক্তিগত হিতের কথা ভাবলে চলে না। তাকে অন্যের হিতের কথাও ভাবতে হয়। সুতরাং কেবল নিজের সুবিধা করো বা খোঁজো এই নীতিবাক্য প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে আত্মবিরোধী এবং অসার।

৩. তৃতীয় লোকমত এই। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিলোপ দুটোই কল্যাণপ্রদ। এই দুই আদর্শকে এক তৃতীয় আদর্শে সম্মিলিত করবার কোনো দরকার নেই। এই দুটো আদর্শকেই আমাদের জীবনে পাশাপাশি সংযুক্ত রেখে আমরা শ্রেয়ের সাধনা করতে পারি। কিন্তু আমরা বরাবরই দেখে আসছি দুটো সান্ত উপাদানের সমন্বয়ের জন্য উভয়েরই পরিবর্তন প্রয়োজন। এই পরিবর্তনের ফলে কোনো উপাদানটাই নিজরূপে সত্য থাকতে পারে না। উভয়কেই পরিবর্তিত হয়ে এক উচ্চতর ও অন্যতর সত্তায় মিলিত হতে হয়। লৌকিক বিচারে এইরকম সমন্বয়ের ধারণা দুর্বোধ্য। সুতরাং প্রচলিত মত-অনুসারে দুটো আদর্শকেই কোনোরকম পরিবর্তন সাধন না করেও বাস্তবরূপ দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই যে ব্যক্তি সর্বসাধারণের হিতসাধন করতে গিয়ে নিজের মঙ্গলও সাধিত করে। আবার আত্মহিত অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্যক্তিকে সর্বসাধারণের হিত সম্বন্ধেও অবহিত হতে হয়। ব্যবহারিক জীবনে আমরা দেখি যে মঙ্গল যেন দুই পরস্পরবিরোধী আদর্শের বা ভাবের মধ্যে একটা অপূর্ব ঐক্য। এক আদর্শ যেন অন্য আদর্শের মধ্যে অন্তর্নিহিত এবং প্রত্যেক আদর্শই যেন অপর আদর্শের এক অংশমাত্র। এই মিলনকে সংযোগ বা সংমিশ্রণ বলা অন্যায় হয়। এই মিলন সমন্বয়মূলক ; যখন কল্যাণের অভ্যন্তরের এই সমন্বয়-সাধক শক্তি সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় তখন আমরা কল্যাণকেও অতিক্রম করে যেতে বাধ্য হই। লৌকিক নীতিশাস্ত্র-অনুসারে শুধু কল্যাণ কেন, কল্যাণের বিভিন্ন দিকের স্বাতন্ত্র্যও হল নিত্য ও চরম। সেইজন্য লৌকিক মতে বিভিন্ন দিকের উচ্চতর সমন্বয় অসম্ভব। যা সম্ভব তা হচ্ছে বিভিন্ন আদর্শের একটা বাহ্য সংযোগ বা মিশ্রণ।

কিন্তু দুটো চরম কল্যাণের সহভাব কি করে যুক্তিসংগত হয় আমরা বুঝতে পারি না। দ্বিবিধ কল্যাণের সহভাব মানেই হচ্ছে দুটোর মধ্যে বন্ধন। বন্ধন থাকলে এই বন্ধন দ্বারা উভয়েই প্রভাবিত হতে বাধ্য। এবং উভয়কেই এক বৃহত্তর সমগ্রতার মধ্যে স্থান গ্রহণ করতে হয়। অথচ লৌকিক মত-অনুযায়ী মিশ্রণের ফলে এই মঙ্গল দুটোর স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় না। এইরকম বিচার একান্ত দুর্বোধ্য। অন্য দিকে যদি সম্বন্ধে আসবার জন্য উভয়ের মধ্যেই পরিবর্তন উৎপন্ন হয় তা হলে এই দুই উপাদানকে চরম বলে স্বীকার করা যায়

না। সংক্ষেপে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই বাস্তবের বাহ্য সংযোগের ধারণাটি হচ্ছে স্ব-বিরুদ্ধ ও অলীক। লৌকিক বিচার এইসব সূক্ষ্ম জটিলতা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং সেইজন্য অসম্ভব সাধন করবার জন্য তার এত উদ্দাম ও অন্ধ আবেগ।

লৌকিক নীতিশাস্ত্র সেইজন্য এক দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণ করে। কল্যাণের বিভিন্ন দিকের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং অসামঞ্জস্যের যুক্তি হচ্ছে শেষ পর্যন্ত অসার এবং সেইজন্য তার বিভিন্ন দিক হচ্ছে স্ব-রূপে পরমসত্য এবং কল্যাণ হল পরমসত্য। সেই দায়িত্ব হচ্ছে এই মত প্রমাণ করবার গুরু দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্বের সম্পূর্ণ তাৎপর্যটাই সে যথার্থ বোঝে বলে মনে হয় না। সে শুধু প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে পরার্থ ও স্বার্থের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই; অর্থাৎ নৈতিক দৃষ্টিতে আত্মোৎসর্গের কোনো সম্ভাবনা নেই। এবং এই অপ্রভেদ প্রমাণ করার সঙ্গে সঙ্গে মূল সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায় এইরকম তার ধারণা। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে এইভাবে মূল প্রশ্নটার কোনো উত্তর দেওয়া হয় না। আমরা আগেই জেনেছি যে আমাদের কামনার অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে পরমোৎকর্ষলাভ বা পরমসিদ্ধি। এই কথা স্বার্থকামনা ও পরার্থকামনা উভয় কামনার ক্ষেত্রেই খাটে। কিন্তু স্বার্থলাভের জন্য পরোপকার করা সংগত এই তত্ত্ব স্বীকার করলেও তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে আমরা চরমসিদ্ধি লাভ করি। সুতরাং দেখা যায় যে লৌকিক মত বলতে পারে না যে প্রকৃত কল্যাণের প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থায় বলতে হয় যে কল্যাণঘটিত মূল প্রশ্নটার মীমাংসা এই মতের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে না। মীমাংসা পাওয়া যায় বলে যিনি বিশ্বাস করেন তিনি বিবেচনাশূন্য। এবার নৈতিক জগতের শৃঙ্খলার প্রশ্ন সম্বন্ধে এই মত যা বলে সেই বিষয়ে আলোচনা করে দেখা যাক।

এখানে বেশি কিছু না বললেও চলে। শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য যে-কৌশল অবলম্বন করা হয় তা হচ্ছে অতি পুরানো। হয় স্পষ্টভাবে নতুবা অস্পষ্টভাবে এই বলা হয় যে শৃঙ্খলাটা রক্ষা করে বিশ্বযন্ত্র-বহিস্থ যাদুকর ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের যাদুক্রিয়ার কল্পনার আশ্রয় এইজন্য নিতে হয় যে স্বাভাবিকরূপে এই সামঞ্জস্য অসম্ভব। সসীম সত্তার পক্ষে পরমসিদ্ধিলাভ বা পরমশ্রেয়োলাভ হল একেবারে অসম্ভব। মনুষ্যজীবনের স্থায়িত্ব বেশ খানিকটা দীর্ঘতর করতে পারলে হয়তো পরোপকারকেই নিজ জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করা

সম্ভবপর হত। কিন্তু এই কাল্পনিক সম্ভাবনা দ্বারা প্রকৃত ও প্রধান সমস্যার সমাধান হয় না। সেরকম একটা সম্ভাবনাতে বিশ্বাস বেশ আরামপ্রদ। কারণ পরহিতে রত হওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ স্বার্থপরতা এরকম আশ্বাস তার থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু এই তত্ত্ব যদি সত্যও হয় তা হলেও তার তাৎপর্য এই হয় না যে আমরা নিজের বা পরের কিংবা উভয়েরই চরমহিত সাধন করতে সমর্থ। সুতরাং আমাদের আদর্শ-দুটো যে পরিপূর্ণতা লাভ করে তার কোনো প্রমাণ নেই; এবং কল্যাণ-বিষয়ক বৃহত্তর অসংগতিগুলো থেকেই যায়। আমরা এও বলতে পারি যে ঈশ্বরের কল্পনা দ্বারা কোনো ফল হয় না। এই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে জটিলতা বাড়ে এই মাত্র। ঈশ্বরকে বর্জন করে লৌকিক নীতিশাস্ত্রে সেইজন্য যৌক্তিকতার দোহাই দেওয়া হয়। দুটো নৈতিক আদর্শই যুক্তিসম্মত; সুতরাং সেদুটোর মধ্যে বিরোধ অযৌক্তিক। কিন্তু এই বিচার ভ্রান্ত। যে উপাদানগুলোর মধ্যে অসংগতি এবং যেগুলো পরস্পরবিরোধী সেগুলোর পরিবর্তন ব্যতীত সমন্বয় সম্ভবপর এরকম সিদ্ধান্তকে বুদ্ধিসম্মত বলে স্বীকার করা যায় না। এইভাবেও সামঞ্জস্য প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত লৌকিক মত পূর্ণ সংশয়বাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু এই লৌকিক সংশয়বাদ হল সম্পূর্ণ বিচারশূন্য এবং কতগুলো অন্ধ সদর্থক বিশ্বাসের কুফলমাত্র। কোনো বিষয়কে সম্পূর্ণ বিচার করে তার অসংগতি লক্ষ্য করে সংশয় করা অবশ্য অন্য ব্যাপার। কারণ এইরকম সংশয়ের সাহায্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে বৃহত্তর ও উচ্চতর ঐক্যের মধ্যে পরিবর্তনের পর অসংগতিগুলো লোপ পাবে। এরকম সংশয়বাদ হচ্ছে সৃজনধর্মী তত্ত্বশাস্ত্রের অঙ্গবিশেষ। লৌকিক সংশয় একপ্রকার ঘোর জড়তা।

এইসব বিষয়ের আলোচনাগুলো ক্লান্তিকর হলেও সেগুলোর দ্বারা আমরা লাভবান হয়েছি। আমরা কল্যাণসম্বন্ধীয় আমাদের বিশ্বাস যে সত্য তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। কল্যাণের চরম বা পরম সত্যতা বা বাস্তবতা নেই। কল্যাণ হল বিশ্বের একপ্রকার আংশিক ও অসম্পূর্ণ প্রকাশ। কল্যাণের অন্তর্গত অসংগতি তার আপেক্ষিকতা প্রমাণ করে। তার মধ্যে স্বতো-বিরোধ ও তার অন্তর্গত দুই নীতির মধ্যে স্বতো-বিরোধ তার অপারমার্থিকতা প্রমাণ করে। কল্যাণ পরমতত্ত্বে পরিপূর্ণতা লাভ করে;

কিন্তু কল্যাণের পরমসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণের নিজ রূপ থাকে না। তবে কল্যাণ পরমসত্তায় স্থান পায়; সুতরাং একে বিশ্বের একটা প্রধান মৌলিক উপাদান বলাও চলে।

বিভিন্ন লক্ষ্যের বা অর্থের মধ্যে বিরোধের বিষয়ে আলোচনা করেও আমরা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছই। পরমতত্ত্বে সমস্ত ভাবই বাস্তবে পরিণত হতে বাধ্য। কিন্তু দৃশ্যমান জগতে কামনার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিরোধ আছে। সুতরাং বাহ্য সংযোগ দ্বারা সেগুলোর সমন্বয় সাধন অসম্ভব। পরমতত্ত্বগত সমন্বয়ের জন্য সেগুলোর শোধন দরকার। আমরা সেইজন্য একই সঙ্গে দুই বিপরীত মন্তব্য করতে পারি। ১. এই অর্থগুলোর প্রত্যেকটাই ইষ্ট এবং ২. এই অর্থগুলোর কোনোটাই হিত নয়। এইসব কামনার বস্তুর মধ্যে সেইসব বিষয়ও আছে যেগুলোকে আমরা প্রকৃত অশুভ বা অধর্ম বলেছি। (সপ্তবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ধর্ম বা ইষ্ট কি জেনেও জ্ঞানত অধর্ম বা দুষ্কর্ম আচরণ করা যায়; তার জন্যও চরম উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে না। এরকম ব্যাপারও চরম উদ্দেশ্য সম্পাদনের কাজে সহায়ক হয়ে ওঠে। অজ্ঞানের বশবর্তী বা দৌর্বল্যের বশবর্তী যে দোষযুক্ত কর্ম করা যায় সেটাও হচ্ছে শেষ পর্যন্ত পরমকল্যাণ সম্পাদনের অনুকূল। সত্য ও ভ্রান্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ, ইষ্ট ও অনিষ্টের মধ্যেও সেই একই সম্বন্ধ। শেষ পর্যন্ত শুভ ও অশুভের মধ্যে কোনো চরম বিরোধ নেই, তবে দৃশ্যমান জগতে এই দুইএর বিরোধ অতি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। ভ্রান্তি ও অশুভ দুটোই প্রত্যক্ষ তথ্য এবং দুটোরই তারতম্য আছে। এবং বিচার্য বিষয়টার কতখানি চরম অর্থ বা বাস্তবতা আছে তা নির্ভর করে তার ইষ্টত্বের তারতম্যের ওপর। তবে কোনো ইষ্টই শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিজরূপে বাস্তব হতে পারে না। অর্থ ও অনর্থ, শুভ ও অশুভ হচ্ছে আপেক্ষিক সত্যমাত্র। আমরা হয়তো এখন আশা করতে পারি যে আমাদের মত আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।

কিন্তু এইসব বিষয়ে আধুনিক চিন্তাধারা এত ঘোলাটে যে আমি বিচারটি আরো বিস্তারিতরূপে করা ভালো মনে করি। কল্যাণের একটা সূক্ষ্মতর অর্থ আছে। সেই দিক থেকে কল্যাণকে বিচার করা হয় নি। শুভ-বুদ্ধি বা সৎবুদ্ধি এবং শুভ ইচ্ছা বা সদিচ্ছা, এক কথায়, নৈতিকতাই হচ্ছে

নৈতিক কল্যাণ বা নৈতিক প্রকর্ষ ; এবং নৈতিক বোধ এবং নৈতিক ইচ্ছা একান্ত আভ্যন্তরিক জিনিস। আত্মার বাইরে হোক কিংবা ভিতরে হোক শুদ্ধ ফলপ্রাপ্তিটাই কখনো কল্যাণ নয়। কারণ, ফললাভের জন্য মানুষকে প্রকৃতি বা স্বভাবের দানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এবং ফল কেমন হবে তাও প্রকৃতিদত্ত সুবিধা ও অসুবিধার উপর নির্ভর করে। অথচ কোনো মানুষকে এই নৈসর্গিক দোষ ও গুণের জন্য দায়ী করা চলে না। সুতরাং যথার্থ নৈতিকতা বা নীতিশীলতার বিচারে কর্মের সাফল্যের বিচার সম্পূর্ণ অবান্তর ; কারণ এই সাফল্য আকস্মিক এবং সাফল্য যে-সব জিনিসের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত, সে-সব জিনিসের নৈতিক মূল্য নেই। মানুষের যে অংশটুকু একান্ত নিজস্ব বা স্বকীয়, শুধু তাই দিয়েই তার বিচার করা সংগত। তার মনের স্বাভাবিক গঠন, তার বাহ্য পরিবেশ এগুলো প্রকৃতির দান, তার নিজস্ব নয়। সুতরাং নৈতিকতাও যা, শুভবুদ্ধি এবং শুভ ইচ্ছাও তাই। সৎভাবের প্রতি ইচ্ছার নাম সদিচ্ছা। এবং সদিচ্ছা এবং সৎবুদ্ধি ও নৈতিকতা হচ্ছে এক জিনিস। যে মানুষ শুভতম সম্বন্ধে তার নিজ ধারণা-অনুযায়ী কর্ম করতে চেষ্টা করে, এই মত-অনুযায়ী সেই নীতিপরায়ণ। যে বিষয়কে সে শ্রেষ্ঠ বা পরমকল্যাণ বলে মনে করে সেটা যদি বাস্তবিকত শ্রেষ্ঠ বা পরম কল্যাণ না হয় নৈতিক বিচারে তাতে যায় আসে না। এবং তার ইচ্ছা দ্বারা কৃতকর্মে সে যদি সিদ্ধিলাভ করতে অসমর্থ হয় তাতেও কিছু হয় না। তার ইচ্ছা বা চেষ্টাটাই নৈতিক বিচারের একমাত্র জিনিস। এই দিক থেকে দেখলে মনে হয় যে বিভিন্ন যুগের নৈতিক মূল্য বিচার করা অসম্ভব। এমন-কি এক ব্যক্তি কিংবা এক যুগের নৈতিকতা অন্য ব্যক্তি বা অন্যযুগের নৈতিকতার চেয়ে উচ্চস্তরের এইরকম কথার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ থাকা সুকঠিন। কারণ কেবলমাত্র সদিচ্ছার ঐকান্তিকতাটুকুও এখানে বিচার্য। পাপ পুণ্য ও নৈতিক দায়িত্ব সমস্তই ইচ্ছার নৈতিকতা বা অনৈতিকতার উপর নির্ভরশীল। এবং আত্মার অমরত্বের যুক্তিকে হয়তো এই মতের উপর দাঁড় করানো যায়।

নৈতিকতা সম্বন্ধে এইরকম ধারণা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে কোনো মানুষের নৈতিক বিচার করতে গেলে তার মনোগত ইচ্ছার নৈতিকতাই বিচার করা উচিত। এইরকম মত

গ্রহণের ফলে যদি কল্যাণের ধারণা বাধিত হয় কিংবা অন্যবিধ অসংগতির উদ্ভব হয়, তা হলে এই ব্যাপার আমাদের বক্তব্যেরই সমর্থন করবে। এই-রকম পরিণতি দ্বারা প্রমাণিত হবে যে শেষ পর্যন্ত কল্যাণ হচ্ছে একটা ব্যবহারিক তত্ত্ব। এও বলতে পারি যে বর্তমান মতের অসংগতি দেখে আমরা সুখী হয়েছি। এই মতের একটা চরমপন্থী রূপ আছে। সেই চরমপন্থী মতে কল্যাণের অন্তর্গত অস্তিত্বরূপী উপাদানটাকে নৈতিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। আমাদের বর্তমান মতটা তত চরমপন্থী না হলেও তার মধ্যেও একই প্রকার অসংগতিদোষ আছে। কারণ, ইচ্ছা কেবল ইচ্ছা হতে পারে না, ইচ্ছাকে কিছু কর্ম করতেই হয় এবং এই কর্ম দ্বারা তাকে বিশিষ্ট হতে হয়। অপর পক্ষে কর্মের রূপ কি হবে তা প্রকৃতির দানের ওপর নির্ভর করে। আমাদের সেইজন্য দুটো মারাত্মক পথের মধ্যে বেছে নিতে হয়। হয় আমাদের বলতে হয় যে ইচ্ছাই হচ্ছে সব এবং আমরা কি কর্ম করি সেটা একেবারে অবান্তর; নতুবা আমাদের বলতে হয় যে ইচ্ছা সব নয় এবং ইচ্ছার অতিরিক্ত ও অতীত অন্য কিছুও হচ্ছে নৈতিক প্রকর্ষের অঙ্গবিশেষ।

এবার পাপ ও পুণ্য বা কর্মফলের বিষয় দু-এক কথা বলব। সাধারণত কর্মফল বলতে আমরা বুঝি যে সুকৃতি এবং দুষ্কৃতির জন্য পৃথক পৃথক ফল আছে; যেমন পুণ্য বা সুকৃতির ফল সুখ এবং পাপ বা দুষ্কৃতির ফল দুঃখ। কিন্তু এই ধারণা অসংগতিপূর্ণ। কারণ সাধুতা এবং সুখের মধ্যে সংযোগসম্বন্ধ যদি অপরিহার্য হয়, তা হলে সাধুতার সংজ্ঞা এমন করা উচিত যে সুখও তার অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। এবং অপর পক্ষে এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ যদি নিতান্ত বাহ্য বা আকস্মিক হয় তা হলে সাধুতার জন্য সুখলাভ না করলে নৈতিক বোধ পীড়িত হবে কেন? সুতরাং হয় আমাদের নৈতিক ফলের ধারণা বদলাতে হয়; নতুবা কল্যাণ-বিষয়ক এই চরমদর্শী মতটাকে ত্যাগ করতে হয়। এবার এই চরমপন্থী ইচ্ছাত্মক ধারণার অন্তর্নিহিত অসংগতিগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

লৌকিক নীতির সঙ্গে এই চরমপন্থী মতের সম্পূর্ণ বিরোধ। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা-কিছু বাঞ্ছনীয় মনে করি তাকেই প্রশংসা বা শ্রদ্ধা করি। বিত্ত, রূপ, বল, আরোগ্য এবং সৌভাগ্য এবং আরো অনেক কিছু আমরা

কামনা করি ও শ্রদ্ধা করি। এ সবার বাড়া, সমস্ত মানুষী উৎকর্ষের অতিরিক্তও কিছুকে যেন আমরা কামনা করি ও প্রশংসা করি। কিন্তু এইসব শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধার কিংবা প্রশংসা বা নিন্দার নৈতিক বিচার করতে বোধ হয় আমাদের বাধে। সুতরাং সেইসব উৎকর্ষের বিষয় আলোচনা করা যাক যেগুলোকে নৈতিক দৃষ্টিতে উৎকর্ষ বলা চলে। যে-সব সাধারণ নৈতিক গুণ দিয়ে ব্যক্তির সচ্চরিত্রতার বিচার করা হয়, সেগুলোর বিষয়ে ভাবা যাক। এইসব গুণ অনেকাংশে প্রকৃতিদত্ত স্বভাব ও শিক্ষা ও দীক্ষার ওপর নির্ভর করে। সেগুলোকে ব্যক্তির স্বকীয় ইচ্ছার দান বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে সেগুলো নৈতিক বিচারে একান্ত অবান্তর, এরকম সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত উদ্ভট বলেই মনে হয়। এবং দৈনন্দিন জীবনের বিশ্বাসগুলোর সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের কোনো সাদৃশ্য নেই।

তা ছাড়া, এই মতকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত তার তাৎপর্য শূন্যতা মাত্র। এই মত-অনুযায়ী মানুষের ইচ্ছা থেকে যা আগত একমাত্র তার দ্বারাই তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এবং এই বলার অর্থও যা শূন্য দিয়ে নৈতিক বিচার করা হয় বলাও তাই। কারণ ইচ্ছাক্রিয়ার ফলরূপে যা উদ্ভূত হয় তার মধ্যে কিছুই ইচ্ছার থেকে প্রাপ্ত নয়, তার সব-কিছুই প্রাকৃতিক দান। এই ইচ্ছাফলটির উৎপত্তি, পরিণতি ও সমাপ্তি সবই নৈসর্গিক উপাদানের দ্বারা নির্দিষ্ট। নৈতিক মানুষ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ নয়; অথচ নিজ জ্ঞান-অনুসারে শুধুমাত্র কর্ম করার ইচ্ছাকে নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে কর্ম কি ক'রে করে সে? তার আধি ও ব্যাধি হচ্ছে তার কর্মের অন্তরায়। তাকে প্রয়াস করতে হলেও প্রাকৃতিক দানের ওপর নির্ভর করতে হয়। কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা কর্ম করা মনোবিদ্যা-অনুসারে অসম্ভব। ধরুন, দুজন ব্যক্তির কর্মের নৈতিক বিচার করা হচ্ছে। তার মধ্যে একজন শরীর ও মনের সম্পদ প্রকৃতির কাছ থেকে প্রচুর পেয়েছে এবং অপর জনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি কৃপণ। এইস্থলে যদি স্বভাব-প্রদত্ত দোষ-গুণকে একেবারে উপেক্ষা করি তা হলে কি বিচার সংগত হবে? অথচ বিচার্য মত যদি সত্য হয় তা হলে এগুলোকে একান্ত অবান্তর বিবেচনা করতে হয়। কারণ, নৈতিকতার মর্মকথা হচ্ছে স্বকীয় জ্ঞান-অনুযায়ী সংকল্প। ফলে, নৈতিক বিচার হয়ে পড়ে অসম্ভব; অন্যথা ইচ্ছা-

অতিরিক্ত বাহ্য জিনিসেরও নৈতিক মূল্য স্বীকার করতে হয়। নৈতিক বোধের ক্ষেত্রেও কম অসুবিধা হয় না। শিক্ষা ও স্বভাবের অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষের জন্য একজনের নৈতিক বোধ আর-একজনের চেয়ে উচ্চতর হতে পারে। এবং কারো পক্ষে সবসময়ে পরম কল্যাণের জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের বলতে হয় যে এইসব তথ্য নৈতিক বিচারে অবান্তর। আগে দেখলাম কে কি করে সেটা অবান্তর। এখন দেখছি কে কি জানে সেটাও অবান্তর হয়ে পড়ছে। এক কথায় শুভ ও অশুভের পার্থক্যটাই যেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এখানে নৈতিক দ্বন্দ্বের গভীরতা দিয়ে নৈতিকতাকে বাঁচাবার চেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ হচ্ছে দুটো। প্রথমত দ্বন্দ্বের তীব্রতা বা গভীরতা নির্ভর করে বাহ্য উপাদানের ওপর। দ্বিতীয়ত এই কল্পনা করতে হয় যে হিত মানে হচ্ছে হিতের জন্য মানুষের মনের এক প্রকার আভ্যন্তরিক সংগ্রাম বা দ্বন্দ্ব। ব্যক্তিবিশেষের নৈতিক উৎকর্ষ-বোধের জন্য তা হলে দরকার হয়ে পড়ে খানিকটা নৈতিক অপকর্ষ। কারণ এই নৈতিক দোষ না থাকলে দ্বন্দ্ব হতে পারে না। প্রথমে আমরা এই ভেবেছিলাম যে মানুষ তার সামর্থ্য-অনুযায়ী যা করতে পারে তার দ্বারাই তার সাধুতার বিচার হয়। এখন দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকেই যা করতে পারে তাই করে এবং যা করে কেবল তাই করতে পারে। অর্থাৎ মানুষের সকল কর্ম ও সকল ইচ্ছা প্রকৃতির প্রভাবে কলুষিত। সুতরাং কোনো মানসিক কর্ম বা ইচ্ছার নৈতিক মূল্য নেই। সোজা কথায়, হিত ও অহিতের মধ্যে প্রভেদ করবার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু আপত্তি উঠতে পারে যে আমাদের পূর্ববর্ণিত সিদ্ধান্তটা হচ্ছে ভ্রান্ত। কল্যাণের উপাদানগুলো হয়তো বাইরে থেকে পাওয়া ; কিন্তু তথাপি ইচ্ছার বা সংকল্পের আগ্রহ ব্যতীত সেগুলো গৃহীত হতে পারে না। এই আগ্রহের বশবর্তী হয়ে জীববিশেষ প্রকৃতি থেকে পাওয়া কাঁচা মালকে কল্যাণের রূপে বা আকারে আকারিত করে। এইভাবে কল্পনা করাতেও অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। কারণ, আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে মনোবৃত্তির তাৎকালিক অবস্থার উপর ইচ্ছার ক্রিয়া নির্ভর করে। স্বতন্ত্র ও শুদ্ধ রূপ-দান-ক্রিয়া বলে কিছু নেই। রূপ দিতে গেলে যে জিনিসটার রূপ দেওয়া হচ্ছে তার দ্বারা বিশেষ করে প্রভাবিত হতে হয়। আকৃতির সূচনা ও বিকাশ দুইই হচ্ছে

প্রকৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট। তা ছাড়া যদি আকারিত উপাদানকে উপেক্ষা করে শুধু আকারগত বিচার করা হয় তা হলে শুভ ও অশুভের মধ্যে প্রভেদ থাকে কি করে? সার কথা এই যে, রূপ-দান-ক্রিয়া বা আগ্রহের সূচনার জন্য বাহ্য উপাদানের প্রয়োজন এবং প্রদত্ত বা প্রাপ্ত উপাদানের উপরই আকার-দান-ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। সুতরাং যেসব উপাদানের নৈতিক মূল্য নেই সেসবের দ্বারাই ইচ্ছার নৈতিকতার মাপ করতে হয়।

অবস্তুক রূপ বা আকার এক প্রকার শূন্যতা মাত্র। সুতরাং বস্তু থেকে স্বতন্ত্ররূপে যে আকার তাকে বা শুদ্ধ আকারকে নৈতিকতা বলা যায় না। বড়ো জোর ইচ্ছার আকারকে সেই-ক্ষেত্রে নৈতিক বলা যেতে পারে যে-ক্ষেত্রে হঠাৎ কোনো এক ইচ্ছার আকারের অনুযায়ী উপাদানটি এমনি এসে জোটে এবং ভালো লেগে যায়। কিন্তু নৈতিকতাকে এই অর্থে গ্রহণ করলে সেটা একরকম খামখেয়ালিপনায় পরিণত হয়। নৈতিকতা যেন একরকম বস্তুহীন আত্ম-অনুমোদন মাত্র কিংবা এটা যেন আমার নিছক ভালো-লাগা-না-লাগার ব্যাপার। এই অবস্থায় বিহিত কর্মের সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়ায় সেটা এমন একটা কর্ম যার সম্বন্ধে আমি মনে করি যে সেটার কর্তা হচ্ছি আমি নেহাৎ ঘটনাক্রমে কিংবা এমন একটা কর্ম যেটা হঠাৎ আমার ভালো লেগে গেছে। নৈতিকতার এই সংজ্ঞা অগ্রাহ্য। এইরকম নৈতিকতা শূন্য আত্মম্ভরিতা ও শুষ্ক আত্মপ্রসাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। চিত্তের কোনো ক্ষণিক আবেগ কিংবা সহসাগত কোনো বাসনায় স্ফীত হয়ে শুভের এই বিকৃত রূপ আমরা দর্শন করি। এই ক্ষেত্রে যা শুভ বলে প্রতিভাত হয় তা শুধু অপকর্ম নয় তার মধ্যে কপটতাদোষও থাকতে পারে। কিন্তু যা নিকৃষ্ট তার মধ্যে অন্তত কোনো কপটতা নেই; কারণ তার মধ্যে আত্ম-সমর্থন নেই এবং বৃথা আত্মপ্রসাদ ও আত্মম্ভরিতা তার কাছে নিন্দার্হ। সুতরাং আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে শুদ্ধ আত্মা বা কেবল আত্মিক ক্রিয়া হচ্ছে একেবারে মূল্যহীন। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মেনে নিতে বাধ্য যে, যে-কল্যাণ বা যে-উত্তমতার উপর আত্মার মূল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল সেটা হচ্ছে আত্মার বহির্ভূত। ফলে, আকারসর্বস্ব নৈতিকতার ধারণা পরিত্যাগ করতে হয়। আমরা শেষ পর্যন্ত যে মত গ্রহণ করি তা এই যে, উৎকর্ষ কিংবা অপকর্ষ সম্পূর্ণরূপে আত্মার ক্রিয়ার ব্যাপার নয়; নৈতিকতা শুধু

নৈতিকতার ব্যাপার নয়; নৈতিকতার প্রতি উদাসীন হওয়াই হচ্ছে আমাদের নৈতিক কর্তব্য।

নীতিমান না হওয়াই আমাদের নৈতিক কর্তব্য এই উক্তির মধ্যে কেমন যেন একটা অসত্যাভাস আছে। কিন্তু এই উক্তির অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিই আমরা এই পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছি। বিশ্বের যে-কোনো এক দিকের পার্থক্যের ওপর প্রাধান্য দিতে গেলে সেই দিককে অতিক্রম করে এক উচ্চতর সত্তাকে স্বীকার করতে হয়। অন্যান্য সর্ববিধ আপাতস্বীকৃত ও ব্যবহারিক বা অবভাসিত সত্তার মতন কল্যাণের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণতা দিতে গেলেও কল্যাণ উচ্চতর তত্ত্বের মধ্যে লয় পায়। অথচ এই সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে কল্যাণকে অপরিণত রাখা চলে না। সুতরাং নৈতিকতা-বিকাশের বিভিন্ন স্তরকে এক উচ্চতর সত্তার অন্তর্ভুক্ত অংশরূপে ধারণা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় আমাদের নেই। অর্থাৎ নৈতিক আচরণের লক্ষ্য হচ্ছে অতিনৈতিক আর-কিছু। এবার আমাদের নীতি-বোধ চরিতার্থতার জন্য কি কি প্রয়োজন সেই বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

আমাদের নীতিবোধ প্রথমে চায় নৈতিকতা ও কল্যাণের মধ্যে যে বিচ্ছেদ বা ব্যবধান আছে তার অবসান। আমরা দেখি যে রূপ, বল, সৌভাগ্য প্রভৃতি সর্ববিধ মানবীয় উৎকর্ষকেই আমরা নিঃসংশয়ে ইষ্ট বা শুভ বলে মনে করি। আমরা এইসব প্রাকৃতিক দানকে কামনা করি না কিংবা সেগুলোর গুণকীর্তন করি না এইরকম মনে করা অলস আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। এটা শেষ পর্যন্ত একটা নৈতিক সংস্কার যে আমরা সুন্দরকে সৎ মনে করি। কারণ, শুধু তথাকথিত নৈতিক আচরণকে সাধুতা বা সচ্চরিত্রতা বলতে অনেক অসুবিধা। আমরা আগে লক্ষ্য করেছি যে সাধুতার এই সংকীর্ণ সংজ্ঞা দিতে গেলে সাধুতার কোনো অর্থই হয় না। কারণ যে উৎকর্ষ কেবলমাত্র আভ্যন্তরিক সেরকম উৎকর্ষের অস্তিত্ব নেই। হয় আমাদের স্বীকার করতে হয় যে প্রাকৃতিক উৎকর্ষগুলো শুভ, নতুবা বলতে হয় নৈতিক জীবন অসম্ভব। সুতরাং নৈতিক গুণগুলো কায়িক ও মানসিক বা আধ্যাত্মিক এই দুইরকমই হতে পারে। এবং দুই শ্রেণীর নৈতিক গুণের তারতম্যও আছে। কোনো নৈতিক গুণ বেশি বা কম কায়িক, আবার কোনো গুণ কম বা বেশি

আভ্যন্তরিক। সুতরাং নৈতিকতা বা নীতিপ্রিয়তা হচ্ছে একপ্রকার বিশেষ প্রকর্ষ বা উত্তমতা। বহুবিধ উৎকর্ষের মধ্যে একবিধ উৎকর্ষ হওয়ার জন্য নৈতিক গুণকে অন্য সবরকম প্রকর্ষের সমষ্টিও বলা যায় না কিংবা অন্য সবরকম প্রকর্ষের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্রও বলা চলে না। স্বতন্ত্র ও শুদ্ধ নৈতিকতা হচ্ছে অবাস্তব। কারণ যেসব বিষয় স্বাভাবিকত ইষ্ট বা উত্তম সে-সবের সঙ্গে নৈতিক আচরণের সম্বন্ধ হচ্ছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং কর্তব্যপরায়ণতা বা নৈতিক বৃত্তিও হল একপ্রকার প্রাকৃতিক দান। শরীরগত নৈতিক গুণগুলোকে অস্বীকার করলে কোনো নৈতিক গুণই আর থাকে না। ফলত সর্ববিধ প্রকর্ষ বা উৎকর্ষকেই শুভ বা কল্যাণ বলে মেনে নেওয়ার উপরই নৈতিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। নৈতিকতাকে কল্যাণ থেকে বিভক্ত করলে নৈতিক জীবনই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

সুতরাং আমাদের নৈতিক বোধ বলে যে সবরকম মানবীয় প্রকর্ষকেই অকৃত্রিম শুভ বা হিত বলে বিবেচনা করা উচিত। এই বোধ আরো বলে যে আন্তর জীবনকে এক উচ্চ স্থান দেওয়া উচিত। আমাদের নৈতিক বোধ চরিতার্থতার জন্য এও দরকার যে সর্বত্রই যেন শুভের বা কল্যাণের জয় হয়। প্রত্যেক জীবেরই অন্তর্গত দোষ ও অসংগতি যেন চলে গিয়ে সে পরম-সমন্বয়-লাভে সমর্থ হয়। এবং সমস্ত প্রকার অমঙ্গল ও অনর্থের প্রণাশে পরম কল্যাণ যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া নৈতিক জীবনের জন্য আরো একটা জিনিস দরকার। শুভ বা শ্রেয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য একটা বিরোধ বা বাধার সব সময়েই অত্যন্ত আবশ্যক। সুতরাং নৈতিক জীবন থাকতে হলে অনর্থ বা অশুভের একেবারে চলে গেলে চলে না। সুতরাং আত্মত্যাগ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে আবার স্বীকার করে নিতে হয়। এই দুই প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিলে চলে না; কিন্তু আবার সে দুটো প্রবৃত্তিকে কিছুটা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে কাজ করতে দিতে হয়। তার মানে নৈতিক জীবনযাপন করবার জন্য তার বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে যে ঐক্য দরকার সেই ঐক্য অসাধ্য। এর ফলে নৈতিক জীবনের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষায় আমরা উন্নততর কল্যাণের অন্বেষণে ব্রতী হই। নৈতিক সাধনা, ধর্ম-সাধনা বা ভগবৎ-সাধনায় পরিণত হয়। (এখানে ধর্ম শব্দকে তার শ্রেষ্ঠ অর্থে নিয়েছি। ধর্ম শব্দকে এখানে

এক পরম, উৎকৃষ্ট, পরিপূর্ণ ও কল্যাণতম বস্তুর প্রতি আত্যন্তিক অনুরক্তি ও ভক্তির অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।)

আমি এমন কথা বলতে চাইছি না যে ভগবৎ-সাধনার দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কারণ, ধর্ম-সাধনা একটা কর্মবিশেষ এবং সেই-জন্য এই সাধনার মধ্যেও চরমকল্যাণের ভাব বা ধারণাটা আগেকার মতোই বলবতী থাকে। কিন্তু ভাবটার মধ্যে রয়েছে অমীমাংসিত এক অসংগতি। ধর্মসাধনা দ্বারাও পরিপূর্ণ ঐক্য লাভ করা যায় না। এই সাধনাতেও বিভিন্ন বিরোধী ভাবের মধ্যে আমরা অনবরত আপস করতে বাধ্য হই এবং সেগুলোর মধ্যে সতত স্থান-পরিবর্তন করি। এবার দেখা যাক নগ্ন নৈতি-কতার চেয়ে ধর্ম-সাধনাকে উন্নততর অবস্থা কেন বলা হয়।

ধর্ম-সাধনার মূলকথাই এই যে সবকিছুই হচ্ছে এক পরমসত্তার ইচ্ছার পরিপূর্ণ প্রকাশ। সেইজন্য সবই শুভ বা মঙ্গলকর। অসম্পূর্ণ, দোষযুক্ত এবং অনিষ্টকর সবকিছু, এমন-কি অনর্থকারী জীবের দুষ্ট ইচ্ছাও, পরম অভি-প্রায়ের সহায়ক এবং পরম উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করে। সেইজন্য ইষ্ট এবং অনিষ্ট, দুইই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত কল্যাণপ্রদ, যেমন সত্য ও মিথ্যা দুইই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত সত্য। দুটোই শুভ, কিন্তু সমান-মাত্রায় শুভ নয়। যেটা অনিষ্ট তার শোধন অবশ্যম্ভাবী এবং তার শোধন মানে তার বিনাশ। যেটা ইষ্ট বা হিত সেটা বিভিন্ন মাত্রায় নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে টিকে থাকে। সত্যের মতো কল্যাণও পরিপূরণের পর পরমতত্ত্বের মধ্যে বেঁচে থাকে। পরমতত্ত্ব থেকে কল্যাণ একেবারে বিতাড়িত বা বহিষ্কৃত হয় না। কল্যাণের মাত্রা-বিচার করতে গেলে আপাতস্বীকৃত ও ব্যবহারিক সত্তার ব্যাপ্তি ও গাঢ়তার দুই দিক এবং সেই দুই দিকের চরম অভেদের কথা আবার স্মরণ করতে হয়। ভগবৎ-সাধনার দ্বারা সসীম জীব পরমসার্থকতা বা পরমসিদ্ধি লাভ করে এবং এই সাধনার দ্বারা ব্যাপ্তি ও গাঢ়তা এই দুই দিকের বিভেদ চলে যায়। কারণ, ধর্ম-সাধনায় সসীম জীব নিজেকে পরমোৎকৃষ্ট, পূর্ণ সত্তার অপরিত্যাজ্য অংশরূপে দেখে এবং পরমসার্থকতা লাভ করে এবং অনুভব করে যে সে পরম-সিদ্ধি পেয়েছে। সসীম জীব যখন নিজেকে চরম সার্থক বলে অনুভব করে তখনকার অনুভবের বিশ্লেষণ করলে দুটো জিনিস পাওয়া যায়। প্রথমত তার মধ্যে পাওয়া যায় একটা গভীর বিশ্বাস যে তার সর্ববিধ অকল্যাণ পরা-

কৃত হয়েছে এবং তার যথার্থ কল্যাণ বিহিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত পাওয়া যায় তার মধ্যে পরমোৎকর্ষের সঙ্গে ঐকান্তিক ও অভিন্ন জ্ঞানগত ও ইচ্ছাগত সংযোগ। অন্যান্য জীব সম্বন্ধে তার ধারণা হচ্ছে এই যে তাদের জীবনও এইভাবে পরম সার্থক। সসীম জীব যখন নিজেকে সামগ্রিক সমন্বয়ের অংশরূপে জানতে পারে তখন সে তার নিজের পরিপূর্ণতার জ্ঞান লাভ করে। কারণ, সমগ্রকে বিভিন্ন সসীম জীবের চেতনার মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করতে হয়। সসীম জীবের পরম সার্থকতার বোধও নিঃসন্দেহে একপ্রকার পাওয়া জিনিস। কিন্তু এই অমূল্য সম্পদের দাতার বাইরে কোনো পৃথক গ্রহীতা নেই। পৃথক গ্রহীতার ধারণা মিথ্যা।

অপর পক্ষে কল্যাণের অতীতে চলে গেলে ধর্ম-সাধনা হয় অসম্ভব। সম্পূর্ণতালাভ করতে হলে সৎ জীবনযাপন করতে হয় এবং ইচ্ছাকে পরম শ্রেয়ের অভিমুখে পরিচালিত করতে হয়। পরমশ্রেয়োলাভের কামনা যতক্ষণ সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ ত্রুটির বোধ তীক্ষ্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও থাকে যে পরমার্থলাভের দ্বারা সমস্ত ত্রুটি ও গ্লানির অবসান হতে বাধ্য। এইজন্যই আত্মার পরম-সার্থকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান, স্বকীয় ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও অপকর্ষের প্রতি আমাদের এত নিষ্করুণ করে তোলে। নিজের চরম পরিণতি সুনিশ্চিত জেনেও আমরা সম্পূর্ণ দোষহীন হওয়ার জন্য ক্লান্তিহীন সংগ্রাম করে যাই। ধর্মজীবনের মধ্যে নৈতিক আবেশ ও প্রয়াসের দিকটা অপ্রধান হলেও বেশ সক্রিয়।

সংক্ষেপে তা হলে আমরা বলতে পারি যে নীতিমান না হওয়াই আমাদের নৈতিক কর্তব্য, এই বাক্যের দ্বারা আমরা বলতে চাই যে আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসী বা ভগবৎ-পরায়ণ হওয়া কর্তব্য। সর্ববিধ মানবীয় প্রকর্ষই হচ্ছে শুভ। কারণ সমস্ত উৎকর্ষই পরম-ইচ্ছার বাস্তবতার প্রকাশ। একমাত্র অনর্থকে স্বরূপে মঙ্গল বলা চলে না। সমগ্রের মধ্যে অনর্থের স্থান আছে, তবে অনর্থরূপে নয়। অনর্থও সমগ্রের কল্যাণসাধনে সাহায্য করে, তবে অন্যরূপে। এক অর্থে, অশুভত্বের কোনো তারতম্য নেই; কিন্তু অন্য অর্থে যা অশুভ তার তারতম্য আছে। ধর্ম-সাধনাতেও এইরূপে বিভিন্ন কল্যাণের মধ্যে পরিমাণগত প্রভেদ ও তারতম্য স্বীকৃত হয়। প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিই এক অর্থে সম্পূর্ণতার প্রকাশ। অন্য দিক থেকে যে ব্যক্তি যত অধিক উৎকর্ষ

সাধন করতে পারে এবং যত গভীরতার সঙ্গে তার ইচ্ছাকে পরম সার্থকতা-মুখী কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে সে তত অধিক সাধু।

ধর্ম-সাধনাতে কল্যাণের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব দূরীভূত হয় এই মতের একটা সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বর্ণনা আমি উপরে দিয়েছি। এবার এই মতের যাথার্থ্য বিচার করা যাক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ধর্ম-সাধনা যেন জীবনের সমস্ত অংশের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত করেছে ; ধর্মের সামগ্রিক প্রভাবে জীবনের প্রত্যেক দিক যেন প্রভাবিত হয়েছে মনে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরোধ থেকেই যায় এই কথা আমাদের স্বীকার করতে হয়। কারণ ধর্ম যে-সমগ্রতা দান করে তাকে যদি তখনো শুভ বলে মনে হয় তা হলে সমন্বয়লাভ করা অসম্ভব ; অপর পক্ষে ধর্মের সাধনার দ্বারা যদি আমরা শুভকে অতিক্রম করি তা হলে ধর্ম-সাধনারও অবসান হয়। বিরোধটা এইখানে যে, ভগবৎ-সাধনার সমগ্রতাকে একই সঙ্গে পরমসার্থকতার পরিপূর্ণ রূপ এবং পরমসার্থকতা অর্জনের উপায়-রূপে গ্রহণ করতে হয়। এবং পরিপূর্ণ কল্যাণ এবং কল্যাণলাভের সাধনা এই দুটোর কোনোটাকেই অ-পারমার্থিক বলে নিন্দিত করা চলে না। কিন্তু এই দুই দিকের মধ্যে অন্যোন্য-বিরোধ আছে এবং উভয়ের সমন্বয় অসম্ভব। ভগবৎ-সাধনার বিষয়কে অসম্পূর্ণ ও সসীম বলে গ্রহণ করলেও বিরোধ যায় না। কারণ সিদ্ধিলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সাধনার প্রয়োজন এবং অস্তিত্ব থাকে না। ভক্তির মধ্যে অসংগতি এইজন্য যে ভক্তি-সাধনার জন্য ভক্তের পৃথক অস্তিত্ব প্রয়োজন অথচ ভক্ত যতক্ষণ পৃথকরূপে থাকে ততক্ষণ সিদ্ধি অসম্ভব। নরনারীর গভীর প্রেমের মধ্যেও এই অসংগতিটি ধরা পড়ে। নিজ স্বরূপ অতিক্রম করে যাওয়াই হচ্ছে সর্ববিধ প্রকর্ষের স্বাভাবিক ধর্ম। সমস্ত রকম উৎকর্ষের সত্তাই আপাতসত্য ও আবভাসিক। খানিকটা আপস-নিষ্পত্তি দ্বারা সেগুলোকে স্বীকার করতে হয় এবং সেগুলোকে টিকে থাকতে হয় দুই চরম-বিন্দুর মধ্যে নিয়ত দোদুল্যমান এক অবস্থায়।

ধর্ম-সাধনার বা ভগবৎ-সাধনার মূল উপাদান হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসের কাছে বিশ্ব ও ব্যক্তি পরিপূর্ণ ও কল্যাণময়। ধর্ম-বিশ্বাস শুধু এক অপ্রমাণিত প্রকল্পে বিশ্বাস নয় ; কারণ এই দ্বিতীয় প্রকার বিশ্বাস জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। ধর্ম-বিশ্বাস হচ্ছে কর্মমূলক এবং এক কথায় এ যেন নিজেকে এক প্রকার বিশ্বাস করানো। এই বিশ্বাস কর্মমূলক হওয়ার জন্য এর মধ্যে

অবিশ্বাসের লক্ষণও সুস্পষ্ট। ধর্ম-বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত কথা হচ্ছে এই যে, কর্ম করবার সময় শুভের বিরুদ্ধে বাধা আছে স্বীকার করতে হয়, কিন্তু আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে কোনো বাধা নেই। এও বলা যেতে পারে বাধা বাস্তবিকত নেই বলেই আরো সাহসের সঙ্গে এই বাধা জয় করবার জন্য কর্ম করা উচিত। এইরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে সুস্পষ্ট স্বতোবিরোধ বর্তমান। যে কোনো এক দিকের কথাকে চরমসত্য বলে গ্রহণ করলে অপর দিক অসত্য হয়ে ওঠে। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই স্ববিরোধ সর্বত্র বিদ্যমান। নরনারীর যৌনপ্রেমের মধ্যে এইরকম স্ববিরোধের সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পুরুষ হয়তো তার প্রিয়াকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাস ছাড়া তার পক্ষে বাঁচাই অসম্ভব, এ-কথাও সে অনুভব করে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার প্রিয়াকে সবসময়ে চোখে চোখে রাখার মধ্যে যে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে তা সে মনে করে না। কিংবা যখন সে তার প্রিয়াকে বা হয়তো নিজেকে আর বিশ্বাস করে না, তখন সে কেবলই বলতে চায় কিংবা কেবলই শুনতে চায়, "আমি ভালোবাসি" এই অসত্য প্রণয়কথা। ধর্মের অনুষ্ঠানের মধ্যেও এইরকম একটা আত্মছলনা ক্রিয়া করে।

এই আলোচনাটাকে বহুদূর প্রসারিত করে নেওয়া যায়; কিন্তু মূল তত্ত্বটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই আমি যথেষ্ট মনে করব। ধর্মানুভূতিতে পরস্পর-বিরোধী ভাবগুলোর বিরোধ মীমাংসা না করে সেগুলোকে অনুভূতির ঐক্যের মধ্যে আমরা কোনোরকমে ধরে রাখি। এই ভাবগুলোর মধ্যে সংগতিস্থাপন করা যেমন ধর্মচিন্তা দ্বারা অসম্ভব, সেগুলোর পরিশোধন করাও ধর্মসাধনা দ্বারা অসম্ভব। সেইজন্য ধর্মতত্ত্বে এত অসংগতি এবং ধর্মবোধে এত অস্থিরতা। ধর্মতত্ত্বগুলো হয় একদেশী ও ভ্রান্ত নতুবা অর্থশূন্য ও দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। ধর্মসাধনাতেও দুরকম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। ধর্মের পথ দুর্গম এবং তার দুই দিকে আছে দুই রসাতলস্পর্শী গহ্বর। ধর্মসাধনায়, জীব ও জগতের অন্তর্নিহিত সংঘর্ষ বা দুঃখ বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারে। বিশ্বের অন্তর্নিহিত বিরোধগুলো বড়ো করে দেখার ফলে বিশ্বের পরিপূর্ণতা ও শান্তি চোখে পড়ে না। এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বিরোধগুলো বড়ো করে দেখার ফলে ব্যক্তির ইচ্ছা ও কল্যাণ দুটো যে স্বতন্ত্র জিনিস এই বোধ প্রায়ই চলে যায় কিংবা সে দুটো যে স্বতন্ত্র জিনিস এই বোধ যদি থাকেও ধর্মসাধনা

কেবল নৈতিক আচরণে পরিণত হয়। অপর পক্ষে, ধর্মসাধনায় বিশ্বের সমন্বয়ের বা আনন্দের দিকটা বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারে। সমন্বয়ের ওপর সমস্ত দৃষ্টি আবদ্ধ করে রাখার ফলেও ভুগতে হয়। জীব ও জগৎ মঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং সমস্ত ঘটনাই মঙ্গলের জন্য ঘটে এই ধারণা বলবতী হয় এবং সেইজন্য নৈতিক আচরণের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। ফলে ধর্মসাধনা বিকৃতরূপ ধারণ করে। কখনো কখনো সসীম বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তির বলেও মানুষ নৈতিক বিধির ঊর্ধ্বে যেতে সক্ষম হয়। এই দেখে ধর্মসাধক পথভ্রষ্ট হয়। সমগ্র বিশ্বের সমুদয় অংশ এক অর্থে হচ্ছে শুভ এবং কল্যাণময়; সুতরাং কর্মের গুণাগুণ বিচার করবার দরকার কি? সব কাজের নৈতিক মূল্যই এক। ধর্মসাধক সেইজন্য ঈশ্বরীয় নৈষ্কর্ম্যের শান্ত জগতে অলস স্বপ্ন দেখেই তার জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। এবং কখনো যদি কোনো আকস্মিক বাসনার বশে তাকে কিছু করতে হয়, সে হাতের কাছে যে কর্ম পায় তাই নির্বিচারে ভক্তির সঙ্গে করতে প্রবৃত্ত হয়। সেই কর্ম যত কলুষিতই হোক তাতে তার কিছু চিত্তচাঞ্চল্য হয় না। নৈতিক রাজ্যের কপটতার তুল্য ধর্মরাজ্যের এই ভণ্ডামি। এখানে বিকৃত ধর্মচেতনার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। ধর্মজীবনের পেছনের ব্যাপারের সঙ্গে যে মানুষের একটুও পরিচয় আছে, সেই কখনো না কখনো নিশ্চয়ই বিদ্রোহী হয়ে থাকবে, এবং তার মনে সন্দেহ জেগে থাকবে যে এত কলুষ ও অপরাধের জনক যে ধর্ম সে কি কখনো মানুষের মঙ্গলদায়ক হতে পারে।

কিন্তু ধর্মসাধনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করেছি। সুতরাং এইরকম সন্দেহ টিকতে পারে না। ধর্মের দ্বারা মানুষের ইষ্টের চাইতে অনিষ্ট যদি বেশি হয়ে থাকে তা হলে বর্তমান আলোচনার কোনো অর্থই হয় না। আমি এই বলতে চেয়েছি যে নৈতিক গুণের মতো ধার্মিকতাও চরম সত্য নয়। ধর্মসাধনার দ্বারা পরমার্থকে পাওয়া যায় না। ধর্ম-সাধনার মধ্যে আছে প্রচুর আত্মবিরোধ। এবং ধর্মের সত্য আপাতস্বীকৃত ও ব্যবহারিক মাত্র; সেইজন্য নিজের সীমা অতিক্রম করা তার স্বভাব। কিন্তু দুই চরম দিকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে ধর্মকে চলতে হয়। ভারসাম্যরক্ষা না করতে পারলেই ধর্মে বিকার উপস্থিত হয়। ধর্মসাধনার দ্বারা নৈতিকতার ঊর্ধ্বে যাওয়া হচ্ছে আমাদের প্রধান নৈতিক কর্তব্য। তার চেয়েও বেশি

জোর দেওয়া দরকার এই সত্যের ওপর যে তবুও ধর্মসাধনার জন্য আমাদের নৈতিক জীবনযাপন করাই হচ্ছে প্রধান কর্তব্য। ধর্ম ও নৈতিকতা, এ দুটো হচ্ছে কল্যাণের দুই বিভিন্ন স্তরের প্রকাশ এবং কল্যাণ হচ্ছে পরমার্থের অবভাস ও একপ্রকার স্ব-বিরুদ্ধ অবভাস।

অন্য আর-এক দিক থেকে ধর্মের অসংগতি বিচার করা চলতে পারে। ধর্মের সাধনায় ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করতে হয়। আমরা আগেই জেনেছি যে সম্বন্ধ জিনিসটাই স্বতোবিরোধী। সম্বন্ধের জন্য দুটো স্বতন্ত্র ও সসীম পদ দরকার। অপর পক্ষে সম্বন্ধ ও সম্বদ্ধপদদ্বয় এক বৃহত্তর অখণ্ড সত্তার বর্ণনা এইরূপ কল্পনা না করলে সম্বন্ধের কোনো অর্থ হয় না। এবং এই আত্মবিরোধ থেকে রক্ষা পেতে হলে সম্বন্ধাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করতে হয়। এই সাধারণ নিয়ম ধর্মের ক্ষেত্রে খাটে কি না পরীক্ষা করা যেতে পারে।

এক দিকে মানুষ হল ঈশ্বরের বাইরে অবস্থিত এক সসীম জীব এবং এই সসীম জীব ও ঈশ্বরের "মধ্যে সম্বন্ধ আছে"। অন্য দিকে ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র মানুষের ধারণা হচ্ছে একপ্রকার একদেশদর্শন মাত্র। ধর্মেও এই তত্ত্বের সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে। সেইজন্য বলা হয় যে, মানুষের মঙ্গল ও বাস্তবতা ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করে এবং যে-মানুষ ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে স্বতন্ত্র হতে চায় সে ঈশ্বরের রোষ ডেকে আনে এবং সেই রোষদ্বারা বিনষ্ট হয়। মানুষ শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে এই কথা সত্য নয়। মানুষ তার অভ্যন্তরে এই বিপরীত শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এবং এই আভ্যন্তরিক আকর্ষণের জন্যই সম্বন্ধটি সম্ভবপর হয়। ঈশ্বর হচ্ছে মানুষের ঊর্ধ্বে এবং বাইরে অবস্থিত এক সসীম বস্তু। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বুদ্ধি মানুষের ইচ্ছা ও বুদ্ধি থেকে পৃথক। সুতরাং জ্ঞাতা ও ভোক্তারূপে ঈশ্বরের স্বকীয় ব্যক্তিতা আছে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধহীন ঈশ্বরের ধারণা হচ্ছে এক অসংগতিপূর্ণ শূন্যতামাত্র। অথচ অপর সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ঈশ্বর হচ্ছে এক বিরোধ-জর্জর সসীম সত্তামাত্র। সুতরাং পুনরায় ঈশ্বরকে সমস্ত বাহ্য সম্বন্ধের অতীত কল্পনা করতে হয়। মানুষের সঙ্গে আভ্যন্তরিক সংযোগের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা, বাস্তবতা ও ব্যক্তিতা প্রকাশিত হয়। সুতরাং দুটো অবিভাজ্য অংশকে পৃথক পৃথক করে দেখবার কৌশলের নাম

হল ধর্ম। এক সম্মিলিত অখণ্ড সত্তাই বিভিন্ন প্রকারে ও স্তরে মানুষ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়। এই অখণ্ড সত্তা একবার স্বতই দুই বিপরীত ও পৃথক অংশে বিভক্ত হয় এবং তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধের উদয় হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই দুই অংশের সাময়িক পৃথকত্ব চলে যায় এবং প্রত্যেক অংশের মধ্যেই অপর অংশটির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত ও অনুভূত হয়। ধর্মে সেজন্য দুটো জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। ধর্ম-সাধনায় সর্বদা দুই বিপরীত বিন্দুর মধ্যে স্থানবিনিময় করতে হয় এবং ধর্ম-তত্ত্বে বিপরীত মতের মধ্যে একটা আপসরফা করে চলতে হয়। মানুষের প্রেমই ঈশ্বরের আত্ম-প্রেম এবং মানুষের প্রেমানন্দের মধ্যেই ঈশ্বর স্বকীয় আনন্দ অনুভব করেন এইরকম উক্তি করতে সংকোচ হয়। অপর পক্ষে ঈশ্বর বিনা প্রেম সঞ্চারিত হতে পারে এই উক্তি করতেও দ্বিধা হয়। এবং কোনো উক্তি না করতে পারার জন্য ধর্ম-সাধক হয়ে পড়েন হতবাক। জীব যখন ভীষণ শাসকরূপী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বৈরীরূপ ধারণ করে তখন সে হয় পাপী। এই বৈরিতার সম্বন্ধের জন্য পাপীর হৃদয়ে গভীর ঘৃণার ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন বিপরীত আবেগের আলোড়নে শাসকের অন্তরও মথিত হয়। কিন্তু তাই বলে একথা বলা একেবারেই নিরর্থক যে ভগবৎ-চৈতন্যের মধ্যে পাপের একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থান আছে। পাপ এই ভগবৎ-চৈতন্যে উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরাভূত হয় এইরকম ধারণাও ঈশ্বরাপবাদবিশেষ। ধর্মে প্রথমে কতগুলো সমর্থনের অযোগ্য উক্তি করা হয়। তার পরে সেগুলো থেকে বাঁচবার জন্য আবার কতগুলো প্রত্যুক্তি করা হয়। সেগুলোও সমান অসমর্থনীয়। যে-কুকুর দুজন প্রভুকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করে তার মতো অবস্থা হয় ধর্মের। সে একবার এগোয় একবার পেছোয়। বিশ্বে ঈশ্বরের স্থান কি এই বিষয়েও যথেষ্ট অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। আমরা বলতে পারি যে ধর্মের ঈশ্বরকে সব সময়ে তার সীমার মধ্যে আটকিয়ে রাখা যায় না। ঈশ্বর পরমতত্ত্বে বা পরমার্থে পরিণত হয়। অথচ পরমার্থ দ্বারা ধর্মের ক্ষুধা মেটানো যায় না। ধর্মের দিক থেকে মানুষের পক্ষে ঈশ্বর হচ্ছে এক সসীম সত্তা ও বিষয়। এরূপ ঈশ্বরের ব্যক্তিতা থাকতে পারে নাও থাকতে পারে; সেটা ধর্মের পক্ষে আসল কথা নয়। অথচ ধর্ম-সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর ও জীবের সাযুজ্য।

তাই যদি হয় তা হলে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের বাইরে কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু নিরন্তর দিক-পরিবর্তনের ধারাকে ঈশ্বর নিশ্চয়ই বলা চলে না। এবং ঈশ্বর ও জীবকে সসীম বস্তু কল্পনা করে এ-সব বিরোধের মীমাংসা অসম্ভব। বিরোধনিরসন সম্ভবপর হয় একমাত্র সম্বন্ধনাশের দ্বারাই; কিন্তু সম্বন্ধনাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও কল্যাণও অন্তর্হিত হয়। ঈশ্বরকে পরমার্থের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা যেতে পারে, কিন্তু এই ঈশ্বর ধর্মানুভূতির ঈশ্বর নয়। ঈশ্বরকে পরমার্থ থেকে ভিন্ন কল্পনা করলে ঈশ্বর সর্বময়ের অন্তর্গত এক সান্ত উপাদানে পরিণত হয়। ধর্মের সাধনা যে-সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই-সম্বন্ধকে বিনাশ করা। সেইজন্য ঈশ্বরকে অন্বেষণ করতে গিয়ে ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বে উপনীত হতে হয় এবং পরমতত্ত্বে এসে জীব ও তার ধর্মের অবসান হয়। ঈশ্বর ও জীবের তুরীয় অনুভূতিতেও এই সমস্যা আবার দেখা দেয়। জীবের তুরীয় অনুভূতির মধ্যেই ঈশ্বর এবং জীবের সাযুজ্য, ঈশ্বর অনুভব করেন; কিন্তু ঈশ্বরের এই আত্মানুভূতি খুব অপরিণত হতে বাধ্য। কারণ জীব ও ঈশ্বরের বাহ্য সম্বন্ধ যদি বিলুপ্ত হয় তা হলে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ থাকে না। অপর পক্ষে জীবের মধ্যে যদি ঈশ্বর ও জীবের পার্থক্যের বোধ থাকে তা হলে সম্পূর্ণ সাযুজ্য হয়েছে বলা চলে কি করে? এক কথায় অন্যবিধ কল্যাণলাভের মধ্যে যে অসংগতি আমরা লক্ষ্য করেছি ঈশ্বরলাভরূপী পরমলাভের মধ্যেও সেই অসংগতি থেকে যায়। কল্যাণ বা সার্থকতার মধ্যে ভাবের সঙ্গে অস্তিত্বের সম্পূর্ণ সংগতি নেই। কিন্তু এই ব্যবধান পরমবস্তুর মধ্যে থাকতে পারে না। এবং পরমবস্তুর অন্তর্নিহিত কোনো একটা ধারাকে পরমবস্তু বলা যায় না। আমরা সেইজন্য বলতে পারি যে ঈশ্বর যতক্ষণ সর্বময় না হন ততক্ষণ তিনি ঈশ্বর হতে পারেন না; আবার তিনি যেই সর্বময় হন অমনি ধর্মানুভূতির ঈশ্বর তিনি থাকেন না। ঈশ্বর হচ্ছেন পরমতত্ত্বের এক দিক মাত্র; সুতরাং ঈশ্বর পরমতত্ত্বের অবভাস-বিশেষ।

এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে আমি কয়েকটা ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার চেষ্টা করব। প্রথমে আমি তথ্য সম্বন্ধে মানুষের কুসংস্কারের বিষয় বলব। এই বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর সিদ্ধান্তকটার পুনরুক্তি করব। ধর্ম যদি অবভাস হয় তা হলে ঈশ্বর ও জীব মায়ামাত্র, কারণ সেগুলো তথ্য নয়

লৌকিক এই মত' অগ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য ব্যতীত কিছুই সত্য নয় এরকম বিশ্বাস হচ্ছে এক বর্বর ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে জেনেছি। একথা নিশ্চিত যে মানুষ একমাত্র বস্তুসত্তাকেই জানে এবং অনুভব করে ; অন্য কিছু তার পক্ষে জানা বা অনুভব করা সাধ্যের অতীত। কিন্তু বস্তুসত্তাকে স্বরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে জানা বা অনুভব করা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ সসীম সত্তা ও জ্ঞানের সবটাই ভাব ও অস্তিত্বের পার্থক্যের অর্থাৎ অবভাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং তথ্যকে যদি পরমবাস্তব ও চরমসত্য হতে হয়, সেরকম তথ্যের অস্তিত্ব নেই। এই অর্থে পরমার্থমাত্র হচ্ছে এক অদ্বিতীয় তথ্য। অপর পক্ষে তথ্যকে যদি সান্ত ও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে, কিংবা এখানে এখন যে-জিনিস আছে তার সঙ্গে সামিল করা হয় তা হলে তথ্যকে সর্বনিম্ন প্রকারের ও সব চেয়ে মিথ্যা অবভাস বলতে হয়। এবং আমাদের জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও আমরা এই নিম্নস্তরের উপরে বিচরণ করি। সেইজন্য এই অর্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যগুলোকেই মায়ামাত্র বলতে বাধা নেই।

ঈশ্বরানুভূতির ব্যাপারে এইরকম নিম্নশ্রেণীর তথ্যের সঙ্গে আমাদের কোনো সংশ্রব থাকতে পারে না। ধর্মের তথ্য হচ্ছে কতগুলো আভ্যন্তরিক অনুভব। সেই অনুভবগুলোর অর্থ যে-দেশ এবং যে-কালের সীমার মধ্যে অনুভবগুলো ঘটছে সেগুলোকে ছাড়িয়ে অনেকদূর অবধি বিস্তৃত। এক ক্ষণের অনুভবের মধ্যে সমস্ত স্বর্গ কিংবা সমগ্র নরকের অনুভব কি করে সম্ভবপর আমরা বুঝতে পারি না। এখানেই হচ্ছে এইসব অনুভবের অসংগতি। এইসব অনুভবে অর্থরূপী তথ্য ঘটনারূপী তথ্যের অধিক হয়ে উঠেছে। ধর্মজগতের বাহ্য ঘটনাগুলোর বেলাতেও এই নিয়ম খাটে। সেই-সব বাহ্য ঘটনা যতক্ষণ সীমাহীন তাৎপর্য বহন না করে ততক্ষণ সেগুলোকে ধর্মবিষয়ক বলা অসংগত। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধটি অ-পারমার্থিক, এই বলে কোনো অভিযোগ উঠতে পারে না। কারণ কোনো তথ্য বা কোনো সম্বন্ধই আবভাসিক ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। এই ব্যাপারে যে-প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক সেটি হচ্ছে এই অবভাসের জগতে তথ্য-বিশেষের স্থান কোথায় অর্থাৎ তথ্যটি কি পরিমাণে সত্য এবং বাস্তব।

এই আলোচনা সম্পূর্ণ করা এখানে অসম্ভব। তবে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে

মাত্রানির্ধারণ করবার যে নিয়ম আমরা আবিষ্কার করেছি সেটি প্রয়োগ করলে ধর্মানুভূতি-বিষয়ক তথ্যের চেয়ে বাস্তবতার অন্য কোনো তথ্য আছে বলে মনে হয় না। এই তথ্যগুলোর সঙ্গে বাহ্যেন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলোর তুলনা করতে যাওয়াই হচ্ছে একপ্রকার বাতুলতা। যে-মানুষ ঈশ্বরানুভূতিতে লব্ধ তথ্যের চেয়ে আরো সারবস্তু অন্বেষণ করে সে নিজেই জানে না যে সে কি চায়। এই অনুভূতিতে ঈশ্বর ও জীবের বাস্তবতার সম্বন্ধে তার যে জ্ঞান হয়েছে তার অধিক কি পেলে সে সন্তুষ্ট হবে সে বলুক। ঈশ্বর ও জীবকে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ দুটো অস্তিত্বরূপে পেলে তাদের আর চেনা যেত না। আমরা বলতে পারি যে ঈশ্বরকে যদি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যেত ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব আর থাকত না। এবং জীব ও ঈশ্বরকে দুটো স্বতন্ত্র ও চরম ও অ-সামান্য সত্তা বলে কল্পনা করলে তাদের স্থান ও সম্বন্ধ বোঝা যায় না; কারণ তাদের মধ্যে স্বতোবিরোধ এসে পড়ে। সুতরাং ঈশ্বর ও জীবের সংযোগ হচ্ছে একপ্রকার অবভাস। যে-পরমার্থকে পেলে ধর্মের অবসান হয় ধর্মানুভূতির মধ্যে সেই-পরমার্থকে ঈশ্বর ও জীবের সংযোগ স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াসরূপে পাওয়া যায়। এই প্রয়াসের বিফলতা ও অসংগতিই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করে যে ধর্মের সত্যতা চরম ও পরম নয়।

তাই যদি হয় তা হলে জীবনের উপর তার প্রভাবের কি হয়? আমি বলব সে বিষয়ে মাথা ঘামানো আমার কর্তব্য নয়। এবং এইরকম প্রশ্ন একটা অনিষ্টকর কুসংস্কারের ফল। তত্ত্ববিদের কাজ পরম সত্য কি তার অনুসন্ধান করা। আরো অনেক অন্য বিষয় সমান প্রয়োজনীয়। কিন্তু তত্ত্ববিদের সে-সব সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। ইংলণ্ডে শিল্প ও বিজ্ঞানের স্বকীয় মূল্যের সম্বন্ধে ধারণা খুব অল্প। সেখানে এইসব সাধনার ফলের উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়। এবং কতগুলো শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হচ্ছে। কারণ সেই-সব ক্ষেত্রে নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা এবং সাহসের অভাবের জন্য আমরা উপযুক্ত পারদর্শিতা লাভ করতে পারি নি। ঈশ্বর ও ধর্ম কি তা বোঝবার চেষ্টা করারও একটা মূল্য আছে এই সত্য আমাদের ধারণাতীত। এইজন্য যেসব ইংরেজ মনীষী বিদেশী চিন্তার সঙ্গে অপরিচিত তাঁদের এই সম্বন্ধে চিন্তার এত দৌর্বল্য। ফলিত-জ্ঞানের প্রতি অন্ধ আসক্তিকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। ধর্ম ও নীতি

সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনা করার অধিকার যদি একমাত্র ধর্মোপদেষ্টা কিংবা শিক্ষকেরই থেকে থাকে তা হলে আমি এই-সব আলোচনা করতাম না। বাধ্য হয়ে আমাকে এই বিষয়ে দু-এক কথা বলতে হয়েছে।

এইটুকু বলে আর কিছু না বললেও চলত। কিন্তু ফলের সম্বন্ধে যখন আমি কিছুই বলতে চাই না তখন অন্তত ফলঘটিত প্রশ্নটার অর্থ কি সেই সম্বন্ধে কিছু বলা ভালো। ধর্মসাধনার জন্য কতকগুলো সত্য স্বীকার করতেই হয়, একথা স্পষ্ট। এও স্পষ্ট যে স্বীকৃত সত্যগুলো চরম সত্য হতে পারে না। অনেকে অবশ্য বলেন যে ধর্মের সত্যগুলো চরম সত্য না হলে চলে না। বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি যে সেখানে এই একই অবস্থা। বিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্যগুলোও শেষ পর্যন্ত অসংগতিপূর্ণ। সেইসব সত্যগুলো আংশিকরূপে সত্য, অথচ সেগুলো প্রামাণ্য ; কারণ সেগুলো দিয়ে কাজ চলে যায়। ধর্মের ক্ষেত্রে এইরকম কার্যকারী সত্য দিয়ে চলে না কেন ? কতগুলো অসুবিধা আছে ; তার মধ্যে প্রধান অসুবিধা এই : বিজ্ঞানসাধনায় আমরা আমাদের লক্ষ্য কি জানি। এবং লক্ষ্য স্পষ্ট জানার জন্য আমরা এই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়গুলোকে পরীক্ষা ও তুলনা করতে পারি। কিন্তু ধর্মসাধনাতে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি সেই সম্বন্ধেই আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। এবং যেখানে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণার মধ্যেই অস্পষ্টতা ও অনৈক্য, সেখানে যুক্তিসম্মত আলোচনা অসম্ভব। ধর্মসাধনার জন্য কোন্ কোন্ ধারণা বা সত্য দরকার আমরা জানতে চাই ; অথচ কোন্ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সত্যগুলো দরকার সে সম্বন্ধে আমরা অনুসন্ধান করতে আগ্রহী নই। কিন্তু এই উদ্দেশ্যের মাপেই স্বীকার্য সত্যগুলোর যোগ্যতা বিচার করা সম্ভবপর। ফলে যখন তখন যার প্রাণে যা ভালো লাগে তাকেই সে উচ্চৈঃস্বরে ধর্মের প্রধান সত্য বলে ঘোষণা করতে থাকে এবং সেই সত্যগুলো স্বীকার না করলে ধর্মের লোপ অবশ্যম্ভাবী এই বলে চীৎকার করতে থাকে। এবং জনসাধারণ এই বিচারহীন শব্দকারীদের ধর্মের সমর্থক বলে উল্লসিত হয়।

এই প্রশ্নের যুক্তিসম্মত আলোচনার জন্য আমাদের ধর্মসাধনার উদ্দেশ্য কি সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করা উচিত। এই অনুসন্ধানের জন্য দুটো জিনিস অপরিহার্য। প্রথমত, বস্তুসত্তা, কল্যাণ ও সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে

আমাদের একটা সুসমঞ্জস ধারণা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধর্মের সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে অবহেলা করলে চলবে না। প্রথমে ধর্মের সত্যগুলো দ্বারা কি উদ্দেশ্য আমরা সাধিত করতে চাই সেই সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সেগুলো কি শুধু জ্ঞানার্জনের জন্য দরকার, না,সেগুলো অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা অর্থসিদ্ধির জন্য দরকার? এবং যদি অন্য কোনো অর্থসিদ্ধির জন্য হয়, কি সেই অর্থ যার সঙ্গে তুলনা করে ধর্মের সত্য-গুলোর যাথার্থ্য বিচার করা যাবে? আমরা যদি ধর্মসাধনার মুখ্য উদ্দেশ্যটি নির্ণয় করতে সক্ষম হই তা হলে যেসব ধারণা এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য নিষ্প্রয়োজন কিংবা এই উদ্দেশ্য-সাধনে অপারগ সেগুলোকে অস্বীকার করতে কোনো বাধা থাকবে না। বৈজ্ঞানিক সত্যের উদ্দেশ্য কি এ সম্বন্ধে যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা না থাকে তা হলে বিজ্ঞানসাধনা ও ধর্মসাধনার তথাকথিত বিরোধের বিষয়ে বুদ্ধিসম্মত বিচার কি করে সম্ভবপর? এমত-অবস্থায় বিরোধ আছে কি না তাই আমাদের পক্ষে বলা অসম্ভব এবং বিরোধ আছে কল্পনা করলেও সেই বিরোধের তাৎপর্য বা গুরুত্ব নির্ধারণ করা আমাদের সাধ্যের অতীত। সুতরাং আমাদের বিচারের ফল এই। ইংরেজ ধর্মবেত্তাগণ তত্ত্ববিদ্যার প্রকৃত অধ্যয়ন না করার ফলে অনেক বিষয়ে তাদের জ্ঞান অগভীর। তত্ত্ব-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করা দু-এক বছরের ব্যাপার নয়। এবং এপর্যন্ত কেউই তত্ত্ববিদ্যার জন্য সারা জীবন উৎসর্গ না করে এই বিষয়ে মূল্যবান কিছুই বলতে পারেন নি। ইতিহাসের কথা কেন বলেছি সে সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ এই। ধর্মসাধনা যদি মুখ্যত জীবনসাধনার ব্যাপার হয় তা হলে ইতিহাসে বা কালের ধারার মধ্যে ধর্মের যে-সব বিভিন্ন সত্য স্বীকৃত হয়েছে সেগুলোকে উপেক্ষা করলে চলে না। তবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় অতীতে ও বর্তমানে সবরকম ধর্মে একরকম ধর্মমত বা সত্য স্বীকৃত নয়। সুতরাং এইসব সত্য, ধর্মের পক্ষে অপরিহার্য এরকম সিদ্ধান্ত অচল। সেজন্যই বলছি বিচার না করে নিজের খুশিমত এরকম উক্তি করা অত্যন্ত অশোভন ও অশালীন যে ধর্মসাধনার জন্য ব্যক্তিতাসম্পন্ন ঈশ্বর অবশ্য-স্বীকার্য।

সংক্ষেপে এই বলা যেতে পারে যে সর্বপ্রথমে প্রশ্নটির দিকে নিরাসক্ত ও পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। এই পরিষ্কার দৃষ্টির ফলে বুদ্ধিসম্মত আলো-

চনা সম্ভবপর হবে। এর বেশি আমরা এই বিষয়ে পাব বলে আমি আশা করি না। হয়তো কালের প্রভাবে এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত মত ও সম্প্রদায়ের অন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ক্রমশ ধর্মের সার সত্যগুলো অসার সত্যগুলো থেকে পৃথককৃত হয়ে পড়বে। কিন্তু পরিপূর্ণ আলোচনা না করে এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। ধর্মের আপাতসত্য ও ব্যবহারিক দিকের বিষয় এইটুকু বলে আমি ক্ষান্ত হতে চাই।

এবার একটি মারাত্মক ভ্রান্তি সম্বন্ধে সতর্ক করে এই অধ্যায় শেষ করবার ইচ্ছা আছে। আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে ধর্মোপলব্ধির তথ্যগুলোর সত্তাও আবভাসিক মাত্র। সেগুলোর চরমসত্যতা নেই। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা এমন প্রতিপন্ন হয় না যে তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে ধর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। ধর্ম যদি মুখ্যত জ্ঞানের বিষয় হত তা হলে এইরকম নিষ্পত্তি যুক্তিসংগত হত। এবং ধর্মের যতটুকু অংশ জ্ঞানমূলক ততটুকুর বেলাতে এই উক্তি সমর্থনযোগ্য। তত্ত্ববিদ্যার কাজ চরমসত্য কি সে সম্বন্ধে আলোচনা করা। সুতরাং ধর্মের উপরে হচ্ছে তত্ত্ববিদ্যার স্থান। কিন্তু ধর্মের সারবস্তু জ্ঞান নয়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে ধর্মের সার কেবল অনুভূতি। ধর্মসাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সমগ্র সত্তা দ্বারা এই প্রকাশ করা যে পরমকল্যাণ পূর্ণরূপে বাস্তব এবং এই দিক থেকে বিচার করলে ধর্মেরস্থান হল তত্ত্ববিদ্যার উপরে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব যে তত্ত্ববিদ্যাও অবভাসের জগতের জিনিস। অনেকবিধ অবভাসের মধ্যে তত্ত্ববিদ্যা হচ্ছে একবিধ আপাতসত্য অবভাস। এক দিক থেকে তার স্থান উচ্চে, কিন্তু অন্য দিক থেকে তার স্থান নিম্নে। তত্ত্ববিদ্যার হীনতা এইজন্য যে তত্ত্ববিদ্যা হচ্ছে কেবল জ্ঞানগত ব্যাপার বা কেবল বুদ্ধির তৃপ্তি। তত্ত্ববিদ্যাকে অন্য কাজে লাগানো যেতে পারে এবং লাগানোও হয়। কিন্তু একান্ত বুদ্ধি দিয়ে সম্যক বোঝবার চেষ্টাই হচ্ছে মূলত তত্ত্ববিদ্যা। সেইজন্য তত্ত্ববিদ্যার দৃষ্টিও হচ্ছে একদেশদৃষ্টি এবং তাকে পরমার্থের এক অসংগতিপূর্ণ প্রকাশ বলতে হয়। তত্ত্ববিদ্যা যখন ধর্মতত্ত্বের বিষয়ীভূত হয় তখন সেটা ধর্মে পরিণত হয়, তত্ত্ববিদ্যা আর থাকে না। আমি এমন কথা বলতে চাই না যে যাঁরা ধর্মবিশ্বাসে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তত্ত্ববিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরা যা অন্বেষণ করছেন তাঁরা তা তত্ত্ববিদ্যায় পাবেন

না। আমি বলতে চাই যে তত্ত্ববিদ্যাতেই হোক বা অন্যত্র যেখানেই হোক তাঁরা তাই শুধু পাবেন যা তাঁরা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে ধর্মের কোনো অবিচ্ছেদ্য সংযোগ-সম্বন্ধ নেই এবং দুটোর কোনোটাকেই অপরটার উচ্চতর বিকাশ বলা যায় না। একমাত্র পরমতত্ত্বে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ ও পরম পরিণতি সম্ভবপর।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

পরমতত্ত্ব ও তার বিভিন্ন প্রকাশ বা অবভাস

আমরা এতক্ষণে বুঝতে পেরে থাকব যে শিব ও সত্য দুটোই হল পরমার্থের একদেশমাত্র। দুটো দিকের নিজ ধর্মই এমন যে সেগুলোকে পরম বাস্তব বলে গ্রহণ করা যায় না। পরম বাস্তব বলে গ্রহণ করতে গেলে সেগুলোর অতীতে যেতে হয়। সেগুলোর মধ্যে যে অসংগতি আছে, তার নিরসন করতে হলে উচ্চতর ও সর্বময় বস্তুসত্তার দিকে এগিয়ে যেতে হয়। এইবার এই অদ্বিতীয় বস্তুসত্তার প্রকৃতি কি তার পূর্ণতর ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশ বা অবভাসের প্রতি আমরা এ পর্যন্ত সুবিচার করবার চেষ্টা করে উঠতে পারি নি। আমরা সত্য ও শুভের সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা দিতে সমর্থ হয়েছি। জড়প্রকৃতি ও আত্মার সম্বন্ধেও একটা শূন্য রূপরেখা আঁকতে পেরেছি মাত্র। কিন্তু এই পুস্তকে এর বেশি আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই পুস্তকে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমবস্তুর সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা দেওয়া এবং আমার দেওয়া ধারণার বিরুদ্ধে যেসব স্পষ্ট ও প্রধান আপত্তি আছে সেগুলোকে খণ্ডন করা। আমার মত প্রতিষ্ঠা করতে হলে একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বশাস্ত্র রচনা করে সর্ববিধ অবভাসের ব্যাখ্যা দিতে হয়। যে কোনো তত্ত্ববিদ্যার অন্তর্নিহিত মূলসূত্রগুলো প্রমাণ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সেগুলোর দ্বারা জীব, জগৎ ও অন্যান্য অবভাসের সম্যক ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যাখ্যা করা। এই পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবার সামর্থ্য আমার নেই। তবুও পরমতত্ত্বের সম্বন্ধে আমার সাধারণ মত যে সত্য তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা আমি করব।

পরমবস্তু এক ও অদ্বিতীয়। পরমবস্তু চিৎস্বরূপ। এই সর্বময় তত্ত্বের মধ্যে সমস্ত অবভাসিত তথ্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সম্মিলন ঘটে। মিলনের কালে বিভিন্ন মাত্রায় এইসব তথ্যের নিজ নিজ ধর্মের লোপ হয়। যে-সব তথ্যের ভাব ও অস্তিত্বের দিকের মধ্যে সংগতি নেই সেই-সব তথ্যকে অবভাসিত বা প্রতীয়মান তথ্য, বা সোজা কথায় অবভাস বলা হয়। আমরা তাকেই তত্ত্ব বা বস্তুসত্তা বলি যার মধ্যে ভাব ও অস্তিত্বের সামঞ্জস্য, সাদৃশ্য এবং পূর্ণসংযোগ আছে। শেষ পর্যন্ত, একমাত্র অদ্বিতীয় পরমবস্তু ছাড়া অন্য কোনো তত্ত্বের মধ্যেই ভাব ও অস্তিত্বের এই পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সংযোগ নেই। সুতরাং পরমবস্তুই একমাত্র বস্তুসত্তা। অন্য যে-কোনো জিনিসকে বিশ্লেষণ করলেই তার ভাবগতরূপ ও অস্তিত্বগতরূপের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং পরমবস্তু ব্যতীত অন্যান্য সব তথ্য প্রতীয়মান তথ্য কিংবা অবভাসমাত্র। প্রতীয়মান সত্তার তথাকথিত বাস্তবতার মধ্যে ফাটল আছে। এই-সব তথ্যের 'তৎ'এর দিক ও 'কিম্'এর দিক সমান নয় এবং প্রত্যেক অন্তবান্ তথ্যের অন্তর্নিহিত এই অসামঞ্জস্যের জন্য সেই-তথ্য অত্যন্ত ভঙ্গুর। অবভাস কিংবা অ-পারমার্থিক সত্তার লক্ষণ এই যে এই সত্তাকে জানবার সময় যে-চিত্তবৃত্তি চৈতন্য অধিকার করে থাকে তার ঘটনারূপ এবং তার তাৎপর্যরূপের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। যেখানেই অস্তিত্ব ও তার তাৎপর্যের মধ্যে অসংগতি সেখানেই আমরা অবভাসের চতুঃসীমার মধ্যে আছি, এই মনে করতে হবে। মানবজীবনের প্রত্যেক অংশে ও ক্ষেত্রেই দুই দিকের অন্তর্গত এই অসংগতি দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সসীম সত্তার স্বরূপ সেই সত্তার বহিস্থ অন্যান্য সত্তার উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য যেখানেই কোনো এক তথাকথিত তথ্যকে বাস্তব বলে স্বীকার করতে যাই সেখানেই আমরা সেই সত্তার বাইরে যেতে বাধ্য হই। বস্তুনিচয়ের এই আত্মবিরোধ, এই অস্থিরতা, এই প্রত্যয়াত্মকতা বা ভাবপ্রবণতাই হল সে-গুলোর অ-পারমার্থিকতার স্পষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু অপর পক্ষে, কোনো অবভাসই সম্পূর্ণ মিথ্যা হতে পারে না। সর্ব-ময়ের ঐক্যসৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রতীয়মান সত্তার দান আছে ও দান থাকা প্রয়োজন। সেজন্য আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিশ্বের যে-কোনো এক দিককে অবশিষ্ট দিকগুলোর অর্থ বা সাধ্যরূপে গ্রহণ করা যায়। (পঞ্চবিংশ অধ্যায়

দ্রষ্টব্য) কোনো এক দিক থেকে বঞ্চিত হলে পরমার্থকে অপদার্থ বা মূল্যহীন বলা চলে। বিশ্বের কোনো এক মূল্যবান অংশ সম্বন্ধে বিচার করতে গেলেই বিশ্বের অন্যান্য অংশ যেন ঐ মূল্যকে সৃষ্টি ও রক্ষার জন্যই আছে, এইরকম মনে হয়। কিন্তু এও নিশ্চিত যে এইরকম মনে হওয়া হল একটা ভ্রান্তি ও একপ্রকার একদেশদর্শিতা এবং এই ধারণা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। অন্যান্য অংশগুলোকে বাহ্য উপায় বা নিমিত্ত বলে কল্পনা করা যায় না। বুঝতে পারা যায় সেগুলো প্রথমোক্ত অংশের মধ্যে অন্তর্নিহিত। সুতরাং পূর্ববর্তী ধারণাকে শেষ পর্যন্ত অসত্য বিচার করে বর্জন করতে হয়। এই পরিণতি থেকে আমরা একটা সত্য উপলব্ধি করি। পরমার্থে বা পরমবস্তুতে এমন কিছু নেই যা কেবল আনুষঙ্গিক কিংবা আগন্তুক মাত্র। বিশ্বের প্রত্যেক উপাদানই এক একটা আপেক্ষিক সামগ্রের অংশবিশেষ; এই সামগ্রের মধ্যে সেই উপাদানের নিজ ধর্ম পুষ্ট ও রক্ষিত হয়। এইরকম আপেক্ষিক সামগ্রগুলোই বিশ্বের প্রধান প্রধান দিক। এই সামগ্রের কোনো একটাকে অপর একটা সামগ্রে পরিণত করা যায় না। এই কারণে এইসব প্রধান দিকের সম্বন্ধে আমরা এরকম উক্তি করতে পারি না যে কোনো এক দিক হচ্ছে অন্য দিকের চেয়ে উন্নততর কিংবা প্রকৃষ্টতর। তবে এই বিভিন্ন প্রধান অংশগুলোকে একেবারে স্বতন্ত্র বলাও যায় না; কারণ প্রত্যেকটারই মধ্যে আছে স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভাব। সম্পূর্ণতালাভ করতে হলে প্রত্যেক অংশকেই অপর অংশের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হয়। তা ছাড়া যে পরমপূর্ণতার মধ্যে এই অংশগুলো সার্থকতা লাভ করে তার সর্বময় প্রভাবে প্রত্যেক আপেক্ষিক সামগ্রেরই নিজরূপে থাকার দাবি অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু এই নিম্নতর প্রকাশ-গুলোর কোনো একটাকে অপরটার তুলনায় হীনতর বলা যায় না। এবং সেগুলোর প্রত্যেকটাই পরমার্থের পরিপূর্ণতার জন্য নিতান্ত আবশ্যক ও প্রয়োজনীয়।

এই অধ্যায়ে চিৎস্বরূপ পরমতত্ত্বের প্রধান প্রধান অংশ বা প্রকাশ কি তাই দেখবার চেষ্টা করব। চৈতন্যের কোনো এক দিককে প্রধান এবং অন্যান্য দিককে অপ্রধান বলা যায় না। চৈতন্যের এমন কোনো অংশ নাই যাকে সারাংশ এবং যার তুলনায় অন্যান্য অংশকে সেই সারাংশের বিভিন্ন গুণ বলা যায়। অর্থাৎ চৈতন্যের মধ্যে এমন কোনো উপাদান নেই যাতে

অন্যান্য সর্ববিধ উপাদানকে পরিণত করা সম্ভবপর। তবে পরমার্থে এই বিভিন্ন অংশের সমন্বয় কি করে ঘটে তা বুদ্ধির অগোচর। পরবর্তী অধ্যায়ে পরম ঐক্যের সদর্থক রূপটার সম্পর্কে আলোচনা করব। এখানে অন্য আর একটা বিষয়ের উপর জোর দিতে চাই। যতরকম বিশেষ বিশেষ অবভাস আছে তার প্রত্যেকটারই মধ্যে পরমার্থ আছে এবং এও এক অর্থে বলা চলে যে পরমার্থের স্বরূপ এইসব অবভাসের প্রত্যেকটারই মতো। তবে এইসব প্রকাশের মধ্যে পরমার্থের বাস্তবতার ও সার্থকতার তারতম্য আছে। এই অধ্যায়ে প্রকৃতি-সম্পর্কিত কয়েকটা অমীমাংসিত প্রশ্নের অতিরিক্ত আলোচনা করব এবং পরজন্ম ও প্রগতি সম্বন্ধেও একটা হ্রস্ব আলোচনা করে অধ্যায় শেষ করব।

সব-কিছুই চৈতন্য ; এবং চৈতন্য বা সংজ্ঞা অখণ্ড ও অদ্বিতীয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমি আবার আলোচনা করব যে এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যায় কি না। বর্তমান অধ্যায়ে এই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে ধরে নেব। চৈতন্যের প্রধান প্রধান অংশ বা দিক কি ? চৈতন্যের দুটো প্রধান দিক আছে সাধারণরূপে আমরা এটা বলতে পারি। এক দিকে ভাবনা বা চিন্তন এবং প্রতীতি বা প্রত্যক্ষবোধ, অপর দিকে বাসনা এবং ইচ্ছা। এ ছাড়া আর-এক দিক আছে যেটাকে ঠিক এই দুই দিকের কোনো একটির মধ্যে অন্তর্গত করা যায় না ; রসোপভোগ বা সৌন্দর্যোপভোগের দিক। আবার সুখ ও দুঃখের বা বেদনার দিক আছে যেটা আর এক দিক। সর্বশেষে অনুভবের একটা দিক আছে। অনুভব দ্বিবিধ। ১. নির্বিকল্প অনুভব এবং ২. অন্যবিধ অখণ্ডতার অনুভব। জীবের চৈতন্য যখন উপরিবর্ণিত বিশেষ বিশেষ দিকে বা প্রকারে বিকল্পিত হয় নি তখনকার সমগ্র ও অখণ্ড ও নির্বিশেষ অনুভব হচ্ছে নির্বিকল্প অনুভব। দ্বিতীয় প্রকারের অনুভূতি হচ্ছে জীবের মনের সেইসব অবস্থাবিশেষ যেগুলোর একটা আভ্যন্তরিক ও নির্বিশেষ অখণ্ডতা আছে। চৈতন্যের এই বিভিন্ন প্রকাশের কোনো একটিকে অন্যটিতে পরিণত করা যায় না। প্রত্যেকটারই নিজস্ব ধর্ম আছে। সর্বময়ের ঐক্য এই দিকগুলোর কোনো একটা অংশ মাত্রকে নিয়ে নয়। প্রত্যেক দিকই অসম্পূর্ণ এবং প্রত্যেক দিকেরই সম্পূর্ণতালাভের জন্য অন্যান্য দিকের সাহায্য দরকার। পূর্ববর্তী আলোচনাগুলো দিয়ে এই জিনিসটা আমরা

অনেকটা বুঝতে পেরেছি। আমি পুনরায় সমস্ত পূর্ববর্তী আলোচনার সারাংশের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেব এবং কিছু অতিরিক্ত প্রমাণের অবতারণা করব। আমি পরমতত্ত্বের অবভাসমালাকে মুখ্যত সেগুলোর মানসিক দিক থেকে এখন দেখব। কিন্তু এই ব্যপদেশে কোনো পূর্ণাঙ্গ মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা সম্ভবপর নয় এবং প্রয়োজনও নয়। যে-সব পাঠকের মত আমার মতের থেকে পৃথক, তাঁদের মত যদি আমার প্রধান সিদ্ধান্তের বিরোধী না হয় তাঁরা যেন তাঁদের মতকে বর্তমান আলোচনার সময় উপেক্ষা করেন, এই আমার অনুরোধ।

১. প্রথমে সুখ ও দুঃখের কথা দেখা যাক। সুখ ও দুঃখকে পরমবস্তুর সারাংশ বলা যায় না, এ অতি স্পষ্ট। কারণ অন্যান্য উপাদানকে সুখ ও দুঃখের ফল বা গুণ কল্পনা করা অসম্ভব; কিংবা অন্যান্য উপাদানকে সুখ ও দুঃখে পরিণতও করা যায় না। সুখ ও দুঃখই একমাত্র বাস্তব জিনিস নয়। কিন্তু অন্যান্য অবশিষ্ট উপাদানের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে এবং বিশ্লিষ্টভাবে সুখ এবং দুঃখকে কি বাস্তবই বলা চলে? আমরা সুখ ও দুঃখের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। কারণ সুখ ও দুঃখ অন্যোন্য -বিরোধী; এবং পরমার্থে সুখ ও দুঃখের সমাগমের পর যে সুখাতিরেকের উদ্ভব হয় তাকে কি আমরা শুদ্ধ সুখ বলতে পারি? (সপ্তদশ ও ষড়্‌বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এ ছাড়া সুখ ও দুঃখকে বাস্তব বলবার বিরুদ্ধে আরো প্রবল আপত্তি আছে। সুখ ও দুঃখকে পেতে হলে সুখকর এবং দুঃখকর কিম্বা আনন্দদায়ক এবং বেদনাদায়ক অন্য-কিছু থেকে সে দুটোকে কল্পনা দ্বারা বিশ্লিষ্ট করে তবে আমরা পাই। সুতরাং সুখ ও দুঃখকে যে -সব বৃত্তি বা অবস্থার সঙ্গে সর্বদা সংযুক্তরূপে আমরা পাই সেগুলোর সঙ্গে সুখ ও দুঃখের নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যুক্তিসম্মত নয়। প্রকৃতপক্ষে সুখ ও দুঃখের সত্তাকে পৃথক বা স্বতন্ত্ররূপে কল্পনা করতে হলে সে-দুয়ের জ্ঞাত ধর্মের বিরুদ্ধতা করতে হয়। এবং তাই যদি সত্য হয় তা হলে সুখ ও দুঃখের সারাংশ ও বস্তুসত্তা হচ্ছে অন্যান্য জিনিসের উপর নির্ভরশীল। সুখ ও দুঃখকে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসৎ জিনিস বলা চলে না। বিশ্বের এক বিশেষ দিক হচ্ছে সুখ এবং দুঃখ। সাকল্যের মধ্যে লীন হওয়ার পর সুখ ও দুঃখ বাস্তব হয়। সুতরাং সুখ ও দুঃখ হল আপাতসত্য অবভাসমাত্র।

২. এবার অনুভবের বিষয় আলোচনা করা যাক। এখানে অনুভব বলতে সসীম চৈতন্যকেন্দ্রবিশেষের অখণ্ডতার সাক্ষাৎ অনুভবকে মনে করছি। এই অনুভব দ্বিবিধ। প্রথমত চৈতন্যের সেই নির্বিকল্প অবস্থাকে অনুভব বলি, যে-অবস্থায় কোনোরকম সম্বন্ধবোধ জাগে নি এবং বিষয় ও বিষয়ীর কল্পনাও উদিত হয় নি। দ্বিতীয়ত চৈতন্যের যে কোনো স্তরে যা-কিছু উদিত হোক না কেন তার উপস্থিতিমাত্র ও শুদ্ধ অস্তিত্বের বোধটুকুকে অনুভব বলব। এই দ্বিতীয় অর্থে যা-কিছু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব তাই অনুভূত হতে বাধ্য। সাধারণত প্রকৃতবাস্তবতার এই বোধকে আমরা অনুভব আখ্যা দিই না। কারণ, কেবল বা শুদ্ধ অস্তিত্বের বোধ খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে। এখন প্রশ্ন ওঠে অনুভবের দুই অর্থের কোনো এক অর্থে অনুভবকে বাস্তব কিংবা পরমবস্তুর স্বরূপ বলতে পারা যায় কি না? উত্তরে না বলতে হয়।

প্রত্যেক অনুভবের অন্তর্গত প্রকারের মধ্যে ভেদ আছে। অনুভবের প্রকারের মধ্যে স্ব-সংগতি না থাকার দরুন অনুভবের অখণ্ডতা নষ্ট হয়ে যায়। যে কোনো অনুভবের প্রকার হচ্ছে সান্ত; এবং সান্ত হওয়ার জন্য তার ধর্মের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ অস্তিত্বের সামঞ্জস্য থাকতে পারে না। প্রত্যেক অনুভবের সান্ত প্রকারটা হল বাহ্য প্রভাবের উপর অবশ্য নির্ভরশীল। এবং বাহ্য সম্বন্ধের প্রভাবের জন্য ঐ প্রকারটার অর্থ বা ধর্ম, তার অনুভবরূপী অস্তিত্বের সঙ্গে সমান নয়। অর্থাৎ অনুভবের 'তৎ'এর দিকের সঙ্গে তার 'কিম্'এর দিক সবসময়েই সংঘর্ষশীল। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে সসীম জীবের অনুভব হচ্ছে আপাতস্বীকৃত অবভাসমাত্র। অনুভবের পরিবর্তন-শীলতা হচ্ছে এক রূঢ় তথ্য। এই তথ্যের দ্বারাই অনুভবের অসত্যতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব প্রতিপন্ন হয়। এবং আরো লক্ষ্য করবার বিষয় যে ভিতর এবং বাইরে দুই দিক থেকেই অনুভবচৈতন্য, সম্বন্ধাশ্রয়ী চৈতন্যে পরিণত হতে বাধ্য হয়। অনুভবের উপরেই পরে আরো অনেক কিছু প্রতিষ্ঠিত করা হয়; কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয় অনুভবের নিত্য আত্মস্খলনের দ্বারা। সুতরাং পরবর্তী সৃষ্টিগুলোকে বা কল্পনাগুলোকে অনুভবের সৃষ্টি বা গুণ বলতে পারি না। কারণ পরবর্তী সৃষ্টিগুলোর অস্তিত্ব নির্ভরশীল অনুভবের অখণ্ডতার বিচ্ছেদের উপর। পূর্ণ অখণ্ডতা হচ্ছে একমাত্র পরমতত্ত্বে সিদ্ধ।

৩. এবার ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ কিংবা চৈতন্যের জ্ঞানমাত্রিক দিক এবং ইচ্ছা

বা চৈতন্যের কর্মমাত্রিক দিকের বিষয় দেখা যাক। সুখ, দুঃখ এবং অনুভবের থেকে এই দুই দিক হচ্ছে ভিন্ন। ভিন্ন এইজন্য যে জ্ঞানমাত্রিক ও কর্মমাত্রিক চৈতন্যের জন্য বিষয় ও বিষয়ীর পার্থক্যের প্রয়োজন। প্রত্যক্ষজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে প্রথমে তার কোনো পৃথক বা বিশেষ অস্তিত্ব থাকে না; কর্মময় বা ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে প্রথমে প্রত্যক্ষজ্ঞান জড়িত থাকে। পরে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষজ্ঞানের দিক পৃথক হয়ে উঠে। কিন্তু এখানে আমরা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের স্বরূপ কি তাই দেখতে চেষ্টা করব। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হচ্ছে অসংখ্য বিষয়ের বিশৃঙ্খল একরাশি অনুভবের মধ্য থেকে এক বা একাধিক বিষয়কে রাশিটার অবশিষ্ট অংশ থেকে পৃথককৃত করে জানা। এতেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষজ্ঞানে মনে হয় যেন বিষয়টা কেবল স্বতন্ত্ররূপে আছে। অপর পক্ষে এমন যদি মনে হয় বিষয়টা অনুভব-রাশিকে প্রভাবিত করার ফলে রাশিটি বিষয়ের ওপর ক্রিয়াশীল হচ্ছে ও বিষয়টার পরিবর্তন সাধন করছে তা হলে চৈতন্য কর্মমুখী হয়েছে এই মনে করতে হবে। প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়ের সম্বন্ধটা যেন অবান্তর বা আকস্মিক এইরকম মনে হয়। আমরা মনে করি যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ের অস্তিত্বটা এই সম্বন্ধ থাকুক আর নাই থাকুক তার উপর একেবারেই নির্ভর করে না। কারণ, প্রত্যক্ষজ্ঞান কিম্বা চিন্তনের বিষয়ীভূত বস্তু শুধু যেন আছে এই আমাদের বিশ্বাস। আমরা যতই কেন না বস্তুটাকে খুঁজে বেড়াই কিম্বা যতই কেন না তার সম্পর্কে ভাবি আমাদের এই মানসিক ক্রিয়াগুলো যেন বস্তুটার পক্ষে কিছুই নয়। বিষয়ীভূত বস্তুটা যেন ঐ বাইরে আছে। তার জ্ঞানলাভের জন্য তার সঙ্গে আমাদের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়। কিন্তু তার অস্তিত্বের জন্য আমাদের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয় না। এই যেন আমাদের ধারণা।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও চিন্তনের মধ্যে অসংগতিটি হচ্ছে এই : যে-সম্বন্ধ স্থাপনের ওপর প্রত্যক্ষজ্ঞান ও চিন্তনের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেই-সম্বন্ধকে এই দুই ব্যাপারে উপেক্ষা করার চেষ্টা চলে। অসংগতিটা দুই দিক থেকে ধরা পড়ে। অনুভবের একটা অখণ্ড পটভূমিকার মধ্য থেকে জ্ঞেয় বিষয়গুলোর উদ্ভব হয়। কিন্তু এইরকম কল্পনা করা হয় যেন জ্ঞেয় বিষয়গুলোর উদ্ভবের ব্যাপারে পেছনের অনুভব রাশির কোনো কৃতিত্ব নেই। কিন্তু সংবেদন এবং ইন্দ্রিয়-

প্রত্যক্ষের স্তরেই উক্তিটা সত্য নয়। চিন্তন বা ভাবনার স্তরে এইরকম স্থিতি একেবারেই অসম্ভব। কারণ, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়েই হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত এবং জ্ঞেয়ের অস্তিত্বের সঙ্গে জ্ঞান-ক্রিয়ার সম্বন্ধ হল অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পরমসমন্বয় সাধিত হবার পর আর জ্ঞেয়ের বা বিষয়ের পৃথক অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এই অবস্থা হচ্ছে প্রত্যক্ষবোধের এক অতীত অবস্থা। অন্য দিক থেকেও অসংগতি ধরা পড়ে ; যে-বস্তু প্রত্যক্ষ ও চিন্তনের বিষয় সেটা শুধু আছে বললেই হয় না, তার একটা রূপও আছে ; বস্তুর রূপ বলতে আমরা বুঝি তার সঙ্গে অন্যান্য উপাদানের সম্বন্ধ ; এবং বস্তুটির পৃথক রূপ অন্যসব উপাদান থেকে তাকে পৃথককরণের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য বস্তুটার রূপের মধ্যে অন্যসব উপাদানের প্রভাব স্বীকার করতে হয়। সুতরাং বস্তুটির ধর্ম তার অস্তিত্বকে ছাড়িয়ে যায়। তার 'কিম্' তার 'তৎ'এর সীমা অতিক্রম করে। এর থেকে বোঝা যায় যে চিন্তন বা প্রত্যক্ষের বিষয় কোনো অস্তিত্ববান বস্তুমাত্র নয়, চিন্তন বা প্রত্যক্ষের বিষয় হচ্ছে এমন এক পরমবস্তু যা ভাবরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। বাস্তব ও তার ঈদৃশ প্রকাশ অভিন্ন নয়। সুতরাং এই প্রকাশকে সম্পূর্ণ সত্য বলা যায় না। সম্পূর্ণ সত্য হতে হলে এই প্রকাশের অন্তর্নিহিত ধর্মের বা ভাবের সংশোধন দরকার। এই সংশোধন প্রথমত শুধু ভাবগত ব্যাপার হতে বাধ্য। যতক্ষণ এই সংশোধন-ক্রিয়া চলে ততক্ষণ ধর্ম ও অস্তিত্বের মধ্যে বিশ্লেষটা থেকেই যায়। সুতরাং সত্য সম্পূর্ণতা লাভ করবার পর সত্যরূপে আর থাকতে পারে না। কারণ সত্য হল একপ্রকার অবভাসমাত্র। দ্বিতীয়ত সত্য যতক্ষণ অবভাসের জগতের জিনিস থাকে ততক্ষণ তার পক্ষে সম্পূর্ণতা লাভ করা অসম্ভব। জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়বস্তু যে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় সেই পরিণতি লাভ করলে সর্ববিধ প্রভেদ ও ভাবধর্মিতার অবসান হতে বাধ্য। কিন্তু এই পরিণতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও নিবৃত্তি হয়। জ্ঞেয়ের মধ্যে যুগপৎ দুই বিপরীত প্রয়োজন লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞেয়ের অস্তিত্বের জন্য সম্বন্ধ দরকার। এবং জ্ঞেয়ের অস্তিত্বের জন্য স্বাতন্ত্র্যও দরকার। এবং এই দুই বিপরীত দিকের সংঘর্ষ চলে গেলে কিংবা এই দুই দিকের সমন্বয় সাধিত হলে জ্ঞেয়ের নিজ বৈশিষ্ট্যও লোপ পায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও ভাবনা বা প্রত্যয় থেকে হয় অপরোক্ষ অনুভবের দিকে ফিরে আসতে হয় নতুবা প্রত্যয় ও

প্রত্যক্ষের একদেশদর্শিতা ও অসত্যতা স্বীকার করে প্রত্যক্ষ ও ভাবনার অতীত এক পরিপূরক ও বৃহত্তর বস্তুসত্তার দিকে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য অগ্রসর হতে হয়।

৪. এইবার চৈতন্যের কর্মমূলক বা ব্যবহারিক দিকের বিষয় আলোচনা করব। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও চিন্তনের ক্ষেত্রে যেমন, এইক্ষেত্রেও তেমন কেন্দ্রস্থিত অনুভবরাশির থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র একটা বিষয়ের দরকার। কিন্তু এখানে বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধটাই প্রধান ও সারজিনিস। এবং এই সম্বন্ধটা বাধার সম্বন্ধরূপে উপলব্ধ হয়। কর্মসম্পাদনের জন্য দরকার, উপস্থিত বিষয়ের পরিবর্তনের কল্পনা, কল্পনার প্রতি কেন্দ্রস্থ অনুভবরাশির অবিরোধিতা, কল্পিত পরিবর্তনসাধনের নিমিত্ত নিজের মধ্যে ক্রিয়া এবং সর্বশেষে কল্পনার বাস্তবরূপ গ্রহণ। এই বিশ্লেষণটা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে ব্যবহারিক ভঙ্গি বা দৃষ্টি হচ্ছে এক অসম্পূর্ণ একদেশদৃষ্টি মাত্র। কারণ কর্মদ্বারা ভাব ও অস্তিত্বের মধ্যস্থিত যে-ব্যবধান বা যে-বিচ্ছেদকে অপসারণ করা হয়, সেই-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা কর্ম-প্রবৃত্তির নেই। এবং এই বিচ্ছেদরাহিত্যের পর কর্ম-প্রবৃত্তিরও অস্তিত্ব থাকে না। এটা নিশ্চিত যে ইচ্ছার প্রয়োগ দ্বারা আমরা ভাবমাত্রের সৃষ্টি করি না; ইচ্ছার প্রয়োগে আমরা একবিধসত্তার প্রকৃত সৃষ্টি করি। কিন্তু ইচ্ছার কার্য আরম্ভের জন্য প্রথমে শুদ্ধ অবভাস বা ভাবপ্রবণতার প্রয়োজন। এবং ইচ্ছা দ্বারা আমরা যে সামঞ্জস্য বিধান করি তা সর্বদা সীমাবদ্ধ এবং সেইজন্য অসম্পূর্ণ এবং অস্থায়ী। অথচ তাই না হয়ে ভাব বা কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে সম্পূর্ণ একীকরণ যদি সম্ভবপর হত তা হলে ইচ্ছাবৃত্তিরই লোপ পেত। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কর্মদ্বারাও পরমার্থ লাভ করা যায় না; কর্ম বা ব্যবহারও হচ্ছে একবিধ অবভাসমাত্র। ইচ্ছার সম্বন্ধে আরো কয়েকটা ভ্রান্ত ধারণার বিষয়ে পরে বিচার করব। এখন বর্তমান বিচারে এগোনো যাক। প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয় বা ভাবের মধ্যে যে প্রভেদগুলো স্বীকৃত হয়, ইচ্ছার ক্রিয়ার জন্য সেগুলোকে স্বীকার করতে হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞান বা চিন্তনের চেয়ে ইচ্ছার মধ্যে বাস্তবতা বেশি আছে কি না এই প্রশ্ন উত্থাপন করাই চলে না।

৫. এবার দেখা যাক রসিকের দৃষ্টিতে পরমবস্তুকে লাভ করা যায় কি না। প্রথমে মনে হয় কান্তরসের অনুভূতির মধ্যে আমরা শেষ পর্যন্ত

ভাব ও অস্তিত্বের বিরোধের মীমাংসা যেন পেলাম ; এখানে আমরা যেন সম্বন্ধাশ্রয়ী চৈতন্যের ঊর্ধ্বে চলে এসেছি। কারণ রসোপভোগের মধ্যে সাক্ষাৎ অনুভবের গুণটা আছে। যে-বিষয় রসের উদ্রেক করে, তার শুধু গুণ আছে তাই নয় সেটা যেন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সত্তা এইরকম মনে হয়। বিশ্বের রসানুভূতির মধ্যে আমরা যে-তৃপ্তি পাই জ্ঞান বা কর্মের মধ্যে সেই-তৃপ্তি অপ্রাপ্য। এবং রসিকের দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানীর বা কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক। কিন্তু ভোক্তার দৃষ্টিভঙ্গিতেও গলদ আছে। সূক্ষ্ম বিচারে এই গলদ ধরা পড়ে। দেখা যায় যে রসভোগের মধ্যে আমাদের প্রশ্নের উত্তর নেই। কারণ এই রীতিতে আমরা পরমবস্তুকে পাই না ; এমন কি আমরা যা চাই তাও পাই না।

কান্তরস হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেগ, কান্তরসের এরকম সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। সর্ববিধ রসকে সুন্দর ও অসুন্দর, মাত্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা সুকঠিন। বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার জন্য আমি অবশ্য ধরে নেব তা যেন সম্ভবপর এবং পরমতত্ত্বের মধ্যে অসত্য ও অনর্থের মতো অসুন্দরও শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয়ে লোপ পেতে বাধ্য। সেইজন্য আমি শুধু সুন্দরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করব।

আনন্দের স্বয়ংসত্তার নাম সৌন্দর্য। সুন্দর হচ্ছে আনন্দের স্বয়ংসম্পূর্ণ-রূপ। এরকম বলার অর্থ এই নয় যে আত্মসুখভোগী স্বয়ংসৎ বস্তুই হচ্ছে সুন্দর। কারণ যতদূর আমরা জানি সেরকম বস্তু সুন্দর নাও হতে পারে। সুন্দরের স্বয়ংসত্তা দরকার এবং তার সত্তার স্বাতন্ত্র্য থাকা দরকার। সুতরাং শুধু ভাবরূপে থাকলে সুন্দরের চলে না ; সুন্দরের স্বকীয় প্রকাশ বা ব্যক্তিতা থাকা চাই। ভাবরাশি কিংবা ভাবনার প্রক্রিয়াগুলোও সুন্দর হতে পারে। এগুলো যখন স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং খানিকটা যেন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ এইভাবে উদ্ভাসিত হয়, তখন এগুলোকে সুন্দর মনে হয়। কিন্তু সুন্দরও কোনো না কোনো চৈতন্যের বিষয় হবেই হবে। মানুষের মনের সঙ্গে এর একটা সম্বন্ধ থাকবেই এবং সুন্দরের মধ্যেও একটা বিশিষ্ট ভাবগত উপাদান নিশ্চয়ই আছে। কেবলমাত্র অনুভূতিকে সুন্দর বলা চলে না। তবে এ হতে পারে যে একটা মিশ্র অভিজ্ঞতার সামগ্রের মধ্যে সৌন্দর্যরস এবং অনুভবের অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে। এছাড়া সুন্দরের ধর্মই হচ্ছে প্রত্যক্ষ আনন্দ দান

করা। সুন্দর হল নিত্য আহ্লাদদায়ী। কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে সুন্দরের সৌন্দর্যের জন্য এমন কেউ না কেউ দরকার যে সেই সৌন্দর্যভোগ করে আনন্দিত হচ্ছে।

সুন্দরের মধ্যে যে-সব উপাদানের সঙ্গম দরকার সেগুলোর মধ্যে বিরোধ আছে এবং সুন্দরের অন্তর্নিহিত অসংগতি ধরতে বেশি সময় লাগে না। সুন্দর থেকে তার মনোহারিত্ব এবং আমার সঙ্গে সুন্দরের সম্বন্ধ এই দুটো উপাদানকে বাদ দিয়ে সুন্দরের অবশিষ্ট অংশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা যাক। এই কল্পিত ও বিশ্লিষ্ট অংশটার মধ্যেও অসংগতি আছে। কারণ সুন্দরের অন্তর্নিহিত ভাব ও অস্তিত্বের মধ্যে সমতা দরকার ; কিন্তু সৌন্দর্যের বিষয়টি সসীম। সুতরাং তার মধ্যে ভাব ও অস্তিত্বের উভয়মুখী সমন্বয় অসম্ভব। এবং এইজন্য সত্য ও শিবের ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপ্তি ও সংগতির মধ্যে আংশিক ব্যবধান লক্ষ্য করেছি, সুন্দরের ক্ষেত্রেও তেমনি অমিল থাকতে বাধ্য। হয় প্রকাশটা অসম্পূর্ণ নতুবা প্রকাশ্য বিষয়টা সংকীর্ণ। উভয়ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত পরম সমন্বয়ের অভাব ও আভ্যন্তরিক অসংগতির জন্য বস্তুসত্তার লাঘব ঘটে। কারণ, উপলব্ধির অর্থটা হচ্ছে সান্ত ও সেইজন্য অসমঞ্জস এবং সেটি শুধু ভাবগত বা কাল্পনিক হতে পারে ; ভাবগত অর্থটির সঙ্গে তার বাহ্য প্রকাশের মিল নাও থাকতে পারে। অপর পক্ষে প্রকাশটির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় বাস্তবতার কমতি থাকতে বাধ্য। কারণ অন্য যাই কিছু হোক যাকে সুন্দর বলি তা হচ্ছে একটা সসীম তথ্য। এই তথ্যের উপর বাহ্যশক্তি প্রভাব বিস্তার করে ; সুতরাং তার অভ্যন্তরে অসংগতি সুনিশ্চিত। সুতরাং সম্বন্ধহীনরূপে ও বিশ্লিষ্টরূপে দেখতে গেলেও সুন্দরকে কখনো পরমবাস্তব বলা যায় না।

কিন্তু সুন্দরকে বিশ্লিষ্ট ও সম্বন্ধরহিত রূপে কল্পনা করাই অসম্ভব। কারণ, আহ্লাদ বা আনন্দই হচ্ছে সুন্দরের সার অংশ। এবং আনন্দ বা কোনো আবেগ কিরূপে জীব-চৈতন্যের বাইরে থাকতে পারে তা আমাদের কল্পনারও অতীত। সুতরাং সুন্দর হচ্ছে জীবের অভ্যন্তরস্থ গুণবিশেষের ক্রিয়ার ফল। আর যাই কিছু হোক, সুন্দর যে সবসময়ই প্রত্যক্ষের বিষয় সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য যে-সম্বন্ধ প্রয়োজন সুন্দরের অস্তিত্বের জন্যও সেই-সম্বন্ধ একান্ত স্বীকার্য। সুতরাং মনের বিকার রূপেই হোক

কিংবা প্রত্যক্ষের বিষয় রূপেই হোক সুন্দরের সত্তা বাহ্য উপাদানের উপর নির্ভরশীল ; সুতরাং সুন্দর হচ্ছে আপাতস্বীকৃত ও প্রতীয়মান সত্তা। অপর পক্ষে, বাহ্য উপাধিগুলো সুন্দরের আভ্যন্তরিক উপাদান হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু জ্ঞাতার চেতনা বা ভোক্তা চেতনার গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধের নাশ হয়। এবং সেইজন্য সৌন্দর্যের স্ব-রূপও অন্তর্হিত হয়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি রসাত্মক বিষয়ের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত সাক্ষাৎ অনুভব, তার স্বাতন্ত্র্য এবং তার সমন্বয় এই তিন দিকের কোনো দিকই পূর্ণ নয়। পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য, পরম সমন্বয় এবং সর্বময় প্রত্যক্ষ হল একমাত্র পরমতত্ত্বেই সম্ভবপর। এই পূর্ণতালাভের অর্থ হচ্ছে সুন্দরের বিলয়। সুতরাং চৈতন্যের অন্যান্য বৃত্তির মতো রসও হচ্ছে দৃশ্যমান জগতের অংশমাত্র।

অনুভব বা চৈতন্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করে আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রত্যেক অংশেই আছে সম্পূর্ণতার অভাব। আমরা নিশ্চয়ই এমন উক্তি করতে পারি না যে এইসব অংশের কোনো এক বিশেষ অংশের মধ্যে পরমতত্ত্ব বিরাজমান আছে। অপর পক্ষে যে-কোনো এক অংশ অপর অংশগুলোর সদৃশ ও সমান নয় বলেই প্রত্যেক অংশকে অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্জস মনে হয়। তথ্যত প্রত্যেক অংশই অন্য অংশগুলোর সঙ্গে খানিকটা জড়িত আছে। এবং পরমবাস্তবতা লাভের জন্য সমস্ত অংশের একত্র সম্মিলন হচ্ছে অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং এইসব বিভিন্ন দিকের সমষ্টিগত সত্তাই হচ্ছে পরমসত্তা ; এবং বিভিন্ন দিক হচ্ছে পরমসত্তার বিভিন্ন ও আংশিক প্রকাশ মাত্র। আবার এই অংশগুলোকে একবার দ্রুত নিরীক্ষণ করা যাক।

আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে সুখ ও দুঃখ দুটোই হল গুণ বা বিশেষণ মাত্র। আমরা সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে যা জানি তার ওপর দাঁড়িয়ে বলতে পারি না যে সুখ ও দুঃখকে জানলেই বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত দিক সম্বন্ধে জানা হয়ে যায়। আমাদের এইটুকু জেনেই তৃপ্ত থাকতে হয় যে সুখ ও দুঃখ, চৈতন্যের অন্যান্য প্রত্যেক বৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত একপ্রকার অনুভূতি বা বিশেষণ। সুখ ও দুঃখের উৎপত্তির পূর্ণরহস্য উদ্ঘাটন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে এই রহস্যভেদ করা যদি সম্ভবপর হয় তা হলে আমরা দেখতে পাব যে বিশ্বের সমস্ত অংশই সুখ ও দুঃখের কারক

উপাধিগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুখ ও দুঃখের থেকে অনুভূতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। সেখানে বিরোধ ও তজ্জনিত বিকাশের প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। অনুভূতির মধ্যে থেকেই অর্থ ও অস্তিত্ব এই দুই দিক ভিন্ন হয়ে উঠতে চায়। সেইজন্য বাহ্য আক্রমণ ও অন্তর্বিবাদের ফলে অনুভূতির মধ্যে পরিবর্তন উপস্থিত হয়। তাত্ত্বিক বা জ্ঞানী, সাধক বা কর্মী এবং রসিক বা ভোক্তার দৃষ্টি অবলম্বন করে আমরা বিশ্বের ভাবরূপী ও সত্তারূপী দুই অংশের মধ্যে অসামঞ্জস্য দূর করতে চেষ্টা করি। তাত্ত্বিক, কার্মিক ও রসিক এই ত্রিবিধ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব অনুভূতি থেকে এবং প্রত্যেকটা ভঙ্গিই হচ্ছে একদেশী দৃষ্টিভঙ্গি। অখণ্ড অনুভূতি পশ্চাতে থেকে চৈতন্যের এই ত্রিবিধ বৃত্তির মধ্যে একরকম একতা রক্ষা করে। কিন্তু জ্ঞান, কর্ম বা রসোপভোগ কোনোটারই মধ্যে অনুভূতির অখণ্ডতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না। রসিক ভাবের অন্তর্নিহিত দোষটা কি তা সহজেই ধরা যায়। সুন্দরের মধ্যে আমরা বাস্তবকে সাক্ষাৎরূপে পেতে চাই, কিন্তু পাই না। কারণ, জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে সৌন্দর্যের অস্তিত্ব সম্ভবপর স্বীকার করলেও সৌন্দর্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যায় ; সম্পূর্ণতা ও সমন্বয়ের চাহিদার দুটোর মধ্যে মিল বা সামঞ্জস্য করা অসম্ভব। সৌন্দর্যের প্রকাশ তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন তার অর্থ সংকীর্ণ ; অপর পক্ষে অর্থ যখন বৃহৎ বা মহৎ, প্রকাশ তখন হয় অসম্পূর্ণ। সেইজন্য সুন্দরতম বা সম্পূর্ণ-সুন্দর তাই যা শিবতম বা সম্পূর্ণ শুভ এবং পরিপূর্ণ সত্য। তার ভাব বা প্রত্যয়কে হতে হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্বগামী এবং তার অস্তিত্বকে ভাবের সমান স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হতে হয়। কিন্তু এই অবস্থায় সত্য, শিব ও সুন্দরের পার্থক্য তিরোহিত হয়ে যায়। বিশ্বের তাত্ত্বিক বা জ্ঞানিক রূপের মধ্যেও এই একই পরিণতি লুক্কায়িত আছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমা যদি সম্পূর্ণ সত্য হয় তা হলে সেগুলো কল্যাণের রূপ ধারণ করে। কারণ তা হলে তত্ত্বকে এমন ভাবে পাওয়া যায় যে তার সঙ্গে প্রত্যয়ের বা ভাবের কোনো ভেদই থাকে না ; এবং প্রত্যয় ও অস্তিত্বের সম্পূর্ণ সমানতাই হচ্ছে প্রকর্ষ। আবার ভাব ও অস্তিত্বের এই পরিপূর্ণ ব্যক্তিতা সুন্দর না হয়েই পারে না। অপর পক্ষে বিভেদগুলো জীর্ণ হওয়ার ফলে সত্য, শিব ও সুন্দরের পৃথক পৃথক ও নিজ অস্তিত্ব আর থাকতে পারে না। কর্মের দিক থেকেও এই একই পরিণতি। প্রসার ও সংহতির পরিপূর্ণ

সার্থকতাই হচ্ছে আমাদের ইচ্ছার অন্তিম কাম্য। পরমসার্থকতায় আমরা এমন বস্তু লাভ করি যার সম্পর্কে আর কোনো অলভ্য ভাব বা প্রত্যয় থাকতে পারে না। কল্পনা বা ভাবের পরিপূর্ণ ও পরম পরিণতিই হচ্ছে পরম কল্যাণ ; এই পরম প্রকাশই আবার পূর্ণ ও পরম সত্য। এবং ভাব ও অস্তিত্বের এই অদ্বিতীয় সমন্বয়কে পরম সুন্দরও বলতে হয়। কিন্তু সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য চলে যাওয়াতে আমরা এখানেও সৌন্দর্য, শিব ও সত্যের অতীতে চলে আসি।

আমরা দেখেছি যে চৈতন্যের বিভিন্ন দিক বা অংশ হল পরস্পরাপেক্ষী। এগুলো এমন এক অখণ্ড তত্ত্বের নির্দেশ দেয় যেটা হচ্ছে সেগুলোর অধিষ্ঠান ও নিধান। এই অখণ্ড সত্তার মধ্যে সেগুলো পরাকাষ্ঠা লাভ করে। আমি অবশ্য বলতে বাধ্য যে এই অন্বয়ী ও অখণ্ড বস্তুসত্তার সম্বন্ধে আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। আমরা এইটুকু নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে এই অদ্বৈত পরমবস্তু, চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু এই পরম চৈতন্যের সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ কোনো জ্ঞান নেই। আমরা এমন কোনো চেতনদশার কথা জানি না যার মধ্যে চৈতন্যের সর্ববিধ বৃত্তির পূর্ণৈক্য হয়েছে। এইজন্য আমরা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য যে চৈতন্যের বহুধা প্রকাশ হল এক অনির্বচনীয় ব্যাপার। এই প্রকাশবৈচিত্র্যের কারণ নির্দেশ করা আমাদের বুদ্ধির অসাধ্য। যথার্থ হেতু-নির্দেশ করতে হলে এক কি করে বহু হয় তাই বুঝতে হয়। কিন্তু সর্বত্রই এইরকম হেতু-জ্ঞান শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্ষমতার বাইরে। চৈতন্যের কোনো এক অংশকে হেতু কল্পনা করে অন্যান্য অংশগুলোকে তার ফল কল্পনা করা যায় না। আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এক অংশ থেকে অন্য অংশগুলো উদ্ভূত হয়েছে, তবুও অন্য অংশ-গুলোকে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সমেত প্রথম অংশের বিধেয়রূপে প্রয়োগ করা যায় না। এমত অবস্থায় সমগ্র বৈচিত্র্যকে এক অনবগত অদ্বৈত তত্ত্বের বিধেয়রূপে মনে করতে হয়। সুতরাং বিশ্বের কোনো এক অংশকে অন্য অংশের হেতু কল্পনা করা বোধ হয় যায় না। তা ছাড়া কোনো পৃথক অংশ-বিশেষই স্বতঃবোধ্য নয়। কারণ প্রত্যেক অংশের মধ্যেই অসংগতি আছে এবং প্রত্যেক অংশকে বুঝতে হলেই অপর অংশগুলোকে স্বীকার করতে হয়। সুতরাং একমাত্র সমগ্রকে সমগ্রভাবে জানতে পারলেই হেতু-নির্ধারণ

সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ এবং বিশদজ্ঞান সম্ভবপর নয়, আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি।

এই সাধারণ সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে আমরা হয়তো সোজাসুজি আর অপেক্ষা না করে অগ্রসর হতে পারি। আমরা মনে করতে পারি যে কোনো এক বা দুই বিশেষ প্রকার চৈতন্যবৃত্তিকে পরমার্থের স্বরূপ কল্পনা করা যায় কি না এই প্রশ্নই যখন ওঠে না তখন এখানেই পরমার্থের স্বরূপ নির্ণয় করবার চূড়ান্ত আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু পরমার্থকে চৈতন্যের কোনো এক বিশেষ বৃত্তিতে পর্যবসিত করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখা ভালো। এই চেষ্টা শিক্ষাপ্রদ হতে পারে। দেখা যাক পরম-তত্ত্বকে ইচ্ছা এবং ভাবনার সমান বলা যায় কি না। কিন্তু এই কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে সম্যক হেতুনির্ণয়ের বা ব্যাখ্যার জন্য কি কি বিষয়ে বিচার করতে হয় সেইগুলো আর একবার স্মরণ করা দরকার।

বিশ্বকে বুঝতে হলে, বিশেষ করে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বস্তু ও তার বিবিধ সম্বন্ধ ও আকার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার; সুখ ও দুঃখের সঙ্গে এইসব ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আকার ও সংস্পর্শজ গুণের সম্বন্ধ কি তাও জানা দরকার। তা ছাড়া সম্বন্ধাশ্রয়ী চৈতন্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ বুঝতে হয় এবং এই সম্বন্ধ-চেতনার অন্তর্নিহিত বিবিধ অবচ্ছিন্ন পদের বহুত্ব ও তার একত্বের মধ্যে সংযোগসূত্র কি তাও বুঝতে হয়। আমাদের আরো জানতে হয় বিশ্বের সব-কিছুই কিংবা প্রায় সব-কিছুই কেন সাক্ষাৎ অনুভবের সসীম কেন্দ্রকে আশ্রয় করে উদিত হয় এবং এক কেন্দ্র অন্য কেন্দ্রের কাছে সাক্ষাৎ রূপে বেদ্য কেন নয় তাও জানতে হয়। তার উপর, কালের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য আছে; কালাশ্রয়ী অনুভবগুলোর মধ্যে প্রত্যয় বা ভাব এবং অস্তিত্বের নিত্য ছাড়াছাড়ি হয়; ইচ্ছা বা চিন্তন ক্রিয়ার মধ্যে আবার কালের এই ছাপ আছে। ভৌতিক জগতের সম্বন্ধেও কতগুলো সমস্যা আছে। প্রকৃতির মধ্যে কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্য কিংবা ভাবার্থ সাধিত হয় কি? এবং আমাদের ভিতরে এবং বাইরে এরকম একটা ব্যবস্থা কি করে সম্ভবপর হল যার ফলে প্রত্যয়ের অনুযায়ী সত্তার উদয় হয়? এরকম শৃঙ্খলা কি করে সম্ভবপর হয় যার বলে আমাদের স্বকীয় বা প্রাতিস্বিক ঐক্য রক্ষিত হয় এবং জীবের মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময়ও সম্ভবপর হয়? সংক্ষেপত

আমাদের বিশ্বের এক দিকে আছে সীমা ও বৈচিত্র্য, অন্য দিকে আছে একত্ব। এবং যতক্ষণ সারা বিশ্বে, এই এক ও বহুর দিকের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধটা কি আমরা সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে না পারি ততক্ষণ বিশ্ব দুর্বোধ্য ও অব্যাখ্যাত থেকে যায়।

কেউ হয়তো বলবেন যে এই ব্যাপারে আংশিক ব্যাখ্যাই যথেষ্ট। আমি বলব এরকম উক্তি অত্যন্ত ভ্রান্ত। আপনি অনুভব বা অভিজ্ঞতার সমগ্র থেকে কতগুলো উপাদানকে একটা সাধারণ সূত্ররূপে গ্রহণ করে বলতে চাইছেন যে এই সামগ্রের মধ্যে আরো কতগুলো উপাদান আছে যেগুলোর স্বরূপ হচ্ছে অবোধ্য। কিন্তু এই অবোধ্য উপাদানগুলোও বিশ্বের অংশ; কিন্তু আপনার গৃহীত সামগ্রের ঐক্যের মধ্যে এগুলোর স্থান না হওয়ায় অন্যবিধ ঐক্য আপনাকে স্বীকার করতে হয়। যেইমাত্র আপনি এইরকম কল্পনা করেন সেইমাত্র আপনার উপাদানগুলোর অধঃপতন হয়; সেগুলো এক অজ্ঞাত ঐক্য-তত্ত্বের বিশেষণ হয়ে পড়ে। সুতরাং আংশিক তত্ত্বজ্ঞান এইজন্যই আপত্তিজনক যে তার অন্তর্নিহিত মূল সূত্রটাই হল দোষাবহ। এই অসম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানে যে-উপাদানকে পরমতত্ত্ব বলা হয়, প্রয়োগ বা ব্যবহার করতে গেলে দেখা যায় সেটা অবভাসমাত্র। আংশিক জ্ঞান হচ্ছে সেইজন্য জ্ঞানের একপ্রকার মিথ্যা ভানমাত্র।

বিশ্বের মূল উপাদান হচ্ছে বুদ্ধি এবং ইচ্ছা। অন্যান্য সর্ববিধ বৈচিত্র্যকে এই দুই উপাদানে পর্যবসিত করা যায়, এইরকম একটা মতবাদ কল্পনা করা যায়। এই মতবাদের গুণাগুণ বিচার করতে গেলেই আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হবে। সুবিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ করবার আগেই এই মতবাদের প্রধান ও অপরিহার্য দোষটার কথা উল্লেখ করতে চাই। সেটা এই। যদি বিশ্বের সর্ববিধ তথ্যকে এই দুই উপাদানে পর্যবসিত করা সম্ভবপরও হয়, তবুও বিশ্ব দুর্বোধ্য থেকেই যায়। কারণ বুদ্ধি এবং ইচ্ছা যত কেন না অন্যোন্যসাপেক্ষ এবং একে অপরের বিধেয় হোক এই দুটো তত্ত্বের দ্বৈত যায় না। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুই তত্ত্বের ভেদ ও অভেদের স্বরূপটি আমরা বুঝতে না পারি ততক্ষণ বিশ্ব আমাদের কাছে রহস্যে আবৃত থাকে। ফলে, আমাদের তথাকথিত পরমতত্ত্ব দুটো, এক অজ্ঞাত অদ্বৈত-তত্ত্বের প্রকাশমাত্রে পরিণত হয়। এইবার আরো বিস্তৃত-

রূপেই এই কল্পিত মতবাদের আলোচনা করা যাক। এই আলোচনার দ্বারা আমরা লাভবান হতে পারি।

এই মতের আপাতসুষ্ঠতা হচ্ছে তার অন্তর্নিহিত অস্পষ্টতার জন্য। এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছা এই দুই শব্দের অনিশ্চিত অর্থটা হল এই মতের বল-বত্তার প্রধান কারণ। এদুটো শব্দ আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। সেইজন্য এই শব্দদুটো ব্যবহারে কোনো বিপদ আছে বলে আমরা ধারণা করতে পারি না। অথচ কার্যক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞাতসারে এই শব্দগুলোকে আমরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে বসি। বিশ্বকে আমাদের বুঝতে হবে; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে আছে এক দ্বিরূপ ধারা বা প্রক্রিয়া। বিশ্বে অবিরাম ধারায় ঘটে চলেছে তথ্য থেকে প্রত্যয় বা ভাবের পৌনঃপুনিক বিচ্ছেদ এবং নূতন তথ্যের সহায়তায় বিচ্ছেদের পৌনঃপুনিক উপরতি। আমরা কোথায়ও এমন কোনো বস্তু দেখি না যা হল দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয়। সমস্ত বস্তুই হচ্ছে কতগুলো ভাবগত বা প্রত্যয়গত সামগ্রী। এই ভাবনির্মাণ নির্ভর করে এক দ্বি-দেশীয় পরিবর্তনের অবিরাম পৌনঃপুন্যের ভিত্তির ওপর। সব জায়গাতেই তাদাত্ম্য, স্থায়িত্ব এবং নৈরন্তর্যের সত্তা হচ্ছে ভাবগত; তথ্যের সততসঞ্চরণশীল প্রবাহের দ্বারা এই-সব ভাবময় সামগ্রের সৃষ্টি ও ধ্বংস হচ্ছে। অপর পক্ষে ভাবসামগ্রের আকর্ষণে তথ্যপ্রবাহের উদ্ভব হচ্ছে এবং ভাবময় সত্তাগুলো তথ্যস্রোতের মধ্যে বাস্তবরূপ ধারণ করছে। এই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করে বিশ্বের দুটো রূপ আমাদের চোখে পড়তে পারে। যেখানে অস্তিত্ব বা তথ্য থেকে প্রত্যয় বা ভাব বিশ্লিষ্ট হয়ে আসছে সেখানে বুদ্ধি বা চিন্তনের ক্রিয়া চলছে এবং যেখানে প্রত্যয় আবার তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে সেখানে ইচ্ছার ক্রিয়া চলছে এইরকম আমাদের মনে হতে পারে। এবং বিশ্বের দুই প্রধান অংশের এই বর্ণনাটা আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাখ্যারূপে প্রতিভাত হতে পারে। আরো খানিকটা অস্পষ্টতার কুপ্রভাবে আমাদের এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় হয়। কারণ, বিশ্বের যাবতীয় জিনিস সম্বন্ধে বলা চলে, হয় সেগুলো আছে, নতুবা সেগুলো কালের ধারার মধ্যে ঘটছে। এই দেখে আমরা হয়তো বলতে পারি ঘটমান জিনিসগুলো ইচ্ছার সৃষ্টি এবং বিদ্যমান জিনিসগুলো হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা চিন্তনের বিষয়। বর্তমানে এই দ্বিতীয় মতটার বিচার না করে

আমরা প্রথমোক্ত মতটার আলোচনা করতে চাই। এই মত-অনুযায়ী বিশ্ব-প্রবাহের আছে দুই দিক। চিন্তন হচ্ছে এই প্রবাহের ভাবনির্মাণের দিক। এবং ইচ্ছা হচ্ছে ভাবকে বাস্তবে পরিণতিসাধনের দিক। বর্তমানের জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে বুদ্ধি এবং ইচ্ছার স্বরূপ যেন স্বয়ংপ্রত্যক্ষ।

এখন উপর্যুক্ত মত যে আমাদের একটা অনুমান সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ভাব-নির্মাণ যে কেবল চিন্তনের কাজ এ আমাদের কাছে মনে হয় না। এবং প্রত্যক্ষ তথ্য যে সব সময় ইচ্ছার ফল, তাও আমাদের মনে হয় না। নিজের মধ্যে, প্রকৃতিতে কিম্বা অন্য জীবের মধ্যে কোথাও আমরা এইরকম দেখতে পাই না যে ইচ্ছাই সব তথ্যের উৎপাদক। তথ্য থেকে ধর্মের বা ভাবের বিশ্লেষ অর্থাৎ ভাবপ্রবণতা বা ভাবমুখিতা সবরকম অবভাসের সাধারণ লক্ষণ। এটা শুধু চিন্তার বৈশিষ্ট্য নয়। সর্ববিধ সম্বন্ধের আকারকে চিন্তন বলা চলে না। চিন্তনক্রিয়ার দ্বারা ভাবিক পার্থক্যের যেমন উদ্ভব হয় তেমনি অবারিত চিন্তনক্রিয়া নির্ভর করে এই ভাবিক পার্থক্যের ওপর। অনেক সময় নানারকম মানসিক বিকার ও ক্রিয়ার ফলে ভাব নির্মিত হয়; এবং তার জন্য যথার্থ চিন্তনক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। এই হচ্ছে আমাদের অসুবিধা; কিন্তু এগুলো হয়তো কাটিয়ে ওঠা যায়। আমরা যেমন সম্ভাব্য জীবের সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে পারি না, তেমনি বুদ্ধি ও ইচ্ছার কার্যক্ষমতার হয়তো কোনো সীমারেখাও টানা যায় না। আমরা সেগুলোর অস্তিত্ব এখানে বা ওখানে আমাদের মধ্যে কিম্বা বাইরে দেখতে পাচ্ছি না বলে সেগুলো নেই প্রমাণিত হয় না। এমন অসংখ্য রকমের জীব থাকা সম্ভবপর যাদের জীবন ও জগৎ হয়তো আমাদের অজ্ঞাতসারেই হচ্ছে এক ও অভিন্ন। তেমনি চিন্তা ও ইচ্ছার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ না হয়েও সেগুলো হয়তো সক্রিয় থাকতে পারে। যেটা আমার কাছে জড়শক্তির ক্রিয়ার ফলরূপে মনে হচ্ছে, কিম্বা যে ভাবিক প্রভেদটা আমার নিজের কল্পিত নয়, সেটা হয়তো বস্তুত চিন্তন এবং ইচ্ছার ক্রিয়ার ফল হতে পারে; এবং তবুও সেটি অংশত কিম্বা সম্পূর্ণত যথাভূত অবস্থায় আমার বাইরে আছে, এরকম অনুভূত হতে পারে। অন্যান্য জীবের সঙ্গে আমার সৌসাদৃশ্য নেহাৎ আকস্মিক হতে পারে এবং অন্য জীবের বুদ্ধিজাত ক্রিয়াগুলো আমার কাছে এক অন্ধশক্তির বাধ্যতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যে-সব জিনিস

আমাদের কাছে হল অন্ধ বিশৃঙ্খলা, মহত্তর সত্তার কাছে সেগুলো হল স্বচ্ছ শৃঙ্খলা। যে-জগৎ আমাদের প্রত্যেকের কাছে দ্বন্দ্বময়, অর্ধ-সম্পূর্ণ এবং আকস্মিক, সেটা সমগ্রের মধ্যে পরিপূর্ণতায় সুসমৃদ্ধ। সেই সমগ্রের মধ্যে সব-কিছু হচ্ছে ইচ্ছা ও বুদ্ধির যুগ্মক্রিয়ার এক অপূর্ব ফল। সেখানে বুদ্ধি এবং ইচ্ছা কাজ করে একযোগে এবং সেখানে ক্ষুদ্রতম অংশটা পর্যন্ত হচ্ছে দুই শক্তির যুগপৎ ক্রিয়ার বিস্ময়কর পরিণতি। এরকম মতবাদ এক দিক থেকে একটি স্বীকার্যমাত্র। কারণ, এই মতের অন্তর্নিহিত বিশেষ বিশেষ তথ্য-গুলোর সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু স্থূলভাবে বা সাধারণ ভাবে এই মতকে একটা অবশ্যগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত এবং ন্যায়সংগত অনুমান রূপে গ্রহণ করাও হয়তো চলে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অন্যরকমের বাধা আছে। সেইসব বাধার বিষয় এখন আলোচনা করা যাক। সুখ ও দুঃখ আছে। অনুভূতির ব্যাপারগুলো আছে এবং কান্তরসের চেতনা আছে। চিন্তন এবং ইচ্ছার সঙ্গে এই তথ্যগুলোর সম্বন্ধনির্ণয় করতে হয়। এই কাজে ব্যর্থ হলে আমাদের কল্পনা করতে হয় যে এগুলো এবং চিন্তা ও ইচ্ছার মধ্যে এক অজ্ঞাত ঐক্য আছে এবং সবগুলোকে এক অজ্ঞাত অদ্বৈততত্ত্বের বিধেয়রূপে ব্যবহার বা প্রয়োগ করতে হয়। প্রথমত অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ ও সংকল্পের নির্বিশেষ উৎপত্তিস্থলরূপে ধারণা করা যায় না; কারণ, এরকম উৎপত্তি কি করে সম্ভবপর তা বোঝা যায় না। এইজন্য অনুভূতিকে একবিধ দুর্বোধ্য ও বিশৃঙ্খল উত্তেজনারূপে স্বীকার করতে হয়। মনে হয় আরো সূক্ষ্ম পরীক্ষার পর এই নীহারিকার স্পষ্টরূপ ধরা পড়বে। কান্তরসের অনুভবকে জ্ঞানবৃত্তি ও কর্মবৃত্তির সমতাবোধ বলা হয়তো যেতে পারে। কিন্তু এইরকম সমতা যদি সম্ভবপর হয় তা হলে আমাদের সামনে আর একটা জটিলতার উদ্ভব হয়। কারণ, জ্ঞান ও কর্মের পৃথকত্ব স্বীকার করলে সেগুলোর দ্বৈত থেকে ঐক্য বা সমতার উদ্ভব কি করে সম্ভবপর আমরা বুঝতে পারি না; অপর পক্ষে জ্ঞান ও কর্মের অপৃথকত্ব স্বীকার করলে তার থেকে উভয় বৃত্তির উৎপত্তি কি করে সম্ভবপর তাও বোঝা যায় না। সুখ এবং দুঃখের ক্ষেত্রে আমাদের বিপত্তি আরো বেশি। আমাদের দ্বিবিধ বৃত্তির সঙ্গে সুখ এবং দুঃখের সংযোগ শেষ পর্যন্ত দুর্বোধ্য। অপর পক্ষে এই সংযোগ যে স্বয়ংপ্রত্যক্ষ

তাও নয়। আমরা ধীরে ধীরে এই স্বীকার করতে বাধ্য হই যে জগতে চিন্তন ও ইচ্ছা ব্যতীত আরো অনেক জিনিস আছে। সেগুলোকে চিন্তন এবং ইচ্ছার অন্তর্নিহিত ঐক্য-সত্তার গুণ মনে করতে হয়; কিন্তু চিন্তন বা ইচ্ছার মধ্যে সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এরকম স্বীকার করার ফলে প্রকারান্তরে স্বীকার করতে হয় যে চিন্তন বা ইচ্ছা বিশ্বের মৌলবস্তু নয়।

এবার অন্যান্য আভ্যন্তরিক বিঘ্নগুলোর বিষয় আলোচনা করা যাক। মনন ও সংকল্পের স্বরূপ স্বপ্রকাশ হওয়া উচিত; অথচ একটা বিনা অপরটার স্বকীয় কোনো সত্তা নেই। কারণ, ইচ্ছার ক্রিয়ার জন্য প্রত্যয় ও তথ্যের প্রভেদ দরকার; কিন্তু এই প্রভেদটা যে-ক্রিয়ার সাহায্যে প্রকটিত হয়, সেই-ক্রিয়াটা হয়তো ইচ্ছাকৃত। আবার মননের জন্য যে-তথ্যের দরকার, সেই-তথ্যের সৃষ্টি একমাত্র ইচ্ছা বা যত্ন দ্বারাই সম্ভবপর। সুতরাং মননের জন্য ইচ্ছার প্রয়োজন এবং মনন-ক্রিয়া যখন চলে তখন সেই ক্রিয়াটাও হচ্ছে ইচ্ছাকৃত। অপর পক্ষে ইচ্ছার ক্রিয়ার জন্য মননের দরকার। আমার মনে হয় এইসব আপত্তির প্রভাবে আমরা মনন ও ইচ্ছার তাদাত্ম্যের বা ঐক্যের দিকটার ওপর বেশি জোর দিতে বাধ্য হই এবং বলি যে আমাদের এই বৃত্তি দুটো হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য; সেইজন্য সেদুটো অন্যোন্যসাপেক্ষ। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে এইরকম অস্থির চক্রাবর্ত হল অবভাসের নিশ্চিত লক্ষণ। তবে এখন এই যুক্তিটার অবতারণা আমি করব না। সুতরাং ইচ্ছা ও চিন্তা হচ্ছে সর্বত্র পরস্পরাপেক্ষী। প্রত্যয়হীন সংকল্পের অস্তিত্ব নেই, এবং ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনন-ক্রিয়াও অসম্ভব। সুতরাং সংকল্পকে কিছুদূর অবধি মূলত চিন্তন এবং চিন্তনকে সর্বত্র মূলত সংকল্প বলা যায়। কিন্তু আবার ইচ্ছার দ্বারাই উদ্দেশ্যরূপে মনন-ক্রিয়ার অস্তিত্বকে আমরা গ্রহণ করি; এবং ইচ্ছা বা তৃষ্ণাকে আমাদের বাদবিচারের বিষয়রূপে গ্রহণ করি। সুতরাং ইচ্ছা এবং মননকে দুই পৃথক ও স্পষ্ট বৃত্তির একযোগ বলা চলে না; এদুটো একই বৃত্তির দুই বিভিন্নরূপ। প্রত্যেক বৃত্তিটাকে পৃথকরূপে গ্রহণ করলে তার মধ্যে অন্য বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কোনো বৃত্তি এককরূপে এবং অনাশ্রিতরূপে সত্য নয়। কোনো এক বৃত্তির সম্বন্ধে একথা বলা চলে না যে সেটা শুধু নিজসত্ত্বেরই আতিশয্য এবং অন্য বৃত্তির সত্ত্ব তার মধ্যে নেই।

অতএব সংকল্প ও মনন হচ্ছে একই তত্ত্বের দুটো বিশ্লিষ্ট ও একদেশী বিভাব মাত্র। অর্থাৎ সহজ কথায় সেগুলোর প্রভেদ আপাতসত্য বা আবভাসিক মাত্র।

তবে আবার এষণা ও ভাবনা যদি বাস্তবিকত ভিন্ন না হয় তা হলে সে-দুটোকে দুটো তত্ত্ব বলা চলে না। সেই দুটোকে বিশ্বের বৈচিত্র্যের সুপরিজ্ঞাত হেতুস্থানীয় দুই প্রভিন্ন তত্ত্ব বলে স্বীকার করা যায় না। কারণ, সেই আপাতদৃশ্য পার্থক্যের অবভাসের কারণ কি তাই আমাদের সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করতে হয়। এই অনুসন্ধানে আমাদের চিন্তা বা ইচ্ছার বাইরে যাওয়ার অধিকার নেই; অথচ এই দুই তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা অসম্ভব। উভয়ের অভিন্নতা দ্বারা মূলসমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, এই অভিন্নতা কি করে ভিন্নতার অবলম্বন হয় তা আমরা বুঝতে পারি না। অথচ এই প্রভেদটির উৎপত্তিই হচ্ছে আমাদের জিজ্ঞাস্য। আমাদের সামনে ব্যাকৃত ঘটনার ধারা বয়ে চলেছে; তার আছে দুই দিক। এই ধারার যথার্থ ব্যাখ্যা বা হেতুনির্ণয়ে আমাদের বলতে হবে কেন এবং কিপ্রকারে একই ধারা দুই ধরণের ব্যাপারের আশ্রয় এবং অবলম্বন হতে পেরেছে; কিন্তু এই বৈচিত্র্যকে বুদ্ধি ও সংকল্পের ক্রিয়াতে পর্যবসিত করাতে বিশেষ কিছু জানা হয় না, শুধু দুই অব্যাখ্যাত বিভাবের দুটো নাম দেওয়া হয়, এই মাত্র। কারণ অন্য সবরকম ত্রুটির কথা নাই তোলা গেল, মূল ত্রুটিটা এখানে থেকেই যাচ্ছে। আমাদের মূল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি। সেই মূল প্রশ্নটি ছিল, কেন ইচ্ছা এবং ভাবনা হল দুই ভিন্ন তত্ত্ব? অথবা কেন সে-দুটো দুই ভিন্ন তথ্যরূপে প্রতীয়মান হয়? এই দৃশ্যমান ভিন্নতার মধ্যেই হচ্ছে আমাদের প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত সীমার জগৎ।

প্রশ্নটা অন্য দিক থেকে বিচার করা যাক। কোনো প্রদত্ত কালাবচ্ছিন্ন ব্যাখ্যার জন্য বুদ্ধি ও সংকল্পের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে; কারণ উভয়ের ক্রিয়াই হচ্ছে কালানুসারী। এখন কালিক ধারা হচ্ছে একবিধ অবভাস মাত্র; সুতরাং যথাভূতরূপে তার পারমার্থিক সত্তা নেই। এবং আমরা যদি যুক্তি উত্থাপন করি যে বুদ্ধি আর সংকল্প দুটো পরস্পরসম্বদ্ধ ও পরিপূরক দুই প্রক্রিয়া বা ব্যাপ্রিয়া, তাতেও কিছু ফল হয় না। কারণ তথাভূতরূপে কোনোটাকেই বাস্তব ঐক্য-তত্ত্বের বিধেয় বলা যায় না। এবং ঐক্য-তত্ত্বটা

ও তার অবভাস-বৈচিত্র্যের সম্বন্ধ ও স্বরূপ অব্যাখ্যাত থেকে যায়। কালাধীন পরম্পরার সমস্তটাই হচ্ছে শুধু প্রত্যক্ষের দিকে এবং ইচ্ছা স্বরূপত কোনো কালান্তর্গত প্রক্রিয়া নয়, এরকম যুক্তিতেও বিশেষ সুবিধা হয় না। কারণ ইচ্ছার একটা বিষয় থাকবেই এবং ইচ্ছিত বিষয়টা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবেই। সুতরাং তার মধ্যে সময়ের কলনা থাকবে; এবং ইচ্ছার স্থান ইচ্ছিতের উপর হতে পারে না। যেরকম ইচ্ছার মধ্যে কোনো ইচ্ছিত বিষয় ভাবগতরূপে নেই, সেরকম ইচ্ছা হচ্ছে এক অজ্ঞাত পদার্থের প্রতি অন্ধ আসক্তিবিশেষ মাত্র। এরকম ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই; এবং শেষ পর্যন্ত এই অপরিচিত পদার্থকে আমরা অব্যাখ্যাত প্রত্যক্ষ জগতের অবলম্বন বা বিশেষ্যরূপে কল্পনা করতে বাধ্য হই। সুতরাং দাঁড়ায় এই যে বুদ্ধি ও সংকল্প হচ্ছে দ্বিবিধ অবভাসের দুটো নামমাত্র। তথাভূতরূপে কোনোটাই পরমবস্তু নয় এবং শেষ পর্যন্ত সেদুটোর ঐক্য ও অনৈক্য দুইই হল অনির্বচনীয়। উপাদানদুটোকে আংশিক ও সাপেক্ষ ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা চলে; চরম ব্যাখ্যারূপে সেদুটো সম্পূর্ণ অচল।

কিন্তু যেখানে দুই উপাদানের একত্ব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই, সেখানে আমরা সেদুটোর একত্বের কথা বলতে পারি কি করে? ভানের সমগ্র রাজ্যটা এই দুটোমাত্র উপাদানের মধ্যেই নিহিত এরকম ধারণাকে ন্যায্য বা সংগত বলি কি করে? যে-সব স্থলে বুদ্ধি ও সংকল্পকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি না সেই-সব স্থলে সেদুটোর অস্তিত্ব স্বীকার করবার পক্ষে আমাদের কিছু প্রলোভন থাকা উচিত। এবং এই দুই উপাদান দিয়ে বিশ্বের ব্যাখ্যাই যদি সম্ভবপর না হয় তা হলে আর কি প্রলোভন থাকল? সমস্ত রকম অবভাসকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করবার জন্য এক দুরূহ প্রয়াস আমরা করব কেন, যখন দেখতে পাচ্ছি যে এরকম করাতে সেই দুই শ্রেণীর অবভাস ও অন্যান্য দৃশ্যমান তথ্যের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না? তার চেয়ে এই মেনে নেওয়া নিশ্চয়ই ভালো যে জগতে দুইয়ের অধিক আরো অনেকরকম বিভাব বা অবভাস আছে এবং সেইসব বিভাবের আধান ও অধিষ্ঠান হল একপ্রকার চৈতন্য। আমাদের এইপ্রকার চৈতন্যের কোনো প্রত্যক্ষ অনুভব থাকা সম্ভবপর নয়। তবে পূর্ববর্তী বাধাগুলোর থেকে রক্ষা পেতে হলে অন্তিমে ঐ সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। সুখ এবং দুঃখ, অনুভূতি এবং রসাত্মক চেতনাকে শুধু বুদ্ধি ও সংকল্পের কোনো

এক সম্মিলিত তত্ত্বের বিভিন্নরূপ বলা কঠিন; তা ছাড়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণনিচয় ও সেগুলোর সংস্থানের মধ্যে কি সম্বন্ধ, উপাদান এবং আকারের মধ্যে কি বন্ধন এসব বিষয় একেবারেই বোঝা যায় না। সংক্ষেপত বলতে হয় যে ইচ্ছা ও ভাবনার একীভাব স্বয়ংপ্রত্যক্ষ মেনে নিলেও জগতের সমস্ত তথ্যকে এই একীভূত তত্ত্বে পর্যবসিত করা অত্যন্ত কঠিন হয়। অপর পক্ষে এই লঘুকরণ সিদ্ধ হয়েছে মেনে নিলেও বুদ্ধি ও সংকল্পের ভিন্নতা ও অভিন্নতার স্বরূপ জানা যায় না। সীমা এবং কালোপহিত ধারাকে যদি বুদ্ধি ও সংকল্পের প্রভেদ দিয়ে বুঝতে হয়, তা হলে প্রশ্নটা উঠে যে এই পার্থক্যের উদ্ভব কি করে সম্ভবপর হল। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে কল্পিত তত্ত্বের বাইরে যেতে হয়। সুতরাং এই লঘুকরণ বা পরিণতি চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা অসম্ভব।

বিশ্বকে দুই প্রতিরূপ বৃত্তির অবভাসরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। এইটুকু বলেই আমরা এগোতে পারতাম। কিন্তু কোনোক্রমেই এ বলা চলে না যে এই দুই বৃত্তি এবং আমাদের সুপরিচিত বুদ্ধি এবং অতিপরিচিত সংকল্প একই জিনিস। এই বিষয়ে একটু তলিয়ে দেখলে ভালো হয়। এ পর্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছি যে বুদ্ধি ও ইচ্ছার স্বরূপ হচ্ছে স্বপ্রকাশ। আমরা পূর্বে একবার লক্ষ্য করেছিলাম যে এই দুই বৃত্তির কে কতখানি রাজ্য দখল করে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবুও ভাব-রচনা-প্রবৃত্তি ও বাস্তব-রচনা-প্রবৃত্তি নামক দুটো মৌলিক ও স্বতন্ত্র বৃত্তি আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু চিন্তন এবং এষণার অন্তর্নিহিত তথ্যগুলো অনুধাবন করলে দেখা যায় সে-দুটোর এরকম রচনাশক্তি নেই। কারণ প্রথমত সেদুটোর কার্যক্ষেত্রের একটা পরিধি আছে। তার উপর ইচ্ছা এবং ভাবনাকে কখনো মৌলিক বা স্বপ্রকাশ উপাদান বলা চলে না। এদুটো বৃত্তির প্রত্যেকটার ক্রিয়া নির্ভর করে কতগুলো বাহ্য এবং পরকীয় সংযোগ পূর্বে ঘটার উপর। আমি এবার আমার এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা করব।

বুদ্ধি ও সংকল্প দুইয়ের মধ্যেই দশা থেকে দশান্তরে যাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এবং এযাবৎ ধরে নেওয়া হয়েছে যে এই মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনের ধারাটা যেন স্বয়ংসিদ্ধ। আমরা কল্পনা করেছি যে ভাবনা এবং এষণার স্বভাবই হল এক অবস্থা থেকে স্বতই অবস্থান্তরে সংক্রমণ করা এবং সেইজন্য এই

সংক্রমণশীলতার কোনো হেতু আছে কি না সে প্রশ্ন আমরা করি নি। কিন্তু যদি আমাদের অভিজ্ঞতার দিকে আমরা তাকাই তা হলে দেখতে পাব যে আমাদের এই কল্পনাটা মিথ্যা। কারণ যথার্থ চিন্তনের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ কতগুলো সংযোগের উপর নির্ভর করতে হয়। এবং প্রদত্ত ও বাহ্য উপাদান বিনা আমাদের পক্ষে কোনোপ্রকার চিন্তন বা মনন করাই অসম্ভব। যে-সব যোগের উপর চিন্তনক্রিয়া অবলম্বী সেগুলো বুদ্ধির অন্তর্নিহিত কোনো উপাদান নয়; সেগুলো প্রায়শই বাইরে থেকে প্রাকৃত অনুভবে প্রাপ্ত কতগুলো উপাদান। এবং কিভাবে সেগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ বলা যেতে পারে আমি ভেবে উঠতে পারি না। আমাদের প্রভেদ-নিরূপণ-ক্রিয়ার স্বরূপ পরীক্ষা করলেই আমার উক্তিটার সত্যতা প্রমাণিত হয়। কারণ যথার্থ চিন্তনের অপেক্ষা না রেখেই প্রভেদগুলো যেন জেগে ওঠে এবং যে-স্থলে পূর্ব থেকেই পার্থক্য আছে সেই-স্থলে এবং তার উপর আশ্রয় করেই প্রভেদ-বুদ্ধি জাগে। সুতরাং এই ভেদগ্রহ বা ভেদ-বিচার কতগুলো বহিরাগত ও দৃষ্টিসিদ্ধ সম্বন্ধের ফল। ফলত চিন্তনের প্রকৃত ক্রিয়াগুলো স্বতঃসিদ্ধ নয়। অর্থাৎ সেগুলো বুদ্ধির মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্ত এরকম ধারণা করা যায় না। ইচ্ছার ব্যাপারগুলোর বেলাতেও সেই একই অবস্থা। কারণ, আমাদের কর্মগুলো স্বতঃপ্রসূত নয়। সেগুলো আমাদের ইচ্ছাবৃত্তির মধ্যে প্রথম থেকেই গূঢ় ও অব্যক্তরূপে নিহিত থাকে এরকম বলা চলে না। ধরুন প্রকৃতির কিংবা আমাদের অভ্যন্তরস্থ যে-সব ঘটনার সঙ্গে ইচ্ছাবৃত্তির কোনো সম্পর্ক নেই সে-সব ঘটনা থেকে আমাদের দৃষ্টি প্রত্যাহার করা গেল এবং যে-সব দিকে আমাদের কোনো-না-কোনো প্রত্যয় বা ভাব বাস্তবরূপ গ্রহণ করছে বলে মনে হচ্ছে সেই-সব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা গেল। আমরা এখন পরিবর্তনের যে ব্যাপারটা দেখতে পাই সেটা কি এত স্বচ্ছ ও এত সহজবোধ্য যে তার কোনো পৃথক ব্যাখ্যা দরকার হয় না? কোনো সময় অভিলষিত ভাবটা ভাবমাত্রই থেকে যায়; আবার কোনো সময় অভিলষিত ভাবটা বাস্তবে পরিণত হয়। প্রশ্ন উঠে কোনো একটা ভাব বাস্তবে পরিণত হয়, আবার কোনো একটা ভাব বাস্তবে পরিণত হয় না, এরকম কেন হয়? আপনি হয়তো উত্তর দেবেন ইচ্ছার ক্রিয়া বা কর্তৃত্ব হচ্ছে এই পরিণতির হেতু; এবং যেখানে ইচ্ছার কর্তৃত্ব আছে সেইখানে বাস্তবে পরিণতিও আছে। পরিণতি-

ব্যাপারটাই যে ইচ্ছার ক্রিয়ার অপর এক নাম এ আপত্তি এখানে আমি তুলব না। আপনার বর্ণিত অত্যদ্ভুত শক্তিটার অস্তিত্ব আমি না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু আমি জানতে চাই যে যদি একক্ষেত্রে আমি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করি তা হলে অন্যক্ষেত্রে আমি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করি না কেন? এই দুই ব্যাপারের মধ্যে প্রভেদটা কি স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃসিদ্ধ? অর্থাৎ যত্ন করা বা না করার কারণটা যে ইচ্ছার সত্তার মধ্যেই নিহিত এটা কি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষরূপে স্পষ্ট? তাই যদি না হয় তা হলে ইচ্ছাশক্তি পরিণামের হেতু নয়। বাহ্য অন্য কিছু তা হলে এই পরিণতির কারণ। এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বুদ্ধি ও সংকল্প দুটো বৃত্তির বেলাতেই আমাদের একইরকম সিদ্ধান্তে আসতে হয়। বিশেষ বিশেষ ভাবনার বা ইচ্ছার মধ্যেই বুদ্ধি ও সংকল্পের অস্তিত্ব। অথচ বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলো স্বয়ংসিদ্ধ নয়। সেগুলো বুঝতে হলে তাদের সঙ্গে বাহ্যজগতের সংযোগগুলোকে বুঝতে হয়। সুতরাং বুদ্ধি এবং ইচ্ছা পরম ও নিরপেক্ষ পদার্থ নয়। কোনো জিনিসকেই এই দুটো উপাদানের কোনো একটার দ্বারা শেষ পর্যন্ত চরম ব্যাখ্যা করা যায় না।

আমরা যে-সিদ্ধান্তে এসেছি মনোবিদ্যাতেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, আমরা যে-অর্থে বুদ্ধি এবং ইচ্ছাকে জানি সেই-অর্থে সেদুটোকে প্রাথমিক তত্ত্ব স্পষ্টতই বলা চলে না। বুদ্ধি এবং ইচ্ছার উৎপত্তি যে নির্বিশেষ ও বিমিশ্র উপাদান থেকে তাকে একান্তভাবে বুদ্ধিও বলা চলে না, কিংবা একান্তভাবে প্রবৃত্তিও বলা চলে না; এবং এই উৎস-স্থানীয় উপাদানটা কখনো অবিমিশ্র বুদ্ধি কিংবা অবিমিশ্র তৃষ্ণাতে পরিণত হতে পারে না। বুদ্ধি এবং তৃষ্ণার অস্তিত্ব যে-সব মানসিক ঘটনা কিংবা যে-সব ঘটনারীতির ওপর নির্ভর করে সেগুলোকে কেবল বুদ্ধি কিংবা কেবল ইচ্ছার বিশিষ্ট সৃষ্টি বা দান বলে উল্লেখ করা যায় না। এবং মনে হয় যেন বুদ্ধি কিংবা ইচ্ছা কখনো ভিত্তিস্থলীয় উপাদানটার সমস্ত অংশ আত্মসাৎ করতে পারে না। বুদ্ধি এবং ইচ্ছা হচ্ছে দুটো বিশিষ্ট বৃত্তি। কিন্তু এই দুটো বৃত্তির অন্তর্গত সমস্ত উপাদানগুলো বিশিষ্টতা বা বৈলক্ষণ্য লাভ করতে পারে না। অর্থাৎ বুদ্ধি এবং ইচ্ছার ক্রিয়ার জন্য যে-সব মানসিক উপাদান দরকার, সেগুলো বাহ্য এবং সেগুলোকে মূলত বুদ্ধিজাত বা ইচ্ছাজাত বলা চলে না। সংক্ষেপে এই বলতে হয় যে একটা সর্বসাধারণ ধাতু বা বস্তু আছে এবং তার

কতগুলো সাধারণ আচরণ-বিধি আছে; বুদ্ধি এবং কৃতি হচ্ছে এই সর্ব-সাধারণ বস্তুর দুটো একদেশী কার্যক্রম মাত্র। এই সাধারণ উপাদানটার সত্তা বৃত্তি-দুটোর মধ্যে কখনো নিঃশেষিত হয় না: বৃত্তি-দুটো হচ্ছে এই সাধারণ সামগ্রীটার দুটো ভিন্ন অংশ মাত্র।

এই সত্যটার তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করা হল মনোবিদ্যার কাজ। কয়েকটা প্রধান প্রধান বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে আমি ক্ষান্ত হব। ভাব বা প্রত্যয়ের উদ্ভবের পর হয় চিন্তনের উদ্ভব ও বিস্তার; এবং ভাবই হচ্ছে চিন্তনের ভিত্তি। ভাব এবং তথ্যের প্রভেদটা চিন্তনের সৃষ্টি নয়, সেটা স্বাভাবিকত জন্মায়। অনুষঙ্গ ও মিশ্রণের নিয়মগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যায় সেগুলোর ক্রিয়াও কতগুলো ভাবগত উপাদানের ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং এই নিয়মগুলোই হল চিন্তনক্রিয়ার জনক ও আশ্রয়। বিভিন্ন সংবেদনের সংঘর্ষ ও জড়চাপ এবং এই নিয়মগুলোর যুগ্মপ্রভাবে চিতি-প্রত্যয় চিতি-তথ্য থেকে আলগা হয়ে আসে। এইজন্য বলা চলতে পারে যে প্রকৃত চিন্তন হচ্ছে ভাবোৎপত্তির ফল; ভাবোৎপত্তি, চিন্তন-ক্রিয়ার ফল নয়। অবশ্য আমার বলবার উদ্দেশ্য এ নয় যে যে চিন্তার বিকাশের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর। কারণ, সেরকম ব্যাখ্যা দিতে হলে সম্বন্ধের আকারে আকারিত চৈতন্যের উৎপত্তির সাধারণ হেতু কি তা আমাদের স্পষ্ট জানা উচিত। কিন্তু অখণ্ড অনুভবের অবস্থা থেকে সম্বন্ধ-গ্রাহী চৈতন্যের অবস্থার পরিণতি কি করে সম্ভবপর হয়েছে তা আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝি না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলব যে খানিকটা পৃথককরণ প্রকৃত চিন্তনের আগেই ঘটে থাকে। মানুষের মনে প্রথমে কতগুলো ভাবগত সংশ্লেষ বা সমষ্টি ও ভাবগত বিশ্লেষ বা ব্যষ্টি গড়ে ওঠে; তার পরে সেগুলো এক বিশিষ্ট আকারে ব্যূহিত হয়ে চিন্তন-ক্রিয়ার উদ্ভব হয়। এই অবস্থায়, বুদ্ধিকে পরমতত্ত্ব বলা চলে না। একমাত্র বুদ্ধিই সবরকম ভাবের উৎপত্তির কারণ নয়।

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মধ্যেও গোড়া থেকেই মননের ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। সেইজন্য তাঁরা বলেন যে মনন-ক্রিয়া হল মানুষের মনের একটা মুখ্য বা আদিম বৃত্তি। এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি আমরা মেনেও নিই যে এই মত সত্য, তা হলেও

মননের সাপেক্ষত্ব দূর হয় না। কারণ, চিন্তনের সত্তা যে-সব অন্বয় ও ব্যতিরেকের তথ্যের মধ্যে এবং যে-সব ভাবিক সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত সেগুলো শেষ পর্যন্ত আমরা কোথা থেকে পাই? এই বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধগুলোর বৈশিষ্ট্য অংশত সেগুলোর প্রকৃতির স্বকীয়তার জন্য এবং সেগুলোর প্রকৃতির অনন্যতার কিছুটা অংশ অন্তত কোনো বুদ্ধি-শক্তির সৃষ্টি নয়। সুতরাং আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বুদ্ধিগ্রাহ্য বা বৌদ্ধ সম্বন্ধগুলো শেষ পর্যন্ত অনুভবের উপর নির্ভর করে। অংশত সেগুলো ইন্দ্রিয়-প্রতীতি ও কতগুলো মানসিক প্রক্রিয়ার ফল। সুতরাং চিন্তন হচ্ছে কতগুলো বহিরাগত উপাদানের উপর নির্ভরশীল। এবং চিন্তনকে যত কেন না প্রাথমিক ও আদিম বৃত্তি রূপে কল্পনা করা হোক, চিন্তনের মধ্যে স্ব-প্রতিষ্ঠা নেই। কারণ কোনো ক্ষেত্রেই বাহ্য উপাদানগুলোকে নিঃশেষে বুদ্ধির স্বগত শৃঙ্খলায় পরিণত করা যায় না। চিন্তনের সংযোগ-সূত্রগুলো হয়তো পরিচিত এবং অলক্ষিত থাকতে পারে; তার পরম্পরাগুলো হয়তো অনবচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে যেতে পারে। এমন কি, চিন্তার বিশেষ বিন্যাসটা বাহ্য সংযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত এক আকস্মিক বিন্যাস নয়, সেটা একটা সত্য ও স্ব-প্রতিষ্ঠ তন্ত্র এরকম বিশ্বাসও অনেক সময় উৎপন্ন হতে পারে। এসবই হতে পারে। কিন্তু নিজেকে যদি প্রশ্ন করি যে চিন্তনের বিষয়ীভূত তন্ত্রটা কি মাত্র চিন্তা-শক্তির নিজ অভিব্যক্তি কিংবা যদি প্রশ্ন করি যে তার অস্তিত্বটা কি কেবল মননের মধ্যে নিহিত, তা হলে প্রশ্নগুলোর উত্তর অন্যরকম দিতে আমরা বাধ্য হই। বিশেষ বিশেষ অন্বয় বা সংযোগগুলো ঠিক সেইরকম না হয়ে অন্যরকম কেন নয়, এর উত্তর কোনো চিন্তা-শক্তির মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং উৎপত্তির দিক থেকে চিন্তনকে গৌণ না বললেও স্বরূপত চিন্তন হচ্ছে গৌণ এক তথ্য। চিন্তনের বিষয়ীভূত উপাদানগুলো হচ্ছে নিছক মানসিক ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তির ফল এবং ভাবগত সম্বন্ধের খানিকটা অংশ সবসময়েই বাইরে থেকে আসে, সেগুলো বুদ্ধি দ্বারা সৃষ্ট নয়, সেগুলো হল বুদ্ধি দ্বারা স্বীকৃত-মাত্র। সেইজন্য কোনো সংযোগ-সূত্রকে যদি বুদ্ধির সৃষ্টি বলে মনে হয়, সেটাকে কাল্পনিক সংযোগ বলে পরিত্যাগ করতে হয়। অতএব মনোবিদ্যার দিক থেকে বিচার করলে এই সংযোগসম্বন্ধগুলো স্বগত ও স্ব-নিষ্ঠ নয়। সুতরাং সত্য মত হল এই যে, চিন্তন-ক্রিয়া হল একপ্রকার প্রচয়। যে-সব প্রক্রিয়ার ক্রম-

অভিব্যক্তিতে চিন্তনের উদ্ভব হয় এবং যে-সব ক্রিয়ার মধ্যে চিন্তন নিহিত থাকে সে-সব ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া চিন্তনের উপর নির্ভরশীল নয়। ফল তা হলে দাঁড়ায় এই : সব সম্বন্ধগুলোই হচ্ছে প্রত্যয়াত্মক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও সংশয়াতীত যে সব সম্বন্ধগুলোই চিন্তনের নির্মাণ নয়।

এষণা যে একপ্রকার গৌণ ও উৎপন্ন বৃত্তি এ কথা মনোবিদ্যায় স্বীকৃত হয়। প্রত্যয়ের বা ভাবের স্বতই বাস্তবে পরিণত হওয়ার কোনো শক্তি নেই। এবং মানুষের মনেও এমন কোনো শক্তি নেই যার কাজ হল এই পরিণতি সাধন করা। আর যদি ধরেও নিই যে সেরকম কোনো শক্তি আছে তবুও কতগুলো ভাবের পক্ষে বাহ্য সাহায্য একান্ত দরকার, এ সত্য আমরা আগে লক্ষ্য করেছি। এই শক্তি সক্রিয় হবার জন্য বিশেষ প্রকারের উত্তেজনা দরকার। কিন্তু যার প্রচোদনায় ক্রিয়াশক্তি স্বীয় স্বভাব অনুযায়ী কাজ করে তাকে ইচ্ছাক্রিয়ার কারণ বলে স্বীকার করতে হয়। সুতরাং তার উপর ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সংক্ষেপে বলা যায় যে শারীরিক ও মানসিক অনুষঙ্গের যুগ্মক্রিয়ার কিংবা শুধু শারীরবৃত্তীয় উত্তেজনা-পরম্পরার উপর ইচ্ছার ক্রিয়া নির্ভরশীল। এইসব বাহ্য তথ্যগুলো থেকে ইচ্ছার উদ্ভব হয় এবং ইচ্ছার ক্রিয়ার জন্যও এইসব বাহ্য উপাধির কারকত্ব প্রয়োজন। সুতরাং এগুলোকে ইচ্ছার প্রবৃত্তির অংশীভূত বলে গ্রহণ করতে হয়। আমি জানি ইচ্ছার স্বরূপ সম্বন্ধে নানারকম মত আছে। তার মধ্যে কতগুলো মত এত অকিঞ্চিৎকর যে সেগুলোর আলোচনা করাও বৃথা। যে-কোনো সুস্থ মনোবিদ্যাতে এই মত স্বীকার করতেই হবে যে ইচ্ছার উৎপত্তি এবং ব্যাপ্রিয়া হচ্ছে কতগুলো শারীর ও মানস ঘটনার সংগমের উপর অধিষ্ঠিত। এবং এই ঘটনাগুলো হচ্ছে ইচ্ছা বা এষণার বহির্ভূত। এ ছাড়া, ইচ্ছাশক্তির বিকাশের কোনো স্তরেই বহিস্থ উপাধিগুলো ক্রিয়াশক্তির স্বগত উপাদান হয়ে দাঁড়ায় না। তাই যদি হয় তা হলে ইচ্ছা কোনো নিরপেক্ষ ও মুখ্য তত্ত্ব নয়।

সমগ্ররূপে বিশ্বকে বুদ্ধিসম্মত বলা চলে। বুদ্ধিসম্মত এইজন্য বলা চলে যে পূর্ণ বুদ্ধির পরম চাহিদাগুলো মেটাবার সামর্থ্য বিশ্বের সত্যরূপের আছে এবং বিশ্বের প্রত্যেক ক্ষুদ্র উপাদান হচ্ছে এই বুদ্ধিসম্মত সমগ্রের এক অংশ ; সুতরাং প্রত্যেক ক্ষুদ্র উপাদানও বুদ্ধিসম্মত। কিন্তু বুদ্ধিসম্মত হলেও বিশ্বকে

সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য বলা চলে না। বুদ্ধি দ্বারা বিশ্বের সমস্তটাকে বোঝা যায় না। এবং শুধুমাত্র বুদ্ধির উপর নির্ভর করে বিশ্বের সব দিকের বিস্তৃত কল্পনা করা অসম্ভব। কারণ, বুদ্ধির পূর্ণসমন্বয়ের দাবি মানতে গিয়ে সমগ্রসৎ বুদ্ধির স্বকীয় ত্রুটিগুলোর সম্পূরণ ও শোধন করে; এবং এই সম্পূরণ ও শোধনের ফলে বুদ্ধির মৃত্যু ঘটে; সম্পূরিত বুদ্ধি আর আমাদের পরিচিত বুদ্ধি থাকে না। বিশ্বের অন্যান্য বিবিক্ত দিকের বিচারের বেলাতেও এই যুক্তি প্রযোজ্য। কোনো দিকই নিজরূপে বা যথাভূতরূপে বুদ্ধি-গ্রাহ্য বা বোধ্য নয়। কারণ বোধ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর নিজরূপের অবসান হয়। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের কিংবা তার বিভিন্ন অংশগুলোর ব্যাখ্যা কোনো একক দিক থেকে কিংবা একযোগে সবগুলো দিক থেকে কোনো ভাবেই দেওয়া যায় না। এতক্ষণ চিন্তন এবং ইচ্ছার ক্ষেত্রে এই সত্যের যাচাই করা হল। মনন-ব্যাপারকে বোঝা যায় না; কারণ মননের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলো স্বয়ং-প্রকাশ নয় এবং চিন্তনের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলো কোনো বুদ্ধিশক্তির স্বগত সত্তার স্বতঃস্ফূর্তি নয়। ইচ্ছা-ব্যাপারের ক্ষেত্রেও এই একই দোষ লক্ষ্য করা যায়। ইচ্ছার স্বকীয় ক্রিয়াপদ্ধতিটা বুদ্ধির ক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র; শুধু তাই নয়; ইচ্ছার ব্যাপারগুলো হচ্ছে অবোধ্য। কারণ সেগুলো স্বয়ং-সিদ্ধ বা স্বতই স্বচ্ছ নয়। ইচ্ছার ঘটনাগুলো আমাদের কম বেশি পরিচিত; কিন্তু সেগুলো স্ব-নিষ্ঠ এবং স্বয়ং-প্রামাণ্য নয়। সেগুলোর কারক উপাধিরূপে আছে কতগুলো বাহ্য তথ্য। সুতরাং সেগুলোর সত্তার মধ্যে সব সময়েই আছে কিছু বিজাতীয় উপাদান। সমগ্র বিশ্বকে দুই বা ততোধিক উপাদানের সমন্বয় কল্পনা করা চলে না। কারণ কোনো উপাদানই বিবিক্তরূপে স্বয়ং-সিদ্ধ নয়; এবং বিভিন্ন উপাদানের বৈচিত্র্যের হেতু কি তার পরিপূর্ণ জ্ঞানও আমাদের নেই।

এইবার আমাদের এগোবার সময় হয়েছে। কিন্তু তার আগে এই প্রসঙ্গে ইচ্ছা বা তৃষ্ণার তথাকথিত পরমত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় দুএকটা মন্তব্য করতে চাই। প্রথমত ইচ্ছা যদি পরমতত্ত্ব হয় তা হলে সর্ববিধ প্রপঞ্চ ও ইচ্ছার মধ্যে যে-সম্বন্ধ তার স্বরূপ বোঝাবার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হয়। এবং এই সম্বন্ধের স্বরূপ নিরূপণে যদি আমরা ব্যর্থ হই তা হলে এই সম্বন্ধের পশ্চাতে এক অজ্ঞাত ঐক্যতত্ত্বের অস্তিত্ব কল্পনা করতে হয়; ফলে

ইচ্ছাও একবিধ আংশিক অবভাস বা ছায়া-সত্তায় পরিণত হয়। কিন্তু ইচ্ছার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। আমরা ইচ্ছানামক যে ব্যাপারকে জানি তার মধ্যে আছে একপ্রকার সম্বন্ধ এবং একপ্রকার ক্রিয়া এবং বিভিন্ন উপাদানের অমীমাংসিত এক অসংগতি। শক্তি কিংবা কর্ম বা তজ্জাতীয় যে-কোনো তত্ত্বের বেলাতেও এই মন্তব্য সত্য। বস্তুত এই বিষয়ে আমি এর পূর্বে এতবার আলোচনা করেছি যে ধরে নিতে পারি যে পুনরায় এ সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। হয়তো আপনি বলতে চান যে আমি যে-সব জটিলতার কথা তুলছি সেগুলো ইচ্ছার প্রকাশের বা অবভাসের সম্বন্ধে সত্য; বাস্তব ও পরম ইচ্ছা হল এক অপর ও সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। কিন্তু আপনার উক্তি যদি সত্য হয় তা হলে বাস্তব ইচ্ছা ও তার প্রকাশের মধ্যে সম্বন্ধটা কি আমাদের জানা দরকার। তা ছাড়া অন্য কারণেও এই-রকম ইচ্ছামাত্রের কল্পনা অসমর্থনীয়। কারণ আমাদের পরিচিত এষণা বা ইচ্ছার মধ্যে আছে ধারা বা প্রক্রিয়া এবং যাকে আমরা ইচ্ছা বলে জানি না তাকে ইচ্ছা বলে অভিহিত করাও অসংগত। এই ইচ্ছামাত্র হয় একটা ভৌতিক ঘটনা মাত্র নতুবা একটা তাত্ত্বিক পদার্থ। এবং কোনো ভাবেই এটি সুবোধ্য নয়, এ বিষয়ে আমরা আগে যথেষ্ট আলোচনা করেছি। মনোবিদ্যা-তেই হোক কিম্বা তত্ত্ববিদ্যাতেই হোক এরকম ইচ্ছাস্বরূপের শরণাপন্ন হওয়ার অর্থই হল এক অজ্ঞাত পদার্থ নিয়ে খেলা করবার নির্বোধ ও ব্যর্থ প্রয়াস করা। যেখানে হেতুটা অবোধ্য কিংবা ব্যাখ্যাটা অস্বচ্ছ, সেখানে হেতুটা আছে কিংবা ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ এরকম ভাবা একপ্রকার আত্মবঞ্চনা; এবং এরকম আত্মবঞ্চনার ফলেই ইচ্ছা-স্বরূপ নামক পদার্থের কল্পনা সম্ভবপর। তবে হয়তো তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে এইপ্রকার নিষ্ফলা আত্মপ্রবঞ্চনার একটা প্রয়োজন বা কারণ আছে। কেবল বুদ্ধির দ্বারা সর্ববিধ প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না: সেইজন্য বস্তুসামগ্রীর অন্য দিকের প্রতি ঝোঁক গিয়ে পড়ে। এবং বুদ্ধির একদেশদর্শিতা দূর করবার জন্য এক অজ্ঞাত বস্তুর কল্পনা করা হয়; এবং মনে করা হয় যে বিশ্বের যে দিক বুদ্ধির তুলনায় সবচেয়ে বেশি বিপরীতধর্মী সেই দিকের সঙ্গে এই অজ্ঞাত বস্তুটা হল অভিন্ন। কিন্তু তা হলে এই অজ্ঞাত তত্ত্বটা শুধু বুদ্ধির বাড়া নয়, সেটা হচ্ছে বুদ্ধি, ইচ্ছা ও সর্ববিধ আপাতগ্রাহ্য অবভাসের মূলে অবস্থিত একটি পদার্থ। সুতরাং এই পদার্থটা শুধু ইচ্ছা বা কোনো এক-

দেশীয় তত্ত্ব নয়। আমরা এখানে প্রকৃতপক্ষে এক সর্বতোগ্রাহী, একদেশ-দোষহীন, সর্বত্রুটিহীন ও পরিপূর্ণ সমগ্রসতের প্রতিষ্ঠা করছি। এবং তার নাম আমরা দিচ্ছি ইচ্ছাময় বা ইচ্ছাস্বরূপ। কারণ, আমরা মনে করি যে ইচ্ছা অন্তত একরকম বিশেষ দোষ থেকে মুক্ত। কিন্তু আমাদের এই বিচারপদ্ধতিটা যে যুক্তিসিদ্ধ নয় সেটা সুস্পষ্ট।

আর-এক দিক থেকে হয়তো ইচ্ছার সর্বময়তা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হতে পারে। এরকম যুক্তি হয়তো উত্থাপন করা যেতে পারে যে সমস্ত বিধি, বিধান এবং স্বতঃসিদ্ধ সূত্রই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত প্রয়োগমূলক এবং সেইজন্য সেগুলোকে ইচ্ছার বা সংকল্পের প্রকাশ বলা উচিত। কিন্তু এই উক্তি প্রমাদপূর্ণ। যাবতীয় বিধি, নিয়ম ও স্বতঃসিদ্ধ সূত্র হল আমাদের স্বভাবের নানা ও বিভিন্ন অংশের প্রকাশ ; সেগুলোকে একমাত্র ইচ্ছার প্রকাশ কোনো মতেই বলা চলে না। জ্ঞানীরূপে, কর্মীরূপে ও রসিকরূপে আমরা কতগুলো অভিজ্ঞতা বা অনুভব থেকে নিঃসন্দেহে তৃপ্তি পেয়ে থাকি। এইসব অনুভব আমাদের শান্তি দেয় এবং সেগুলোর অভাবে আমাদের অন্তরে দুঃখ, অশান্তি ও অভীপ্সা জাগে। এবং অনুভবগুলোর গুণের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা ধরতে পারি এবং চাই কি সেগুলোকে আদর্শরূপে স্বীকার করতেও পারি এবং সেগুলোকে আমাদের জীবনের পুরুষার্থ বা সাধ্যরূপে গ্রহণ করতেও পারি। কিন্তু তাই বলে একথা বলা চলে না যে একমাত্র নৈতিক উদ্দেশ্য বা সাধনার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র কোথায়ও ইচ্ছার সঙ্গে সেগুলোর সম্বন্ধ হচ্ছে অপরিহার্য। এইসব ক্ষেত্রে আমরা সেগুলোকে ইচ্ছা করি বলে সেগুলো আছে বলার চাইতে এই বলা বেশি ঠিক হবে যে সেগুলো আছে বলেই আমরা সেগুলোকে ইচ্ছা করি। আরো একটা আপত্তি তোলা যেতে পারে এই বলে যে এগুলো তো শেষ পর্যন্ত সবই হচ্ছে ইচ্ছার বিষয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। একইরকম যুক্তি দিয়ে বুদ্ধিকেও চরমতত্ত্ব প্রমাণ করা সম্ভবপর। কারণ ইচ্ছা ও বিশ্বের অন্যান্য সর্ববিধ তথ্য হচ্ছে বুদ্ধির বিষয়ীভূত, এও বলা চলে। এই দ্রুত দৃষ্টির পর ইচ্ছার তথাকথিত প্রাধান্য যে অমূলক তা আমরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য। সবসময়েই তত্ত্ব-চিন্তাক্রান্ত বা দর্শন-তাড়িত চিত্তের পক্ষে এই মতবাদটা হচ্ছে এক ক্লেদ-কৃষ্ণ আশ্রয়স্বরূপ। এই মতবাদের দাবিগুলোর আপাতসুষ্ঠুতা হচ্ছে সেগুলোর

অস্পষ্টতার জন্য। দাবিগুলোকে শুধু মাত্র অবোধ্য বললে কম বলা হয়। সেগুলো হচ্ছে উদ্ভট ও অসম্ভব।

আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে অনুভবের কোনো বিশেষ দিক নিজরূপে বা তদ্রূপে বাস্তব নয়। কোনো এক বিশেষ দিকের উপাদানকে প্রধান ও অন্যান্য দিকের বা সমগ্রের হেতুস্থানীয় বিবেচনা করা যায় না। সবগুলো উপাদানই অবভাসস্থানীয়, একদেশী এবং স্বাতিগামী। আপনি হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন সেগুলোকে অবভাস বলা হবে কেন? কারণ একমাত্র ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের জগতের ক্ষেত্রেই যথার্থত অবভাসের কথা ওঠা উচিত এবং প্রত্যক্ষ অনুভব হচ্ছে চৈতন্যের মাত্র এক দিক। আপনি হয়তো বলবেন একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর কাছেই অবভাস সম্ভবপর এবং অবভাসরূপে গণ্য হওয়ার মধ্যে একরকম বিচার ও বর্জন আছে। উত্তরে আমি বলব যে প্রচ্ছন্ন উপমার উপর যদি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হয় তা হলে কটা শব্দ এবং বাক্যাংশই বা ব্যবহারের যোগ্য থাকে! তবু এই আপত্তির যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। অবভাস-শব্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর দ্বারা এমন এক তথ্যকে উল্লেখ করা হচ্ছে যেটা প্রত্যক্ষদৃষ্ট এবং বিচারিত। অথচ সবরকম অবভাসের সম্বন্ধে বলা যায় না যে সেগুলো প্রত্যক্ষ-দৃশ্য। কারণ আমরা যদি স্বীকার করেও নিই যে সর্ববিধ প্রপঞ্চ বা অবভাসের উদয় চৈতন্যকেন্দ্রকে আশ্রয় করে হয় তবুও স্বীকার করতেই হয় যে চৈতন্যকেন্দ্রের সমস্তটাই প্রত্যক্ষ অনুভব নয়। এবং পূর্ণসতের মধ্যে সর্ববিধ প্রপঞ্চের বিবেচনা বা বিচারণা হয় এও একরকম কষ্ট-কল্পনা। সংক্ষেপে, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে এমন অনেক অবভাস আছে যেগুলো প্রকৃতপক্ষে অবভাসিত হয় না। এইসব ক্ষেত্রে অবভাস-শব্দকে আভিধানিক অর্থে ব্যবহার না করে এক বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়। শব্দ-ব্যবহারের এইটুকু শৈথিল্য মার্জনীয়।

তত্ত্ববিদ্যাতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে জ্ঞানিক। এখানে বস্তুসংস্থানের বিভিন্ন দিকের বিচার ও তুলনা করা আমাদের কাজ। সুতরাং বিচারে যা-কিছু পরমবস্তুর তুলনায় হীন মনে হয় তাকেই আমরা অ-পরমার্থ বা অবভাস বলি। কিন্তু অবভাস বলাতে আমরা এরকম ইঙ্গিত করতে চাই না যে তথ্যটা সবসময়েই কারো না কারো কাছে প্রত্যক্ষরূপে অবভাসিত হয়েছে।

বিচার্য জিনিসটা সম্বন্ধে আমরা বলতে চাই যে তার স্বভাব এমন যে তত্ত্ব-বিচারে নিযুক্ত হলে তাকে অবভাস বিবেচনা করতে হয়। এবং আমরা দেখেছি যে অবভাসের লক্ষণ হল প্রত্যয়াত্মকতা বা ভাবধর্মিতা। তথ্য ও প্রত্যয়ের বিচ্ছিন্নতার নাম অবভাস ; এবং এই বিদীর্ণ স্বভাবের জন্য প্রত্যেক সসীম দিককেই অবভাস বলতে হয়। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে সারা বিশ্বে এই ভাবালুতার বা প্রত্যয়-প্রবণতার ছড়াছড়ি। সমগ্র বা পরাকাষ্ঠা ছাড়া অন্য কিছুই আত্মস্থ নয়। সমগ্রেতর প্রত্যেক জিনিসেরই স্বভাবের মধ্যে বহিস্থ অপরের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ আছে ; তার ফলে তার অন্তর সর্বদা বাহ্য প্রকোপের বিষে জর্জরিত হয়ে থাকে। সর্বত্রই সসীম নিজেকে অতিক্রম করে অপর সত্তার দিকে ধাবিত হয়। এক দিকে সসীম হল পরমবস্তুর বিশেষণ ; অন্য দিকে সসীম, বিশেষণরূপেও হচ্ছে অবাস্তব। সুতরাং সসীমের সত্তা অ-পারমার্থিক অর্থাৎ আবভাসিক। অবভাস-শব্দের এই ব্যবহারে কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়।

এই অধ্যায়ে এ পর্যন্ত আমরা কেবল নেতিবিচার করেছি। সবই হচ্ছে অবভাসমূলক বা অবভাসাত্মক। এবং কোনো এক বা একাধিক অবভাস বা সমস্ত অবভাসের যোগফল বস্তুসত্তা নয়। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা আমরা সত্যের অর্ধেকটা মাত্র প্রকাশ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করা হবে এক বিপজ্জনক ভ্রম। সুতরাং সিদ্ধান্তটার অন্তর্নিহিত দোষ সংশোধনের জন্য পরিপূরক ও প্রতিরূপ সিদ্ধান্তটাকে স্বীকার করতে হয়। পরমবস্তুই হচ্ছে তার অবভাসসমূহ ; পরমসৎই হচ্ছে বাস্তবিকত প্রত্যেক ও সকল অবভাস। সত্যের এই অপর অর্ধেকটার ওপর আমরা বরাবর জোর দিয়ে আসছি। এবং পুনরায় জোর দেওয়া দরকার মনে করি। এইখানে আর একটা মারাত্মক ভ্রমের কথা আমাদের স্মরণ করা উচিত। কোনো এক বিশেষ বা ব্যষ্টিগত অবভাসকে বা সর্ববিধ অবভাসের এক সমষ্টিকে কল্পনা করে যদি শুধু এই উক্তি করি যে পরমসৎ হচ্ছে এগুলোর একটা বা সব কয়টা তা হলে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হবে। কারণ, তা হলে যাকে আমরা অবভাস মনে করছি, পরমসত্তার সঙ্গে তার তাদাত্ম্য কল্পনা করে তাকেই আবার অবভাসের ঠিক বিপরীত মনে করছি। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কি তা আমরা জানি। এবং কি উপায়ে বা

অর্থে বিভিন্ন অর্ধসত্যগুলোর সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয় তাও আমরা জেনেছি। পরমসৎ ও অবভাস একই জিনিস; কিন্তু পরমসতের সঙ্গে অবভাসের এই ঐক্য অবভাসের নিজরূপে বা তথাভূতরূপে নয়। এবং পরমসৎ সমানভাবে সর্ববিধ অবভাসের মধ্যে বাস্তব নয়; অবভাসিত সত্তার বাস্তবতার তারতম্য আছে। অর্থাৎ সত্য ও বাস্তবতার মাত্রা স্বীকারই হচ্ছে এখানে বাঁচবার একমাত্র পথ। প্রত্যেক জিনিসটাই আবশ্যক, অথচ একটা জিনিস হয়তো আরো অন্য কয়েকটা জিনিসের তুলনায় সম্পূর্ণ মূল্যহীন হতে পারে। কিছুই পূর্ণ বা পরাকাষ্ঠা নয়; অথচ পূর্ণতার বা পরাকাষ্ঠার জন্য সব-কিছুরই ন্যূনাধিক প্রয়োজন আছে। সংবিৎ বা অনুভবের যত দিক আছে এবং বিশ্বের যত লোক ও স্তর আছে পরমার্থে সব-গুলোরই একান্ত দরকার হয়। প্রত্যেক অংশেরই খানিকটা সার্থকতা আছে এবং যতক্ষণ তার বাড়া অন্য কোনো অংশের সন্ধান না পাওয়া যায় ততক্ষণ তার সত্য স্বীকার্য। সুতরাং যদি অবভাসকে প্রমাদ বা ভ্রমজ্ঞান বলতে চান বলুন। কিন্তু বিভ্রম-মাত্রই অমূলক মায়া নয়। (সপ্তবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) প্রত্যেক স্তরেই তার চেয়ে উচ্চতর স্তর আছে; সেইজন্য প্রত্যেক স্তরেই অসংগতি আছে এবং সেইজন্যই প্রত্যেক স্তরেই সত্যও আছে। প্রত্যেক স্তরেই সেই স্তরোপযোগী সত্য আছে যেটা হচ্ছে সেই স্তরের ভাব-ধারণা অনুযায়ী; সেই স্তরের দাবি দাওয়া সেখানে থেকেই মেটানো যায়। যখন কোনো এক স্তরের সত্যকে সেই স্তরের অতীত বা ঊর্ধ্বস্থ কিছু দিয়ে বিচার করা হয় তখন সেই সত্যটা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। পরমতত্ত্ব এইভাবে সর্ববিধ অবভাসের মধ্যেই সমানত অনুস্যূত হয়ে থাকে। অবভাসের তারতম্য আছে ও স্তরভেদ আছে; কিন্তু পরমার্থের সমান প্রয়োজন প্রত্যেক ও সমস্ত অবভাসকে।

জগতের এমন কোনো দেশ নাই যা এত হীন যে তা পরমার্থসতের নিবাসের অযোগ্য। বিশ্বের কোথায়ও এমন কোনো একটা তথ্য নেই যা এত খাপছাড়া এবং তুচ্ছ যে বিশ্বের কাছে তা সম্পূর্ণ মূল্যহীন। যত কেন না মিথ্যা হোক প্রত্যেক প্রত্যয় বা ভাবেই কিছু সত্য আছে; যত কেন না অকিঞ্চিৎকর হোক প্রত্যেক সত্তাতেই কিছু বস্তুসত্তা আছে; এবং যেখানেই সত্য ও বাস্তবতা আছে সেখানেই পরমার্থসতের অভঙ্গ ও অদ্বয় উপস্থিতি

স্বীকার করতে হয়। বস্তুসত্তা ব্যতীত অবভাস অসম্ভব; কারণ অবভাস মানেই কোনো-কিছুর অবভাস। এবং অবভাস ব্যতীত বস্তুসত্তাও অসম্ভব; কারণ অবভাসের বাইরে কোনো-কিছু নেই। কিন্তু পুনরুক্তি হলেও এখানে বলা আবশ্যক যে অবভাসের সমষ্টি বা সমাহার পরমবস্তু নয়। যে-ঐক্যের মধ্যে সবরকম অবভাসের সমাগমে প্রত্যেকটার রূপান্তর সাধিত হয়, যে-ঐক্যের মধ্যে প্রত্যেক অবভাসের পরিবর্তন হতে বাধ্য, যদিও সমানত নয়, সে-ঐক্যটার নাম পরমবস্তু। আমরা এও জেনেছি যে সর্ববিধ বিবিক্ত ও বৈরী সম্বন্ধ এই সমগ্রের দ্বারা গৃহীত ও ভক্ষিত হয়। এগুলো সবই সমগ্রের মধ্যে সমন্বয় লাভ করে; কিন্তু সেগুলো যতক্ষণ পৃথক পৃথক রূপ বা স্বীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে থাকে ততক্ষণ সেগুলোর মধ্যে সংগতি বা সামঞ্জস্যের অভাব থাকে। জগতে অসৌন্দর্যের ঔদ্ধত্য আছে, ইচ্ছাকৃত অনর্থের বিরোধ আছে বলে আমাদের মতের বিরুদ্ধতা করা সেইজন্য হচ্ছে একপ্রকার অন্ধতার লক্ষণ। চরম বৈরিতার সম্বন্ধ হচ্ছে একবিধ তীক্ষ্ণতর সম্বন্ধ এবং সমগ্রের মধ্যে এই সম্বন্ধেরও স্থান আছে। এরকম সম্বন্ধ দ্বারাও সমগ্রের ঐক্য সমৃদ্ধ হয়। বিশ্বে যত সব আপাত-প্রতীয়মান বিরোধ ও সংঘর্ষ আছে সেগুলো সবই হচ্ছে বৃহত্তর সমন্বয়ের সাধক এবং সেগুলো সবই হল পূর্ণতর ও অ-সামান্যতর ব্যক্তিতা বিকাশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পরমার্থসৎকে যথার্থত সুন্দর বা শিব বলা চলে না। এক অর্থে পরমার্থসৎ হল অশিব, এবং অসুন্দর ও অসত্যও বটে। কিন্তু যে-অর্থে এই বিশেষণগুলোকে পরমসত্তার প্রতি প্রয়োগ করা যেতে পারে সে-অর্থ অত্যন্ত কষ্টকল্পিত ও অস্বাভাবিক। সমগ্রের প্রতি এগুলোকে বিধেয়রূপে প্রয়োগ করতে গেলে যে ব্যকলন দরকার তা সম্পূর্ণ অসমর্থনীয়। কারণ পৃথক অংশরূপে এবং নিজরূপে এগুলোর কোনো সংগত অর্থই হয় না। নিজরূপে ও বিবিক্তরূপে অসুন্দর, অশুভ এবং অসত্য হচ্ছে কতগুলো অপ্রধান দিক মাত্র। সেগুলো হল পরমার্থের বিপুল রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের অন্তর্নিহিত কতগুলো প্রভেদ। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেগুলো এক উন্নততর অথচ সংকীর্ণ সামগ্রের সঙ্গে তদধীনস্থ এক উপাদানের দ্বন্দ্বের সম্বন্ধের নির্দেশ দেয়। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামগ্রের মধ্যে বিরোধটা তার অন্তর্গূঢ় তন্ত্রের শক্তিতে বেঁচে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ শৃঙ্খলার কাছে অবনত হয়। আমরা যখন কোনো জিনিসকে

অসত্য, অসুন্দর ও অমঙ্গল বলে সংজ্ঞিত করি তখন বলতে চাই যে জিনিসটা হচ্ছে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রদেশের এক অপ্রধান ও অধীনস্থ অংশ মাত্র। সেইজন্য এইসব বিশেষণ পরমসম্রাট পরমার্থসতের বেলাতে প্রযোজ্য হতে পারে না। একথা তবুও হয়তো বলা চলে যে পরমসত্তার অসৌন্দর্য, অসত্য ও অকল্যাণ আছে; কারণ, এগুলো যে-সব প্রদেশের খণ্ড বা অংশ সে-গুলোর অধিকারী হচ্ছে পরমসত্তা। কিন্তু এরকম উক্তি একেবারেই করা চলে না যে পরমসত্তা হচ্ছে তার কোনো এক ক্ষুদ্র ও অপ্রধান অংশবিশেষ-মাত্র।

বিভিন্ন বিষয়-সামগ্রকে সমগ্র বিচার করেও পরমতত্ত্বের গুণরূপে চিন্তা করা একপ্রকার অপরাধ। তবে সে অপরাধ মার্জনীয়। বিশ্বকে সুন্দর, শুভ বা সত্য বলার মধ্যে অনেকখানি ভ্রান্তি ও স্বৈরিতা আছে। তার বেশি কিছু বলতে সাহস করা হচ্ছে বৃথা ও বিপজ্জনক দুইই।

যদি নৈতিকদৃষ্টিতে কখনো পরমার্থসৎকে বিচার করা হয় তা হলে বলতে হবে যে পরমসত্তা হল মঙ্গলময়। কিন্তু পরমসত্তাকে কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত কোনো পরাভূত উপাদানবিশেষের সঙ্গে একীভূত কল্পনা করা অসংগত হবে। সেইরকম নৈয়ায়িক বা রসিকের দৃষ্টিতে দেখলে পরমার্থকে কেবল সত্য বা কেবল সুন্দরও বলা যায়। পরমার্থসতে এই প্রধান প্রধান গুণগুলো প্রয়োগ করার পর তবে আমরা অসত্য ও অসুন্দরের কথা উল্লেখ করতে পারি। সুতরাং সোজাসুজিভাবে অসত্য অসুন্দর ও অশুভকে পরমার্থসতের বিধেয়রূপে প্রয়োগ করা যায় না। বিশেষ উদ্দেশ্যে কোনো এক খণ্ড সামগ্রের সঙ্গে পূর্ণ সামগ্রের সমীকরণ সমর্থন করা যায়। কিন্তু যে-উপাদানটা খণ্ড সামগ্রের বশ্যতা স্বীকার করেছে এবং তৎকর্তৃক অবদমিত হয়ে আছে তাকে পরমার্থসতের সমান কল্পনা করার পক্ষে কোনো সুযুক্তি নেই। অসৌন্দর্য, অসত্য ও অকল্যাণ সবগুলোরই পরমার্থসতের মধ্যে স্থান আছে; সেগুলো পরমসত্তার সম্পদ বৃদ্ধি করে। অবভাস ছাড়া পরমবস্তুর অন্য কোনো ধনদৌলত নেই; অথচ পরমবস্তুর যদি একমাত্র এই ধনদৌলতই থাকে তা হলে পরমবস্তু দেউলিয়া হতে বাধ্য। শোধন ব্যতীত কোনো অবভাসেরই কিছু মূল্য নেই। অপর পক্ষে লক্ষণীয় যে বিশেষ বিশেষ অবভাসের বিশেষ বিশেষ মাত্রায় পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। সেইজন্য অবভাসের অন্তর্নিহিত সত্য ও

বাস্তবতার তারতম্য আছে। কতগুলো বিধেয় আছে, যেগুলোকে অন্য-সব বিধেয়ের তুলনায় মিথ্যা এবং বস্তুহীন বলা চলে।

তত্ত্ববিদ্যার কাজ হল অবভাসগুলোকে পরীক্ষা ও সমীক্ষা করা এবং পূর্ণব্যক্তিতার বা অখণ্ডব্যক্তিতার ভাবাদর্শে সেগুলোকে যাচাই করা এবং বস্তুত্ব ও মূল্য অনুযায়ী সেগুলোকে এক শৃঙ্খলা বা তন্ত্রের মধ্যে সুবিন্যস্ত করা। এই গ্রন্থে এত বড়ো দায়িত্ব পালন করবার ভার আমি গ্রহণ করি নি। মূল সত্য বা মৌলিক সূত্রটা কি তাই নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমি এখানে গুরুত্ব আরোপ করেছি এবং সূত্রটার স্বরূপ ব্যাখ্যান করতে চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত আরো দুএকটা আকর্ষণীয় বিষয়ে কিছু বলব। আমি আশা করি যে এখানে এসে কতগুলো প্রশ্নের একটা মীমাংসা হবে।

আর-একবার আসুন আমরা প্রকৃতি বা জড়জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করি। একথা কি বলা চলে যে প্রত্যয়গুলোর বা ভাবগুলোর কর্মকারিকা শক্তি আছে এবং প্রকৃতির মধ্যে কতগুলো অর্থ বা উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে? প্রকৃতি কি প্রকৃতপক্ষে সুন্দর ও পূজার যোগ্য? আমি প্রথমে দ্বিতীয় প্রশ্নটির আলোচনা করব; কারণ এই বিষয়ে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। আমরা দেখেছি যে প্রকৃতি-শব্দকে সমগ্র বিশ্বের অর্থে ব্যবহার করা যায়; আবার দেশোপহিত বিশ্বকে প্রকৃতি সংজ্ঞা দেওয়া চলে; কিংবা তার চেয়েও সংকীর্ণতর অর্থে প্রকৃতি-শব্দের ব্যবহার করা যায়। এই জগতে যা-কিছু মানস বা মনোগত তাকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট একদেশকে অর্থাৎ মাত্র প্রধান বা স্বগত গুণগুলোকে প্রকৃতি নাম দিতে পারা যায়। বলা যায় যে প্রধান বা স্বগত গুণগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির সারাংশ; বাকি সব-কিছু হচ্ছে প্রকৃতির আগন্তুক বা অপ্রধান গুণ মাত্র এবং যথার্থত সেগুলো হল অবস্তুক। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এইরূপে কল্পিত প্রকৃতির বাস্তবতা হল অতি সামান্য। এই প্রকৃতি হচ্ছে বিজ্ঞান-সাধনার জন্য একপ্রকার ভাব-নির্মাণ; তাকে বড়ো-জোর একটা কার্যকরী ও অবশ্যপ্রয়োজনীয় কল্পনা বলা যেতে পারে। এবং আমরা বলতে পারি যে আমাদের কাছে বিশুদ্ধ ভৌতিক বা জড়ীয় ব্যাখ্যার অর্থ হচ্ছে এই কাল্পনিক পদার্থের একটা দৃষ্টান্তরূপে ও ফলরূপে প্রদর্শন। কিন্তু এইভাবে একটা বড়ো চিত্তবিভ্রমের উৎপত্তি হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে রূপরসগন্ধাদি সর্ববিধ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণের দ্বারা সমন্বিত ও

সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ এই জগৎ। অথচ প্রকৃতির সারভাগ হয়ে ওঠে কতগুলো প্রধান গুণের বা স্বগত গুণের এক শীর্ণ কল্পনা ; এবং কল্পনাটাকে ভাবমাত্র মনে না করে একটা নিরেট ও কঠিন তথ্যরূপে ধরে নেওয়া হয়। ফলে প্রকৃতির অব্যাখ্যাত অংশের মধ্যে থেকে যায় জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের যাবতীয় ঐশ্বর্যচ্ছটা এবং ব্যাখ্যাত অংশটা হয়ে পড়ে তুচ্ছ ও জীর্ণ একটা একদেশদৃষ্টিমাত্র। এক দিকে থাকে প্রকৃতির সারবস্তু ; এবং প্রধান গুণের শুষ্ক কঙ্কালটাই হল সেই সারবস্তু বা পরমবস্তু। অন্য দিকে থাকে জীবনের অন্তহীন প্রাচুর্য এবং সেই প্রাচুর্য দিক-দিগন্ত বিস্তার করে আমাদের সম্মুখে প্রসারিত হয়ে আছে। এই দুই চরম বিন্দুর মধ্যে যে প্রভেদ, তা হয় আমাদের ভুলতে হয়, না হয় নিতান্ত অস্পষ্টতা কিংবা অন্ধদোলার সহায়তায় এই দুই বিন্দুর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতে হয়। যে-ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত তথ্যগুলোকে অন্য-কিছুর ফল বা বিশেষণরূপে কল্পনা করা হয় অথচ তথ্যগুলো সেই অন্য-কিছুর গুণ নয় তাও বলা হয় সেরকম ব্যাখ্যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় ; এবং এই বিচারপ্রণালী বা ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু তথ্যগুলো আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু যদি তথ্যগুলো মৌল ও সারীভূত সত্তার গুণ হয় তা হলে স্বীকার করতে হয় যে মৌলসত্তার স্বরূপ অন্যরকম। পরবর্তী ব্যাখ্যায় মূর্তকে শুধু অমূর্তে পরিণত করা হয় না, অমূর্তকেও সম্পদ ও স্বকীয়তা দেওয়া হয়। সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানের সোপানরূপে এই ব্যাখ্যা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে এই পরবর্তী ব্যাখ্যার অবলম্বন করার প্রশ্নই ওঠে না। সেইজন্য আমরা এক দোদুল্যমান অবস্থায় পড়ি এবং বুদ্ধিসম্মতরূপে ঐক্যলাভের চেষ্টা আমাদের ত্যাগ করতে হয়। এক দিকে প্রকৃতি হল একটা বিরাট সমারোহ ; তার অন্তর্নিহিত বস্তু হচ্ছে কতগুলো প্রধান বা স্বগত গুণের শুদ্ধসত্ব ; অন্য দিকে প্রকৃতি হল রূপরস-গন্ধগীতের ও ইন্দ্রিয়-অনুভবের এক অন্তহীন, বিচিত্র ও অপরূপ জগৎ ; সেই জগৎকে আমরা ভালোবাসি, সে আমাদের টানে ও আমাদের মনে বিস্ময় উদ্রেক করে। যে-প্রকৃতি কবির ও প্রকৃতি-বৈজ্ঞানিকের প্রিয় ও প্রাণের প্রাণ, এই সেই-প্রকৃতি। আমরা যখন প্রকৃতির কথা উল্লেখ করি তখন এই দুই চরম অর্থের কোনো অর্থে প্রকৃতি শব্দ ব্যবহার করি কিংবা আদৌ কোনো অর্থে শব্দটা ব্যবহার করি কি না তার কোনো ধারণা আমাদের

থাকে না। যখন যেমন দরকার প্রসঙ্গ-অনুযায়ী আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে এক চরম অর্থ থেকে অন্য চরম অর্থে দুলে বেড়াই বা সরে যাই।

বিচার্য বিষয়ের মীমাংসার জন্য সিদ্ধান্তটা কাজে লাগবে। প্রশ্নটা হল প্রকৃতি সুন্দরী ও আরাধ্যা কি না : এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে, 'প্রকৃতি' শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর। যদি কেবল প্রধান বা স্বগত গুণগুলোই প্রকৃতির বস্তুসত্তা হয়, তা হলে এই প্রশ্নের কোনো গভীর আলোচনার প্রয়োজন নেই। এক কথায় এরকম প্রকৃতি হল নির্জীব। খুব জোর তার খানিকটা আঙ্গিক প্রতিসাম্য বা সৌষ্ঠব থাকতে পারে। আমাদের অভাব বা প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তার সঙ্গে যে ব্যবহারিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে তার জন্য যতটুকু দরদ থাকা সম্ভবপর ততটুকু দরদ তার প্রতি হয়তো আমাদের থাকতে পারে। কিন্তু এই অনুভূতিগুলো নিতান্ত আমাদের মনের ভিতরের ব্যাপার। যুক্তিযুক্তভাবে একথা বলা চলে না যে সেগুলো হচ্ছে প্রকৃতির অংশ কিংবা কোনোভাবে সেগুলো প্রকৃতিকে গুণান্বিত করে। দ্বিতীয়ত এইসব অনুভূতি কখনো আরাধনার বা পূজার অনুভূতির আকার ধারণ করে। সেইজন্য যে প্রকৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তাকে কেউ যদি সুন্দরী বা দৈবী বলে বর্ণনা করতে চান বা প্রতিষ্ঠিত করতে চান তা হলে আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করব। কেবলমাত্র প্রধান বা স্বগত গুণগুলোর মধ্যে প্রকৃতির বস্তুসত্তা নিহিত ; যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন তাঁরা কেউই উপর্যুক্ত দাবি করবেন না। অপর পক্ষে যদি বলা হয় যে তার ঐশ্বর্য সমেত সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হচ্ছে সত্য ও বাস্তব এবং তার বিপুল শোভা এবং মানুষের সব উষ্ণ অনুভূতি হচ্ছে প্রকৃতির সারীভূত অংশ তা হলে দুই দিক থেকে অসুবিধা উপস্থিত হয়। প্রথমত ভৌতিক বিজ্ঞানকে দিয়ে দাবিটা মঞ্জুর করিয়ে নিতে হয়। বস্তুসত্তার ব্যাপারে জড়ের সঙ্গে মানসের অন্তত সমান অধিকার আছে, এই দাবি স্বীকার করতে হয়। জড়বস্তুর সত্তার পক্ষে জীবদেহের এবং জীবাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে অপরিহার্য ও আভ্যন্তরিক এই মত মানতে হয়। প্রথম অসুবিধাটা এখানে না আসা অবধি। তার পর দ্বিতীয় অসুবিধার আরম্ভ হয়। এতদূর অগ্রসর হওয়ার পর আরো অগ্রসর কেন হব না তার পক্ষে যুক্তি দেখাতে হয়। কারণ, প্রকৃতিকে শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ

করা কেন হবে? যদি মানসিক বা প্রত্যক চেতনার কিঞ্চিৎ মাত্রাও প্রকৃতির অংশ হয়ে থাকে তা হলে কোন্ যুক্তির বলে মানুষের ঊর্ধ্বতম ও আধ্যাত্মিকতম অনুভবকে প্রকৃতির সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর? শিল্পী, কবি, ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট ও সৃষ্ট যে প্রকৃতি তা যে মূলত বাস্তব নয় তাই বা কেন হবে? কিন্তু এইভাবে এগোলে জড় ও চৈতন্যের সমগ্র ও অবিভক্ত জগৎটাই প্রকৃতি হয়ে পড়ে। এবং এই পর্যন্ত আলোচনা করে আমাদের সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এইরকম। বর্তমান প্রশ্নগুলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উত্থাপন করা স্পষ্টতই বৃথা। কারণ সেগুলোর সম্যক আলোচনার জন্য প্রথমে ঠিক করতে হয় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুটা কি এবং তার বস্তুসত্তা বিনিশ্চয় করবার নিয়মই বা কি।

এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্নটাকে আরো যুক্তিযুক্ত-দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তার হয়তো একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া যায়। প্রকৃতির মধ্যে সুন্দরের স্থান কি ও তার বিশেষরূপ কি সে বিষয়ে আমি কিছু বলব না। এবং কতদূর ও কি অর্থে জড়জগৎ হচ্ছে ধর্মানুভূতির যথার্থ বিষয় সেই সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করব না। এসব বিষয় এই পুস্তকে আলোচ্য নয়। কিন্তু প্রকৃতি শোভাময়ী ও সম্পূজ্যা, এই উক্তিটা কি সত্য? প্রকৃতি কি বাস্তবিকই সুন্দরী ও নমস্যা? এই নির্বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি, "হাঁ।" আমরা জেনেছি যে শুদ্ধজড়বস্তুরূপীয় প্রকৃতি হচ্ছে একপ্রকার কার্যসিদ্ধ খণ্ডদৃষ্টিমাত্র। (দ্বাবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আগন্তুক বা অপ্রধান গুণগুলোকে প্রকৃতির অংশ বলে স্বীকার করলে ও জীবদেহ ও দেহীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ স্বীকার করলে প্রকৃতি হয়ে ওঠে নানাদেশী এবং বাস্তবতর। ইন্দ্রিয়ের যত আবেগ ও যত অনুভব, জগতের যত উষ্ণতা ও যত বর্ণচ্ছটা এবং যত গন্ধ ও যত গীত সব বাদ দিয়ে যে-প্রকৃতি সে-প্রকৃতি তো বুদ্ধির এক নীরস প্রত্যয়মাত্র। স্বগত বা প্রধান গুণাবলী হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য বুদ্ধির কতগুলো নির্মাণবিশেষ। অপ্রধান গুণাবলী থেকে বিবিক্তরূপে সেগুলোকে তথ্য বলা চলে না। বিজ্ঞান এক প্রেতপুরী থেকে এই জগতের ব্যাখ্যা করে; কিন্তু সেই প্রেতপুরীর অধিবাসীরা সকলেই হচ্ছে কায়াহীন ছায়ামাত্র। অপ্রধান গুণগুলোকে প্রকৃতির দিকে টেনে নিলে প্রকৃতি বাস্তবতর হয়। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণতালাভের তার অনেক বাকি থাকে।

প্রকৃতির সন্তানদের রকমারি সুখ ও রকমারি দুঃখ ও তাদের নানান প্রীতি ও নানান ভাবনা যে প্রকৃতির বস্তুসত্তার অংশ নয়, একথা কে বলতে পারে? এই সীমানির্দেশ হল এক উদ্ভট ব্যাপার। যে-ব্যক্তি কোনো নীতির বলে নিজের বিচারশক্তিকে সংকীর্ণ করে তার পক্ষে এরকম একটা সীমাস্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমরা এই মূল সূত্রটা মেনে নিয়েছি যে প্রকৃতি যতই সম্পূর্ণতর হবে ততই সে বাস্তবতর হবে। সুতরাং আমাদের কাছে এই অবধির কোনো মূল্য নেই। স্বীকৃত মূলসূত্রটা আমাদের অন্য আর এক সিদ্ধান্তের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ধ্যানমগ্ন মনের মধ্যে প্রকৃতি যে প্রক্ষোভ বা ভাবাবেগের প্রবাহ সৃষ্টি করে তার অন্তত কিছুটা অংশ হচ্ছে প্রকৃতির নিজস্ব গুণ, এই সিদ্ধান্ত আমাদের স্বীকার করতেই হয়। যদি প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য বাস্তবিকত নাই থাকে, যদি সৌন্দর্যানুভবকে প্রকৃতির বাইরের কোনো রাজ্যের জিনিস বলা হয়, তা হলে শেষ পর্যন্ত কোনো বা কিছু গুণই বা প্রকৃতির থাকে কি করে? এবং যদি ভাবাবেগের সুরভিকে প্রকৃতির গুণরূপে স্বীকার করতে কুণ্ঠা হয় তা হলে কোন্ যুক্তির বলে এ ছাড়া অন্য কোনো-কিছু যে প্রকৃতির ধর্ম এই বিধান দেওয়া চলে? একভাবে দেখতে গেলে প্রকৃতির সর্বাঙ্গই হচ্ছে অধ্যাত্মীয় ও প্রত্যয়ৈকরস। সেইজন্য শুধুমাত্র প্রক্ষোভের বা বেদনার সুরটাকে এই দোষের জন্য প্রকৃতি থেকে ছেঁটে বাদ দেওয়া যায় না। এবং যথার্থ গুণরূপে এই ভাবাবেগের সুরটার বাস্তবতা আমরা স্বীকার করবই বা না কেন? আমি একই নিয়ম সর্বত্র স্বীকার করি এবং বর্তমানের অভিনব সিদ্ধান্তটাকেও সেইজন্য আমি স্বীকার করে নেব। যে-প্রকৃতি আমাদের প্রাণে সাড়া জাগায় ও আমাদের দোলা দেয়, যে-প্রকৃতিকে আমরা ভালোবাসি সেই-প্রকৃতিই আসল প্রকৃতি। তার কান্তরূপ, ভয়ালরূপ, শক্তিরূপ কোনোটাই মিথ্যা নয়। প্রকৃতিই কান্তিরূপে ভীতিরূপে এবং শক্তিরূপে সংস্থিতা। এবং সেইজন্য আক্ষরিক সত্যের যথার্থ অর্থ হচ্ছে সেই-সত্য যে-সত্যকে আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে স্বীকার করতে বাধ্য হই।

অন্য এক দিক থেকে এই সিদ্ধান্তের কিছু পরিবর্তন সাধন দরকার। এটা নিশ্চিত, যে প্রত্যেক জিনিসই নানা সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে এবং তার স্বভাব এইসব সম্বন্ধ দ্বারা বিশেষিত বা নির্দিষ্ট হয়। এটা নিশ্চিত যে একটা

জিনিস যত বিশিষ্টতা লাভ করে তত বাস্তব হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে, যে-বস্তুটা হচ্ছে সর্বতোরূপে বিশিষ্ট বা অসামান্য তার নাম পরমবস্তু। একটা বিন্দু অবধি পৌঁছবার পর বস্তুসত্তার আতিশয্যের অর্থ হচ্ছে স্বাতিগামিতা। প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জিনিসই তার অব্যবহিত উপরের সামগ্রের একটা উপাদান হয়ে ওঠে ; এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশের ও বিভাগের সকল অবর ও অধীন সামগ্রের সীমারেখা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতির বস্তুত্ব বিবেচনা করবার সময় এই সত্যটা মনে রাখতে হয়। প্রকৃতির বস্তু-সত্ত্বার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি তার নিজ প্রকৃতি হারিয়ে এক উচ্চতর সত্তায় লয় পায়। প্রকৃতির স্বরূপ ধ্যান করতে গিয়ে তাকে আমরা সমগ্র বিশ্বের বা পরমবস্তুর সঙ্গে একীভূত করে ফেলি। সেইজন্য প্রশ্ন ওঠে যে আমরা যখন মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুভবগুলোকে পরে পরে প্রকৃতির গুণরূপে বিশ্বাস করছি তখন কোন্‌খানে এসে প্রকৃতি আর যথার্থ প্রকৃতি থাকছে না। কোন্‌খানে প্রকৃতি আর বস্তু-রাজ্যের এক প্রত্যন্ত দেশমাত্র থাকছে না এবং তার বদলে সে বিপুল বৃহৎ ঐক্যের এক শান্ত ও শৃঙ্খলিত অংশ-বিশেষ হয়ে উঠছে ? দর্শনে এইসব প্রশ্নের উত্তর চাই। এবং উত্তর পেলে প্রকৃতির গুণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও স্পষ্টতর হবে। আমি এই প্রশ্নগুলোর উল্লেখ করে আমার প্রধান সিদ্ধান্তটাকে এখানে পৃথকভাবে প্রকাশ করব। পরমসত্তার মধ্যে কিছু হারায় না ; সকল অবভাসেরই কিছু না কিছু বস্তুত্ব আছে। দর্শক, কবি ও শিল্পীর ধ্যানের যে-প্রকৃতি, সে-প্রকৃতি তার পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও রসময়ী রূপ সমেত হচ্ছে অত্যন্ত বাস্তব। ভৌতিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের যথার্থ বিষয়বস্তু যে-প্রকৃতি সে-প্রকৃতির চেয়ে এই প্রকৃতি হচ্ছে বহুলাংশে বাস্তবতর। কারণ যে-প্রকৃতির সার উপাদান হল কতগুলো প্রধান গুণের সমষ্টি মাত্র সে-প্রকৃতি অতি নিম্নমাত্রায় সত্য ও বাস্তব। সে প্রকৃতি হচ্ছে একবিধ অর্থকারী ও ইচ্ছাকৃত একদেশদৃষ্টিমাত্র। হয়, এই কঙ্কালসার প্রকৃতি নতুবা অপ্রধান-গুণসমন্বিত রক্তমাংসের প্রকৃতি, এ দুটোর একটা প্রকৃতি হচ্ছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। সেইজন্য প্রকৃতি আমাদের মধ্যে যে ভাবাবেগের আলোড়ন সৃষ্টি করে তার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আগে আমাদের প্রথমে জানা দরকার আমরা কোনো প্রকৃতির কথা ভাবছি। কিন্তু অপ্রধান গুণ-

গুলোতে এসে প্রকৃতির বহিঃসীমা টানা যায় না। অথবা যদি সেখানে বহিঃ-সীমা টানতেই হয়, তা হলে সেটা কোনো বিশেষ সুবিধার জন্য এবং সে সীমা হচ্ছে মন-গড়া ও কৃত্রিম। শুধু একমাত্র এই যুক্তি বলে মানবজীবনকে আমরা প্রকৃতির থেকে পৃথক করতে পারি। এই হেতু ব্যতীত অন্য কোনো হেতু দ্বারা আমাদের স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করা যায় না। এবং নিশ্চিত-রূপে বলা যায় যে প্রকৃতির মধ্যে কান্তরসোদ্দীপক কিংবা ভয়োদ্দীপক কিংবা ভক্তিরসসঞ্চারী গুণ নেই এই উক্তি হচ্ছে একপ্রকার বিচারশূন্য হঠকারিতা মাত্র। একমাত্র কোনো বিশেষ তাত্ত্বিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই মানবজীবনকে প্রকৃতির থেকে পার্থক্য বা বিয়োগ করা হয়। আমাদের মূলসূত্র হল এই : যা ঐকদেশিক তা অবাস্তবিক। এই তত্ত্ব অনুসরণ করলে আমাদের ক্রমশ উর্ধ্বযান দিকে উঠতে হয়। এই নীতি-অনুযায়ী প্রথমে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে কেবল প্রধান গুণগুলো কখনো বাস্তব নয়; সর্বশেষে আমরা বাধ্য হয়ে স্বীকার করি যে মানুষের সকল প্রকার উচ্চতর ভাবাবেগ ও রসানুভূতি দ্বারা সুসমৃদ্ধ প্রকৃতিই হচ্ছে বাস্তব। এবং এই উর্ধ্বযান যেখানে শেষ হয় সেখানে প্রকৃতি হচ্ছে চৈতন্যের মধ্যে জারিত ও রূপান্তরিত এক অপরূপ সত্তা। এবং মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে যতই উপরে ওঠা যায় দেখতে পাই ততই বস্তুসত্তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছে।

প্রকৃতির এই উন্নততর ব্যাখ্যা এবং তার এই অন্তিম স্বাতিক্রমণের কথা থেকে আমরা পূর্ববর্ণিত বাকি প্রশ্নটার আলোচনায় এসে পড়ি। সসীম জীব এবং ইচ্ছাশক্তির ভিতর ছাড়া প্রকৃতির অন্যত্রও অর্থ বা উদ্দেশ্যসাধনের ক্রিয়া বর্তমান, এরকম মনে করা যায় কি? কিংবা ভাবাদর্শ বা প্রত্যয়শক্তি অন্য কোনোরূপে প্রকৃতির মধ্যে ক্রিয়া করে এরকম মনে করা চলে কি? প্রকৃতির মধ্যে অর্থ বা ভাবাদর্শ কাজ করে এরকম একটা বিশ্বাস কান্ত-বিদ্যায় বা ধর্মতত্ত্বে কতখানি দরকার তার কোনো বিচার আমি এখানে করব না। কিন্তু ভৌতিক জগৎ যদি দেশোপহিত অবভাসসমূহের এক শৃঙ্খলামাত্র হয়, তা হলে প্রশ্ন ওঠে যে তত্ত্ব-বিচারের দ্বারা সেখানে যান্ত্রিকতাবাদকে সমর্থন করা যায় কি? কোনো প্রকৃতি-সম্পর্কিত দর্শন সম্ভবপর কি এবং যদি সম্ভবপর হয় সেই দর্শনের রূপ কি? এখানে আমি এই কঠিন প্রশ্ন-গুলোর একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

সত্যের পূর্ণ বর্ণনারূপে যান্ত্রিকতাবাদ হচ্ছে স্পষ্টত এক আজগুবি মতবাদ। আমরা বলতে পারি যে প্রকৃতিকে যন্ত্রবৎ কল্পনা করলেও প্রকৃতি সমানই ভাবধর্মী থাকে; তবে যন্ত্ররূপে কল্পিত প্রকৃতির ভাবাংশটা তার বাইরে কোথাও গিয়ে পড়ে। (দ্বাবিংশ এবং ত্রয়োবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং জোর করে একথা আমি বলতে পারি না যে কার্যকারী নীতিরূপেও সর্বত্র এই মতের শুদ্ধতা রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়। তবে একটা বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের নিজ নিজ বিচার-পদ্ধতি বা অনুসন্ধান পদ্ধতি মেনে নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা নিশ্চয়ই উচিত। এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য সর্ববিধ ব্যাখ্যাকে যদি বর্জন করা হয় তাতে তত্ত্ববিদ্যার মাথাব্যথার কোনো কারণ নেই। আমি এইটুকু বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক বিশেষ বিজ্ঞান তার নিজের কাজ ভালোই বোঝে। কিন্তু যেখানে এমন-সব উক্তি করা হয় যেগুলো বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের গণ্ডির বাইরে সেখানে তত্ত্ববিদের প্রতিবাদ করবার পূর্ণ অধিকার আছে। সে সেখানে জোর করতে পারে যে ঐকদেশিক কল্পনাগুলো বাস্তবতত্ত্ব নয়, সে বলতে পারে যে কার্যকারী কল্পনাগুলো হচ্ছে সত্যের কতগুলো প্রয়োগ-সিদ্ধ বা প্রয়োজন-সিদ্ধ অংশ মাত্র এবং তার বাড়া আর কিছু নয়। আরো একটা বিষয়ে সে শুনানী দাবি করতে পারে। প্রামাণ্য ব্যাখ্যার একটা বিশেষ নিয়ম বা পদ্ধতি গ্রহণ করবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেক বিজ্ঞানের আছে। এবং কোনো বিজ্ঞান যদি বলে যে কোনো তথ্যের ব্যাখ্যার অর্থই হচ্ছে সেটাকে গৃহীত পদ্ধতি বা নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা তা হলেও দোষ হয় না। কিন্তু তাই বলে যেখানে কতগুলো তথ্যের বিভিন্ন দিকের বা বিভিন্ন অংশের কোনো ব্যাখ্যাই দেওয়া হয় নি, কিংবা ব্যাখ্যার কোনো সূচনাই করা হয় নি, সেখানে তথ্যগুলোর ব্যাখ্যা হয়ে গেছে বা ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এরকম ঘোষণা করা সম্পূর্ণ অন্যরকম ব্যাপার। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এরকম সীমালঙ্ঘনের কোনো অধিকার নেই। প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে স্বক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থান হচ্ছে অতি পবিত্র। এবং প্রকৃতির মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে কি না এই প্রশ্নটা আমার মতে অধিবিদ্যায় স্পর্শ করা উচিত নয়।

তা হলে কি তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে প্রকৃতির দর্শন বলে কোনো বিষয় নেই?

এই বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্র কি হতে পারে সেই সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে কিছু বলব। অধিবিদ্যার দৃষ্টিতে সবরকম অবভাসেরই কিছু-না-কিছু বস্তুসত্তা আছে। পরোৎকর্ষ বা অদ্বিতীয় ব্যক্তিতারও একটা আমাদের ধারণা আছে; এবং যে-সত্তা পূর্ণতার ধারণার যত অনুযায়ী বা সন্নিকট ক্রমিক স্তরে তার স্থান তত উচ্চে। আমরা এও জেনেছি যে নিম্নতর স্তরের সত্তার দোষ ও ত্রুটিগুলি যেমনি সংশোধিত হয়, সেগুলো অমনি উচ্চতর স্তরে নির্বাণ লাভ করে। পরমব্যক্তিতা হল পরাকাষ্ঠা; এবং সব-কিছুর গতি হচ্ছে এই পরাকাষ্ঠার অভিমুখে। নিম্নতর স্তরগুলোর মধ্যেও কাষ্ঠার প্রতি আভিমুখ্য প্রথম থেকেই হচ্ছে ক্রিয়াশীল এবং পূর্ণতার প্রতি এই প্রবণতার দ্বারাই নিম্নতর স্তরগুলোর বাস্তবতা নির্দিষ্ট হয় এবং পরে পরে যেমন যেমন উচ্চতর সামগ্রের মধ্যে নিম্নতর স্তরগুলো বিলীন হয়, তেমন তেমন ব্যক্তিতার সম্পূর্ণতাও ক্রমশ বাড়ে। অর্থাৎ অধিবিদ্যাতে ক্রমোন্নতি ও পরোৎকর্ষের একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থ করা সম্ভবপর। বিবিধ নৈসর্গিক তথ্যগুলোকে বিজ্ঞানে যেভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সেই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে এ তথ্যগুলোর শ্রেণীবিন্যাস বা স্তরভেদ করা যদি অধিবিদ্যা দ্বারা সম্ভবপর হত এবং নিম্নতর স্তরের দোষগুলো উচ্চতর স্তরে কিরূপে সংশোধিত হয় এবং নিম্নতর স্তরের অন্তর্নিহিত সত্য উচ্চতর স্তরে কি ভাবে প্রতিপন্ন হয় তা যদি অধিবিদ্যা দ্বারা দেখানো সম্ভবপর হত, তা হলে অধিবিদ্যার থেকে প্রকৃতিকে বুঝতে অনেক সাহায্য পাওয়া যেত। এই কঠিন কর্তব্য পালন করবার সামর্থ্য আমার একেবারেই নেই। তবে এরকম কাজকে অবৈজ্ঞানিক বিবেচনা করবার কোনো হেতু নেই। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই ব্যাপারে সর্বজ্ঞতার ভান দেখানোর মতো অসংগত আর কিছুই নেই। এবং বিশেষজ্ঞের সংকীর্ণ ও সূক্ষ্ম জ্ঞানকে পরিহাস করা শুধু যে অসংগত তা নয়, তার চেয়েও খারাপ। বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-গুলো রীতিবদ্ধ করে সার্থকতার তারতম্য নির্ধারণের সত্য নিয়ম-অনুযায়ী সেগুলোকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়াসকে বুদ্ধিবিগর্হিত বিবেচনা করা যায় না।

এরকম প্রকৃতিদর্শন যখন নিজের গণ্ডির মধ্যে থাকে ততক্ষণ তার সঙ্গে জড়-বিজ্ঞানের কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধের অবকাশ নেই। কারণ সত্যি-কারের দর্শনের বিচারে উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনো কল্পনা বা আলোচনা চলতে

পারে না। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের উদ্ভব কালের ধারার মধ্যে কি করে হল এবং কি ক্রম-অনুযায়ী সেগুলোর উদ্ভব হল এবং সেই-সব উদ্ভবের কারণ কি এই-সব আলোচনা দর্শনের বিষয়গত নয়। দর্শনে ক্রম-বিকাশ বা ক্রমোন্নতি সম্বন্ধীয় ধারণাটা কালোপহিত হতে পারে না। এবং সেইজন্য প্রচয় বা ক্রমভেদ সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নের ব্যাপারে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে প্রকৃত সংঘর্ষ অসম্ভব। দর্শনে 'উচ্চতর' ও 'নিম্নতর' শব্দদুটো এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। একটা পরাকাষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করে দর্শনে এই শব্দগুলোর ব্যবহার করা হয় এবং সেখানে এই শব্দগুলো শুধু সত্তার মর্যাদা নির্ণয় করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এই শব্দগুলোর ব্যবহার যে কোনো অর্থে করা চলতে পারে। বিজ্ঞানের এই বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সেখানে বিজ্ঞানের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী শব্দগুলোর অর্থ নির্দিষ্ট হবে। দার্শনিক বিচারে ক্রমোন্নতির অর্থ কালের ধারার মধ্যে ক্রমোন্নতি নয়। এবং অন্যত্র ক্রমোন্নতির অন্য কোনো অর্থ নেই কিংবা কোনো অর্থই নেই এ উক্তিতে দার্শনিকের বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এইটুকু বলেই এই বিষয়ের আলোচনা আমি বন্ধ করব। কোনো সন্দেহ নেই যে বিষয়টা গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিচার করবার মতো।

পূর্ণাঙ্গ দর্শনের কাজ হল অবভাসের সমগ্র জগৎটাকে এক বিপুল ক্রমবিকাশরূপে দেখানো। এই ক্রমবিকাশ হবে তত্ত্বের বিকাশ, কোনো কালোপহিত পরম্পরাধীন বিকাশ নয়। দর্শনে অনুভবের প্রতি অংশকে তুলনা করা হয় এক পরমপ্রমাণের সঙ্গে এবং সেই অংশের মর্যাদা নির্ণয় করা হয় তার গুণাগুণ দ্বারা। এই শ্রেণীবিন্যাসের মানের এক প্রান্তে হচ্ছে শুদ্ধ চৈতন্য এবং অপর প্রান্তে হচ্ছে নিষ্প্রাণ প্রকৃতি। এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যে অমিল সবচেয়ে বেশি। এই মানের যত উপর দিকে ওঠা যাবে তত প্রথম গুণটার আধিক্য ও দ্বিতীয় গুণটার ন্যূনতা দেখতে পাওয়া উচিত। আমরা বলতে পারি যে আত্মার আদর্শ হল যান্ত্রিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিবিধের মিলন হচ্ছে আত্মা; কিন্তু আত্মার অন্তস্থ বিবিধ ও তার ঐক্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা বাহ্য সম্বন্ধ নেই। সেখানে সার্বিকভাব বা সামান্যপ্রত্যয় প্রতি অংশবিশেষের মধ্যে অন্তর্নিহিত ও গূঢ়ক্রিয় হয়ে থাকে। সেখানে সার্বিক শৃঙ্খলাটা নানা পৃথক অংশের

মধ্যস্থিত সম্বন্ধের ফলমাত্র নয় এবং সেই সম্বন্ধের বহির্ভূত অপর একটা উপাদানও নয়। আত্মার শৃঙ্খলাকে সম্বন্ধোপহিত বলা চলে না; আত্মার ঐক্য হচ্ছে এক উচ্চতর শ্রেণীর ঐক্য; সেই ঐক্যের মধ্যে অংশসমূহ ও সেগুলোর নিয়মরাশি অবিভাজ্যরূপে অবস্থিত থাকে। শুদ্ধ যান্ত্রিকতার অসংগতির মধ্যে এই তত্ত্বের ক্রিয়া একেবারে স্থরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়। (দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) সেইজন্য এরকম উক্তি করা খুব ভুল নয় যে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যই আত্মচিতিতে বাস্তবরূপ ধারণ করে এবং এই পরিণতির ফলে প্রকৃতি রূপান্তরিত হয়। কিন্তু দুই চরম কল্পনার কোনোটাই তথ্যরূপে সত্য নয়। একান্তপ্রাণহীন ও যন্ত্রমাত্র জগৎকে আমরা একান্তবাদী কল্পনার দ্বারা পাই; এবং একদেশী কল্পনারূপেই তার প্রকৃত সত্তা। অপর পক্ষে, একমাত্র পরমতত্ত্বেই শুদ্ধ চৈতন্য বাস্তব। দৃশ্যমান জগতে পূর্ণ চৈতন্যের প্রকাশ কোনোখানেই সম্ভব নয়। পূর্ণতা ও অখণ্ড ব্যক্তিতা একমাত্র সর্বসমগ্রেরই বেলাতে সত্য। এই নিষ্কল সমগ্রের মধ্যে সবরকম মাত্রার সত্তাই নির্বাণ লাভ করে এবং সবরকম মাত্রার সত্তাই আছে। এই পরমার্থসতের পক্ষে যথাভূতরূপে কোনো দৃশ্যমান বা প্রতীয়মান সত্তার মধ্যে প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। ক্রমোন্নতি এবং অগ্রগতির বিচারে পরমার্থসতের কথা আনতে হয় কিন্তু পরমার্থসতের নিজের ক্রমিক উন্নতি ও প্রাগ্রসরণ বলে কিছুই থাকতে পারে না।

শেষ উক্তিটার সম্বন্ধে আলোচনা হয়তো শিক্ষাপ্রদ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত এবং মোটামুটিভাবে দেখলে বিশ্বে কি কোনো প্রগতি দেখতে পাওয়া যায়? এরকম কি বলা চলে যে পরমতত্ত্ব কোনো এক সময়ের তুলনায় অন্য এক সময়ে উৎকৃষ্টতর বা নিকৃষ্টতর? আমরা সুস্পষ্টভাবেই এইসব প্রশ্নের উত্তরে, বলতে পারি "না"। কারণ যে-বস্তু পরম ও পরিপূর্ণ তার প্রচয় ও অপচয় অসম্ভব। সংসারে বা দৃশ্যমান জগতে অগ্রগতি যেমন আছে পশ্চাদগতিও তেমনি আছে। কিন্তু সর্ব-সমগ্র এগিয়ে চলে কিংবা পেছিয়ে যায় এরকম ধারণাই করা যায় না। পরমার্থসতের নিজের কোনো উত্থান পতনের ইতিহাস নেই; পরমার্থসৎ হচ্ছে অগণিত উত্থানপতনের ইতিহাসে সমৃদ্ধ। কোনো এক স্বীকৃত সসীম জগতের উপর ভিত্তি করে এইসব উত্থান-পতনের কাহিনীর সৃষ্টি হয়। কালের অনন্ত প্রবাহের অংশবিশেষের

ছবি হল এইসব ইতিহাস। ব্যাপকতা ও মূল্যের দিক থেকে এইসব ইতিহাসের সত্যতার ও বাস্তবতার প্রকারভেদ থাকাও সম্ভব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরমবিচারে সেগুলোর সত্যতা ও বাস্তবতা নিতান্তই আপেক্ষিক। এবং মানুষের ইতিহাসে কিংবা জগতের ইতিহাসে অগ্রগতি ও পশ্চাদ্‌গতির মধ্যে কোনটা সত্য, এই প্রশ্ন অধিবিদ্যার প্রশ্ন নয়। কারণ যা পরিপূর্ণ এবং যা বিশুদ্ধসত্ত্ব তার মধ্যে কোনো গতি থাকতে পারে না। পরমার্থের কোনো ঋতু নেই ; ফল, ফুল ও পল্লবের সমুদ্‌গম সেখানে একই সঙ্গে এবং ইচ্ছামাত্র। আমাদের ধরণীর মতো সবসময়েই সেখানে শীত ও গ্রীষ্ম ; এবং আমাদের ধরণীর মতোই কখনো সেখানে শীতও নেই বা গ্রীষ্মও নেই।

এরকম দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের নিরুৎসাহ হওয়ার কিছু নেই। যদি নৈরাশ্য বোধ করি তা হলে মনে করতে হবে মতটা বোঝার ভুল হয়েছে। একান্ত ভ্রমক্রমেই এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ব্যবহারিক বিশ্বাসের সংঘর্ষ উৎপন্ন হয়। নৈতিক প্রকর্ষের জগৎ হচ্ছে আপেক্ষিক সত্যের জগৎ। সমগ্র বিশ্বের সম্বন্ধে যে-সব ভাব প্রযোজ্য, সেগুলো হল নিরপেক্ষ ; জোর করে সেগুলোকে আপেক্ষিক জগতের বেলায় খাটাতে গেলে দোষ নিশ্চয়ই আমাদের নিজেদের। পরমতত্ত্বের ধর্ম কখনো আপেক্ষিক তত্ত্বের ধর্ম হতে পারে না। দৃশ্যমান জগতে আপেক্ষিক তত্ত্বের ধর্ম যা আছে তাই থাকে ; এবং পরমতত্ত্বে প্রত্যেক সাপেক্ষসত্তার একটা স্থান আছে। প্রশ্ন ওঠে যে ব্যবহারিক জগতে নিজেকে বন্দী করে রেখে সেই জগতের বিচারসূত্রগুলোকে সমগ্র বিশ্বের বেলায় প্রয়োগ করা যায় কি? কর্মজীবন বা ব্যবহারিক জীবনের জন্য কালান্তর্গত ঘটনা এবং সীমিত ব্যক্তিত্ব এ দুটো তথ্যই হচ্ছে আমাদের দরকার। তা ছাড়া ভালো ও খারাপ হওয়ার শক্যতাও থাকা দরকার। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব বা চরমবস্তুর বেলায় এইসব উপাধি কল্পনা করা অসম্ভব। যদি পরমার্থেরও এইসব উপাধির প্রয়োজন থাকে তা হলে মনে করতে হবে যে আমাদের এই গ্রন্থের মূল সিদ্ধান্তগুলোই ভ্রমাত্মক। কিন্তু পরমার্থসম্বন্ধীয় অন্য কোনোপ্রকার মত গ্রহণ করবার আগে তার পক্ষে যুক্তিবিন্যাসটা কি সেটা দেখা উচিত। যে মতগুলো প্রায়শই আমার কাছে কপট বলে মনে হয় সেগুলোকে আমি শ্রদ্ধা করতে অপারগ। প্রগতি হল আপেক্ষিক সত্যের চাইতে বেশি কিছু এবং আংশিক অবভাসমাত্রের

অধিক-কিছু, এই মত স্বীকার করলে আমাদের অতি প্রচলিত ধর্মমতকে বর্জন করতে হয়। প্রগতিকে অন্তিম ও চরম তত্ত্ব এবং বস্তু-সম্পর্কিত শেষ কথা বলে বিশ্বাস করলে খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী হওয়া চলে না। আমি অবশ্য আমার মন্তব্যটাকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে চাই না। এরকম বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত অসংগতিটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আপনি যদি চরম সত্য মনে করেন তা হলে আপনার স্থিতিটা কেবল বুদ্ধিগর্হিত হয় না, আপনি সবরকম গ্রহণযোগ্য ধর্মমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এবং শুধুমাত্র একটা কুসংস্কারের দাসত্ব করবার ফলেই এই দুরবস্থা!

আমি স্বীকার করি যে জীবনের সব দিককে দর্শনের সমর্থন করা উচিত। কিন্তু এক দিককে চরমসত্য ধরে নিলে এই সর্বতোমুখী সমর্থন অসম্ভব। আমাদের জীবনে অনবরত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে। এবং স্বচ্ছন্দ জীবন-নির্বাহের পক্ষে ক্ষেত্রোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গিটার প্রাধান্য স্বীকার করলেই যথেষ্ট হয়। সেইজন্য এটা সুনিশ্চিত যে বিশ্বের প্রগতি অস্বীকার করলেও জীবনের যে ক্ষেত্রে নৈতিকতা ছিল সেই ক্ষেত্রে নৈতিকতা থেকেই যায়। প্রত্যেক মানুষেরই নিজ নিজ জীবন ও জগৎ আছে। স্বীয় চেষ্টা ও কৃতির দ্বারা সেগুলোর উন্নতি বিধান করা আমাদের কর্তব্য। কিংবা অন্ততপক্ষে সেগুলোর শ্রেষ্ঠ ব্যবহারই হচ্ছে আমাদের কাম্য। উদ্যোগী পুরুষ বিশ্বাস করে যে তার আত্মকর্তৃত্ব আছে এবং সে ভালো করেই জানে যে ইহজীবন ও ইহজগতের সার্থকতা হচ্ছে সেগুলোর সদ্‌ব্যবহারের মধ্যে। এই দিক থেকে দেখলে এক সংকীর্ণ অর্থে আমরা বলতে পারি যে ব্যক্তিবিশেষের ব্যর্থতার ফলে বিশ্বের অবনতি হয় এবং ব্যক্তিবিশেষের সার্থকতার ফলে বিশ্বের উন্নতি হয়। কিন্তু এতটুকুতে সন্তুষ্ট না হয়ে আমরা যদি সমগ্র বিশ্বের পরিবর্তন দাবি করে বসি তা হলে যুক্তি, ধর্ম ও নৈতিকতার রাস্তা ছেড়ে আসতে হয়। কারণ, বিশ্বের উত্থান ও পতনের কথা হচ্ছে একপ্রকার অর্থশূন্য ও হেয়বাদ-পূর্ণ প্রলাপ মাত্র। অপর পক্ষে এও বলে রাখা ভালো যে এই গ্রহের অধিবাসী-দের উন্নতি বা সন্ততিতে বিশ্বাসের সঙ্গে অধিবিদ্যার কোনো সংযোগ বা সংশ্রব নেই। এই প্রসঙ্গে আরো বললে দোষ হবে না যে নৈতিকতার সঙ্গেও এই বিশ্বাসের এমন কিছু সম্পর্ক নেই। এইরকম বিশ্বাসের ফলে আমাদের

নৈতিক কর্তব্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। বরঞ্চ এই বিশ্বাসের ফলে যে মনোভাব বা মেজাজের উদ্ভব হয় সে মন ও মেজাজ নৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুকূল বা হিতকর নাও হতে পারে। নৈরাশ্যের যেমন ক্ষমতা আছে আমাদের দুর্বল করবার, তেমনি মূঢ় উচ্ছ্বাস এবং কুৎসিত কপটাচারেরও সামর্থ্য আছে আমাদের অযথা উত্তেজিত করবার। কিন্তু এইসব বিষয়ে আলোচনা করবার স্থল এটা নয় ; আমরা এইটুকু বলেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই যে পরমতত্ত্বের উন্নতি বা প্রগতির কথা একেবারে নিরর্থক।

এইবার আর একটা নিকট বিষয়ের সম্বন্ধে দু-এক কথা বলে আমি এই অধ্যায় শেষ করতে চাই। আমি আত্মার অমরত্বের কথা ভাবছি। এই বিষয়ে কয়েকটা কারণের জন্য আমি নীরব থাকাই ভালো মনে করি ; কিন্তু লোকে আমার নীরবতার কদর্থ করতে পারে। প্রথমত ভবিষ্য বা পরজীবন বলতে আমরা কি বুঝি প্রকাশ করা সহজ নয়। এটা স্পষ্ট যে ব্যক্তিগত জীবনের স্থায়িত্ব অন্তহীন না হলেও চলে। দ্বিতীয়ত কি অর্থে ব্যক্তিত্বের টিকে থাকা বা স্থায়ী হওয়া দরকার তাও সহজে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। আমি এখানে ধরে নেব যে অমূর্তজীবন হল মৃত্যুর পরের জীবন এবং সেই জীবনেও ইহজীবনের সঙ্গে ঐকাত্ম্যবোধটা বেঁচে থাকে। এবং এই জীবনের স্থিতিকাল এমন হওয়া উচিত যে অনিচ্ছা-বিনাশ বা অকাল-মৃত্যুর কোনো কথাই উঠতে পারে না। নানারকম কারণের জন্য আমরা ভবিষ্যৎ বা পারত্রিক জীবন কামনা করি। এই কারণগুলো কি সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার করার প্রয়াস অন্যত্র বেশ চিত্তাকর্ষক হতে পারে। আমি এইরকম জীবনের সম্ভাবনা কি সেই বিষয়ে এখনই আলোচনা করব।

এক অর্থে জীবাত্মার অমরত্ব অসম্ভব। আমাদের মনে রাখা দরকার যে সমগ্র বিশ্বে কোনোপ্রকার বৃদ্ধি সম্ভব নয়। নিত্য নূতন নূতন আত্মার সৃষ্টি হয় অথচ তারা ধ্বংস পায় না, এরকম কল্পনা করতে গেলে এক দুরপনেয় বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে আমার মনে হয় এই অর্থে মতটা গ্রহণ করবার কোনো আবশ্যকতা নেই। সাধারণভাবে বর্তমান প্রশ্নের বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে মৃত্যুর পর জীবনের সম্ভাবনা অস্বীকার করা অসম্ভব। আত্মার অস্তিত্বের জন্য যে শরীরের একান্ত দরকার, এই উক্তি

প্রমাণ করবার কোনো উপায় নেই। (ত্রয়োবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) আমরা যতদূর জানি দেহ-হীন আত্মা, হয়তো আরো বেশি নশ্বর হতে পারে; সোজা কথায়, এই বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। এমন অবস্থায় মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব এরকম উক্তি করা যুক্তিসম্মত নয়। আত্মার অস্তিত্বের জন্য দেহ একান্ত আবশ্যক এবং এই দেহ আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত দেহের মতো না হলে চলবে না, এরকম বিশ্বাস সত্য হলেও পারলৌকিক জীবনের সম্ভাবনা অসিদ্ধ হয় না। স্থূল লৌকিক জড়বাদের ভিত্তিতেও পরজীবন সম্ভবপর। কালের একটা ব্যবধানের পর, সেই ব্যবধান কত দীর্ঘ হবে এখানে তা বিচার্য নয়, আমার বর্তমান স্নায়ুতন্ত্রের মতো একটা স্নায়ুতন্ত্রের উদ্ভব সম্ভবপর; এবং সেই স্নায়ুতন্ত্রের উদ্ভবের পর এই ক্ষেত্রে পূর্বস্মৃতি ও স্বকীয় অভিন্নতা-বোধের উদয় হতে বাধ্য। এরকম ঘটনা অসম্ভাব্য হতে পারে, কিন্তু একে অসম্ভব বলা যায় না। এমন-কি আমরা আরো এক ধাপ এগোতে পারি। আমরা এও বলতে পারি যে একাধিক নব নব দেহ পরম্পরাক্রমে উদ্ভূত না হয়ে যুগপৎ উদ্ভূত হতে পারে; এই-রকম কল্পনার মধ্যে কোনো আত্মনাশক বিরোধ নেই। সেইরকম যদি হয় তা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন একক না হয়ে বহুরূপী হয়ে উঠবে। এই কাল্পনিক আলোচনা আর বাড়াবার ইচ্ছা নেই; কিন্তু এখন একটা জিনিস স্পষ্ট হচ্ছে। নানাভাবে পারত্রিক জীবন সম্ভবপর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা ভালো যে সম্ভাবনাগুলোর মূল্য খুব বেশি নয়।

কোনো একটা জিনিসের সঙ্গে তত্ত্ববস্তুর বিরোধ উপস্থিত হলেই তাকে আমরা নির্ব্যূঢ়ভাবে অসম্ভব বলি। যে-ভাবকে সহেতুকরূপে বাস্তব বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তার সঙ্গে যখন কোনো জিনিসের সংঘর্ষ দেখা দেয়, তখন সেই জিনিসটাকে আপেক্ষিক দৃষ্টিতে অসম্ভব বলা হয়। প্রথমে যতক্ষণ কোনো জিনিস সম্পূর্ণরূপে অর্থশূন্য নয়, ততক্ষণ তাকে সম্ভবপর বলেই স্বীকার করতে হয়। আলোচ্য জিনিসটার মধ্যে বিশ্বের কোনো-না-কোনো সদর্থক গুণ থাকতেই হবে, এবং তার প্রকৃতি এমন হতে হবে যে বিশ্বের সঙ্গে সংযোগের ফলে তার এবং এই সদর্থক গুণের অবলুপ্তি না ঘটে। পরে জিনিসটার সঙ্গে বাস্তব বলে স্বীকৃত অন্য তথ্যগুলোর সামঞ্জস্য যেমন যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমন তেমন সে আরো বেশি সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ফলত কোনো

একটা জিনিসের সম্ভাব্যতা যত বাড়ে, তার সম্ভাবনাও তত বাড়ে। এবং একথা অত্যন্ত সত্য যে জীবনপথে চলবার আমাদের একমাত্র সহায় হল সম্ভাব্যতা। আমরা যা জানতে চাই তা এ নয় যে বিচার্য জিনিসটা শুধু এবং খালি সম্ভবপর কি না। জীবন পরিচালনা করবার জন্য আমরা জানতে চাই যে বিচার্য জিনিসটি সম্বন্ধে আশংসা করা যায় কিনা এবং আশংসার সপক্ষে এবং বিপক্ষে কতখানি যুক্তি আছে।

এই ক্ষেত্রে অবশ্য সম্ভাবনার পরিমাণ নির্ধারণ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। কারণ এখানে যেসব উপাদান সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে সেগুলোর মূল্য আমাদের জানা নেই। সম্ভাব্যতা বিচারের অজ্ঞাত বিষয়টি নানারকমের হতে পারে। যেমন, পদার্থটার সম্বন্ধে হয়তো আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই; এরকম পদার্থের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত; এইরকম পদার্থকে শূন্যমাত্র বলে বর্জন করতে হয়। কিংবা পদার্থটার সম্পূর্ণ প্রকৃতি হয়তো আমাদের জানা নেই; কিন্তু অন্য "ঘটনার" তুলনায় তার সম্ভাবনার মাপ ও মূল্য আমাদের কাছে স্পষ্ট। এই পর্যন্ত সব কিছু বেশ সোজা। কিন্তু এ ছাড়া আরো দুই গোলমেলে রকমের অজ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করতে হয়। অজ্ঞাত পদার্থটি শুধু সম্ভাবনামাত্র হতে পারে; এই পদার্থের বিষয়ে হয়তো আমরা আর কিছুই জানি না এবং তার সম্পর্কে উক্তি করবার অন্য কোনো হেতুও খুঁজে পাই না। কিন্তু অজ্ঞাত রাজ্যটা হয়তো এমন যে সেখানকার সম্বন্ধে সবিশেষ কোনো জ্ঞানই আমাদের নেই; কিন্তু আমরা এইটুকু বুঝি যে সেই রাজ্যে নানারকম ঘটনার সম্ভাবনা আছে।

এইসব নীরস ভেদ-বিচারের সার্থকতা আমরা এখনই উপলব্ধি করব। নিরবয়ব আত্মা সম্ভবপর; কারণ তার কল্পনা অর্থশূন্য নয় কিংবা এরকম পদার্থকে অসম্ভব বলে আমরা জানি না। কিন্তু এর সপক্ষে অন্য অতিরিক্ত কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন করি এই নিরবয়র আত্মা কি অমর? এবং তার পরে প্রশ্ন করতে চাই মৃত্যুর পরে বিশেষ করে আমাদেরই বেলায় বা কেন শুধু বিদেহ জীবন থাকবে? এইসব প্রশ্ন বিচারের ফলে ভবিষ্যজীবনের স্বল্প সম্ভাবনার পরিমাণের বিশেষ কিছু বৃদ্ধি হয় না। পরিচিত কিংবা অপরিচিত জড়ধাতুতে গঠিত শরীর-বিশেষ

আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এই যুক্তির সাহায্যেই বা পর-জীবনের সম্ভাবনা কতদূর প্রতিষ্ঠিত করা চলে? এখানে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সেইজন্য এই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো অজ্ঞানকে সম্বল করে বলতে চাইবেন, "এই ঘটনা কেন সত্য হবে না বিশেষ করে যখন এর বিপরীতটার সম্ভাবনার মাত্রা যতখানি এর সম্ভাবনার মাত্রাও ততখানি?" এর উত্তরে আমি বলতে বাধ্য যে আপনার প্রশ্নটি একটা হেত্বাভাসের উপর আশ্রিত। আমি যে পার্থক্য-বিচার আগে করেছি তার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার মনে করি। এই অজ্ঞাত রাজ্যের বিশেষ বিশেষ সম্ভাবনার মাত্রা নির্ণয় আমরা কোনো প্রকারেই করতে পারি না; কিন্তু আর-এক দিক থেকে রাজ্যটা যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তাও বলা চলে না।

আমরা এমন বলতে পারি না যে সেখানে যে বিভিন্ন সংযোগ বা সমবায় সম্ভবপর তার মধ্যে অর্ধেক হচ্ছে আমাদের জ্ঞানত পরজীবনের অনুকূল। কারণ প্রাকৃতজ্ঞান দিয়ে বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে সংযোগ ও সমবায়গুলো ভবিষ্যজীবনের বিশেষ প্রতিকূল। আমাদের প্রাকৃতজ্ঞানের বহির্ভূত জিনিসের ধর্ম হয়তো ভিন্নরূপ হতে পারে; কিন্তু আমরা যা জানি তার আলোতেই আমাদের বিচার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই যদি হয় তা হলে ফল দাঁড়াল এই: এই অজ্ঞাতদেশে সম্ভবপর সংযোগ সমবায়ের সংখ্যা অনেক অনেক; কিন্তু তার মধ্যে একক বা বহুরূপী পরজীবনের অনুকূল সংযোগ বা সমবায়ের সংখ্যা অল্প। এই অজ্ঞাতদেশ নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয় তার সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত এর বেশি আর কিছু হতে পারে না। অপর পক্ষে এই অজ্ঞাতদেশ সম্বন্ধে যদি কোনো আলোচনা না করা হয় তা হলে ভবিষ্য-জীবনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না এবং সেই সম্বন্ধে কিছু বলবার অধিকারও আমাদের থাকে না। সুতরাং সংক্ষেপে আমার কথা এই যে বিদেহ পরজীবন কিংবা শরীর-বিশিষ্ট পরজীবনের সম্ভাবনার মূল্য বা মাত্রা বিচার করলে বলতে হয় তার পরিমাণ বেশি নয়; বিরুদ্ধ সম্ভাব্যতার পরিমাণ এত বেশি যে অবশিষ্ট যেটুকু পড়ে থাকে তা বিবেচনার যোগ্য নয়। পুনরাবৃত্তি হলেও আমরা সেইজন্য বলতে চাই যে নিছক অজ্ঞানতার দোহাই দিয়ে ভবিষ্যজীবন প্রমাণ করা যায় না। সেইরকম ক্ষেত্রে ভবিষ্যজীবনের সম্ভাবনা সম্বন্ধেই কিছু বলা চলে না। আবার এই নিকৃষ্ট চরম স্থান যদি

আমরা পরিহার করি, তা হলে বড়ো জোর এই বলতে পারি যে পর-জীবন একটা শুদ্ধ সম্ভাবনা মাত্র। কিন্তু অনির্দিষ্ট বিশ্বের মুখোমুখি এই সম্ভাবনাটা হল সম্পূর্ণ অসহায় এবং নিরতিশয় অনাশ্রিত ; এবং এই সম্ভাবনার মূল্য-গণনায় কোনো লাভ নেই। অপর পক্ষে যতটুকু জ্ঞান আমাদের আছে আমরা যদি তার ব্যবহার করি এবং আমাদের জানা যে-সব যুক্তি আছে সেগুলোর সাহায্যে ভবিষ্য-জীবনের সম্ভাবনার সম্বন্ধে যদি আমরা বিচার করি তা হলেও শেষ পর্যন্ত ফল একই রকম হয়। এই যুক্তিগুলোর মধ্যে কতগুলো হচ্ছে পর-জীবনের অনুকূল ; কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা কম। সুতরাং পর-জীবনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করা একেবারেই চলে না।

কিন্তু আপত্তি উঠতে পারে যে এই ভাবে প্রশ্নটার যথার্থ মীমাংসা হয় না। আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে, "যে-সব যুক্তির আপনি অবতারণা করেছেন তার দ্বারা পর-জীবনের অসম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন হয়তো হতে পারে ; কিন্তু এইসব যুক্তি হচ্ছে আসল প্রমাণটার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। এই বিষয়ে ভবিষ্য-জীবনের সপক্ষে যে-সব প্রত্যক্ষ তথ্যমূলক প্রমাণ আছে সেগুলোই হল আসল জিনিস এবং সেগুলোর মূল্যই সবচেয়ে অধিক। বিশ্লিষ্টরূপে তত্ত্বগত বিচারে ভবিষ্য-জীবনের সম্ভাব্যতা যাই কিছু হোক না কেন, তথ্যের প্রমাণই হচ্ছে এই বিষয়ে গ্রাহ্য।" এই আপত্তির যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করি ; আমার জবাবও খুব সোজা ও সহজ। আমি তথ্যমূলক প্রমাণকে বিবেচনার মধ্যে আনি না। তার কারণ আমার কাছে এই প্রমাণের যথার্থ কোনো মূল্যই নেই। ভবিষ্য-জীবন শুধু সম্ভবপরই নয়, ভবিষ্য-জীবন হল বাস্তব, এরকম সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করবার সপক্ষে যে-সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, সেগুলো আমার কাছে ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়। আমার বিচারে এইসব প্রমাণের দ্বারা নির্বিশেষ সম্ভাব্যতার অধিক এমন-কিছু প্রতিপন্ন হয় না। এই যুক্তিগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করতে আমি চাই না ; তবে কয়েকটা মন্তব্য এ বিষয়ে আমি করব।

আমি পুনরুক্তি করব যে দর্শনে আমাদের প্রকৃতির সমস্ত দিকের সমর্থন পেতে হবে। তার মানে আমাদের স্বভাবের প্রধান প্রধান বাসনাগুলোর পরিতৃপ্তি দর্শনকে দিতে হবে। কিন্তু তাই বলে প্রত্যেক রকমের ক্ষুধা মেটাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সেইরকম দাবি অত্যন্ত অযৌক্তিক।

অন্তত এইটুকু আমরা বলতে পারি আমাদের বিচারলব্ধ পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত-গুলো এই দাবিকে সমর্থন করে না। সর্বত্র আমরা লক্ষ্য করেছি যে সসীমের নিয়তিই হল পূর্ণতালাভ করা, কিন্তু ঠিক নিজরূপে নয়, এবং ঠিক নিজের মতোও নয়। এবং এই ভবিষ্য-জীবনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এমন পরম পবিত্র কি আছে? আমাদের স্বভাবের মৌলিক ধর্মের সঙ্গে এর কি এমন সংযোগ আছে? নৈতিক জীবন বা ধর্মজীবনের জন্য কি এর নিতান্তই প্রয়োজন? আমি দুঃখ চাই না, আমি শুধু সুখ চাই এবং তার উত্তরোত্তর ও নিরন্তর বৃদ্ধি চাই। কিন্তু আমার পক্ষে আমি থেকে এই খেয়ালের চরিতার্থতা করা অসম্ভব। আমার স্বভাবের সঙ্গে এই খেয়ালের সামঞ্জস্য নেই; সেইজন্য স্বধর্ম-অনুযায়ী যতখানি সুখ আমি পেতে পারি ততটুকুতেই আমার সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু তাই বলে তত্ত্ববিদ্যা আমার অলীক খেয়ালগুলোর দিকে কর্ণপাত করে না, এই যুক্তির বলে তাকে দেউলিয়া বলে আমি ঘোষণা করতে পারি কি?

কিন্তু কেউ হয়তো বলতে চাইবেন যে পারলৌকিক জীবন বা ভবিষ্য-জীবনে বিশ্বাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটা হচ্ছে একটা অত্যাবশ্যক অভ্যু-পগম। আমাদের স্বভাবের অন্তঃস্থল থেকে এই দাবি ওঠে। এখন এরকম বলার মানে যদি এই হয় যে এই বিশ্বাস ব্যতিরেকে নৈতিক জীবন এবং আমাদের ধর্মজীবন অচল হবে, তা হলে আমি বলব যে আমাদের ধর্ম ও আমাদের শীলাচারের মধ্যেই গলদ আছে। এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে কল্যাণ সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ও অনৈতিক ধারণাগুলোর সংশোধন করতে হয়। এর উত্তরে আপনি হয়তো চীৎকার করে বলে উঠবেন, "কিন্তু এ তো ভীষণ অবস্থা! জগতে আত্মত্যাগের মূল্য স্বীকার করতে হবে, এবং সাধুকৃত্য ও স্বার্থের মধ্যে বিরোধও থাকবে।" আমি পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করে বুঝিয়েছি কেন এ করুণ উক্তিতে আমার মন গলে না। "কিন্তু তা হলে তো ঋত ও দণ্ডের প্রভুত্ব থাকে না"; না, থাকে না; আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে কঠোর ন্যায়ের শাসন অমোঘ নয়। এই বিশ্বে নগ্ন নৈতিকতার উপরেও অনেক কিছু আছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এবং নৈতিক জগতেও ন্যায়ের নিয়ম শ্রেষ্ঠ নিয়ম নয়, তাই আমার সিদ্ধান্ত। "কিন্তু দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে যদি সব শেষ হয়ে যায়, তা হলে

আমাদের কষ্টার্জিত লাভগুলোও কি নষ্ট হয়ে যায় না" ? কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে একটা কৃতকর্মের ফল আমি পেলাম না বা রাখতে পারলাম না বলেই যে সেটা প্রণষ্ট হল এরকম ভাববার কারণ কী ? এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যাকে আমরা নিতান্ত অপচয় বলছি তা তো হচ্ছে প্রধানত বিশ্বের রীতি বা ধারা। এই বিষয়ে অযথা উদ্‌বিগ্ন হয়ে আমাদের মাথাখারাপ করার কোনো দরকার নেই। "কিন্তু অন্তহীন প্রগতি বিনা পূর্ণতাপ্রাপ্ত কি সম্ভবপর?" এর উত্তরে বলব : অনন্ত প্রগতির মানে যাই হোক তা পেলেই কি পরম পরিপূর্ণতা লাভ করা যায় ? সান্ত কখনো নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হতে পারে না। পূর্ণ হতে হলে আপনাকে চূর্ণ হতে হবে, আপনাকে বিলীন হতে হবে। অনন্ত প্রগতি তো পূর্ণতাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঠেলে রাখা মাত্র। এবং পূর্ণ বিশ্বের অপেক্ষক রূপে আপনি তো পূর্ণই হয়ে আছেন। "কিন্তু আমরা চাই যে সব দুঃখ ও সব বেদনার পর এক চরম সার্থকতার আনন্দ মিলবে কোথাও।" আমাদের মত যদি সত্য হয় তা হলে সমগ্রভাবে ও সমগ্রের মধ্যে এই তো হয়ে আছে। তবে আমি স্বীকার করি যে ব্যষ্টি বা ব্যক্তি বহুক্ষেত্রেই এই অন্তিম সার্থকতার আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকে এবং অসংখ্য জীবের মধ্যে এক ক্ষুদ্র জীবরূপে আমি এই চরম সার্থকতার আনন্দকে কামনা করি ; আমার কর্তব্যবোধ আমাকে এই সার্থকতালাভের জন্য প্রণোদিত করে ; এবং সসীম জীবসমূহের আকাজ্ক্ষা ও আকুতির মধ্যে দিয়েই সমগ্রের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ ও সফল হয়। কিন্তু তাই বলে আমি এই তর্ক উত্থাপন করতে পারি না যে ব্যষ্টি যেখানে বিষণ্ণ সেখানে সবই হচ্ছে বিপন্ন। আমি স্বীকার করি যে জীবনে সবসময়েই একটা বিষাদের সুর আছে ; কিন্তু এই সুর বড়ো হয়ে ওঠা উচিত নয় এবং বড়ো হয়ে ওঠেও না। এবং বিশ্ব ও ব্যষ্টির সম্বন্ধটা পৃথক পৃথক রূপে বিচার করা চলে না ; একটা ওতপ্রোত বিন্যাস বা শৃঙ্খলার অঙ্গরূপে উভয়কে বিচার করতে হবে। "কিন্তু আশা ও ভয় যদি না থাকে তা হলে আমরা কম সুখী ও কম নীতিপরায়ণ হব।" হয়তো বা হব কিম্বা হয়তো বেশি সুখী ও বেশি শ্রেয়স্কামী হব। এই প্রশ্নটা খুব বড়ো এবং এর আলোচনা আমি এখানে করতে চাই না। কিন্তু এইটুকু আমি বলতে চাই যাঁরা তর্ক করেন যে পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাসের ফলে সমগ্রভাবে মানুষের খারাপই হয়েছে তাঁদের অন্তত বলবার বেশ কিছু আছে। কিন্তু প্রশ্নটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে।

যদি এটা প্রমাণ করা সম্ভবপর হত যে সসীম জীবের স্বভাবের গঠনই এমন যে পরলোক ও পারলৌকিক জীবনকে দৃষ্টির সম্মুখে না রেখে তার পক্ষে নৈতিক আচরণ করা অসম্ভব, তা হলে ব্যাপারটা আমি স্বীকার করি অন্যরকম দাঁড়াত। কিন্তু এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটা যদি এই হয় যে এখন মনুষ্য-জীব যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় এইরকম একটা ধোঁয়াটে, হয়তো বা অমূলক বিশ্বাস না থাকলে তার অধঃপতন অনিবার্য, তা হলে আমি বলব সেটা সত্যি হলে বিশ্বের পক্ষে সেটা একটা অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য ব্যাপার। যে জীবশ্রেণীর নিজ প্রতিবেশের সঙ্গে এত অসামঞ্জস্য, তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক ; এবং তারা বিনষ্ট হয়ে যদি এক নূতন উন্নততর শ্রেণীর জীব গড়ে ওঠে এবং তাদের মনের গঠন যদি আরো বাস্তবধর্মী হয় তা হলে তাতে ভালোই হবে। এটুকু বলেই আমি ক্ষান্ত হব।

ওপরের সমস্ত যুক্তি এবং এইরকম আরো অনেক যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে কতগুলো কল্পিত ধারণা। এই গ্রন্থের মূল ও প্রধান সিদ্ধান্তগুলো এই কল্পিত ধারণাগুলোকে কোনোরূপে সমর্থন করে না। এই অমূলক ধারণাগুলোর সম্বন্ধে একটা আলোচনা বাঞ্ছনীয়। "আমি এটা চাই বা আমি ওটা চাই" বলে আস্ফালন করা বৃথা ; আমাদের দেখাতে হবে যে চাহিদাটার প্রতিষ্ঠা বস্তুর মৌলিক প্রকৃতির মধ্যে আছে কি না। এবং বিশ্বের চরমরূপ কি তা না জেনে এই বিশেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

পারলৌকিক জীবন বা ভবিষ্য-জীবন সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল না। আমাকে বাধ্য হয়ে কিছু বলতে হয়েছে। এবং এ বিষয়ে বলবার আগে আমি এতদ্‌সম্পর্কিত অন্যান্য প্রধান সমস্যাগুলোর আলোচনা শেষ করেছি।

আমি যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি মোটামুটিভাবে বলা চলে যে শিক্ষিত জগৎও সেই সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছে। দেহ-নাশের পরও ব্যক্তিগত জীবনের অক্ষুণ্ণ স্থায়িত্ব হল একটা সম্ভাবনামাত্র ; তার বেশি আর কিছু নয়। তবে এও সম্ভবপর যে কেউ কেউ হয়তো এরকম পর-জীবনে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করে মনে ও জীবনে শক্তি পান। অপর পক্ষে মনে হয় যে হীন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে থাকার চাইতে আশা ও ভয়ের বন্ধনের বাইরে থাকা অনেক ভালো। আত্মার অমরত্ব ব্যতীত ধর্মের অস্তিত্ব নেই এবং আত্মার অমরত্ব বিনা নৈতিক

জীবন একপ্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। যিনি এই মত ঘোষণা করেন কিংবা যিনি এইরকম মতের ইঙ্গিত দেন তিনি স্বেচ্ছায় এক গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন; এই দায়িত্বের চেয়ে গুরুভার দায়িত্ব এই জগতে খুব কমই আছে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

অন্তিম সংশয়

সব-কিছু বলতে না পারলেও, এবার গ্রন্থ শেষ করবার সময় এসেছে। শেষ করবার আগে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি যে কি কি বিষয়ে ও কতদূর আমাদের প্রধান সিদ্ধান্তগুলোকে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা যায়। আমরা জেনেছি যে পরমবস্তু এক; পরমবস্তু মূলত অনুভবস্বরূপ বা চৈতন্যস্বরূপ এবং পরমবস্তুর মধ্যে আছে দুঃখের চাইতে সুখের আধিক্য। সমগ্রসতের মধ্যে অবভাস ছাড়া অন্য কিছুও নেই; এবং অবভাসের প্রত্যেক অংশ বা খণ্ড এই সমগ্রের বিশেষণ। অপর পক্ষে, পরমবস্তুতে সমাবিষ্ট হওয়ার পরে অবভাসমূহের নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে। বিশ্বে কিছুই নষ্ট হয় না; এবং এমন কিছু সেখানে নেই যা অদ্বিতীয় পরমবস্তুর সম্পদ বৃদ্ধি না করে। কিন্তু পরমতত্ত্বে গিয়ে প্রত্যেক সসীম বৈচিত্র্যের শোধন ও সম্পূরণ হয়। প্রত্যেক উপাদানই সে নিজে যা পরমবস্তুতে তাই থাকে। তার স্বকীয় ধর্ম নষ্ট হয় না; তবে পূরণ ও সংযোজনের ফলে স্বীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্যটা গলে যায় ও খসে যায়। এবং সেইজন্য কোনো অবভাসই শেষ পর্যন্ত তথাভূতরূপে বাস্তব নয়; কারণ কোনো অবভাসই কেবল নিজ বা নিঃসঙ্গরূপে সত্য নয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের অবভাসের অন্তর্নিহিত বস্তুসত্তার তারতম্য আছে: কোনো একটা অবভাস সমগ্রভাবে অন্য আর একটা অবভাসের সমান, বস্তুসত্তার বিচারে এরকম উক্তি হল দুষ্ট ও ভ্রান্ত।

অবভাসের তথ্যরূপ ও তার সামগ্র-বৈচিত্র্যের হেতু আমাদের জানবার উপায় নেই। কেন অবভাসের উদয় হয় এবং এত বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ন প্রকারের অবভাস কেন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। কিন্তু এইসব সত্তা-বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা এমন কিছু পাই না যা

সম্পূর্ণ সমন্বয় বা সমগ্রের শৃঙ্খলার বিরোধী। এই মহা-তন্ত্রের সুবিস্তৃত সূক্ষ্ম জ্ঞান আমাদের বুদ্ধির অলভ্য ; তবে এর মধ্যে কোথায়ও কোনো বিশৃঙ্খলা বা বিদ্রোহী উপাদানের অস্তিত্বের লক্ষণ আমরা দেখতে পাই নি। আমরা এমন কিছু দেখতে পাই নি যার ওপর ভিত্তি করে আমাদের পরমবস্তুসম্বন্ধীয় ধারণাকে খণ্ডন করা যায়। সেইজন্য আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে সাহসী হয়েছি যে পরমবস্তুর যে নির্বিশেষ ধর্ম আমরা নিরূপণ করেছি পরমবস্তু সেই ধর্মের অধিকারী। তবে কিভাবে পরমবস্তু এই ধর্মের অধিকারী আমরা জানি না।

আপত্তি উঠতে পারে : "আপনার সিদ্ধান্তটি প্রমাণিত হয় নি। ধরুন আপনার সিদ্ধান্তটি খণ্ডন করবার উপযোগী কোনো আপত্তি পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে আপনার সিদ্ধান্তটি অপ্রমাণিত করানো যাচ্ছে না। কিন্তু অপ্রমাণের এই অভাব ও বিনিশ্চয় এক জিনিস নয়। আপনার অনুমিত বস্তুটি সম্ভবপর হতে পারে ; কিন্তু তাই বলে সেটি বাস্তব নাও হতে পারে। কারণ, পরমবস্তু যে অন্যরকম নয় তা কেন ? অনন্ত সম্ভাবনার অজ্ঞাত রাজ্যে আমরা কেন এই একটি সম্ভাবনাকে সত্য বলে বেছে নেব ?" আপত্তিটির যাথার্থ্য স্বীকার করে নিচ্ছি। এই আপত্তিটার আলোচনাকল্পে কতগুলো তত্ত্বগত বিবেচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। এখানে তার মধ্যে যেটুকু অত্যাবশ্যক সেই দিকে আমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করব।

১. তত্ত্বগত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে চরম সংশয়ের অবস্থা অবলম্বন করতে গেলে স্ব-বিরুদ্ধতা দোষ জন্মে। স্বেচ্ছায় হোক আর নাই হোক, একটা জায়গায় এসে বাধ্য হয়ে অভ্রান্ততা স্বীকার করতেই হয়। কারণ, তা না হলে বিচারনিষ্পত্তি করা যায় কি করে ? আপনি বুদ্ধিকে মনুষ্য-প্রকৃতির এক নগণ্য অংশ মাত্র বলতে চান বলুন। কিন্তু বুদ্ধির জগতে বুদ্ধির আদেশ শিরোধার্য করতেই হবে ; কারণ বুদ্ধির স্থান সেখানে সর্বোচ্চে। বুদ্ধিকে সিংহাসনচ্যুত করতে গেলে বুদ্ধির রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেইজন্য আমাদের কথা হল এই, বুদ্ধির বা বিচারের ক্ষেত্রের বাইরে যে মত ইচ্ছা হয় অবলম্বন করুন ; কিন্তু খেলার যদি ইচ্ছা না থাকে খেলতে বসবেন না। প্রত্যেক কর্ম পরিচালনা করবারই একটা নিয়ম বা কৌশল আছে। এমনকি চরম জ্ঞানিক সংশয়বাদেরও ভিত্তি হল সত্য ও তথ্য সম্বন্ধীয় কোনো

এক স্বীকৃত মতবিশেষ। সত্য ও বাস্তবের কোনো এক দিকের সম্বন্ধে নিঃসংশয় বলেই বিশেষ বিশেষ আলোচ্য সত্যগুলো অস্বীকার করতে কিম্বা সন্দেহ করতে আপনি বাধ্য। তার মানেই আপনি অন্তত একটা পরমসত্যের ওপর আশ্রয় নিচ্ছেন; এবং প্রচ্ছন্নভাবেই হোক কিংবা অপ্রচ্ছন্নভাবেই হোক এই সত্যটার অভ্রান্ততা বা নিঃসংশয়তা আপনি স্বীকার করছেন। সেইজন্য ভ্রান্তির সাধারণ অস্তিত্ব থেকে কিছুই অভ্রান্ত নয় এইরকম বিচার করা বুদ্ধিসম্মত নয়। কারণ, "আমি এ বিষয়ে নিঃসংশয় যে আমরা সর্বত্র ভ্রান্ত" এই উক্তির মধ্যে স্বতো-বিরোধ অতি স্পষ্ট। এই উক্তিটা অতিপরিচিত আর-একটা উভয়তোনাশী গ্রীসীয় যুক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। এবং উক্তিটা পরিবর্তন করে যদি "সর্বত্র" এই শব্দের স্থলে "সাধারণত" শব্দটা ব্যবহার করি তা হলে সার্বত্রিক সংশয়বাদ আর প্রতিপন্ন হয় না। কারণ সার্বত্রিক ভ্রান্তির সত্যতা স্বীকার করতে গেলে মনে করতে হয় যে, সব সত্যই কলুষিত এবং প্রত্যেক সত্যের মধ্যেই ভ্রান্তির সম্ভাবনা। কিন্তু আমরা সাধারণত ভ্রান্ত হয়েও বিশেষস্থলে অভ্রান্ত হতে পারি, তাতে কোনো বাধা বা বিরোধ নেই। সংক্ষেপে এইরূপ বলা যায় যে তত্ত্বগত বিচারে বসে আমরা মৌল বা মূলীভূত ভ্রান্তির কথা চিন্তা করতে পারি না। আমরা যখন কোনো বিষয়ে বিনয় প্রকাশ করতে চাই কিম্বা বুদ্ধির মূল্য সম্বন্ধে যে হীন ধারণা আমাদের হয়েছে তার প্রকাশ করতে চাই তখন মানুষের ভ্রমশীলতার কথা তুলি। কিন্তু বুদ্ধি-ক্রিয়া পরিচালনার সময় এই ধারণা বা এই ভাব ক্রিয়াটির বাইরে থাকে। ক্রিয়ার মধ্যে তাকে স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অসংগতি ও অযৌক্তিকতার জালে জড়িয়ে পড়ি। ২. দ্বিতীয়ত স্বীকৃত সম্ভাবনার কোনো-না-কোনো একটা অর্থ থাকতেই হবে। শূন্য শব্দমাত্র সম্ভাবনা হতে পারে না; এবং শব্দ-মাত্রকে জ্ঞানত কেউ কখনো সম্ভাবনারূপে দাবি করে না। সম্ভাবনার জ্ঞানের জন্য একটা-না-একটা অনুভূত ভাবের বা প্রত্যয়ের উপস্থিতি সর্বক্ষেত্রে দরকার।

৩. এবং এই প্রত্যয়ের বা ভাবের স্বতো-বিরোধী কিংবা আত্ম-বিনাশী হলে চলবে না। তার যতটুকু অংশ স্ব-বিরুদ্ধ, ততটুকুকে সম্ভবপর বলে স্বীকার করা যায় না। কারণ সম্ভাবনাও বাস্তবের একপ্রকার

বিশেষণ বা গুণ এবং সেইজন্য বিশেষ্যস্থানীয় বাস্তবের অবগত ধর্মের প্রতিকূল হলে তার চলে না। এখানে এরকম আপত্তি তোলা বৃথা যে সর্ববিধ অবভাসই হচ্ছে স্বতো-বিরুদ্ধ। সে কথা তো অতি সত্য ; কিন্তু সেইজন্যই অবভাসের স্বতো-বিরোধী রূপটুকু পরম বাস্তবের প্রকৃত বা সম্ভবপর বিধেয় বা বর্ণনা নয়। যে বিধেয় স্ব-বিরুদ্ধ তাকে তথাভূতরূপে সম্ভবত বাস্তব বলা যায় না। বাস্তব হতে হলে তার বিশেষ রূপের সংশোধন ও পরিবর্তন দরকার। এবং এই সম্পূরণ ও সংশোধন ক্রিয়ার ফলে বিধেয়টির সম্পূর্ণ রূপান্তর সম্ভবপর এবং তার ফলে তার পরিচিত রূপটি নাও থাকতে পারে। (চতুর্বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

৪. যেখানে ভাব মাত্র একটি, সেখানে ন্যায়ত সংশয় করা অসম্ভব। যে-ক্ষেত্রে এমন দুটো ভাব উপস্থিত থাকে যে-দুটো বস্তুত এক হয়েও দুই প্রকারে প্রতিভাসিত হচ্ছে সেই-ক্ষেত্রে মনের মধ্যে সন্দেহের ক্রিয়া সম্ভবপর। এমন-কি, প্রত্যক্ষ প্রতিভাস বা ভ্রমজ্ঞান ছাড়াও মনে অস্বস্তি-বোধ ও দ্বিধার উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু ন্যায়ত সংশয়ের জন্য দুটো ভাব বা প্রত্যয়ের দরকার। এবং সে-দুটোর দুই বিভিন্ন অর্থ থাকা উচিত, যাতে তারা যথার্থত দুই হতে পারে। এইরকম বিভিন্ন একাধিক ভাব ব্যতীত সংশয়ের অস্তিত্ব ন্যায়সম্মত হতে পারে না। ৫. যদি এমন কোনো প্রত্যয় বা ভাব থাকে যাকে সন্দেহ করা যায় না তা হলে সেই ভাবকে ন্যায়ত আপনি স্বীকার করতে বাধ্য। কারণ, আমরা একটা জিনিস বরাবরই লক্ষ্য করে আসছি যে যাই-কিছু হোক তাকেই বাস্তবের বিধেয়রূপে বা বিশেষণ রূপে ধারণা করতে আমরা বাধ্য। যে-ভাবকে যথাভূতরূপে কিংবা অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে গ্রহণ করলে কোনোরূপ স্ব-বিরোধের উৎপত্তি হয় না সেই-ভাবকে সত্য ও বাস্তব বলে অবিলম্বে স্বীকার করা চলে। (ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এখন এটা স্পষ্ট যে যেখানে সম্ভাবনা মাত্র একটি সেখানে এইরকম বিরোধ বা ব্যাঘাত অভাবনীয়, সুতরাং তাকে স্বীকার বা সমর্থন করতে আমরা বাধ্য। এখানে কল্পনার অসামর্থ্য এবং সংমূঢ়তা একটা বাধা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির বা তত্ত্বের দিক থেকে এই ব্যর্থতা ও চিত্তবিভ্রমের কোনো মূল্য নেই।

৬. আপত্তি উঠতে পারে, "এরকম যুক্তির অর্থ শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায়

এই যে জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে অজ্ঞানতা। আমাদের স্বীকারটা হল নিছক অশক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।" কিন্তু আপত্তিটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমাদের মতের অন্তর্নিহিত অর্থটা হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। আমাদের মতের মূল কথাই হল যে নিতান্ত অজ্ঞানতাকে জ্ঞানের ঘরে স্থান দেওয়া চলে না। যিনি দুটো সত্যিকারের প্রত্যয় বা ভাব সম্মুখে না পেয়েও সংশয় পোষণ করতে চান, যিনি বাস্তব-সম্পর্কিত প্রাকৃতজ্ঞানের অধিকারী না হয়েও সম্ভাবনার কথা বলতে চান তিনিই একান্ত অসামর্থ্যের ওপর আশ্রয় নেন; তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি নিজের শূন্যতা স্বীকার করছেন অথচ সত্যপ্রদর্শন করবার ভান করছেন। এই বিকৃত ভান এবং ছদ্মবিনয়ের প্রমত্ত দুঃসাহসের বিরুদ্ধেই হচ্ছে আমাদের মতের মূল প্রতিবাদ। এই বিষয়ে তলিয়ে দেখলেই আমাদের সিদ্ধান্তটা সুস্পষ্ট হয়। নিশ্চিতরূপে বলা যায় প্রত্যেক প্রত্যয় বা ভাবের একটা অর্থ থাকতেই হবে; নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে দুটো প্রত্যয় মনের সম্মুখে না থাকলে বুদ্ধিসম্মত বা ন্যায্য সংশয় সম্ভবপর নয়; এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে যাকে সম্ভবপর মনে করা হয় তাকে বাস্তবের ধর্মরূপে খানিকটা স্বীকার করতেই হয়। এবং যেখানে বিকল্প ভাব নেই সেখানে সংশয়াপন্ন ভঙ্গির কোনো যৌক্তিকতা বা ন্যায্যতা নেই, সে বিষয়েও কোনো সংশয় নেই।

৭. নেতিবাচক বা নাস্তিসূচক অবধারণের স্বরূপ চিন্তা করলে সাধারণ সংশয়ের পক্ষে আর-একটা যুক্তি হয়তো খাড়া করা যেতে পারে। সেইটে সম্বন্ধে এখন আলোচনা করব। এরকম অবধারণ বা বিচারে যা ঘটে তা এই যে, বস্তুসত্তা কর্তৃক কোনো ব্যঞ্জনাবিশেষ অস্বীকৃত হয়; কিন্তু অবগত উদ্দেশ্যের বা বিশেষ্যের কোনো সদর্থক ধর্মকে এই অস্বীকৃতির মূল দেখতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত এখানে ভিত্তিটা একপ্রকার অভাবমাত্র এবং অভাবমাত্রের জন্য দরকার হচ্ছে আমাদের অন্তর্গত চেতসিক পরিবেশ দ্বারা উপস্থিত বিশেষ্যটার বিচার। কিংবা আমরা বলতে পারি যে, এখানে জ্ঞাত বিশেষ্যটা সম্পূর্ণ বলে কল্পিত; কিন্তু তার অবচ্ছেদগুলো হচ্ছে কতগুলো বাইরের জিনিস; এবং সেগুলোর কারণ হচ্ছে আমাদের অক্ষমতা। আরো বলা চলে যে পরমবস্তুর বেলায় এই বর্ণনাটা সর্বদাই সত্য। আমরা অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে আমাদের জ্ঞাত বিশ্বকে সম্পূর্ণ মনে করি; সেইজন্য হয়তো বলা চলে যে সত্যজ্ঞানের

কাছে বিশ্ব হচ্ছে সবসময়েই অসম্পূর্ণ। এবং এই কারণে, বিকল্পভাবের অনস্তিত্বেও একক সম্ভাবনাকে সত্য বলে স্বীকার করতে আমরা অসম্মত হতে পারি।

আমি নিজেই স্বেচ্ছায় এই আপত্তি উত্থাপন করেছি। কারণ এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্য নিহিত আছে। এবং সীমাবদ্ধভাবে এই নীতিটা সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই গ্রন্থের সর্বত্রই আমি জ্ঞানের এক অবিদিত সম্পূরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এসেছি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে আমরা এই নীতিকে এখন কি করে বর্জন করতে পারি? পরমবস্তুর জ্ঞান সবসময়েই আমাদের অক্ষমতার দ্বারা অবচ্ছিন্ন এইরকম আমরা মনে করব না কেন? সুতরাং পরমবস্তু যে আমাদের কল্পিত সম্ভাবনাসমূহের অতীত নয় তাই বা বলা যায় কি করে?

এইখানে আপত্তিটার মধ্যে স্বতো-বিরোধ উপস্থিত হচ্ছে। সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে এখানে এক নিশ্বাসে বাড়ানো এবং কমানো হচ্ছে। এবং উপরের প্রশ্নের উত্তরে একটা উভয়তোনাশী যুক্তির প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে ভালো হবে মৌলিক ভ্রান্তিটা কি তাই আবিষ্কার করা। অন্য সবরকম জ্ঞানের মতো অভাবাত্মক জ্ঞানও শেষ পর্যন্ত সদর্থক বা অস্তিসূচক। অনুপস্থিতি ও অভাবের কথা বলতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে অন্যত্র কোথায়ও কোনো একটা ক্ষেত্র এবং কোনো এক উপস্থিতি আছে। শুধু অজ্ঞান বা অবিদ্যার ভিত্তিতে জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বা দোষযুক্ত বলা যায় না। জ্ঞানকে দোষযুক্ত বিচার করতে হলে অজ্ঞান-অধিকৃত রাজ্যের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দরকার। আমাদের বাস্তব-সম্পর্কিত জ্ঞানের একটা পরিধি আছে; এবং সেই জ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগ আছে। সেইজন্য এক বিভাগে যেটা না থাকে সেটাকে হয়তো অন্য বিভাগে খোঁজা চলে। যেখানে জগতের কিছুটা অংশকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয় সেখানে জগৎটা সেই অংশকে ছাড়িয়ে যায়। সুতরাং সেখানে এই জ্ঞাত অংশের অতিরিক্তরূপে যে বাস্তবটা প্রসারিত হয় তার স্বরূপ নির্ণয় ও অনুমান করার অধিকার আমাদের হয়। এবং আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় এই অধিকারই আমরা প্রয়োগ করেছি। কিন্তু যতক্ষণ বিশ্ব-সম্পর্কিত জ্ঞানের মৌল অবধির মধ্যে এবং অপ্রধান বিষয়ের মধ্যে আমরা আমাদের পর্যালোচনা ও পরীক্ষা সীমাবদ্ধ রাখি

ততক্ষণই এই অধিকার সত্য। চরম বস্তুসত্তার বাইরেও একটা রাজ্য আছে এরকম কল্পনা মিথ্যা এবং চরমতত্ত্বের বাইরে যাবার প্রয়াসও বৃথা। আমাদের জ্ঞানের বাইরে যদি কোনো বস্তুসত্তার রাজ্য থাকেও আমরা তার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি না এবং যেখানে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেখানে বলতেই পারি না যে সেই রাজ্য হচ্ছে অজ্ঞান-আবৃত। সেইজন্য শেষ বিচারে আমরা যাকে বস্তু বলে জানি তাই হচ্ছে বস্তু এবং জ্ঞান ও বস্তু হচ্ছে সম-বিস্তার। জ্ঞানের ক্ষেত্রের বাইরে সম্ভবপর বলে কিছুই থাকতে পারে না এবং সেই ক্ষেত্রের অন্তস্থিত একমাত্র সম্ভাবনাকে অদ্বিতীয় বাস্তব বলে গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য। যত অজ্ঞান-আচ্ছন্ন রাজ্য সবই এই পরিধির মধ্যে অবস্থিত; এবং সর্ববিধ বুদ্ধিসম্মত সংশয়ের বিষয় এবং সর্ববিধ যৌক্তিক সম্ভাবনার স্থানও হচ্ছে এই সীমার মধ্যে। তার বাইরে নয়।

৮. এই বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট করবার জন্য এক আদর্শ অবস্থার কল্পনা করা যাক। আমাদের জ্ঞাত জগৎ যদি একটা পূর্ণ শৃঙ্খলা বা নির্দোষ সংগঠন হত তা হলে কোথায়ও তার মধ্যে এতটুকু অসম্পূর্ণতার ব্যঞ্জনা থাকতে পারত না। সেই শৃঙ্খলার মধ্যে প্রত্যেক সম্ভবপর ব্যঞ্জনার যথা-নির্দিষ্ট স্থান থাকত; সেই স্থানটা শৃঙ্খলানিহিত অন্যান্য অবশিষ্ট অংশগুলো কর্তৃক পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ও নিরূপিত হত। তা ছাড়া এরকম পরিপূর্ণ তন্ত্রের যে কোনো একটা উপাদান থেকে সমগ্র বিশ্বের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে জেনে বার করা যেত। এইরকম ক্ষেত্রে অভাব-জনিত সংশয় কিংবা অজ্ঞানাশ্রিত সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকত না। এইরকম ব্যূহনের বাইরে কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারত না; এবং তার ভিতরের সমস্ত ক্ষুদ্র ও সান্ত অংশগুলোর মধ্যেও সমান চরিতার্থতা পরিলক্ষিত হত। প্রকৃতপক্ষে "অভাব" কিংবা "অক্ষমতা" এই শব্দগুলোর যথার্থ কোনো অর্থই থাকত না। কারণ এই আদর্শ অবস্থায় প্রত্যেক প্রত্যয় বা ভাবের বেলায় তার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সবকিছুর সংবাদ সুপরিস্ফুট হত; ফলে সংশয়, সম্ভাবনা বা অবিদ্যা অসম্ভব হত।

৯. আমরা জানি যে তথ্যরূপে এই চরমমাত্রার জ্ঞান সত্য নয়। আমাদের জগতে জ্ঞানের এই পরাকাষ্ঠায় আরোহণ করা সম্ভবপর নয়। অনুভব বা চেতনার অন্যান্য দিকের সঙ্গে বুদ্ধির এখন যে সংযোগসম্বন্ধ এই

আদর্শ-জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য তার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের সর্বজ্ঞতা অপ্রমাণ করবার জন্য যুক্তি দেখানো নিষ্প্রয়োজন; এই গ্রন্থের আলোচ্য প্রত্যেক ব্যাপারেই আমাদের অক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়েছে। এই বিশ্বের ভূয়সী ও বহুবিচিত্র অভিব্যক্তির কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই বাহুল্য অনির্বচনীয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যা বলেছি তার পুনরুক্তি এখানে করব না। আমাদের শৃঙ্খলার সূক্ষ্ম অংশগুলো হচ্ছে সর্বত্র অসম্পূর্ণ।

শৃঙ্খলা অসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য সর্বত্রই খানিকটা অজ্ঞানের রাজত্ব থাকতে বাধ্য। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের শেষ পর্যন্ত মিল হতে পারে না; সেইজন্য বিশ্বের খানিকটা অংশ চির-অজ্ঞাত থাকে; এই অজ্ঞাত প্রদেশের স্থূল রূপরেখাটি ছাড়া আর কিছু আমরা জানি না। যত সংশয় সম্ভাবনা এবং তাত্ত্বিক পরিপূরণের ক্রিয়া হচ্ছে এই প্রদেশের মধ্যে। যে শৃঙ্খলা অসম্পূর্ণ তার অঙ্গে অঙ্গে আছে বিসংবাদ; এবং সেইজন্য প্রত্যেক অসম্পূর্ণ শৃঙ্খলারই ইঙ্গিত হচ্ছে তার বাইরের কিছুর দিকে; কিন্তু কি পরিপূরক উপাদান পেলে প্রত্যেক সূক্ষ্ম অংশের অভাব দূর হবে এই শৃঙ্খলা থেকে তা জানা যায় না। এবং এই কারণের জন্য ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনার দিক থেকে জ্ঞাত শৃঙ্খলাটার খানিক অংশ সবসময়েই অহেতুক মিশ্রণ বা সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হতে বাধ্য। আমরা বলতে পারি যে বিশ্বের এই অসম্পূর্ণতা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমাদের অসম্পূর্ণতারই ফল ও পরিণতি।

১০. এখানে পূর্ব-বর্ণিত পার্থক্যটার কথা আমাদের পুনরায় স্মরণ করতে হবে। আমরা যে অসম্পূর্ণ জগৎকে জানি সেই অসম্পূর্ণ জগতেও, অসম্পূর্ণতা ও অবিদ্যা হচ্ছে আংশিক মাত্র। আমাদের জ্ঞানের সবটাই অসম্পূর্ণ ও অবিদ্যা-ক্লিষ্ট এরকম উক্তি সত্য নয়; এমন কতগুলা জায়গা আছে যেখানে অপর-সম্বন্ধীয় কোনো ন্যায্য ধারণাই আমাদের নেই। সেই-সব স্থলে সংশয় বা সম্ভাবনার কথা অর্থশূন্য। কারণ এইসব ক্ষেত্রে অজ্ঞানের সম্ভবত কোনো স্থান নেই; এইসব স্থানে বুদ্ধিসম্মত সংশয় হচ্ছে একরকম যুক্তিহীন ও বিকৃত কল্পনামাত্র। (অবশ্য এইসব স্থলের সীমা আগে থেকে নির্ধারিত করা যায় না।) কিন্তু এই জায়গাগুলোর বাইরে কয়েকস্থলে নানা কল্পনা সম্ভবপর; সেইসব কল্পনাকে নিরর্থক বলা চলে না কিংবা বস্তুস্বরূপের বিসংবাদী বলাও চলে না; কিন্তু সেগুলো নিতান্ত রক্তশূন্য

ও সেগুলোর রিক্ত সম্ভাবনার মূল্য বিশেষ কিছুই নয়। পুনরুক্তি হলেও আবার বলে রাখা ভালো যে তবে বিশ্বের অবশিষ্ট অংশে ব্যাপারটা হচ্ছে অন্যরকম। সেখানে প্রকৃত সম্পূর্ণতাকে আমরা অল্পবিস্তর মাত্রায় জানি এবং সেখানে সম্ভাবনার মূল্যানুযায়ী একটা ক্রম বা পর্যায় নির্ণয় করাও যায়। এই বিষয়ে আর বেশি আলোচনা করে কোনো লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না। এবার পরমার্থসৎ-সম্পর্কিত বিভিন্ন সংশয়ের বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

পরমতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের স্থিতি হচ্ছে এই। এই সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তটাকে আমরা নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত বলে বিশ্বাস করি। এই সিদ্ধান্তকে বিপর্যস্ত করা হচ্ছে ন্যায়ত অসম্ভব। আমরা যে-মত প্রকাশ করছি সেই-মত ছাড়া অন্য কোনো ভাব বা প্রত্যয় এবং অন্য কোনো মত নেই। এমন-কি বুদ্ধিসম্মত উপায়ে অন্য কোনো সম্ভাবনার কথা কল্পনা করাও অসম্ভব। আমাদের বিচারের ফলের বাইরে যা আছে তা হয় নিতান্ত নিরর্থক, নয় এমন-কিছু যাকে সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করলে আমাদের সিদ্ধান্তের সামিল মানতে হয়। প্রকৃতপক্ষে দেখতে পাওয়া যায় যে কল্পিত অপরটি শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদের পরমতত্ত্বেরই সমান; কিংবা দেখতে পাওয়া যায় যে তার মধ্যে যে উপাদান আছে সেগুলো সবই আমাদের স্বীকৃত পরমার্থের মধ্যে আছে; কিন্তু সেগুলো স্থানচ্যুত হয়েছে এবং তার ফলে সেগুলো ভ্রান্ত অবভাসরূপে বিকৃতিলাভ করেছে। এবং আমাদের স্বীকৃত তত্ত্বের দ্বারাই এই স্থানভ্রংশেরও হেতুনির্দেশ করা সম্ভবপর।

বস্তুত আমাদের বিচারের ফলটার সত্যতা সংশয় করা চলে না। কারণ এর মধ্যে সর্ববিধ সম্ভাবনা আছে। যদি আমাদের পরিকল্পের পরিপন্থী প্রত্যয় বা ভাব কিছু থাকে তা হলে সেটা প্রদর্শন করবার জন্য আমরা আপনাকে আহ্বান করি। আশা করি আমরা প্রমাণ করতে পারব যে প্রত্যেক প্রত্যয়টিই হচ্ছে বাস্তবিকত আমাদের পরিকল্পের অন্তর্গত উপাদান-বিশেষ। এবং প্রদর্শিত প্রত্যয়টা যে আমাদের তন্ত্রের এক আত্ম-বিসংবাদী অংশ তাও দেখাতে পারব। আমরা প্রতিপন্ন করতে পারব যে এই প্রত্যয়টা আমাদের বৃহৎতন্ত্রের একটি ক্ষুদ্র খণ্ডমাত্র; নেহাৎ অন্ধ বলেই সে নিজেকে তন্ত্র-বহির্ভূত মনে করেছে। আমরা প্রমাণ করতে পারব যে বিশ্বে তার

স্বাধীনতা ও অসংগতার কোনো অর্থ নেই ; নিজ স্বভাবের একাধিক দিক সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্যই স্বতন্ত্রতার একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্ট হয়েছে।

আমাদের দৌর্বল্য ও হীনতার কথা তুলে কাতর ক্রন্দন করলে অস্থির হবার কোনো কারণ নেই। এক অর্থে আমাদের স্বভাবের এই দৌর্বল্যের উপরই হচ্ছে আমাদের যুক্তিটা প্রতিষ্ঠিত। আমরা বিশ্ব ও বিশ্বাতীত এই দুইভাগে বিশ্বকে বিভক্ত করতে অক্ষম। আমরা আমাদের অক্ষমতা ও বিনয়ের দোহাই দিয়ে বিশ্বের বাইরে আর-একটা জগৎ আছে এরকম কল্পনা করতে পারি না। আমাদের বিচারে এই অপর জগতের কথা একপ্রকার সাড়ম্বর প্রলাপোক্তি মাত্র ; এবং আমাদের শক্তিহীনতার জন্য এই প্রলাপে বিশ্বাস করার সাহসও আমাদের নেই। অর্থাৎ সম্বিৎ বা অনুভবকে অতিক্রম করবার ব্যর্থ প্রয়াসের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করি। আমরা বলতে চাই যে সাধারণত শূন্য বা শুদ্ধ সন্দেহ করার মানে হচ্ছে হয়তো এইরকম এক ব্যর্থ চেষ্টা এবং বিশেষ করে আমাদের মৌলিক সিদ্ধান্তের বেলায় সেটা যে তাই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং সিদ্ধান্তটার সাধারণ রূপ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ; এবারে দেখা যাক এই সম্বন্ধে আমরা কতখানি নিশ্চিত।

পরমার্থসৎ অদ্বয়। পরমতত্ত্ব একক হতে বাধ্য ; কারণ নানাত্বকে বাস্তব-রূপে স্বীকার করলে স্ব-বিরোধ উপস্থিত হয়। নানাত্বের জন্য সম্বন্ধের প্রয়োজন এবং সম্বন্ধ স্বীকার করলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবসময়ই এক উন্নত ধরণের ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সেইজন্য বিশ্ব বহু এই কল্পনা স্বতো-বিরোধী ; এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ব এক এই বাক্য স্বীকার করতেই হয়। এক বিশ্বের সঙ্গে আর এক বিশ্ব যোগ করুন ; অবিলম্বে দুটো বিশ্বই আপেক্ষিক এবং উচ্চতর এক অদ্বৈত তত্ত্ববস্তুর সীমোপহিত অবভাস হয়ে দাঁড়ায়। এবং আমরা জেনেছি যে শেষ পর্যন্ত অবভাসরূপীয় নানাত্বকে একটা ঐক্যের মধ্যে স্থান দিতেই হবে এবং তাকে সেই অদ্বয়তত্ত্বের ধর্ম বা গুণ বলে মেনে নিতে হবে।

এইরকম ঐক্যের খানিকটা অস্তিমূলক একটা ধারণা আমাদের আছে। (চতুর্দশ বিংশ এবং ষড়বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) একথা সত্য যে বৈচিত্র্যের নানা দিক বা বিভাগ কিরূপে সমবেত বা একত্রকৃত হয় তার বিস্তৃত-

জ্ঞান বা বিশদজ্ঞান আমাদের নেই। আবার এও সত্য যে বহুত্বের সঙ্গে প্রতিপ্রভেদ করেই একত্বকে যথার্থ অর্থে বোঝা যায়। সেইজন্য ঐক্য হচ্ছে এমন এক প্রেক্ষা বা লক্ষণ যেটা অন্য এক প্রেক্ষা বা লক্ষণের দ্বারা উপহিত বা নির্দিষ্ট হয়; এই বিচারে ঐক্যও হচ্ছে একপ্রকার অবভাস। এবং এটা পরিষ্কার যে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তত্ত্ববস্তুকে যথার্থত এক বলা চলে না। তবে অন্য এক অর্থে তত্ত্ববস্তুকে এক বলা সম্ভবপর।

সমস্ত নানাত্বই হচ্ছে প্রথমত পরমবস্তুর বিশেষণ। পরমবস্তু বহু না হয়েও এই বহুত্বকে বা বৈচিত্র্যকে ধারণ করে। তবে পরমবস্তু বহুত্বের অধিকারী হয়েও বহুত্বের উর্ধ্বে। পরমতত্ত্ব বহুত্ব থেকে ব্যাবৃত্ত কোনো পৃথক তত্ত্ব নয়। পরমতত্ত্বের মধ্যেই একদেশী বহুত্ব ও তার বিপরীত তত্ত্বটা অর্থাৎ একদেশী ঐক্য উভয়েই হচ্ছে নিহিত এবং সমাসক্ত। এবং নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা চলে যে তত্ত্ববস্তুর এই স্থূল রূপটা হচ্ছে এক অস্তিমূলক ভাব বা প্রত্যয়।

সাক্ষাৎ অনুভবের মধ্যে পরমার্থসতের রূপরেখার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের ধারণা এই যে আত্মার বিকাশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম অবস্থা হল একপ্রকার প্রাক-সম্বন্ধীয় অস্তিত্বের অবস্থা। সেই অবস্থার ওপর আমি এখানে জোর দেব না। আরো একপ্রকার অবস্থা আছে; মনে হয় সেটা হচ্ছে স্পষ্টতর ও তার সম্বন্ধে সংশয় আরো কম। সেই অবস্থার দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেই অবস্থাটা হচ্ছে ভেদবিচার করবার জটিল মানসিক অবস্থা। এই অবস্থায় আমরা চেতনাস্থিত নানাকে অনুভব করি এবং তার উপর ও তার বিপক্ষে আমরা ঐক্যের একটা স্পষ্ট ধারণা করবার চেষ্টা করি। ঐক্যের প্রত্যয় বা ভাবটা এখানে বিশ্লেষণের ফলে পাওয়া যায় এবং স্বগতভেদের বহুত্বের বিরোধিতার ফলে তার রূপটা নির্দিষ্ট হয়। এখানে ঐক্যের দৃষ্টিটা অপর আর-একটা দৃষ্টির বিরোধিতার জন্য জাগে; সেইজন্য ঐক্যের যেরকম অস্তিমূলক ভাব আমরা খুঁজছি, সেরকম ভাব এখানে পাওয়া যায় না। তবে সেরকম ভাব বা প্রত্যয় স্পষ্টত না থাকলেও এবং তার কথা বাদ দিলেও বলা চলে যে এখানে সমগ্র মানসিক অবস্থাটাকে আমরা অখণ্ডরূপে সত্য সত্যই অনুভব করি। মনে হয় যেন যে-সম্বন্ধগুলো আমরা পরে লক্ষ্য করি সেগুলোর উপরে বরং সেগুলোর নীচে একটা সাকল্য রয়েছে এবং সেই সাকল্যের মধ্যে

পার্থক্যগুলো জড়ো হয়ে মিশে আছে। মনে হয় যেন আমাদের মানসিক দশাটা হচ্ছে এক অখণ্ড অনুভূতির পশ্চাৎভূমি এবং তার মধ্যে কতগুলো বিভেদকে আমরা সন্নিবেশিত করছি; সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হয় যেন চেতনদশাটা এক সামগ্র এবং তার মধ্যে পূর্বসিদ্ধ কতগুলো পার্থক্য গোড়া থেকেই নিহিত হয়ে আছে। এখন এটা ঠিক যে আমাদের বর্ণনার মধ্যে অসংগতি আছে। কারণ পার্থক্যের তথ্যের জন্য সম্বন্ধনির্ণয় এবং ভেদবিচার দুইই দরকার হয়। অর্থাৎ অনুভূতির বর্ণনা দেওয়া যায় না। অনুভূতির রূপান্তর বিনা তাকে চিন্তনে পরিণত করা যায় না। অপর পক্ষে এই অব্যাকৃত সমষ্টিটা হচ্ছে অসমঞ্জস ও অস্থির। তার প্রকৃতিই হচ্ছে নিজেকে অতিক্রম করে সম্বন্ধাশ্রয়ী চৈতন্যে পরিণত হওয়া। এই সম্বন্ধগ্রহী চেতনা হচ্ছে একটা উচ্চতর অবস্থা। তার মধ্যে এসে সমষ্টিটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তবুও প্রতিক্ষণেই অস্পষ্টভাবে অখণ্ড চেতনদশার অনুভূতিটা টিকে থাকে। এবং এইজন্যই আমাদের স্বীকার করতে হয় যে জটিল সামগ্রগুলোরও একটা অখণ্ডতা আমরা অনুভব করি। কারণ, এক দিকে এই চেতনদশাগুলো যে মিশ্র নয় তা বলা যায় না; আবার অন্য দিকে এও বলা চলে না যে সেগুলো কেবলমাত্র বহুল; আবার এও বলা কঠিন যে সেগুলোর ঐক্য স্পষ্ট ও প্রকট কিম্বা সেগুলোর ঐক্যটা হচ্ছে সেগুলোর বহুত্বের সঙ্গে বিরুদ্ধ সম্বন্ধ দ্বারা সম্বদ্ধ ও পুষ্ট।

আমাদের দৈনন্দিন প্রক্ষোভ বা বেদনার সামগ্রের মধ্যে এই তত্ত্বের অতি সহজ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সামগ্রকে আমরা পাই অখণ্ডরূপে অথচ মিশ্ররূপে; তার বৈচিত্র্য বা নানাত্ব অংশত অস্পষ্ট থাকে; মনে হয় তার নানাত্ব যেন ব্যাবৃত্ত হয়ে ও বিভিন্ন সম্বন্ধের দ্বারা উপহিত হয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। আমি অবশ্য আবার বলব যে চেতনার এইরকম অবস্থা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং চঞ্চল। এইরকম দশা কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল নয়। অবস্থাটাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করতে গেলে সেটার অন্তর্ধান হয়। যে বেদনা বা প্রক্ষোভকে আমরা জ্ঞানের বিষয়ীভূত করি, সেটাকে কখনো আমাদের অনুভূত ও যথাবৎ প্রক্ষোভ বা বেদনা বলা যায় না। জ্ঞানের বিষয়ীভূত হওয়ার জন্য আভ্যন্তরিক পৃথককার দরকার হয়; এবং তার ফলে বেদনাটার রূপান্তর ঘটে এবং সেটা আর-একটা সমগ্র অনুভবের উপাদানমাত্র হয়ে ওঠে। জ্ঞানের বিষয়ী-

ভূত বেদনা ও তার পশ্চাদ্‌বর্তী অনুভূতি দুটোর মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সে-দুটো উভয়েই আর একটা নূতন অখণ্ড অনুভূতির অংশ হয়ে পড়ে। (ঊনবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) পরপর আমরা অনুভব করে যাই ; কিন্তু সব সময়েই আমরা অনুভব করি অখণ্ডরূপে ; এবং যখনই কোনো অনুভবকে আমরা জ্ঞেয়রূপে বা বিষয়রূপে পরিণত করি, তখনই তার অখণ্ডতা নষ্ট হয়ে যায় ; কিন্তু এক অখণ্ডতা নাশের পর অন্য আর এক নূতনতর অখণ্ড অনুভবের উদয় অবশ্যম্ভাবী। এবং এই কারণেই যতক্ষণ একটা অনুভব স্থায়ী থাকে ততক্ষণ তাকে আমরা অভঙ্গরূপে পাই ; অথচ অনুভবটিকে অমিশ্রও মনে হয় না কিংবা সম্বন্ধ দ্বারা উপহিত কতগুলো পদ বলেও মনে হয় না।

সম্বন্ধ-নিম্ন ঐক্যের এই অনুভব থেকে আমরা সম্বন্ধ-ঊর্ধ্ব উচ্চতর অনুভবের ঐক্যের ধারণা করতে পারি। এবং এইভাবে আমরা তত্ত্ববস্তুর ঐক্যের একটা অস্তিমূলক ধারণা করি। অবিশ্বাসী আপত্তিকারীকে অন্তত এই তিনটে সিদ্ধান্ত স্বীকার করতেই হয়। প্রথম সিদ্ধান্ত : তত্ত্ববস্তু হচ্ছে একটা সদর্থক পদার্থ ; সমস্ত নেতিবচনের স্থান তত্ত্ববস্তুর মধ্যে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত : সর্ববিধ নানাত্ব হচ্ছে তত্ত্ববস্তুর অঙ্গের ভূষণ ; তত্ত্ববস্তুর মধ্যেই সেগুলোর স্থান। এবং তৃতীয় সিদ্ধান্ত : তথাপি তত্ত্ববস্তুকে বহু বা বহুল বলা যায় না। এতখানি স্বীকার করবার পর পরমপদার্থ বা পরমসৎ এক, এই উক্তি স্বীকার করাই হচ্ছে আমার মতে সবচেয়ে কম বিভ্রান্তিকর।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পরমবস্তু হচ্ছে অদ্বিতীয়। তার ঐক্য অবিসংবাদিত ; কিন্তু এই ঐক্যের অন্তর্নিহিত উপাদানটা কি ? আমরা আগেই দেখেছি আমরা যা-কিছু জানি তাই অনুভব-স্বরূপ বা সংবিৎ-স্বরূপ। সুতরাং পরমবস্তু হচ্ছে এক অখণ্ড অনুভব বা চেতনা। আমাদের এই নির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র নেই।

আমাদের পক্ষে এমন-কিছু আবিষ্কার করা অসম্ভব যেটা বেদনাও নয়, ভাবনাও নয়, এষণাও নয় বা তজ্জাতীয় কিছুই নয়। এগুলো ছাড়া আমাদের অন্য-কিছু জানা নেই এবং অন্য-কিছুর প্রত্যয় বা ভাব একেবারে অসম্ভব। এরকম অন্য কিছুর কোনো কল্পিত ধারণা যদি থাকে তা হলে হয় সেটা নিরর্থক এবং নাস্তিমূলক নয়, সেটা হচ্ছে প্রচ্ছন্নরূপে অনুভবমূলক। এরূপ কল্পনার দ্বারা যে-অপরকে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সেই-অপরটা বস্তুত

কোনো সত্যিকারের অপর-কিছু নয়। অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছাক্রমে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে এই তথাকথিত অপরটি একপ্রকার সম্বিৎ বা অনুভব। আপনি যদি বলতে চান যে আপনার অপর-কিছুটা সত্যই অপর-কিছু আমরা তাতে আপত্তি করব না। কিন্তু এই অপর-কিছুও অনুভব বা চেতনার জাতেরই অপর-কিছু। যার সঙ্গে বিরুদ্ধতা করে এই অপরের অপরত্ব এবং বিরোধ তারই আভ্যন্তরিক অংশরূপে এই অপরকে স্বীকার না করলে তার কোনো অর্থ থাকে না। শেষ পর্যন্ত, আমাদের মৌলিক প্রত্যয় বা ভাব হচ্ছে মাত্র একটা এবং সেই ভাবটা হচ্ছে অস্তিমূলক। সেইজন্যই তাকে অস্বীকার করতে গেলেও স্বীকার করতে হয়; এবং নেহাৎ মতিভ্রম না হলে তাকে সংশয় করা যায় না।

আরো বেশি স্পষ্ট ধারণা দেবার চেষ্টা করতে গেলে ব্যাপারটা বিভ্রমের সৃষ্টি করবে। আপনার যদি এমন কোনো অপর বা অতিরিক্ত পদার্থের ধারণা থাকে যেটা অনুভবের উপাদানে গঠিত নয়, আপনি বরঞ্চ সেটাকে দেখান। আমি অচিরে আপনাকে দেখাতে পারব যে সেটাও একান্তরূপে ও সম্পূর্ণরূপে অনুভব ছাড়া আর কিছুই নয়। সর্ববিধ সম্ভব এবং অসম্ভব আত্ম-বিভ্রমের বিষয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নাই। সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি যে এই মূলতত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার চেষ্টা হবে এখন এই তত্ত্বটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যগুলো বিবৃত করা এবং কতগুলো অস্পষ্ট ধারণার নিরসন করা।

আমি আবার একবার পূর্বালোচিত নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদের প্রসঙ্গে ফিরে যাব। প্রসঙ্গটা দুরূহ। একবিংশ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তবে কয়েকটা বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করলে দোষ হবে না, বরং লাভই হবে। একটা আপত্তি উঠতে পারে যে একক অনুভবকে পরমবস্তু বললে নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদকে ঠেকানো যায় না। আবার হয়তো আপত্তি আসতে পারে যে আমরা যদি আত্মাকে অতিক্রম করতে পারিই তা হলে স্বীকার করতে হবে যে আত্মার অতিরিক্ত কিছু আছে এবং সেই অতিরিক্ত কিছুটা অনুভব-স্বরূপ বা চিৎ-স্বরূপ নয়। অর্থাৎ আমাদের মূল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটা উভয়তোনাশী যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে। এবং আমাদের সিদ্ধান্তটা আত্ম-বিরোধী এই প্রমাণ করে সেটাকে খণ্ডন করবার চেষ্টা হতে পারে।

এই উভয়তোনাশী যুক্তির থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন নয়। আমি বলব যে, যে-কল্পনাগুলোর ওপর যুক্তিটা আশ্রিত, সেই-কল্পনাগুলোই হল অমূলক। প্রথমত মেনে নেওয়া হয়েছে যে অনুভবের সীমা ও আত্মার সীমা হচ্ছে অভিন্ন, অর্থাৎ আত্মা ও অনুভব একই জিনিস। দ্বিতীয়ত মনে করা হয়েছে যে আত্মা হচ্ছে একটা শক্ত ও সুনির্দিষ্ট পদার্থ। সেইজন্য যা আত্মার মধ্যে আছে তার পক্ষে আর আত্মার বাইরে থাকা অসম্ভব, কিংবা যেটা আত্মার বাইরে আছে তার পক্ষে আবার আত্মার মধ্যে আসার উপায় নেই। একবিংশ এবং ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে আমরা প্রমাণ করেছি যে এই কল্পনাগুলো অগ্রাহ্য। এবং এই কল্পনাগুলোর অসারতা প্রমাণিত হলেই উভয়সংকটাত্মক যুক্তিটাও ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

আমরা যতখানি জানি অনুভবের সান্ত কেন্দ্রগুলো পরস্পরের কাছে স্বচ্ছ নয়। কিন্তু এক দিকে দেখতে পাওয়া যায় আত্মা এবং সান্ত অনুভবকেন্দ্র এই দুটো এক জিনিস নয়; অন্য দিকে দেখতে পাওয়া যায় সমগ্র তত্ত্ববস্তুটি হচ্ছে প্রত্যেক অনুভবকেন্দ্রের মধ্যেই উপস্থিত। সসীম চেতনা বা অনুভবের বিভিন্ন ধারা আছে, কিন্তু তার কোনোটারই চারি দিকে প্রাচীর নেই। অনুভব-কেন্দ্রের প্রকৃতির মধ্যেই অপরিহার্যরূপে থাকে সর্বান্তপ্রবিষ্ট পরমসৎ। এবং আত্মা ও জগৎ এক ও অভিন্ন কখনো ছিল না কিংবা কখনো হয় না। কারণ, কোনো অবস্থাতে আত্মা ও জগতের পার্থক্য-বোধ যদি না থাকে সেই অবস্থাতে আত্মা ও জগৎ আছে, এও বলা যায় না। কিন্তু আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ অনুভবের মধ্যে আমরা সমগ্র বস্তুতত্ত্বকেই পাই। তার মানে এমন নয় যে অন্য অনুভবকেন্দ্রগুলোও যথাভূতরূপে সেই অনুভবের মধ্যে থাকে। এই উক্তির অর্থ হল: প্রতি কেন্দ্রই হচ্ছে পরমসতের বিশেষণ এবং পরমসৎ বিশেষ্যরূপে এইসব বিশেষণের প্রত্যেকটার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। সাক্ষাৎ অনুভব থেকে ব্যাকৃতির ফলে আত্মার উদয় হয়। ফলে আত্মা ও জগৎ হল দুটো উপাদান; অনুভবের মধ্যে অনুভবের সাহায্যেই পৃথককারের দ্বারা এ-দুটোর উৎপত্তি হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অহংএর উৎপত্তি হচ্ছে একটা বুদ্ধির নির্মাণের উপর নির্ভরশীল। আত্মার অস্তিত্ব হচ্ছে সর্বক্ষেত্রেই বুদ্ধির সৃষ্টি। সাক্ষাৎ অনুভবকে অতিক্রম করে বুদ্ধির একবিধ রচনার ফল হল আত্মা। সেইজন্য আত্মাকে যে-কোনো অর্থে গ্রহণ করা যাক, অনুভব আত্মার

ধর্ম এরকম উক্তি একেবারেই অচল। অতিক্রমণ ব্যাপার সম্বন্ধে এই বলব যে প্রথম থেকে অনুভব আত্মার অধিক এবং অনুভব আত্মাকে অতিক্রম করেই আছে। কিংবা বলা যেতে পারে, প্রথম অসম্পূর্ণ প্রকার অনুভবকে অতিক্রম করবার একটা ফল হল আত্মা। কিন্তু সম্পূর্ণ অনুভব ও বস্তুসত্তা হচ্ছে একই জিনিস; সুতরাং তাদের বাইরে যাওয়ার বা অতিক্রমণের কোনো কথাই উঠতে পারে না।

আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি পুনরাবৃত্তি করব। সাক্ষাৎ অনুভবের কেন্দ্ররূপে হচ্ছে চেতনার প্রাথমিকতম আবির্ভাব। এই প্রথম আবির্ভাবের সময় আত্মা বা অনাত্মা বলে কিছুই থাকে না। তবে অনুভবটার মধ্যে থাকে তত্ত্ব-বস্তু এবং অনুভবটা তাকে উদ্দেশ্য করেই হয় এবং অনুভবের সীমিত প্রকার বা বিষয়টাই তাকে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখে। সম্ভবপর হলে অনুভব-কেন্দ্রটাই চেতনার পক্ষে তার সমস্ত বিশ্ব হয়ে উঠত। কিন্তু প্রথম অনুভবের মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকে; সেই কারণে অনুভবের অখণ্ডতা নষ্ট হয়ে যায়। আভ্যন্তরীণ অশান্তি এবং বহিস্থ চাপ দুয়ের সংযুক্ত প্রভাবে অনুভবের ঐক্য ভেঙে যায়। এবং এই ভাঙনের ফলে এক দিকে আত্মা এবং অহংএর উৎপত্তি হয় অন্য দিকে অপর জীবাত্মা, জগৎ ও ঈশ্বরের উদ্ভব হয়। এগুলো সমস্তই সসীম অনুভবের বিষয়রূপে উদিত বা অবভাসিত হয় এবং সসীম অনুভবের মধ্যেই এগুলো মূর্তরূপে ও অকৃত্রিমরূপে নিহিত থাকে। এগুলোর খানিকটা অংশ আমাদের অনুভবের মধ্যে অল্পবিস্তর থাকে। তবে যে-অংশটুকু অনুভবের মধ্যে থাকে সেইটুকু হল বাস্তব। এই দিক থেকে সসীম জীবের অনুভবকে অংশত বিশ্বের সমান বলা চলতে পারে। সুতরাং এখানে এ জগতের গণ্ডি পেরিয়ে অন্য জগতে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দুটো জগতের উপাদানই হচ্ছে অনুভব; অনুভবের মধ্যেই সে-দুটোর বস্তুতা। আসল প্রশ্নটা হল জ্ঞানে বা কর্মে দুই জগতের এই সমানধর্মিতা কতদূর রক্ষা করা যায়। প্রকারান্তরে বলা চলে: আমাদের সসীম জীবের অনুভবের মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। বিশ্বকে সম্পূর্ণতা দিতে গেলে এই অনুভবকেই সম্পূর্ণতা দিতে হয়। এইজন্য ভিন্ন জগতে উত্তরণের কথা ভ্রান্ত।

কতগুলো উদ্দেশ্যের জন্য আমি যা অনুভব করি তাকে আমরা আত্মা বা অহংএর বিপরিণতি মনে করা চলতে পারে। এক দিক থেকে এরকম মনে

করা দোষাবহ নয়; কারণ এক অংশে প্রকৃত তথ্য হচ্ছে তাই। কিন্তু সেই অংশ ছোটো একটা অংশ। কোনো অবস্থাতেই আমি যা অনুভব করি তা আমার আত্মার কেবলমাত্র একটা দশা বা বৃত্তি হতে পারে না। আমার আত্মা সাক্ষাৎ বস্তু নয়, কিংবা চরম বস্তুও নয়। সাক্ষাৎ বস্তু হচ্ছে এরকম প্রতীতি বা অনুভব; তার মধ্যে হয় আত্মা এবং অনাত্মা দুইই আছে কিংবা কিছুই নেই। অপর পক্ষে চরম বস্তু সমগ্র বিশ্বের সমান।

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে নিজবিজ্ঞানমাত্রবাদের অন্তর্নিহিত সত্যগুলোর দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। অহং-সমেত সব কিছুই পরমতত্ত্বের পক্ষে আবশ্যক এবং সেগুলো হচ্ছে পরমতত্ত্ব থেকে অবিচ্ছেদ্য। তা ছাড়া বস্তুসত্তার সঙ্গে সংযোগ বা স্পর্শ একমাত্র অনুভূতির মধ্যে দিয়েই সম্ভবপর হয়। এইসব সত্যগুলোর সম্বন্ধে এখানে আবার কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার অনুভব জগতের পক্ষে আবশ্যক; কিন্তু জগতের মাত্র এক দিক হল আমার অনুভব। স্থূলদৃষ্টিতে জগৎ ও অনুভব এক। এক অতি অপ্রধান অর্থে আমার চেতনা এবং তার দশাগুলোকে প্রকৃতপক্ষে অখিল জগৎ বলা চলে; কারণ, এই অর্থে অদ্বিতীয় তত্ত্ববস্তু এবং আমার আত্মা বা অহং হচ্ছে অভিন্ন। কিন্তু তার বিপরীত বললে বিভ্রান্তি কম হবে। অর্থাৎ এই বললে যে সমগ্র জগৎকে আমরা আমাদের অনুভবের মধ্যে পাই। কারণ সমগ্র জগৎটাই অবভাসিত হয় আমাদের চেতনা বা অনুভবের রাজ্যে এবং যখনই অবভাসিত হয় তখনই জগৎটির অখণ্ড সত্তাটা অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

যে আপত্তির ভিত্তিস্থল হচ্ছে যুক্তিহীন কুসংস্কার সেই আপত্তির পর্যালোচনায় সময় নষ্ট না করে এবার আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা যাক। প্রশ্নটা হল পরমার্থসৎ বা পরমাত্মাকে বিভিন্ন ভূতাত্মার সমাহারে রচিত এক তত্ত্ববস্তু বলা যায় কি না? কিংবা ভূতাত্মাসমূহের সমষ্টিই হচ্ছে পরমবস্তু এরকম বলা যায় কি না? প্রশ্নটার নানারকম অর্থ হতে পারে; সুতরাং বিভিন্ন অর্থে প্রশ্নটার আলোচনা দরকার। সর্বপ্রথমে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি বিশ্বে এমন কোনো উপাদান আছে কি যেটা সসীম অনুভব কেন্দ্রগুলোর গ্রাহ্য বা আধেয় নয়। এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের প্রথমে অনুভব-কেন্দ্রগুলোর অন্তর্বর্তী সম্বন্ধগুলোর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে এরকম সম্বন্ধগুলো

হচ্ছে কেন্দ্রগুলোর প্রতীতি এবং সেগুলো হচ্ছে চিন্তনের বিষয়ীভূত। প্রশ্নটা সেইজন্য আমাদের কাছে অন্যরূপ ধারণ করে। প্রশ্নটা হয় এই : অনুভবের এমন কোনো উপাদান আছে কি যেটা কোনো সসীম অনুভব-কেন্দ্রের আধেয় বিষয় নয় ?

আমাদের অজ্ঞান এত বেশি যে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। পরমসত্তা কেন কিংবা কিভাবে বিভিন্ন অনুভব-কেন্দ্রের মধ্যে বিভক্ত হয় আমরা জানি না। বিভক্ত হয়েও পরমসত্তার ঐক্য কি প্রকারে সুরক্ষিত হয় তাও আমরা জানি না। অনেক জীবাত্মার অনুভবের সঙ্গে পরমাত্মার অখণ্ড অনুভবের কি সম্বন্ধ এবং বহু জীবাত্মার পারস্পরিক অনুভবের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাও আমাদের জ্ঞানের অতীত। এবং তাই যদি হয় তা হলে সমগ্রসতের অনুভবের মধ্যে এমন উপাদান থাকবে না কেন যার অনুরূপ অনুভব জীবাত্মার মধ্যে নেই। এ প্রশ্ন সম্পর্কে বিচার করতে গিয়ে আমাদের মনে অন্য দিক থেকে একটা সংশয় উপস্থিত হয়। এইরকম অনাসক্ত উপাদান বা উপাদানের প্রান্তিক অংশের কি কোনো অর্থ হয় ? এইরকম একটা ভাবকে আমরা বুদ্ধিসম্মত বলতে পারি কি ? আমাদের অজ্ঞানের জন্যই বরঞ্চ স্বীকার করা উচিত নয় কি যে সসীম অনুভবের অবিষয়ীভূত কোনো উপাদান অন্যত্র কোথায়ও অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা নেই ? এই বিষয়ে ভাববার পর বুঝতে পারি আমাদের এই সংশয় অমূলক। এই অনাসক্ত উপাদানের ভাবটি একপ্রকার একদেশদর্শনের ফল ; এবং তাকে প্রথমে অসংগত বলেই মনে হয়। এই অনাসক্ত উপাদানগুলোকে আর-এক অখণ্ড অনুভবের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে কল্পনা না করে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কতগুলো পৃথক উপাদানরূপে কল্পনা করলে সেগুলোকে অসম্ভব বলেই মানতে হয়। কারণ এইরকম উপাদানের ভাবের মধ্যে আত্ম-সংগতি নেই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অ-সক্ত উপাদানগুলো সমগ্রসতের অভঙ্গ অনুভবের অংশীভূত আমরা এইরকম কল্পনা করেছি। সুতরাং এখানে অবস্থাটা হচ্ছে ভিন্নরূপ। সীমিত অনুভব-কেন্দ্রের থেকে নিকৃষ্ট এই ভাবটাকে স্ব-বিরুদ্ধ বলা চলে না। সুতরাং এইরকম উপাদানের সম্ভাবনা স্বীকার করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই।

অপর পক্ষে এই সম্ভাবনার বিশেষ কোনো মূল্য নেই। আমরা যদি ধরেও নিই যে সমগ্রসতের মধ্যে বাস্তবিকত এমন-সব উপাদান আছে

যেগুলো সসীম অনুভব-কেন্দ্রগুলোর মধ্যে নেই তা হলেও সমগ্রের অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় না। তা ছাড়া এরকম মনে করবার সপক্ষে কোনো সুযুক্তি নেই। এই দুটো দিকের আলোচনা সংক্ষেপে করা যাক। আমরা দেখেছি যে চেতনা-বিষয়গুলো যদি নির্বিশেষরূপে ও নির্ব্যূঢ়রূপে অ-সক্ত থাকত তা হলে সাংঘাতিক অবস্থার উদ্ভব হত। কিন্তু সব-কিছুই শেষ পর্যন্ত সমগ্রের মধ্যে গলে একাকার হয়ে যায় এবং সমগ্রটা সর্বদাই হল অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ বা অনুভবস্বরূপ। সুতরাং আমাদের মূল সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন দরকার মনে হয় না। কতগুলি চেতনা-বিষয় সীমিত কেন্দ্রগুলোর প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয় নয় এই একক তথ্য থেকে কোনো নূতন সিদ্ধান্তে আসতে পারা যায় না। অপর পক্ষে এটা যে তথ্য তাও ভাববার পক্ষে কোনো সংগত হেতু নেই। আমরা জানি সসীম কেন্দ্রগুলো বিপুল সংখ্যক ও বহুধাবিচিত্র এবং অবিশ্বাস করবার কারণ নেই যে এরকম সংখ্যাহীন আরো কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রগুলোর "অন্তর্বর্তী" সম্বন্ধগুলোর জন্যও বিশেষ কোনো কষ্ট উপস্থিত হয় না। বস্তুসত্তার বাইরে কোথায়ও সম্বন্ধগুলো অবস্থিত এরকম কল্পনা করা চলে না; এবং বাস্তবিকতই যদি সম্বন্ধগুলো কেন্দ্রসমূহের "অন্তর্বর্তী" কিছু হয়ে থাকত তা হলে কেন্দ্রগুলোর বাইরে কতগুলো অতিরিক্ত অনুভব-বিষয় আছে, এরকম মনে করতে হত। কথা ঠিক যে এরকম সিদ্ধান্ত করা তা হলে অন্যায় হত না এবং আমরা দেখেছি যে এরকম একটা ব্যাপার যে মূলত অসম্ভব তাও বলা যায় না। কিন্তু সিদ্ধান্তটি নিষ্প্রয়োজন। কারণ, আমরা যতদূর জানি সম্বন্ধের চেহারার এমন কোনো অংশ বা দিক নেই যেটাকে সসীম কেন্দ্রের অনুভব-বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু বলে মনে হয়। পরমবস্তুর মধ্যে সম্বন্ধগুলো যথাভূতরূপে নেই এবং থাকতে পারে না। পরমাত্মার উচ্চতর অনুভবের মধ্যে সম্বন্ধগুলো রূপান্তর লাভ করে আধৃত হয়। এখন প্রশ্ন ওঠে, এই অনুভবের মধ্যে এমন-কি কোনো বিষয় আছে যা কেন্দ্রগুলোর অনুভবের বহির্ভূত? যদি থাকেও আমাদের জানবার কোনো কারণ নেই। এবং আছে মেনে নিলেও মূল সিদ্ধান্তটা যেমনকার তেমনই থেকে যায়। সুতরাং প্রকৃষ্ট পথ হল বলা যে সেরকম কোনো উপাদান বা বিষয় নেই। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি যে তত্ত্ববস্তুর কোনো অংশই সসীম কেন্দ্রসমূহের অনুভবের বহির্ভূত নয়।

তা হলে কি আমরা বলব যে পরমবস্তু বা পরমাত্মা হল ভূতাত্মাসমূহের যোগফল ? আমার মতে এরকম বলার বিপক্ষে দুটো যুক্তি আছে। চৈতন্য-কেন্দ্র এবং আত্মা বা অহং এক জিনিস নয়। চৈতন্য-কেন্দ্রের মধ্যে অহং বা আত্মা এবং অনহং বা অনাত্মার প্রভেদ সূচিত নাও হয়ে থাকতে পারে ; এবং প্রভেদটুকু সূচিত হোক বা নাই হোক চৈতন্য-কেন্দ্রকে যথার্থত অহং বলা যায় না। আমরা জেনেছি যে আত্মা একটা বুদ্ধির নির্মাণ। সাক্ষাৎ অনুভবের কেন্দ্রমাত্রকে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা চলে না। আবার এও আমরা বলতে পারি না যে প্রত্যেক চৈতন্য-কেন্দ্রের অস্তিত্বের জন্য একটা অনুরূপ আত্মার অস্তিত্বের প্রয়োজন। কারণ, চৈতন্য-কেন্দ্রগুলো অনেক সময় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং একমাত্র স্বমত-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো অর্থে সেগুলোকে আত্মা বলা চলে না। সুতরাং সমস্ত জীবাত্মার সমষ্টিই হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য।

দ্বিতীয়ত পরমসত্তাকে বিভিন্ন ভূতাত্মার সংগ্রহের বা সংঘাতের ফল কোনোরূপেই বলা চলে না। এইরকম সংযোগকে চরম বলে স্বীকার করা যায় না। জীবাত্মাকে পরমসত্তার মৌল উপাদানরূপে কল্পনা করলে বিশ্বাস করতে হয় পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার স্বীয় অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে ও তারাও পরমাত্মার মতো নিত্য ও অব্যয় এবং পরমাত্মা হচ্ছে এই বহু আত্মার একটা সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত রূপমাত্র। কিন্তু আমরা এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে আগে এসেছি তা অন্যরূপ। ভূতবিশেষের চরম পরিণতি ও অন্তিম গতি এইরকম নয়। পরমসত্তার মধ্যে ভূতাদির শুধু পুনর্বিন্যাসই হয় না সেগুলোর স্বকীয় সত্তারও প্রণাশ হয়। পরমসত্তার মধ্যে সমস্ত উপাদান প্রণষ্ট হয়ে এক সর্বতোমুখী পরিবর্তন লাভ করে। সেইজন্য পরমাত্মাকে সমস্ত সসীম আত্মার এক সন্নিবেশ বলা ভুল। কোনো আত্মারই আত্মরূপ পরমসত্তার মধ্যে থাকে না ও সবই রূপান্তরিত হয়।

তা হলে পরমবস্তু এক এবং পরমবস্তু অনুভবস্বরূপ বা সংবিৎস্বরূপ। শুধু আমার অনুভবকে পরমবস্তু বলা যায় না ; সকল দেহী কিংবা আত্মার সমবায়কেও পরমবস্তু বলা চলে না। তাকে অনুভব ও অনুভব-অতিরিক্ত অন্য-কিছু এই দুয়ের ঐক্য বলা চলে না ; কারণ সেই অপর-কিছুকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় তাও অনুভবস্বরূপ। দ্বাবিংশ এবং ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে প্রকৃতি

সম্পর্কে আলোচনার সময় এই সিদ্ধান্তের যাচাই আমরা করেছি। অন্য সব জিনিসের মতো প্রকৃতির স্বরূপও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির অগোচর। প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত হচ্ছে একবিধ সংস্থান, একবিধ যুগপৎ এবং পরম্পরীণ ঘটন-পদ্ধতি ও একবিধ যোগমায়া। এই সংস্থান বা ধারার হেতু আমাদের অবিদিত। কিন্তু এই অবিদ্যার জন্য আমাদের মূল সিদ্ধান্তটা দুষ্ট হয় না। অনুভব থেকে একবিধ একদেশী নিষ্কর্ষণের দ্বারা আমরা প্রকৃতির ভাবটিকে পেয়েছি। এবং অনুভবের মধ্যে প্রকৃতি এবং মন বা প্রাণ সমপর্যায়ভুক্ত নয়। প্রকৃতির চেয়ে মনের বস্তুসত্তা উচ্চতর ; এবং ভৌতিক জগৎকে উচ্চতর এক বস্তুসত্তা ব্যতীত বোঝা যায় না ; এই উচ্চতর সত্তার মধ্যে প্রকৃতি জীর্ণ ও উত্তীর্ণ হয়। অখণ্ড অনুভবকে বিভক্ত করে তবেই প্রকৃতির উদ্ভব হয় এবং এই বিভাজন অসমর্থনীয়।

অখিল অনুভবের এই অখণ্ডতার কোনোপ্রকার সাক্ষাৎ ও সবিশেষ উপলব্ধি অসম্ভব। এই অখণ্ড অনুভব-স্বরূপের স্থূল রূপটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে ; তার সম্বন্ধে সবিশেষ ও সবিস্তার জ্ঞান আমাদের নেই। আমাদের বেদনা বা অনুভূতির মধ্যে থেকে নিঃসম্বন্ধ ঐক্যের একপ্রকার অস্তিমূলক ধারণা আমরা করতে পারি। এই ধারণাটা একেবারে পূর্ণ বা দোষলেশহীন নয়। তবুও সম্বন্ধোত্তর অখণ্ডতার একটা মোটামুটি অস্তিমূলক নিদর্শন এর মধ্যে পাওয়া যায়। তা ছাড়া আমাদের মৌলিক সূত্র অনুযায়ী আমরা এক অখণ্ড সত্তায় বিশ্বাস করতে বাধ্য; অভিজ্ঞতা বা অনুভবের সকল অংশ এই সমগ্র বস্তুর মধ্যে এক সম্বন্ধোত্তর সমন্বয় লাভ করেছে তাও আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য। বিবিধ অনুভব যার মধ্যে ঐক্য লাভ করে সেটাও যদি অনুভব-স্বরূপ না হয় তা হলে পরমবস্তু হয়ে পড়ে অর্থহীন। সমগ্রসৎকে সেইজন্য অখণ্ড অনুভব-স্বরূপ বলতেই হয় ; সর্ববিধ সম্বন্ধের উর্ধ্বে হচ্ছে এই ঐক্য ; এই ঐক্যের মধ্যে সেগুলো ধৃত ও শোধিত হয় এবং ঐক্যটা হচ্ছে অস্ত্যর্থক। এই অখণ্ড বস্তুসত্তার স্বভাবের সূক্ষ্ম ও সবিশেষ ধারাগুলো আমাদের জ্ঞানের অগম্য। তার স্থূল ও নির্বিশেষ রূপটার একটা অস্তিমূলক ও বিমূর্ত ধারণা আমাদের আছে। এবং যে-পরিণতিতে আমরা পৌঁছেছি তাকে অস্বীকার কিংবা সংশয় করা অসম্ভব। তা করতে গেলে আমাদের অজ্ঞাতসারেই সিদ্ধান্তটার যাথার্থ্য স্বীকার করে নিতে হয়।

পরমতত্ত্বকে আমরা জানি; কিন্তু পরমতত্ত্ব, এক অর্থে, জ্ঞান ও অনুভবেরও অধিক। এই প্রসঙ্গে আমরা জানতে চাই পরমসত্তা পুরুষ কি না। আমরা যেখানে এখন এসেছি সেখান থেকে এই প্রশ্নের উত্তর সত্বরই দিয়ে দেওয়া যায়। পুরুষ বা পৌরুষ বলতে আমরা যা বুঝি তার ওপর নির্ভর করে এই প্রশ্নের উত্তরে হাঁ বা না দুইই বলা চলতে পারে। পরমবস্তু সমস্ত কিছুর নিবাস ও আধার; সুতরাং পৌরুষও পরমবস্তুর বিভূতি হতে বাধ্য। এবং পৌরুষ বলতে যদি আমরা বুঝি সসীম দেহীর আধ্যাত্মিক উন্নতির সত্তম ও পূর্ণতম রূপ, তা হলে স্বীকার করতেই হবে পরমসত্তার মধ্যে এইরকম পৌরুষ বেশ প্রচুর পরিমাণেই আছে। কারণ পুনরায় আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে যেটা উন্নততর সেটা সবসময়েই বাস্তবতর। এবং পরমতত্ত্বের মধ্যে অনুভবের ন্যূনতম বা নীচতম রূপগুলোই যখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না তখন পৌরুষ পরমতত্ত্বের মধ্যে আছে কি না এই প্রশ্ন তোলাই কেমন যেন অস্বাভাবিক।

তবে প্রশ্নটা সাধারণত অন্য অর্থে করা হয়। "পৌরুষ" শব্দটা একটা সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হয়। পৌরুষের স্তরের নীচে যা আছে তার সঙ্গে তার উপরে যা আছে, দুটোকেই পৌরুষের পরিপন্থী মনে করে বর্জন করা হয়। অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্নরূপে এরকম একটা ধারণা কাজ করে যে পরমপৌরুষ বা অতি-পৌরুষ এক অসম্ভব জিনিস। মনে করা হয় সংজ্ঞার বা অনুভবের শ্রেষ্ঠ সম্ভবপর রূপই হল পৌরুষ; এবং স্বাভাবিকতই, তাই সত্য হলে, পরম চৈতন্যকে পরমপুরুষ বলতে পারা আর যায় না। এই সিদ্ধান্তটি এবং যে ধারণার ওপর এই সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত দুটোকেই সরাসরি নাকচ করে দেওয়া যায়। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার মধ্যে তাদের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়েছে। যদি 'পৌরুষ' শব্দের প্রচলিত অর্থই এই শব্দের একমাত্র অর্থ হয়, তা হলে পরমবস্তুকে কেবল পুরুষ বলা অসংগত। তাকে কেবল পুরুষ বলা চলে না। কারণ সে পুরুষ এবং তা ছাড়াও অনেক অধিক। এক কথায় বলতে হয় পরমসত্তা হচ্ছে পরমপুরুষ বা অতিপুরুষ।

এখানে 'পৌরুষ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ নিয়ে আমি কোনো আলোচনা করতে চাই না। আত্মা বা অহংপ্রত্যয় সম্বন্ধে আমি আগেই অনেক কথা বলেছি। এখানে আমি এইটুকুই বলব যে আমার মতে একমাত্র সসীম জীবই পুরুষ হতে পারে, নতুবা পুরুষ শব্দ অনর্থক। পরমতত্ত্বের পৌরুষ-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের

উত্তরে আমি সংক্ষেপে বলব এই : যদি পরমসত্তাকে পুরুষ বলে অভিহিত করে আপনি বলতে চান যে পরমার্থসৎ অনুভবস্বরূপ, তার মধ্যে আমাদের শ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত সর্বপ্রকার জ্ঞান এবং অনুভূতিগুলোর স্থান আছে এবং এই সমস্ত জগৎ তার ঐক্যের দ্বারাই তত এবং প্রোত তা হলে আপনার এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে আমিও আছি। কিন্তু আপনার এই পুরুষ শব্দের ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত। ব্যবহারটা অশুদ্ধ বলেই যে আমার দুঃখ তা নয়; কারণ সেটা এমন কিছু বড়ো ব্যাপার নয়। অন্য কারণে এই শব্দটা ব্যবহারে আমার আপত্তি আছে। আমার মতে শব্দটা হচ্ছে বিভ্রম-উৎপাদনকারী এবং অসাধুতার প্রশ্রয়দায়ক।

যাঁরা ঈশ্বরে পুরুষত্বের কথার ওপর জোর দেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধির ব্যবহারে অসাধুতা অবলম্বন করেন। তাঁরা একরকম সিদ্ধান্ত চান এবং সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য আর-একরকম সিদ্ধান্তের জন্য তর্ক করেন। কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটা প্রমাণিত হলেও তা থাকে অন্য এবং তার দ্বারা তাঁদের কার্যসিদ্ধি হয় না। কেবল দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটার সঙ্গে প্রথমটার প্রভেদ অস্পষ্ট রাখার জন্যই তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়। এবং এখানে তাঁদের ব্যবহারিক উদ্দেশ্যটিকে মনে রেখেই বিচার করতে হয়। তাঁরা যে ঈশ্বরকে চান তিনি সসীম। সেই ঈশ্বর তাঁদেরই মতো ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভাবনা ও বেদনার ধারা দিয়ে গড়া, সীমিত ও পরিবর্তনশীল এক পুরুষবিশেষ। তাঁরা পুরুষ বলতে বোঝেন অন্য বহু আত্মার মধ্যে এক পৃথক ও বৃহৎ আত্মা এবং তাদের ধারণা যে অন্যান্য জীবাত্মার সঙ্গে এই বৃহৎ আত্মার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছে; এবং ঘৃণা ও ভালোবাসার এক বন্ধনও আছে; এবং জীবাত্মাদের কর্ম ও আচরণ-অনুসারে এই সম্বন্ধের তারতম্য ও পরিবর্তন হয়। এবং তাঁদের কাছে যে-ঈশ্বর এরূপ নয় সেই-ঈশ্বর বাস্তবিকত শূন্যমাত্র। বর্তমান প্রসঙ্গে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা কতদূর সমর্থনযোগ্য সেই বিষয়ে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এটাও অবশ্য ঠিক যে কেউ কখনো স্থির মস্তিষ্কে এবং সত্য সত্যই এইরকম অর্থে পরমসত্তা পুরুষ কি না সেই প্রশ্ন করতে পারে না। এবং এখানে আমার প্রশ্ন সত্যতা সম্বন্ধে নয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে বুদ্ধিগত সততার সম্পর্কে। আমরা কি চাই তা যদি প্রথম থেকেই স্পষ্ট বলে দিই এবং তার পরে অনুসন্ধান করতে বসি যে এই আকাঙ্ক্ষিত

সিদ্ধান্তটার পক্ষে কোনো সারবান যুক্তি আছে কি না, তা হলে আমাদের আচরণ সাধু ও সংগত হবে। কিন্তু বিচার্য বিষয়টাকে লুক্কায়িত রাখা সাধুতার লক্ষণ নয়। সেইজন্য এক অর্থে ঈশ্বরের পুরুষত্ব চাওয়া এবং ভিন্ন অর্থে পুরুষত্বের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা এবং দুই অর্থের মধ্যবর্তী বৃহৎ পার্থক্যটাকে না বোঝাবার ভান করাকে কপটতা বলতে হয়। সসীম এবং নিত্যপরিবর্তনশীল পুরুষকে বর্জন করলে আপনার কাছে পৌরুষ বলতে মূল্যবান যা কিছু আছে তা সবই চলে যায়। শুধু একটা শব্দ-সহযোগে পার্থক্যটার ওপর সেতু নির্মাণ করা যায় না। এই অপপ্রচেষ্টার ফলে চারি দিক থেকে আরো কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হয় এবং যতই কেন-না বলুন যে আপনি দুই দিকেই আছেন, প্রকৃত ব্যাপার তা হতে পারে না। প্রহেলিকা সৃষ্টির ব্যাপারে আমার একটুও আগ্রহ নেই। এবং এইরকম যাদের ভাবধারা তাদের সঙ্গে 'পৌরুষ' শব্দের অর্থ নির্ণয় করতে যাওয়া বৃথা। তা ছাড়া যথেষ্ট সন্দেহ আছে, 'পৌরুষ' শব্দের অর্থ একটাই কি না। আমি জানি যে পরমসত্তা সসীম পুরুষ নয়। এইটুকু জেনেই আমি তৃপ্ত। কোনো দূর বা সূক্ষ্ম অর্থে পরমসত্তাকেও পুরুষ বলা যায় কি না এই প্রশ্নটা হচ্ছে আমার কাছে গৌণ ও কার্যত তুচ্ছ।

পরমসত্তার পুরুষত্বের প্রশ্নের উত্তরে দুটো একদেশী ভ্রম বাঁচিয়ে চলতে হয়। পরমবস্তু পুরুষত্বভাবসম্পন্ন নয়, নীতিমান নয়, সুন্দর নয় এবং সত্য নয়। কিন্তু এই নেতিবচনগুলোর ফলে নিকৃষ্টতর ভ্রমে পতিত হবার সম্ভাবনা। কারণ, পরমবস্তু অসত্য বা অসুন্দর বা নীতিহীন এরকম উক্তি আরো ভ্রান্ত; কিংবা পরমবস্তু এমন এক নিম্ন সত্তা যার বেলায় এইসব বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না, এই উক্তিও অগ্রাহ্য। সেইজন্য পরমসত্তাকে নিঃপৌরুষ বলার চাইতে বরং সপৌরুষ বলা ভালো। কিন্তু এ দুটো ভ্রান্তির কোনোটারই আমাদের হওয়া উচিত নয়। আভ্যন্তরীণ প্রভেদগুলোর উর্ধ্বে পরমতত্ত্বের স্থান; প্রভেদগুলো পরমতত্ত্বের বহিস্থ নয়, সেগুলো পরমাত্মার অন্তস্থ এবং সেগুলো তার পরিপূর্ণতার উপকরণ। ভিন্নভাবে বলা চলে যে, পরমতত্ত্বকে বিবিধ অত্যাতির এক উদাসীন ও নির্বিশেষ সমূহ বলা অনুচিত; সেগুলোর সর্বতোমুখী ও অবিচ্ছিন্ন সমন্বয়ই হল পরমতত্ত্বের স্বরূপ। সেইজন্য এই প্রসঙ্গে পরমসত্তাকে পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম বলাই শ্রেয়ঃ।

আমরা জেনেছি যে পরমসত্তা এক অনংশ অনুভব-স্বরূপ। এইটুকু জেনে এবার অন্য একটা তুরূহ প্রশ্নের দিকে মন দেওয়া যেতে পারে। প্রশ্নটা হল পরমসত্তাকে সুখী বা আনন্দময় বলা চলে কি? এই প্রশ্নের একটা বিশেষ অর্থ হতে পারে এই যে পরমসত্তার মধ্যে তুঃখের লেশমাত্র আছে কি? পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে দ্বিতীয় অর্থে প্রশ্নটি উত্থাপন করা চলে না। পরমসত্তার মধ্যে তুঃখের চাইতে সুখের আতিশয্য আছে। আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে সুখ ও তুঃখের মিশ্র অনুভূতির মধ্যে পরিণামে যদি সুখ অবশিষ্ট থাকে, তা হলেও অভিজ্ঞতাটা আমাদের প্রিয় হতে পারে। আমরা নিশ্চিত যে পরমসত্তার মধ্যে যে সুখ আছে তা এইরকম উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত সুখ এবং যে আনন্দের বোধ বা অনুভূতি পরমসত্তার মধ্যে আছে তাও এই পরিণাম-সুখের অনুভূতি। এর বেশি বলতে পারা অসম্ভব। অন্য উপাদানের সঙ্গে সম্পূরণের ফলে সুখের মধ্যে এমন পরিবর্তন আসতে পারে যে সেটা ঠিক আমাদের পরিচিত সুখ নাও থাকতে পারে। তার প্রেয়রূপ যেতে পারে না; কিন্তু সমগ্রসতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে মিশে তার রূপের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে পারে। এবং তাই যদি হয় তা হলে পরমসত্তার মধ্যে সুখের অনুভব আছে, এরকম বলা অসংগত হবে। তবে পূর্ণ অবস্থাতে পরমসত্তার মধ্যে যা থাকে সুখও নিশ্চয়ই তার একটা উপাদানবিশেষ।

এইখানে আমাদের মনে একটা সংশয় উপস্থিত হয়। চতুর্দশ অধ্যায়ে এ বিষয়ে অংশত আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তটা কি ভ্রমহীন? পরমসত্তার মধ্যে তুঃখ বা তজ্জাতীয় নিকৃষ্ট কিছুর আধিক্যের সম্ভাবনা নেই এরকম বলা কি যুক্তিসংগত? এই কঠিন প্রশ্নের উত্তরে যা আমার বক্তব্য তা এখনই বলছি। যদি শুদ্ধ সম্ভাবনার নিকৃষ্ট অর্থে সম্ভাবনা শব্দের ব্যবহার করা হয় তা হলে এরকম সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ ভাবটি নিরর্থক বলে মনে হয় না এবং তার মধ্যে স্ব-বিরুদ্ধতা-দোষও ধরা পড়ে না। পরমবস্তু এক নয় কিংবা চিৎ-স্বরূপ নয় এই উক্তি অর্থশূন্য; কিংবা আমাদের এই অস্বীকৃতিমূলক উক্তিটা শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতিতে পরিণত হয়। কিন্তু পরম-বস্তু আনন্দময় নয় এই উক্তিতে এইরকম বিপর্যয় বা তুরবস্থার উদ্ভব হয় না।

সত্য, অভিজ্ঞতাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র ক্ষেত্র যেখান থেকে আমরা সুখ ও দুঃখের বিষয় জানতে পারি। এও সত্য যে আমাদের অভিজ্ঞতার প্রায় সব-কিছু একটা কথাই বলে। সেটা হল এই। একতা ও সমন্বয় যেখানে আছে সেখানে দুঃখবোধ থাকতে পারে না। এমন কোনো বিশেষ তথ্যের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই যার থেকে অনুমান করা চলতে পারে যে সামঞ্জস্যের সঙ্গে দুঃখের সহভাব সম্ভবপর। এবং এই যদি পরিস্থিতি হয় তা হলে আমরা বলব না কেন, "সমন্বয়ের সঙ্গে দুঃখ একত্র থাকতে পারে না। সুতরাং দুঃখের এই স্বরূপকে অস্বীকার করার মানে স্বতো-বিরোধে জড়িয়ে পড়া।" অর্থাৎ এমন কোনো তৃতীয় সম্ভাবনা আছে কি যেটার বিষয় আমরা এ পর্যন্ত ভাবি নি? আমি বক্তব্যটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করব।

আমরা যে-জগৎকে জানি বা দেখি সেইটেই নিশ্চয় গোটা বিশ্ব নয়, এবং কত কি যে আমাদের দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারে তাও আমরা জানি না। সেইজন্য আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে সর্বক্ষেত্রেই অজ্ঞাতরাজ্যের থেকে অনির্দিষ্ট পরিমাণ পরিপূরণ সম্ভবপর। এরকম কি হতে পারে না যে আমাদের না-জানা এমন-সব উপসর্গ বা কারণ আছে যেগুলোর ফলে সুখ ও দুঃখের স্বরূপই বদলিয়ে যেতে পারে? এবং এইভাবে যেটা দুঃখের স্বরূপ বা প্রকৃতি বলে মনে হচ্ছে সেটা প্রকৃতপক্ষে তা নাও হতে পারে? যেটা দুঃখের স্বরূপ বলে আমাদের কাছে মনে হয় সেটা হয়তো বাস্তবিক কতগুলো অজ্ঞাত উপসর্গের আকস্মিক ক্রিয়ার ফলমাত্র। এবং সেইজন্য শেষ পর্যন্ত সমন্বয় ও শৃঙ্খলার সঙ্গে দুঃখের বিরোধ হয়তো নেই। এই মতের বিরুদ্ধে আমরা বলতে পারি যে দুঃখটাই তো এই কল্পনা-অনুসারে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে এবং তার দুঃখত্বও থাকছে না; কিংবা বলতে পারি যে যেটাকে এক বিশেষ মাত্রায় আকস্মিক বলা হচ্ছে সেটা পরোক্ষরূপে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং দুঃখের ধর্ম যা আছে তাই থাকে। আমাদের এইসব আপত্তির জোর আছে স্বীকার করি। কিন্তু সেগুলোকে চূড়ান্ত বা অখণ্ডনীয় বলে গ্রহণ করতে পারা যায় না। দুঃখপূর্ণ বিশ্বের ধারণাকে নিরর্থক বা প্রত্যক্ষরূপে স্ব-বিরুদ্ধ বলা চলে না। সুতরাং সূক্ষ্ম বিচারে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এইরকম বিশ্ব সম্ভবপর।

কিন্তু এইরকম সম্ভাবনার বিশেষ কিছু মূল্য নেই। সম্ভাবনাটার প্রতিষ্ঠা যে একপ্রকার অস্তিবাচক জ্ঞানের ওপর তাও ঠিক। আমরা জানি যে কতগুলো ক্ষেত্রে বিশ্বের স্বরূপের একটা অনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পূরণ বা পরিবর্তন সম্ভবপর। এবং এখানে যেরকম পরিপূরণের কথা কল্পনা করা হচ্ছে তার সঙ্গে জ্ঞাত বস্তুসত্তার সাধারণ প্রকৃতির কোনো বিরোধ নেই। এই মতের সপক্ষে এর বেশি আর কিছু বলা চলে না। এই জগতের সাধারণ ধর্মের সঙ্গে একটা নির্বিশেষ সারূপ্যই এইরকম সম্ভাবনার পক্ষে একমাত্র যুক্তি। এর অধিক কোনো বিশেষ বা প্রাকৃত প্রমাণ এইরকম সম্ভাবনার পক্ষে পাওয়া যায় না। কিন্তু এর বিপক্ষে আছে এই সম্বন্ধে আমাদের বিদিত বিশেষ বিশেষ সর্ববিধ জ্ঞান। ফলে, সম্ভাবনাটার মূল্য বিচার করতে গেলে তাকে নগণ্য বলতেই হয়। আমরা এইটুকুমাত্র বলতে পারি যে এরকম একটা সম্ভাবনা আছে কিন্তু সেটা আর বেশি বিবেচনার নিতান্ত অযোগ্য।

এইখানে এসে আমরা নিরুপাধিক জ্ঞানের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে সোপাধিকজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করি। পরমবস্তু হল সর্ব অনুভবের এক শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলাটিও অনুভব-স্বরূপ ; এই জ্ঞান নিরপেক্ষ এবং নিরুপাধিক। এই পর্যন্ত আমাদের বিচার অভ্রান্ত এবং আমাদের সিদ্ধান্তের বিপরীত হচ্ছে অভাবনীয় ও একান্তরূপে অসম্ভব। অর্থাৎ এই পর্যন্ত ভ্রমের সম্ভাবনা বা আশঙ্কা একেবারেই নেই। কিন্তু তার বাইরেকার সকল বিচার বা অবধারণই ইয়ত্তাযুক্ত এবং আপেক্ষিক ; এবং সেখানকার সব সত্যই অসম্পূর্ণ এবং সেইজন্য অংশত মিথ্যা। এবং সম্পূর্ণতার পরিমাণ আমাদের জানা নেই বলে এমন হয়তো হতে পারে যে ক্ষেত্রবিশেষে আমাদের বিদিত সত্যটা এত দোষযুক্ত যে সেটা অসার বলে পরিত্যাজ্য। এখন থেকে সত্যের বিপরীতটা আর একান্তরূপে অসম্ভব হবে না সেটা হবে সাপেক্ষরূপে ও সোপাধিকরূপে অসম্ভব।

যার সম্পূর্ণ স্বভাব তার নিজের মধ্যে নিহিত তাকে নিরপেক্ষ বলা হয়। যার সকল উপাধি নিজের মধ্যে অবস্থিত তাকে নিরুপাধিক বলা হয়। যার বিপরীত অচিন্তনীয় তাকে অভ্রান্ত বলা হয়। পরমবস্তু অনুভব-স্বরূপ এবং অদ্বিতীয় এই উক্তিটার মধ্যে তিনটি গুণই আছে। কারণ, এই সত্যগুলো সমগ্র অক্ষর বস্তুসত্তার সম্পর্কে নির্বিশেষরূপে সত্য ; সেগুলো গৌণ বা ক্ষর-

জগৎ-সম্পর্কিত নয়। এই সত্যগুলো দিয়ে নিত্যবস্তুর পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া যায় না। মাত্র তার স্বরূপের সারাংশের পরিলেখটি এগুলোর মধ্যে মেলে। অর্থাৎ পরমবস্তু হল এই সত্যগুলোর চাইতে অনেক অধিক; তবে তার আতিশয্যও এগুলোরই আতিশয্য, অন্য-কিছুর নয়। যাই-কিছু না কেন পরমবস্তুর মধ্যে কল্পনা করা যাক, শেষ পর্যন্ত সবই এই নির্বিশেষ সত্যগুলোর অধীন এবং অনুকূল হয়ে পড়ে। সেইজন্য এই সত্যগুলোর বেলায় সব সংশয় ও প্রমাদ নিরর্থক। সমগ্রসতের এই নিত্য ও নির্বিশেষ ধর্মের বিরোধিতা করবার কোনো কিছুর ক্ষমতা নেই। ক্ষর ও সসীম জগৎটা বিশ্বের এক গৌণ অংশ; তার মধ্যেই আছে যত সংশয় ও ভ্রান্তি। যেখানে প্রকৃত কোনো অপরকে পাওয়া যায় না, সেখানে তার কোনো অর্থ নেই। এ পর্যন্ত কোনো অপরকে পাওয়া যায় নি; কিন্তু হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা অপর সত্তা কল্পনা করা যেতে পারে। এইরকম কথাও কোনো কাজের কথা নয়। অসম্ভব মানে হচ্ছে এযাবৎ অলব্ধ। এইরকম আপত্তিও বৃথা। কারণ, অভাব ও অলাভের জন্যও বস্তুসত্তার এক প্রান্তদেশের প্রয়োজন; কিন্তু এখানে সেরকম বহিস্থ দেশের কোনো অর্থই হয় না। "আপনি হয়তো তাকে পেতে পারেন" কথাটা শুনতে খুব সামান্য, কিন্তু তার তাৎপর্যটা বিরাট। কথাটা যদি অর্থপূর্ণ হয় তা হলে বিশ্বাস করতে হয় যে সত্তার কোনো এক লোক বা দেশে আছে যেখানে জিনিসটাকে পাওয়া যাবে। এইখানে এই-রকম অতিরিক্ত সত্তা-লোকের বিশ্বাস অচল; সেইজন্য কথাটা হচ্ছে স্বতো-বিরুদ্ধ এবং অগ্রাহ্য। অতএব সংশয় হচ্ছে ভিত্তিহীন।

যার বিপরীত হচ্ছে অভাবনীয় বা অচিন্তনীয় তাকে আমরা সত্য বলে স্বীকার করি। এই বিপরীত ভাবনার অক্ষমতাই হল সত্যের লক্ষণ। কিন্তু আমাদের জানা উচিত অচিন্তনীয় বলতে আমরা কি বুঝি। চিন্তার এই অক্ষমতা কি চরম বা নিত্য না আপেক্ষিক বা সাময়িক? এবং এই অক্ষমতা কি আমাদের অশক্তি কিংবা অভাববোধের জন্য? এই প্রসঙ্গে আবার একবার অসম্ভবপরতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলো স্পষ্ট করে নিলে ভালো হয়। (চতুর্বিংশ এবং ষড়বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অসম্ভব দ্বিবিধ: নির্ব্যূঢ়রূপে বা নিরপেক্ষরূপে অসম্ভব এবং ব্যূঢ়রূপে বা সাপেক্ষরূপে অসম্ভব। কিন্তু কেবলমাত্র আমাদের অশক্তি কখনো অসম্ভবের ভিত্তি হতে পারে না। কারণ,

আমাদের সমূলক জ্ঞানের বিসংবাদী না হয়ে কোনো জিনিস অসম্ভব হতে পারে না। যেখানে অবশ্য সেই জ্ঞানটা আপেক্ষিক সেখানে আমাদের শক্তি-হীনতার কারণে তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকে। জ্ঞানের এই অসম্পূর্ণতার জন্য অর্থাৎ পরোক্ষরূপে আমাদের অশক্তির জন্য অসম্ভবতার বল কমে যায় এবং সেটা সোপাধিক হয়ে পড়ে একথা বলা চলতে পারে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই অসম্ভাবনার ভিত্তি বা উৎপত্তিস্থল একান্ত অসামর্থ্য হতে পারে না। আমরা যখন বলি, "আমার পক্ষে অসম্ভব" তখন তার মানে এ নয় যে "আমি অপারগ", তার মানে "আমি বাধা পাচ্ছি"।

নিরপেক্ষরূপে বা চরমরূপে অসম্ভব হওয়ার মানে নিত্যবস্তুর অবগত প্রকৃতির বিরোধী হওয়া। এবং এই অর্থে যা অসম্ভব তার রূপ হচ্ছে আত্ম-বিসংবাদী। যেটাকে অস্বীকার করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে অজ্ঞাতসারে স্বীকার করতে হয় তার নাম এইরূপ অসম্ভব। এখানে আমাদের বস্তুমূলক জ্ঞানটা হচ্ছে সমগ্রের সম্বন্ধে ; সুতরাং তার বাইরে আর কিছু নেই। এই জ্ঞানের বাইরে এতটুকুও শূন্য স্থান নেই যার মধ্যে আমাদের অশক্তি দাঁড়াতে পারে। এবং আমাদের যত অক্ষমতা ও অভাবের জ্ঞান হচ্ছে জানা-জগৎ সম্বন্ধেই।

ক্ষর ও সসীম জগৎ সম্বন্ধীয় আমাদের জ্ঞান হল অপ্রধান জ্ঞান। যা এইরকম জ্ঞানের বিরোধী তা আপেক্ষিকরূপে অসম্ভব। যেটা সাপেক্ষরূপে অসম্ভব সেটা হতে পারে না, কারণ আর-একটা-কিছু আছে। সেটাকে যতক্ষণ সত্য বলে আমরা বিশ্বাস করব ততক্ষণ এটাও অসম্ভব হয়ে থাকবে। এখানে যে জ্ঞানের পরিপন্থী হওয়ার জন্য একটা জিনিস অসম্ভব হচ্ছে সেই জ্ঞানের পূর্ণতার মাত্রাভেদ আছে। সেইজন্য তার নিঃসংশয়তার মাত্রাভেদের ওপর অসম্ভবপরতার দৃঢ়তার তারতম্য নির্ভর করে। এখানেও অসম্ভববোধের কারণ আমাদের অশক্তি এবং ব্যর্থতা নয়। ফলত অসম্ভবকে আমরা খুঁজে পাই না বলে যে অস্বীকার করি তা নয় ; সেটাকে অস্বীকার করি কারণ সেটাকে পেয়ে দেখি তার সঙ্গে আমাদের বস্তুমূলক ও নিশ্চিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু অপর পক্ষে এও সত্য যে আমাদের এই জ্ঞান হচ্ছে সপ্রমাদ ও সীমাযুক্ত। আমাদের অক্ষমতার ও অশক্তির দরুন এই জ্ঞান আপেক্ষিক।

শেষ কথাটায় আবার ফিরে আসব। তার আগে জিনিসটাকে আর-এক দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করব। কোনো জিনিসের বিপরীতটা যখন ও যতখানি অসম্ভব, জিনিসটাও তখন ও ততখানি বাস্তব। আবার শেষ পর্যন্ত জিনিসটার বিপরীত ততখানি অসম্ভব, জিনিসটা যতখানি বাস্তব। একটা জিনিসের মধ্যস্থ বস্তুসত্তার পরিমাণের উপর নির্ভর করে তার বিপরীতটা চিন্তা করা কতখানি কষ্টকর হবে। অর্থাৎ যে জিনিসের সম্ভাবনা যত বেশি তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটাবার উপযোগী জিনিসের সম্ভাবনা তত কম। যে-সব সত্যকে আমরা চরম সত্য বলে অভিহিত করেছি সেগুলোর অতিরিক্ত কোনো সম্ভাবনার লেশমাত্র নেই। পরমসত্তার বিপরীত অভাব বা অসত্তা নয়, পরমবস্তুর বিপরীত হল নৈষ্কল্য বা শূন্যতা। তার বাইরে কিছু নেই, কারণ সব কিছু তার ভিতরে। কিন্তু আপেক্ষিক ও অপ্রধান সত্যগুলোর বেলায় অবস্থাটা অন্যরকম। এই সত্যগুলো স্বয়ম্ভর বা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ নয়; সেগুলো যে-সব জিনিসের উপর নির্ভরশীল সেগুলো অংশত আমাদের কাছে অজ্ঞাত। এইজন্য এই সত্যগুলোর মধ্যে আমাদের অশক্তির ছাপ আছে। কিন্তু এই সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে সসীম ও আপেক্ষিক জ্ঞানের সত্যতা এবং সংশয়হীনতা নির্ণয় করবার নীতিটা হচ্ছে বস্তুমূলক। যত ব্যাপক ও সংগতিপূর্ণ হবে এই-সব জ্ঞান তত সেগুলো সত্য ও বাস্তব হবে; এক কথায়, যত শৃঙ্খলাপূর্ণ হবে সেগুলো, তত তারা বাস্তব হবে এবং সেগুলোর নাশক উপাদানও তত অসম্ভব হবে। যে পরিমাণে অস্ত্যর্থক বস্তুসত্তার সঙ্গে বিপরীতটার বিরোধ হবে সেই পরিমাণে বিপরীতটা কল্পনা বা চিন্তা করা কঠিন হবে।

আমরা জেনেছি যে কতগুলো প্রধান সত্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়; এবং অবশিষ্ট সমস্ত সত্যই হচ্ছে গৌণ এবং সেগুলোর মধ্যে অল্পবিস্তর ভ্রম আছে। ক্ষরজগৎ-সম্বন্ধীয় যে-কোনো সসীম সত্যকে পূর্ণ সত্যে পরিণত করতে গেলে তার পরিবর্তন দরকার; অনেক সময় সত্যটার এত বেশি পরিবর্তন দরকার হতে পারে যে তার সম্যক রূপান্তর ঘটতে পারে। চতুর্বিংশ অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছি এবং এই মত সপ্রমাণ করেছি। আমি তবুও আর-একবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে ক্ষর

বা সসীম তথ্যগুলোর সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান হচ্ছে ভ্রমদুষ্ট। এই প্রসঙ্গে আমার সাধারণ যুক্তিটা হল এই। প্রত্যেক সসীম সত্যের সম্পর্ক হচ্ছে একটা অনির্দিষ্টরূপে জ্ঞাত বাহ্যজগতের সঙ্গে; এবং যেখানে এইরকম একটা অনির্দিষ্ট বাহ্যদেশ আছে সেখানে একটা অনিশ্চিত উপাধিনিচয়ের সন্নিবেশ খুবই সম্ভবপর। তার মানেই উপাধির পরিবর্তনে যে-কোনো আপেক্ষিক সত্য সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। এবার সংক্ষেপে সূত্রটার যাচাই করবার চেষ্টা করব।

যেখানে সত্য, আমরা যাকে সমীক্ষা বলি, তার ওপর নির্ভর করে সেখানে একটা জিনিস সুস্পষ্ট। সেখানে কতখানি বাদ পড়েছে তা বলা যায় না; এবং যে-অংশ আমাদের দৃষ্টির মধ্যে পড়ে না সেই-অংশটুকু হয়তো আলোচ্য বিষয়ের বৃহত্তর অংশ হতে পারে। এবং সেইজন্য আমাদের সত্যটির মধ্যে এক অনির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্রম থেকে যায়। সত্যটা বিশেষ কি সামান্য তার জন্য একটুও তফাৎ হয় না। যে-সব উপাদান আকস্মিক সেগুলোকে হয়তো সারভূত বা আবশ্যক বিবেচনা করা হয়ে থাকতে পারে; এবং এইরকম প্রমাদ বা ভ্রান্তি কোথায় গিয়ে যে শেষ হবে তাও নির্দিষ্টরূপে বলা যায় না। উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের সংযোগটা কতগুলো অজ্ঞাত উপা-দানের অদৃশ্য কারসাজি নয়, একথা জোর করে বলা যায় না। এবং এরকম একটা সর্বঘাতী সম্ভাবনার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হয়।

আপনি হয়তো বলবেন যেখানে যথার্থ পৃথককরণ বা নিষ্কর্ষণ সম্ভব, সেখানে ভ্রমের সম্ভাবনার লেশমাত্র নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনি বলবেন যে গণিতের সত্যগুলোর মধ্যে কোনো সংশয় বা ভ্রম নেই। আমাদের সাধারণ সূত্রের বিরুদ্ধে এই আপত্তিটা টিকতে পারে না। একথা ঠিক এমন কতগুলো স্থল আছে যেখানে এক বিশেষ প্রকার ব্যবচ্ছেদ সম্ভবপর এবং সেখানে আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর না করেই সত্য নির্ণয় করতে পারি। আমি স্বীকার করি যে অন্যান্য উদ্দেশ্যে এই পার্থক্যটার গুরুত্ব হচ্ছে যথেষ্ট, কিন্তু এখানে বৈশিষ্ট্যটার গুরুত্ব, প্রকৃতি বা পরিমাণ নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই। যে ব্যাপারটা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে তার দিক থেকে পার্থক্যটা নিতান্ত অবান্তর। কোনো প্রকার আচ্ছিন্ন ধারণাই শেষ পর্যন্ত সমর্থনযোগ্য নয়; যেভাবেই পৃথককরণ করা হোক তাতে আসে যায় না।

আচ্ছিন্ন সত্যগুলোর কোনোটাই সম্পূর্ণ সত্য নয় ; এবং প্রত্যেক পৃথককৃত বা নিকৃষ্ট সত্যের মধ্যেই ভ্রমের সম্ভাবনা আছে এবং সেই সম্ভাবনার পরিমাণ আমাদের জানা নেই। যে-সত্যকে এইভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয় সেটাকে কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বরূপত বাস্তব বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে না। পৃষ্ঠভূমিকে এখানে উপেক্ষা করা হয়, কারণ ধরে নেওয়া হয় যে তার জন্য কোনো পার্থক্য হয় না ; এবং যে-সব উপাদান থেকে এইরকম সত্যকে আচ্ছিন্ন করা হয়, মনে করা হয়, যেন সেগুলোর কোনো কার্যকারিতা নেই ; এবং সেইজন্য সেগুলোকে বাদ দেওয়া হয়। বিধেয়টা যেন উদ্দেশ্যের অপরিহার্য ও নিত্য ধর্ম এইরকম একটা বিশ্বাস এখানে কাজ করে। বিধেয়টা যে উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্য কিছুর জন্য সংযুক্ত এবং সেই অন্য কিছুর অন্তর্ধান বা পরিবর্তন হতে পারে এ কথা একেবারেই মনে থাকে না। কিন্তু এখানে সমগ্র বস্তুসত্তার সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। আমরা যা জানি তা হচ্ছে এক সীমিত ও সংকীর্ণ অংশ ; আমাদের অক্ষমতা ও অজ্ঞানই এই সীমারেখা টেনে দেয়। সেইজন্য এখানে সর্বদাই নানা অজ্ঞাত উপাধির সম্ভাবনা আছে এবং আমাদের বিচারটা হয়তো সেগুলোর উপর নির্ভরশীল এবং এই কারণে আমাদের প্রতিপাদ্য সত্যটি নিতান্ত আকস্মিক এমন খুবই হতে পারে।

এই একই কথা অন্যভাবে আমরা বলতে পারি। আমরা বলতে পারি যে সসীম সত্য সবসময়েই সোপাধিক ও সাপেক্ষ হতে বাধ্য। এইরকম কোনো তথ্য বা সত্যই বাস্তবিকত স্ব-নিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র নয়। সেগুলো সবই হচ্ছে অজ্ঞাত উপাধিনিচয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং এই উপাধিগুলোর পরিমাণের কোনো ধারণাও আমাদের নেই। এর মানে যে কোনো সসীম তথ্য বা সত্য এক অনির্দিষ্ট মাত্রায় আকস্মিক হতে পারে। প্রকারান্তরে বলা চলে যে যদি তার কারক উপাধিগুলোকে সম্পূর্ণ জানা যেত তা হলে হয়তো তার স্বরূপ অন্যরকম হত। তার হয়তো এত পরিবর্তন বা রূপান্তর দরকার হত যে তার স্বভাব রক্ষা করা অসম্ভব হত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এইরকম আমূল পরিবর্তনকে অবশ্য অসম্ভাব্য বলে মনে হয়, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তাকে চরম বা একান্ত অসম্ভব বলা চলে না। প্রত্যেক সসীম জিনিসের সত্তা হচ্ছে অন্য আর-কিছুর জন্য। এখানে "অন্য আর-কিছুর" প্রকৃতি ও পরিমাণ আমরা নির্ধারণ করতে পারি না, এবং "জন্য" শব্দটা "যদি থাকে" এই শব্দসমূহের

নামান্তর মাত্র। বলা বাহুল্য যে এমন কোনো সসীম উপাদান নেই যার অস্তিত্ব অজ্ঞাত উপসর্গের প্রভাবে বিপন্ন হবার আশঙ্কা নেই।

আমরা সেই কারণে বলতে পারি যে সর্বত্রই সসীম সত্য এবং তথ্যগুলোর অস্তিত্ব হল বৈতর্কিক। কিন্তু বৈতর্কিকই বলি বা সোপাধিকই বলি আমাদের একটা বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বোঝা যায় যে কোনো এমন সসীম জগৎ নেই যাকে বাস্তব এবং ব্যক্ত বলা চলতে পারে ; কিংবা যাকে এক বিশেষ অর্থে বাস্তব ও প্রকৃত বলে স্বীকার করা যায়। অর্থাৎ তথ্য এবং সত্তার একটা পৃথক জগৎ এবং তার বাইরে আর একটা অবাস্তব শুদ্ধ কল্পনার পৃথক দেশ আছে এইরকম কখনো হতে পারে না। এক দিকে স্বীকার করতেই হয় যে কোনো সসীম সত্তা কখনো পরম বাস্তব হতে পারে না, এবং অন্য দিকেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সর্ববিধ বিধেয়েরই শেষ পর্যন্ত নিত্যবস্তুর মধ্যে স্থান আছে এবং তাকে উদ্দেশ্য করেই সেগুলোকে আমাদের প্রয়োগ করতে হয়। বিধেয়গুলো বিভিন্ন মাত্রায় নিত্যবস্তুর প্রতি প্রযোজ্য ; এইজন্য সেগুলোর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ; এবং এও সম্ভবপর যে পরিবর্তনের পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলো হয়তো শেষ পর্যন্ত ভ্রান্ত। সেইজন্য স্থলবিশেষে এই পরিবর্তনের ফলে অমিত রূপান্তর ঘটতে পারে। এই কারণেই সসীমকে উপহিত না বলে বৈতর্কিক বা উপাধেয় বা সোপাধিক বলা শ্রেয়ঃ। কোনো একটা জিনিস উপহিত হয়েও সুস্থির এবং অবিচলিত থাকতে পারে যদি তার কারক উপাধিগুলো তেমন হয়। কিন্তু সসীমের কারক উপাধিগুলো অন্যরকম ; সেগুলো এমন যে ক্ষেত্র-বিশেষে তাদের প্রভাবে সসীমের বিশেষ স্বভাবটা অনির্দিষ্টরূপে পরিবর্তিত হওয়া খুবই সম্ভবপর।

প্রত্যেক সীমিত তথ্য এবং সত্যই হচ্ছে খানিকটা অবাস্তব এবং অসত্য। এবং সেটা কতখানি মিথ্যা তা নিশ্চিতরূপে জানা শেষ পর্যন্ত অসম্ভব। অসম্ভব এই কারণ যে আমাদের অজ্ঞান অপরিসীম, আমাদের সবরকম মানসিক ব্যবচ্ছেদ বা পৃথককারই বিপজ্জনক এবং অদৃষ্টের শক্তি হল অপরিমেয়। আমাদের জ্ঞান যদি সম্পূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হত তা হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত। আমরা তা হলে সমগ্রের মধ্যে প্রত্যেকটা জিনিসের স্থান কোথায় তা জানতে পারতাম এবং তার সত্যতা ও মিথ্যাত্বের পরিমাণ

নির্ধারণ করতে পারতাম। এইরকম সুশৃঙ্খল জ্ঞান থাকলে পৃথক অজ্ঞানের কোনো প্রান্তদেশ থাকত না এবং বিশ্বের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ ও বিশদ জ্ঞান আমাদের থাকত। তবে এইপ্রকার সর্বব্যাপী, সুষম ও পূর্ণ জ্ঞান নিশ্চয়ই কখনো মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

অন্তত বর্তমানের জন্য পরমবস্তু-সংশ্লিষ্ট কতগুলো সত্যকে নিত্য ও উপাধি-নিরপেক্ষ রূপে স্বীকার করতে বাধা নেই। এই দিক থেকে সে-গুলোকে অন্যান্য সর্ববিধ গৌণ সত্যগুলোর থেকে ভিন্ন বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর গৌণ সত্যগুলোর বেলায় আমরা কেবল এই বলতে পারি যে সেগুলো হচ্ছে কম-বেশি ভ্রম-যুক্ত। সেগুলোর সব-কটারই সম্বন্ধে একপ্রকার বুদ্ধিজনিত সংস্কার বা সংশোধন সম্ভবপর বা দরকার হতে পারে, এবং এই সম্ভাবনার পরিমাণ নিশ্চিতরূপে জানবার কোনো উপায় নেই। জ্ঞানের এক-এক ক্ষেত্রে আমাদের বৌদ্ধিক ব্যবচ্ছেদ বা পৃথক-করণের ক্ষমতা এক-এক রকম। তবে যে-ক্ষেত্রেরই সত্য হোক না কেন, ক্ষর-জগৎ-সম্বন্ধীয় কোনো সসীম সত্যই একেবারে নিঃসংশয় ও সুস্থির নয়। সেগুলোর প্রত্যেকটার বেলায় সবসময়েই ভ্রমের সম্ভাব্যতা আছে এবং সেগুলোর অন্তর্নিহিত প্রমাদ-দোষটা শেষ পর্যন্ত একটা মাত্রার ব্যাপার মাত্র। এবং এই সত্যগুলোর মধ্যে যেগুলো সমগ্রতা বা পূর্ণতার যত কাছাকাছি সেগুলো তত বেশি সত্য ও দৃঢ়।

পূর্ণতা ও সমগ্রতাই হল আমাদের মাপ। সম্পূর্ণ শৃঙ্খলার ভাব বা অখণ্ডব্যক্তিতার আদর্শই হল আমাদের বিচারের মূলসূত্র। চতুর্বিংশ অধ্যায়ে এই আদর্শের স্বরূপ আমরা নির্ণয় করেছি। আমার বিশ্বাস যে প্রধান নিয়মটা বুঝতে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না। আসল অসুবিধা হয় যখন আমরা নীতিটাকে সবিস্তারে প্রয়োগ করতে চাই। আমরা আগেই দেখেছি যে আভ্যন্তরীণ সংগতির নীতি ও প্রশস্ততম প্রসারের নীতি, দুটোই শেষ পর্যন্ত এক জিনিস। কারণ সে দুটো হচ্ছে অখণ্ড ও সর্বতোদেশী ঐক্যের প্রত্যয়ের বা ভাবের দুটো বিভিন্ন দিক মাত্র। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যে-জিনিসটার বিপরীতটা যত বেশি অচিন্ত্য তার বাস্তবতাও তত বেশি দৃঢ়। এই নিয়মটা অংশত সত্য। কিন্তু অন্য দিকে, বিপরীতটা তখনই বেশি

অচিন্ত্য বা অসম্ভব হবে যখন জিনিসটা স্বরূপত বাস্তব বেশি এবং তার সম্ভাব্যতা ও সত্যতাও বেশি। পুনরুক্তি সত্ত্বেও আমি আবার বলব যে যাচাই করার মূল নীতিটা হল অস্তিমূলক বা বস্তুবাচক। যে জ্ঞানের শাখা যত শৃঙ্খলাবদ্ধ সুসমৃদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত, তার সঙ্গে অন্য আর-একটা জিনিসের সংঘর্ষের অসম্ভবতা ততই বেশি। কিংবা আমাদের মতটাকে অন্য ভাবেও প্রকাশ করা চলে। যে তথ্য বা গ্রাহ (ভাব) প্রত্যক্ষরূপে কিংবা পরোক্ষরূপে স্বীকৃত জ্ঞানের যত বেশি পরিপন্থী তার অসত্য, অসম্ভব ও অভাবনীয় হবার সম্ভাব্যতা ততই বেশি। এবং কতগুলো সসীম সত্য আছে, সেগুলোর বেলায় বুদ্ধিজনিত সংশোধন বা ভ্রান্তির কথা খুবই অসম্ভাব্য। সেগুলোর ক্ষেত্রে ভ্রান্তির সম্ভাবনার মাত্রা এত তুচ্ছ যে সেটা বিবেচনার মধ্যে না আনলেও ক্ষতি নেই। তবে সম্ভাবনা যে একেবারে নেই তা বলা যায় না।

সসীম সত্যগুলো হল বৈতর্কিক; কারণ সেগুলো অজ্ঞাত বা অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এই অদৃষ্টটাও হচ্ছে আপেক্ষিক। অজ্ঞান আমাদের নিরপেক্ষ জ্ঞানের মধ্যে ও তার অধীনস্থ একটা অংশরূপে থাকে; এবং অজ্ঞাত রাজ্যের সাধারণ প্রকৃতিটা হচ্ছে পরম-বস্তুর সাধারণ প্রকৃতির সমান; সুতরাং অদৃষ্টেরও সাধারণ প্রকৃতিটা আমাদের জানা বলতে হয়। কারণ সেই অদৃষ্ট বা অজ্ঞাত উপাদানটাও যে শেষ পর্যন্ত অনুভবস্বরূপ এবং অখণ্ড ও পূর্ণ অনুভবের অংশ মাত্র হবেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে-অজ্ঞানের জন্য সসীমের অস্তিত্ব কখনো সংশয়হীন বা বিপন্মুক্ত নয় সেই-অজ্ঞান, চরম বা ঐকান্তিক নয়। অজ্ঞানটা এইজন্য যে আমরা যা জানতে পারি তার চেয়েও অনেক বেশি আছে; কিন্তু আমরা আগের থেকেই বলতে পারি যে এই আরো বেশি যা-আছে তাও আমরা যা-জানি সেই শ্রেণীরই বা জাতেরই জিনিস। এবার সসীম সত্যের বিশেষ আলোচনা ছেড়ে বিষয়ান্তরে যাওয়া যাক।

আমরা আগে যে প্রভেদটা করেছি সেটা কতদূর বিচারসম্মত তা এখন দেখার সময় হয়েছে। আমরা কতগুলো সত্যকে পরম বা নিরপেক্ষ বলেছি এবং তাদের তুলনায় সসীম জগতের সত্যগুলোকে আপেক্ষিক বা বৈতর্কিক বলেছি। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে এই প্রভেদটা টিকতে পারে না। কারণ কোনো সত্যকে নিরপেক্ষ এবং পরম সত্য বলতে হলে তার

এবং বস্তুসত্তার মাঝখানে কোনো ব্যাবধি থাকা চলে না। কিন্তু সত্য মানেই বস্তুসত্তার সম্বন্ধে বা সম্পর্কে সত্য। এই 'সম্বন্ধে বা সম্পর্কে' শব্দটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যের মধ্যে সবসময়েই বিধেয়ের অতিরিক্ত এবং বিধেয়ের বাইরে একটা কিছু থাকে। এই বাহ্য উপাদানটার জন্য নিরপেক্ষ সত্যের অন্তর্নিহিত বিধেয়কেও শেষ পর্যন্ত সাপেক্ষ বলা চলতে পারে। ফলত উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের পার্থক্যটা সত্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু এই পার্থক্যটার কোনো হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। এ পার্থক্যটাকে অবধারণের অন্তর্নিহিত কোনো কিছুর দ্বারা বোঝা যায় না। এটা অবধারণের বহিস্থ কোনো উপাদানের উপর নির্ভরশীল এবং বলা চলতে পারে যে বহিস্থ উপাদানটা হচ্ছে এক অর্থে অনবগত। অর্থাৎ কাষ্ঠা, আদর্শ বা শুদ্ধসত্তা কখনো বস্তুসত্তার সমান হয়ে উঠতে পারে না। শুদ্ধসত্তা যদি বস্তুসত্তায় পরিণত হয় তা হলে সেটা আর সত্য থাকে না; এবং পরিণত না হয়ে সেটা যদি বিমূর্ত শুদ্ধসত্তাই থাকে তা হলে সেটা আর বাস্তব নয়। শেষ পর্যন্ত, চরম সত্যও যেন প্রমাদযুক্ত তাই বলে মনে হয়।

অবশেষে স্বীকার করতেই হয় যে কোনো সত্যই সম্পূর্ণ সত্য নয়। সত্যের সাহায্যে আমরা বস্তুসত্তার সন্নিকর্ষ লাভ করতে চাই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাই তার একটা অসম্পূর্ণ ও আংশিক প্রতিমূর্তি মাত্র। এবং সত্যের প্রকৃতির মধ্যেই এই দ্বন্দ্বের উৎস আছে। তবুও চরমসত্য ও আপেক্ষিক সত্যের প্রভেদটাকে অস্বীকার করলে চলে না। কারণ প্রথম শ্রেণীর সত্যের কোনো বুদ্ধিজনিত সংশোধন অসম্ভব। কোনো বুদ্ধিজনিত বা প্রত্যয়ের সংস্কারের সাহায্যে চরম সত্যের সামান্যরূপ ও চরমবস্তুর অসামান্য রূপের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপ ঘটানো যায় না। আমরা লক্ষ্য করেছি এরকম সব চেষ্টাই হচ্ছে আত্মনাশী; এবং এই বিষয়ে কোনো সংশয়েরও অর্থ হয় না। পরমসত্যের সংশোধনের একমাত্র পথ হচ্ছে বুদ্ধির পারে যাওয়া। একমাত্র অনুভবের অপরাপর বৃত্তির সহযোগিতায় এই সংস্কার সাধন করা যায়। কিন্তু এই উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের স্বীয় রূপও বিনষ্ট ও বিবর্তিত হয়।

অপর পক্ষের সসীম জগতের সত্যগুলোর বৈশিষ্ট্যই হল এই যে সেগুলোর বুদ্ধিজনিত সংশোধন সম্ভবপর। সত্যরূপে সেগুলো হচ্ছে নির্বিশেষ বা সাধারণ;

সেইজন্য সেগুলো সমগ্রের এক আংশিক বিভাবের সন্ধান দেয়। শুধু এই দিক থেকে যে সসীম সত্যগুলো অসম্পূর্ণ তা নয়। সেগুলো বুদ্ধির যে জগৎ অধিকার করে আছে তার মধ্যে সেগুলোর বাইরে আছে অনেক শূন্য জায়গা। অর্থাৎ সেগুলো ছাড়া আরো অনেক সত্য বা সম্ভাবনা আছে; এই অতিরিক্ত সত্য ও সম্ভাবনাগুলোকে সেগুলোর প্রতিপক্ষে এবং অপররূপে খাড়া করা যেতে পারে। এই দিক থেকেও সসীম জগতের সত্যগুলো অসম্পূর্ণ। কিন্তু চরম সত্যের বেলায় বুদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো বহিরঙ্গন দেখতে পাওয়া যায় না। কোনো অতিরিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বিধেয় নেই যাকে এই সত্যের অন্তর্নিহিত বিশেষ্যের প্রতি প্রয়োগ করে সত্যটার প্রতিপাদ্যের মধ্যে পরিবর্তন আনা সম্ভবপর। আপনি পরম বা নিরপেক্ষ জ্ঞানকে সোপাধিক বা বৈতর্কিক বলতে চান বলুন; কিন্তু মনে রাখা ভালো, কোনো অপর সত্য বা সম্ভাবনাই তার মধ্যে নূতন কোনো ইয়ত্তার নির্দেশ দিতে পারে না।

আমি যে মত প্রকাশ করতে চাচ্ছি তা খুব সরল। সত্য হচ্ছে অনুভব বা সংবিতের একটা ভঙ্গি বা বৃত্তি। সেইজন্য অনেক কিছু তার বাইরে থেকে যায় এবং তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকতে বাধ্য। তবে চরম সত্যের মধ্যে এক-প্রকার সম্পূর্ণতা আছে। কোনো কিছুর সত্য ও বাস্তব হতে হলে যে সাধারণ রূপ বা ধর্ম থাকতেই হবে পরমসত্য তার পরিচয় দেয়। এবং বিশ্বের সামান্য বা নির্বিশেষ ধর্ম-সম্বন্ধীয় এই জ্ঞানের মধ্যে দোষের লেশমাত্র নেই; এই নির্বি-শেষ জ্ঞান নিষ্কলুষ ও সম্পূর্ণ। বিশ্বকে সবিস্তারে কখনো জানা যায় না এবং কখনো জানা যাবেও না। যদি জ্ঞান বলতে আমরা অনুভবকে বুঝি তা হলে বিশ্বকে সমগ্ররূপেও কখনো জানা যায় না এবং কখনো জানা যেতে পারে না; কারণ, অনুভবের সঙ্গে সত্য ও জ্ঞান যদি সমান হয়ে ওঠে তা হলে সেদুটোর স্বভাবের মৌলিক রূপান্তর ঘটে। অপর পক্ষে সত্যরূপীয় ও জ্ঞানরূপীয় বিশ্ব আমরা যে-সত্যকে চরম সত্য বলেছি তার সামিল না হয়েই পারে না। কারণ সেরকম সম্ভাবনা হল আত্ম-ঘাতী। আর অসম্ভবও যদি সম্ভব হয়ে পড়ে তা হলেও সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা বা গ্রাহ থাকতে পারে না। কারণ সেরকম ধারণা আমাদের কাছে নিতান্ত অর্থহীন হবে। পরম সত্য হচ্ছে একবিধ সামান্যজ্ঞান মাত্র; নির্বিশেষ জ্ঞানের বেশি কিছু এই সত্যের দেওয়া

উচিত, যাঁদের ধারণা এই ধরণের তাঁরাই পরমসত্যকে দুষ্ট বা ভ্রান্ত বলতে পারেন। চরম সত্য হল একরকম বিমূর্ত ও একান্তদর্শী জ্ঞান ; এই জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর বিশেষ বিশেষ অংশ সম্বন্ধে সবিস্তার ও সূক্ষ্মজ্ঞান নয়। পরম সত্য হল একদেশী, এবং সমগ্রসতের সর্বাঙ্গের বা সর্ব দিকের সন্ধান এই সত্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। আবার একথাও সত্য যে বিশ্বে এমন কিছুই নেই যা এই সত্যের বহির্ভূত। চরম সত্য হচ্ছে সর্বান্তর্ভাবী ; যাই কিছু-না কেন প্রতিপক্ষরূপে কল্পনা করা যাক, তাই আগে থেকেই হচ্ছে তার অন্তর্বর্তী। কারণ, এমন-কিছু এই সত্যের প্রতিবাদী হতে পারে না যা বুদ্ধিজন্য নয় বা যা সত্যের প্রভুত্ব স্বীকার করে না। সেইজন্য এই সত্যে বেশি কিছু পেতে গেলেও তার রাজ্যের মধ্যেই থেকে পেতে হয়। বেশি চাইলেও একই জাতীয় সামগ্রীর বেশি নিতে রাজি হতে হয়। অর্থাৎ সত্যরূপে বিশ্বের ধর্ম হল অপরিবর্তনীয় ও এক ; এবং বিশ্বের নিত্য ও সামান্য ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের এই জ্ঞান হচ্ছে অভ্রান্ত।

এই বিষয়টাকে অন্য দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় যে সত্য ও নিত্যবস্তুর মধ্যে বিরোধটা হচ্ছে অলীক। নিত্যবস্তুকে পূর্ণ হতে হলে তারই মধ্যে তার নিজের এই আংশিক প্রেক্ষারও স্থান ও মূল্য থাকা উচিত। এবং সত্যকেও সম্পূর্ণ হতে হলে সর্বদেশী ও বিশ্বতোমুখ হওয়া উচিত। সত্যের স্বভাবের মধ্যে যে প্রেরণা আছে তাই তাকে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের অপ্রভেদ স্বীকার করায় এবং তাই তাকে স্বতই তার বাইরে ঠেলে দেয়। পঞ্চদশ, চতুর্বিংশ এবং ষড়্বিংশ অধ্যায়ে এই সিদ্ধান্তটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের প্রধান সিদ্ধান্তগুলো এই : তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা দ্বারা আমরা যে চরম সত্য বা জ্ঞান লাভ করি তার মধ্যে নিত্যবস্তুর সামান্য বা নির্বিশেষ ধর্মকে আমরা পাই। কিন্তু নিত্যবস্তুর এই নির্বিশেষ রূপ বা ধর্ম এবং নিত্যবস্তু এক জিনিস নয় ; পরমবস্তুর এই নির্বিশেষ ধর্মকে জ্ঞান ও সত্যের সাধারণ ধর্মের বেশি কিছু বলা যায় না। তবে সর্ববিধ জ্ঞান ও সত্যের পক্ষে এই ধর্মটি অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয় ; সুতরাং এ ধর্মটা হল নিত্য। সত্য শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ও সাপেক্ষ হতে বাধ্য ; এবং বুদ্ধির সাহায্যে সত্যকে উত্তরণ করা যায় না। স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও নিরপেক্ষতা লাভ করতে হলে বুদ্ধির পারে যেতে হয় এবং সমগ্রসতের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়।

আমার বিশ্বাস, আমরা দাবি করতে পারি যে যে-সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছেছি তার মধ্যে সর্ববিধ চরম দৃষ্টির সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এই সমন্বয়টা নেহাত আপস-রফামূলক নয়। আমাদের এই মতবাদকে বিজ্ঞানবাদ বলা হবে না বস্তুবাদ বলা হবে সে বিষয়ে আমি মাথা ঘামাই নি। ভাব, গ্রাহ বা বিজ্ঞানই যে বিশ্বের প্রধান উপাদান তা এই মতবাদে বলা হয় নি; অপর পক্ষে এমনও এই মতবাদের বক্তব্য নয় যে অন্য আর-কিছু স্বরূপত বাস্তবতর। সত্য হল সমগ্র বিশ্বের একটি একমুখী রূপ মাত্র এবং দর্শনে সত্যাশ্রয়ী ভঙ্গিই হল চরম। তবে দর্শনেও সত্য নিজ অসম্পূর্ণতার সম্বন্ধে অবহিত। আমাদের সিদ্ধান্তের যে-অংশটুকু আমরা অভ্রান্ত বলে দাবি করছি তার সঙ্গে মার্জিত শ্রেণীর লৌকিক জ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই। লৌকিক জ্ঞানের উপযোগী করে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় এগোতে হবে এরকম স্থূল আবদার স্বীকার করা যায় না। কারণ, অধিবিদ্যার চিন্তনপদ্ধতি কিংবা তত্ত্ববিচারের ফলগুলো যে সর্বসাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য হবে এরকম আশা করা ভুল। তবে তত্ত্ববিদ্যার প্রধান সিদ্ধান্তগুলো যদি কাণ্ডজ্ঞানের পরিপন্থী হয় তা হলে খুবই ভাবনার কথা হয়। একমাত্র অতি নির্বোধ যে সেই এরকম অসামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার মনে করে না। আমি অবশ্য বলতে চাইছি না যে ঈশ্বরের পুরুষত্ব কিংবা পারলৌকিক বা ভাবী জীবন প্রভৃতি যে-সব আনুষঙ্গিক বিষয়ে সাধারণ মতৈক্য নেই সেইসব বিষয়েও দর্শনে এক বিশেষ চিন্তাধারা অবশ্যস্বীকার্য। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে আমাদের প্রকৃতির ধাতুগুলোকে সাজিয়ে যে-শৃঙ্খলা রচনা করা হল, তার তাৎপর্য বুঝে কাণ্ডজ্ঞান যদি তাকে নিতান্ত একদেশী বলে বর্জন করে তা হলে মনে করতে হবে আমাদের সংশয় ও দ্বিধার ন্যায়-সংগত হেতু আছে। এই দিক থেকে বিচার করলে আমার মনে হয় আমাদের প্রধান সিদ্ধান্তটা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা যে চরম জ্ঞান-লাভের দাবি করেছি তা হচ্ছে অতিস্থূল এবং নির্বিশেষ শ্রেণীর। এক দিকে এই জ্ঞান আমাদের স্বভাব ও জীবনের প্রধান প্রধান ধারাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট; অন্য দিকে তার মধ্যে অতি-মানুষী লোলুপতার লেশমাত্র নেই। আমরা নিঃসংকোচে বলব যে পরমবস্তুর একটা সাধারণ রূপ আছেই আছে। অনুভব বা চৈতন্যকে নিত্যবস্তুর উপাদান স্বরূপ হতেই হবে। অনুভব-রাশিকে এক

মহৎ শৃঙ্খলা রচনা করতেই হবে এবং শৃঙ্খলাটাকেও অনুভবগত হতেই হবে। সমগ্র অনুভবের মধ্যে সবরকম আভাস ও অবভাস ও বিদিত সত্তা ও সেগুলোর অংশ ও ভগ্নাংশের পূর্ণ ও পবিত্র সমন্বয় ঘটতেই হবে। আমরা যা জানি তার অধিক বা তার ঊর্ধ্বে যদি কিছু ঐ পরমবস্তুর মধ্যে থাকে তা হলে সেই অধিক কিছুও এবং সেই উন্নত কিছুও ঐ একই জাতীয় উপাদানেরই স্ফার ও স্ফীতিমাত্র হবেই হবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। আমরা বলব যে আমাদের এই সিদ্ধান্তটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আমাদের এই জ্ঞান হচ্ছে অপেক্ষাশূন্য ও চরম জ্ঞান। তবে আমরা আগেই বলেছি যে এতখানি জানবার পর আরো অনেক কিছু অজানা থেকে যায়। আমাদের স্বীকার করতে কোনো কুণ্ঠা নেই যে আমাদের জ্ঞানের তুলনায় আমাদের অজ্ঞান হচ্ছে অপরিমেয়। আরো কতরকম অনুভবের ধারা থাকতে পারে, তার সীমা ও সংখ্যা আমরা জানি না। অতিস্থূলরূপে পরম ঐক্যের একটা ধারণা মাত্র আমরা করতে পারি; সেই ঐক্য সম্বন্ধে পূর্ণ বা স্পষ্ট বা বিশদ কোনো জ্ঞান আমাদের নেই। এই অখণ্ড সত্তা নানা জীবরূপে কেন প্রকাশিত হয় তাও আমরা জানি না। আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই-সব জ্ঞান আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কেন অসম্ভব তার হেতুও আমরা জেনেছি। কারণ, সত্য যতক্ষণ সত্য থাকে ততক্ষণই তার সাহায্যে জানা যায়। আমাদের প্রকৃতির সব দিকের সমন্বয়ের পর সেগুলোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। সত্যের সঙ্গে পরমসত্তার সামঞ্জস্য বিধান করতে গেলে সত্যকে সত্যাতীত অন্য-কিছুতে সম্পূরিত হতে হয়। এই অন্য-কিছু সত্য থাকতে পারে না। এই অন্য-কিছু হচ্ছে আমাদের অলভ্য। সুতরাং আমাদের দর্শনে সংশয় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের স্থান আছে। মানুষের সমস্ত জ্ঞানই ব্যর্থ ও সমগ্র বিশ্বের ঐশ্বর্যের তুলনায় অতি হীন ও অকিঞ্চিৎকর হচ্ছে তার বিজ্ঞান। আমাদের দর্শনে এই সুস্থ সংশয়বাদ সমর্থিত হয়। অতিপরিচিত শুভ্র দিবালোকের জগতের মধ্যে সমগ্র সত্য নেই; সেইজন্য চিত্ত বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে আধা-জানা এবং আধা-অজানার প্রতি ধাবিত হয়। এই অজানা রহস্যলোকের দিকে অভিসারের প্রতিও আমাদের দর্শন বিমুখ নয়। বিশ্ব সম্বন্ধে শেষ কথা হল এই : বিশ্ব হচ্ছে অনির্বাচ্য, সবই হচ্ছে বুদ্ধির অগম্য। আমাদের দর্শনে এই অন্তিম ও অনিবার্য ধারণার কারণ কি তাও আমরা দেখতে

পেরেছি এবং এই ধারণার অভ্রান্ত সত্যতাও আমাদের দর্শনে প্রতিপন্ন হয়েছে।

সবই হল ভ্রান্তি, কিন্তু সবই অমূলক মায়া নয়। যেখানে আমাদের ভাব বা প্রত্যয় এবং বাস্তব অভিন্ন নয়, সেখানে এই অনভেদটাই হল ভ্রান্তি। যেখানে এই প্রভেদের জন্য আমাদের প্রকৃতির মধ্যে বিরোধের উদ্ভব হয়, সেখানে বিরোধটাই হল মায়া বা প্রতিভাস। যখন বাহ্য বা আন্তর অনুভবের সঙ্গে ধারণাবিশেষের সংঘর্ষের ফলে আমাদের মধ্যে বিমূঢ়তা আসে, বিশৃঙ্খলতা ও কষ্টবোধ আসে তখন আমরা মায়ার সম্মুখীন হয়েছি মনে করতে হবে। মায়া হল ঘটনাস্রোতের সঙ্গে আমাদের ভাবধারার সংঘর্ষ। এক অর্থে ভ্রম হল একদেশী এবং আংশিক সত্য; এই অর্থে ভ্রান্তি আমাদের স্বভাবের সম্পূর্ণ উপযোগী। অন্য-কিছুই আমাদের জীবন পরিচালনার পক্ষে এত উপকারী ও সত্যলাভের পক্ষে এত সহায়ক হতে পারত না। আমাদের সসীম জীবন হচ্ছে অসংখ্য অসংগতিতে পূর্ণ। তার মধ্যে নানা বৃত্তি ও প্রবৃত্তি কাজ করে; সেগুলোর চরিতার্থতার জন্য আংশিক সত্যরূপী ভ্রমের বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য দরকার। এরকম না হয়ে বস্তু-সংস্থান যদি অন্যরূপ হত তা হলে সসীম জীবন নির্বাহ করাই অসম্ভব হত। সেইজন্য সর্বদা এবং সর্বত্র খানিকটা ভ্রমের বিদ্যমানতার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি এবং ভ্রমের অস্তিত্বের জন্য খানিকটা অমূলক মায়া বা প্রতি-ভাসও সব সময়েই এবং সব জায়গাতেই কাজ করে। সসীম ভূতগ্রামের নিজেদের অন্তরেই আছে আত্মসংগতির অভাব; তার উপর কালান্তর্গত ঘটনার যদৃচ্ছা-জগতের মধ্যে তাদের স্বভাবের বিভিন্ন অংশের চরিতার্থতা লাভ করতে হয়। সেইজন্য ভাব বা প্রত্যয় ও অস্তিত্বের পুরো মিল কখনো হয় না; এবং এই অমিলের জন্য সবসময়েই খানিকটা প্রতিভাস বা মায়ার বর্তমানতা অবশ্যম্ভাবী। সখেদে স্বীকার করতে হয় এরকম লোকও আছে যার কাছে সমগ্র জীবনটাই একটা বঞ্চনা ও নিরাশার ধূসর কাহিনীরূপে প্রমাণিত হয়েছে। এমন কেউই বোধ হয় নেই যার কাছে জীবনের কোনো-না-কোনো অংশ এক বিষণ্ণ ক্ষণে অমূলক এক মরীচিকা বলে মনে হয় নি। কিন্তু তাই বলে জীবন মূলত একটা মায়া বা মরীচিকা এরকম সিদ্ধান্ত বিচারসম্মত মোটেই নয়। আমাদের প্রত্যয় বা ধারণার সঙ্গে

ঘটনার যদি একটা স্থূল ও সাধারণ সামঞ্জস্য থাকে তা হলেই যথেষ্ট। সসীম দেহধারী জীবরূপে আমাদের এর বেশি আশা বা আকাঙ্ক্ষা করার অধিকার নেই। আমরা সেজন্য দৃঢ়তার সঙ্গেই বলব যে যদিও জীবনের এখানে ওখানে নিশ্চয়ই ফাঁকি বা ফাঁক আছে, তবুও গোটা জীবন একটা বিরাট ও নির্মুল মায়া নয়। আমরা পরমাত্মার অনুভব পেতে আগ্রহান্বিত নই ; এবং আমরা নিশ্চিত যে সেই অনুভব পেলেও আমাদের কাছে তার কোনো অর্থই হত না। আমরা জানতে চাই কোন্ পরমবস্তু এই দৃশ্যমান জগতের পেছনে লুকিয়ে আছে এবং আমাদের জীবনটা কি একটা প্রহসন মাত্র। ইহলোকে আমরা যে-সব জিনিসকে সত্যতর, সুন্দরতর, শিবতর বা উন্নততর বলি সেগুলো কি যথার্থত তাই নয়? কিংবা সেগুলো কি অন্য-কিছু? অর্থাৎ আমাদের বিচারের মানগুলো কি মিথ্যা ও প্রতিপত্তিহীন কতগুলো কল্পনামাত্র? বিশ্বের মধ্যে কি সেগুলোর কোনো প্রতিষ্ঠা নেই? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে আমরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলব যে অবভাসিত বা প্রতীয়মান জগতের বাইরে কোথায়ও বস্তুসত্তা নেই ; এবং এই জগতের মধ্যেই নিত্যবস্তুর স্থূল রূপের সন্ধান আমরা পাই। নিত্যবস্তুর পূর্ণরূপ বা বিশ্বরূপ হচ্ছে আমাদের অনুভব বা জ্ঞানের অলভ্য ; কিন্তু তার নির্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে আমাদের একটা আচ্ছিন্ন ধারণা আছে। বিশ্বের এই সামান্য ধর্মকে ভিত্তি করেই আমরা যাবতীয় আপাতদৃশ্য ও প্রতীয়মান সত্তার আপেক্ষিক মূল্য বা সার্থকতা নির্ণয় করতে পারি। আমাদের ভুলভ্রান্তি হয় ঠিক ; তবুও জগতের এই সাররূপই হচ্ছে বস্তুত্ব ও ইষ্টার্থের পরিমাপক আমাদের একমাত্র মান। আমাদের জীবনে মহত্তর, সত্যতর, সুন্দরতর, মঙ্গলতর বাস্তবতর এইসব বিশেষণের যে অর্থ এবং আদর, নিত্যলোকেও সেগুলোর সেই একই অর্থ এবং সেই একই আদর থাকতে বাধ্য। আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে সমগ্রভাবে সত্তার সঙ্গে আমাদের ভাব ও ধারণার সাদৃশ্য বা আনুরূপ্য আছে। কারণ আমাদের কাছে উন্নততর সত্তার সাধারণ অর্থই হল এমন সত্তা যার মধ্যে অধিকতর মাত্রায় বস্তুসত্তা আছে। অদ্বয় পরমসত্তার বাইরে কোনো আবভাসিক সত্তা নেই ; একটা অবভাসিত বা দৃশ্যমান সত্তার মধ্যে পরমসত্তা যত বেশি থাকে সেই প্রতীয়মান সত্তা তত উৎকৃষ্ট ও তত উচ্চ।

পরমসত্তার স্বরূপ শেষ অবধি অজ্ঞেয়; এই সত্য আবিষ্কার করতে বেশি কিছু পরিশ্রম করতে হয় না। প্রতীয়মান সত্তাগুলোর পরম বস্তুসত্তা নেই; সুতরাং এক অর্থে সেগুলো সবই হচ্ছে হেত্বাভাস-পূর্ণ; এই তত্ত্ব বুঝতেও খুব কষ্ট পেতে হয় না। এই সত্যগুলো যে-কোনো লোকের আয়ত্তের মধ্যে। পরমবস্তু সঙ্গহীন; এবং সর্ববিধ প্রপঞ্চের বাইরে এক তুরীয় লোক পরমসত্তা আত্মস্থ হয়ে নিত্য বিরাজ করে; এরকম সিদ্ধান্তও খুব সরল ও সহজ। আর-এক শ্রেণীর ভ্রান্ত ধারণা আছে; সেগুলোও সমান অনায়াসলভ্য। যেমন, পরমবস্তু সর্ববিধ প্রতীয়মান সত্তার মধ্যেই সমানভাবে নিরূঢ় ও নিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই মত-অনুযায়ী সব জিনিসই এত তুচ্ছ বা এত মহার্ঘ্য যে কোনো একটা জিনিসই আর-একটা জিনিসের চাইতে তুচ্ছতর বা মহত্তর হতে পারে না। আমার এই গ্রন্থে এই উভয়বিধ মতের ভ্রান্তি এবং দোষ কোথায় তা দেখাবার চেষ্টা করেছি। শূন্য তুরীয়বাদ এবং তরল সর্বেশ্বরবাদ দুই মতের কোনোটাই গ্রাহ্য বা সমীচীন নয়। যথার্থ দর্শনের মূলকথা হল দুটো ১. সর্ববিধ প্রতীয়মান সত্তাই হচ্ছে পরমসত্তার প্রকাশ বা বিভূতি এবং ২. বিভিন্ন সত্তার মধ্যে পরমবস্তুর প্রকাশের তারতম্য এবং চরম মূল্য বা পরম চরিতার্থতার মাত্রাভেদ আছে। পরমবস্তু এক নিঃসঙ্গ, আচ্ছিন্ন ও অমূর্ত পদার্থমাত্র নয়; তার স্বরূপ হচ্ছে অস্তিমূলক বা গ্রহণধর্মী। সর্ববিধ অবভাসকেই ধারণ করে আছে পরমবস্তু; সেইজন্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের চরম মূল্য আছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়। এই মূল নীতিকে অস্বীকার করলে জগতের সত্যতা, বাস্তবতা বা সার্থকতা নির্ণয়ের কোনো অভ্রান্ত সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। যাঁরা অজ্ঞাত পরমবস্তুর বুদ্ধিমান উপাসক তাঁদের আমি ডেকে বলতে চাই, তাঁরা ভেবে বলুন এই সিদ্ধান্ত কি করে খণ্ডন করা যায়। এক দিকে আমাদের একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে একটা মান বা কাষ্ঠার; অন্য দিকে আমরা দেখছি যে পরমবস্তুর একটা নিশ্চিত ও অস্ত্যর্থক বোধ ছাড়া এরকম মানের জ্ঞান অসম্ভব।

প্রতীয়মান ও প্রকাশমান জগৎ ছাড়া পরমবস্তু শূন্যমাত্র। একাধিক বাস্তব তত্ত্ব বা অন্য-কিছু আছে; এবং ভব-প্রকৃতি এই নির্বিকার তত্ত্ববস্তুদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে; কিংবা প্রতীয়মান জগৎটা তত্ত্ববস্তুদের মধ্যে একটা দোদুল্যমান সম্বন্ধ-সেতুবিশেষ এইরকম কল্পনা

শেষ পর্যন্ত হচ্ছে নিতান্ত অর্থহীন। আমরা দেখেছি যে তত্ত্ববস্তুর বহুত্ব অসিদ্ধ। বহু তত্ত্ববস্তু কল্পনা করতে গেলে সেগুলো হয় অপারমার্থিক বস্তু হয়ে পড়ে, নতুবা দেখা যায় সেগুলো একেবারে কিছুই নয়। কারণ, প্রকাশ বা অবভাস ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে পরমসত্তাকে বিশেষিত করা যায় না এবং পরমবস্তুর বাইরে জগতের অবভাসের কোনো পৃথক অবকাশ নেই। এই অবভাসময় জগতের মধ্যেই পরমবস্তুর অবভাস এবং এই বিশ্বই হচ্ছে পরমসত্তার প্রকাশ; এরকম যদি না হত তা হলে অবভাসময়ী সত্তাও হত এক শূন্যগর্ভ মায়া। পরমবস্তুকে জ্ঞানের মধ্যে ধরা যায় এবং সেইজন্য কোনো একটা জিনিসকে যত বেশি আমরা জানি পরমসত্তাকে এক দিক থেকে তত বেশি আমাদের মধ্যে আনি। পরমবস্তুই হল ভালো ও মন্দ, সুন্দর ও অসুন্দর, সত্য ও অসত্য এবং বাস্তব ও অবাস্তব নির্ণয়ের পরাকাষ্ঠা ও চরম মান। এই পরমবস্তুর সাহায্যে উচ্চতর ও নীচতরের তাৎপর্য ও সংজ্ঞা খুঁজে পেতে হয় এবং এই পরমবস্তুর সাহায্যেই উচ্চতর ও নিম্নতরের ভেদনির্ণয় করতে হয়। এই পরাকাষ্ঠা না থাকলে জগতে উচ্চতর ও নীচতরের মূল্য এক ও সমান হয়ে পড়ত। এবং পরমসত্তা হচ্ছে অদ্বিতীয় অনুভবস্বরূপ; সেই মহৎ অনুভব হচ্ছে সর্বসম্বন্ধের ঊর্ধ্বে। এবং সমস্ত জগৎ হচ্ছে সেই বিরাট অনুভব দ্বারা তত ও প্রোত। এই বিরাটের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হল একান্ত যান্ত্রিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত। পরমসত্তা হচ্ছে শেষ অবধি চিৎসত্ত্বের পূর্ণ, পরম ও অনন্য বাস্তবরূপ। সুতরাং পরমবস্তু চিৎস্বরূপ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই আমি গ্রন্থ শেষ করব। হেগেলের অতিপরিচিত ও বিখ্যাত উক্তিটার কথা এখানে মনে পড়ে। একেবারে বিনা ব্যাখ্যায় সেই উক্তিকে আমি সমর্থন করতে চাই না। তবে আমি যা বলে শেষ করব হেগেলের উক্তি থেকে তার তফাৎ খুব বেশি নয়; এবং বোধ হয় আমার উক্তিটা হচ্ছে হেগেলের মর্মকথা। চৈতন্যের বাইরে কোনো বস্তু নেই এবং কোনো বস্তু থাকতে পারে না; এবং যে-জিনিস যত বেশি চিন্ময়, সেই-জিনিস তত বেশি সত্যিকারের বাস্তব।

—

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	২৪	গোড়াকার সমস্যা	গোড়াকার সমস্যা।
২৭	১২	লাইবিজ দর্শনে	লাইব্নিজ দর্শনে
৩০	৫	পরস্পর-সম্বন্ধ	পরস্পর-সম্বন্ধ
৩৬	১৪	সততক্লিষ্ট-কল্পনা	সততক্লিষ্ট, কল্পনা
৪৯	৩	অন্ধত	অন্ধতা
৫৫	১	বেলা	বেলায়
৬৪	২৮	কল্পিতনিরপেক্ষ	কল্পিত ও নিরপেক্ষ
৬৯	শেষ পঙ্‌ক্তি	পারস্পর্য	পারম্পর্য
৭৪	২৬	আত্মভরিতা	আত্মম্ভরিতা
৭৪	২৭	আত্মভরিতা	আত্মম্ভরিতা
৭৫	১৫	বৈশিষ্ট্য নেই	বৈশিষ্ট্য নেই।
৭৬	২১	যে অনস্তিত্ব নিত্যতা	যে নিত্যতা
৮৭	১১	ইন্দ্রিয়ের কাছে,	ইন্দ্রিয়ের কাছে ;
৯২	১৭	বাস্তবিক	বাস্তবিকত
১০৭	২	জড় পদার্থের	জড় পদার্থে
১১০	২৭	বিশিষ্ট	বিশ্লিষ্ট
১২৬	১৫	সংস্থায়িত্বের	স্থায়িত্বের
১২৮	৩	এইসব সম্ভাবনার তথ্যের	এইসব তথ্যের
১৪৩	১	"যে…হয়"	যে...হয়
১৪৬	১১	তথ্যতা	তথ্য তা
১৫৯	৯	এক ভাব	এক ভাবে
১৬২	১৮	অবিচ্ছিন্ন	অবচ্ছিন্ন
১৬৫	৪	উদ্ভব	উদ্ভব ;
১৬৮	৪	যদি	যদিও
১৬৯	৩	উপযুক্ত	উপর্যুক্ত
১৭০	২৫	ত্রাস	হ্রাস
১৭১	১৩	করবার	দরকার
১৭৫	২০	পূর্ণরচনা	পুনর্রচনা
১৯৮	২১	বাস্তব	সান্তবিক
২৮৬	২২	ব্যকলন	ব্যবকলন
২৯০	১৫	ধারণ করে।	ধারণ করে না।
২৯৪	৩	যুক্তি	যুক্তির
২৯৪	১১	উর্ধ্বযান	উর্ধ্বের
৩০৩	১১	সম্ভাবনা	অসম্ভাবনা
৩০৩	১৮	কিন্তু	কিংবা
৩২৪	২৮	আমরা	আমার
৩৩২	৫	বোঝাবার	বোঝবার